তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

পেপার-ব্যাক সংস্করণ

Panchagram
a novel by
Tarasankar Banerjee

Published by
S. N. Roy
Mitra & Ghosh Pub Pvt. Ltd.
10 S. C. De Street
Cal-73.

পরম শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু

এক

আষাঢ় মাস। শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা পর্ব; দ্বাদশ মাসে বিষ্ণুর দ্বাদশ যাত্রার মধ্যে আষাঢ়ে রথযাত্রা হিন্দুর সার্বজনীন উৎসব। পুরীতে জগন্নাথ-বিগ্রহের রথযাত্রাই ভারতবর্ষে প্রধান রথযাত্রা। সেখানেও আজ জগন্নাথ-বিগ্রহ জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষের ঠাকুর; অবশ্য এ জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষত্ব কেবল হিন্দু-ধর্মাবলম্বীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ; হিন্দুদের সকলেই আজ রথের দড়ি স্পর্শ করিয়া জগন্নাথ-বিগ্রহের স্পর্শপুণ্যলাভের অধিকারী। জগন্নাথ-বিগ্রহ কাঙালের ঠাকুর।

পুরীর রথযাত্রা প্রধান রথযাত্রা হইলেও, হিন্দু-সমাজের সর্বত্র, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের প্রায় গ্রামে গ্রামেই ক্ষুদ্র বৃহৎ আকারে রথযাত্রার উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উচ্চবর্ণের হিন্দু-গৃহে আজ জগন্নাথদেবের উদ্দেশে পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃতের সহযোগে পায়সান্নের বিশেষ ভোগ নিবেদন করা হইবে। আম-কাঁঠালের সময়, আম-কাঁঠাল ভোগের একটি অপরিহার্য উপকরণ। ধনী জমিদারদের অনেকেরই ঘরে প্রতিষ্ঠিত রথ আছে; কাঠের রথ, পিতলের রথ। এই রথে শালগ্রাম-শিলা অথবা প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহমূর্তিকে অধিষ্ঠিত করিয়া পুরীর অনুকরণে রথ টানা হয়। বৈষ্ণবদের মঠে রথযাত্রা উপলক্ষে মহোৎসব সংকীর্তন হয়, মেলা বসিয়া থাকে। বাংলার চাষীদের অধিকাংশই বৈষ্ণবধর্মাশ্রয়ী, তাহারা এই পর্বটি বিশেষ আগ্রহে পালন করে; হলকর্ষণ নিষিদ্ধ করিয়া তাহারা পর্বটিকে আপনাদের জীবনের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়াইয়া লইয়াছে। দু-দশখানা গ্রাম অন্তর অবস্থাপন্ন-চাষীপ্রধান গ্রামে বাঁশ-কাঠ দিয়া প্রতি বৎসর নূতন রথ তৈয়ারী করিয়া পর্বের সঙ্গে উৎসব করে। ছোটখাটো মেলা বসে। আশপাশের লোকজন ভিড় করিয়া আসে। কাগজের ফুল, রঙীন কাগজে মোড়া বাঁশী, কাগজের ঘূর্ণিফুল, তালপাতার তৈরী হাত-পা-নাড়া হনুমান, দুম-পটকা বাজী, তেলেভাজা পাঁপর, বেগুনি, ফুলুরী ও অল্পস্বল্প মনিহারীর জিনিস বিক্রি হয়।

মহাগ্রামের ন্যায়রত্নের বাড়ীতে রথযাত্রার অনুষ্ঠান অনেক দিনের; ন্যায়রত্নের ঊর্দ্ধতন চতুর্থ পুরুষ রথ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দন-ঠাকুর রথারোহণ করেন; পাঁচচূড়া-বিশিষ্ট মাঝারি আকারের কাঠের রথ। একটি মেলাও বসে। আগে মেলাটা বেশ বড় হইত। বিশেষ করিয়া লাঙলের জন্য বাবলাকাঠের টুকরা, বাবুই-ঘাসের দড়ি, তৈয়ারী দরজা-জানালা এবং কামারের সামগ্রী অর্থাৎ লোহার বড় গজাল, ফাল, কোদাল, কুড়ুল, কাটারী, হাতা, খন্তা কিনিতে কয়েক-খানা গ্রামের লোকই এখানে ভিড় করিয়া আসিত। কিন্তু এখন আর সে সব জিনিস কেনাবেচা হয় না। স্থানীয় ছুতার-কামারেরা এখন সাহস করিয়া এ সব জিনিস মেলায় বিক্রির জন্য তৈয়ারী করে না। তাহাদের পুঁজির অভাবও বটে, আবার লোকে কেনে না বলিয়াও বটে। একমাত্র লাঙলের জন্য বাবলাকাঠের কেনাবেচা এখনও কিছু হয় এবং বাবুই-ঘাস এবং বাবুই-দড়িও এখনও কিছু বিক্রি হয়। তবে অন্য কেনাবেচা কম হয় না, দোকানপাটও পূর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যায় আসে, লোকের ভিড়ও বাড়িয়াছে। মাতব্বর ছাড়াও লোকজনেরা ভিড় করিয়া আসিয়া থাকে। সস্তা শৌখীন মনিহারী জিনিসের দোকান, তৈরী জামা কাপড়ের দোকান আসে, জংশনের ফজাই শেখের জুতার দোকানও আসিয়া একপাশে বসে। কেনাবেচা যাহা হয়—তাহা এইসব দোকানেই। লোকও অনেক আসে। কয়েক-খানা গ্রামের মাতব্বর লোকেরা আজও সসম্ভ্রমে ন্যায়রত্নের বাড়ীতে ঠাকুরের রথযাত্রা উপলক্ষে আসিয়া উপস্থিত হয়, রথের টানে প্রথম মাতব্বরেরাই দড়ি ধরিবার অধিকারী। অপর লোকের জনতা দোকানেই বেশী। এখনও তাহারা ভিড় করিয়াই আসে। পাঁপর খাইয়া, কাগজের বাঁশী বাজাইয়া, নাগর দোলায় চাপিয়া ঘুরপাক খাইয়া তাহারাই মেলা জমাইয়া দেয়।

মহাগ্রাম এককালে—এককালে কেন, প্রায় সত্তর-আশী বৎসর পূর্বেও—ঐ অঞ্চলের প্রধান গ্রাম ছিল। ন্যায়রত্নই এ অঞ্চলের সমাজপতি, পরম নিষ্ঠাবান পণ্ডিত-বংশের উত্তরাধিকারী। এককালে ন্যায়রত্নের পূর্বপুরুষেরাই ছিলেন এখানকার পঞ্চ-বিংশতি গ্রাম-সমাজের বিধান-দাতা। পঞ্চবিংশতি গ্রাম-সমাজ অবশ্য বর্তমানকালে কল্পনার অতীত। কিন্তু এককালে ছিল। গ্রাম হইতে পঞ্চগ্রাম, সপ্তগ্রাম, নবগ্রাম,

বিংশতিগ্রাম, পঞ্চবিংশতিগ্রাম—এমনি ভাবেই গ্রাম্য-সমাজের ক্রমবিস্তৃতি ছিল; বহুপূর্বে শতগ্রাম, সহস্রগ্রাম পর্যন্ত এই বন্ধনসূত্র অটুট ছিল। তখন যাতায়াত ছিল কষ্টসাধ্য। এখন যাতায়াত সুগম হইয়াছে কিন্তু সম্পর্ক-বন্ধন বিচিত্রভাবে শিথিল হইয়া যাইতেছে। আজ অবশ্য সে সব নিতান্তই কল্পনার কথা, তবে পঞ্চগ্রাম-বন্ধন এখনও আছে। মহাগ্রাম আজ নামেই মহাগ্রাম, কেবলমাত্র ন্যায়রত্নের বংশের অস্তিত্বের লুপ্তপ্রায় প্রভাবের অবশিষ্টাংশ আঁকড়াইয়া ধরিয়া মহৎ বিশেষণে কোন-মতে টিকিয়া আছে। রথযাত্রার মতই কয়েকটি পর্ব উপলক্ষে লোকে ন্যায়রত্নদের টোল ও ঠাকুরবাড়ীতে আসে। রথযাত্রা, দুর্গাপূজা, বাসন্তীপূজা—এই তিনটি পর্ব এখনও ন্যায়রত্নের বাড়ীতে বেশ একটু সমারোহের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

আজ ন্যায়রত্নের বাড়ীতে রথযাত্রার উৎসব।

ন্যায়রত্ন নিজে হোম করিতেছেন। টোলের ছাত্রেরা কাজ-কর্ম করিয়া ফিরিতেছে। কয়েকখানি গ্রামের মাতব্বরেরা আটচালায় শতরঞ্চির আসরে বসিয়া আছে। গ্রাম্য চৌকিদার এবং আরও কয়েকজন তামাক সাজিয়া দিতেছে। মেলার মধ্যেও লোক-জনের ভিড় ধীরে ধীরে ক্রমশ বাড়িয়া চলিয়াছে। একটা ঢাকী ঢাক বাজাইয়া দোকানে দোকানে পয়সা মাগিয়া ফিরিতেছে।

বর্ষার আকাশে ঘনঘোর মেঘের ঘটা; শূন্যলোক যেন ভূ-পৃষ্ঠের নিকট স্তরে স্তরে নামিয়া আসিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই-একখানা পাতলা কালো ধোঁয়ার মত মেঘ অতি দ্রুত ভাসিয়া চলিয়াছে; মনে হইতেছে সেগুলি বুঝি ময়ূরাক্ষীর বন্যা-রোধী উঁচু বাঁধের উপর বহুকালের সুদীর্ঘ তালগাছগুলির মাথা ছুঁইয়া চলিয়াছে।

ঢাকের বাজনা শূন্যলোকের মেঘস্তরের বুকে প্রতিহত হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

শিবকালীপুরের দেবু ঘোষ ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধ ধরিয়া দ্রুতপদে মহাগ্রামের দিকে চলিয়াছিল। ঢাকের গুরুগম্ভীর বাদ্যধ্বনি দিগন্তে গিয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মহাগ্রামেই ঢাক বাজিতেছে। ন্যায়রত্নের বাড়ীতে রথযাত্রা। এতক্ষণে ঠাকুর বোধ হয় রথে চড়িলেন। রথ হয়ত চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। দ্রুত-গতিতেই সে

চলিয়াছিল, তবু সে তাহার গতি আরও দ্রুত করিবার চেষ্টা করিল।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পৌত্র বিশ্বনাথ দেবুর স্কুলের বন্ধু—শুধু বন্ধু নয়, স্কুলে তাহারা ছিল পরস্পরের প্রতিযোগী। ক্লাসে কোনবার দেবু ফার্স্ট হইত, কোনবার হইত বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথ এম্-এ পড়ে। দেবু পাঠশালার পণ্ডিত। এককালে, অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যুর পূর্বে, একথা মনে করিয়া তীব্র অসন্তোষের আক্ষেপে দেবু বিদ্রূপের হাসি হাসিত; কিন্তু এখন আর হাসে না—দুঃখও তাহার নাই। প্রাক্তন অথবা অদৃষ্ট অমোঘ অখণ্ডনীয় বলিয়া নয়, সে যেন এখন এসবের গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল যতীনকে।

ডেটিন্যু যতীন তাহাকে দিয়া গেল অনেক! এ সমস্তকে জয় করিবার শক্তি—যতীনের সাহায্যই তাহাকে দিয়াছে। যতীনবাবু আজ এখান হইতে চলিয়া গেলেন। এই কিছুক্ষণ পূর্বে সে তাঁহাকে ময়ূরাক্ষীর ঘাট পর্যন্ত আগাইয়া দিয়া বিদায় লইয়াছে। সেখান হইতে সে মহাগ্রামের দিকে আসিতেছে। তাহার শূন্য জীবনে ডেটিন্যু যতীনই ছিল একমাত্র সত্যকারের সঙ্গী। আজ সে-ও চলিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল—এই বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন দিনটিতে এই ময়ূরাক্ষীর ঘাটেই কোন নির্জন গাছতলায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। ওই ঘাটের পাশেই—ময়ূরাক্ষীর বালুচরের উপর সে তাহার খোকনকে এবং প্রিয়তমা বিলুকে ছাই করিয়া দিয়াছে। জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে—অল্পস্বল্প বৃষ্টিতে সে চিহ্ন আজও নিঃশেষে মুছিয়া যায় নাই; তাহার পাশ দিয়া ভিজাবালির উপর পায়ের ছাপ আঁকিয়া যতীন চলিয়া গেল। আজ যে ঘটা করিয়া মেঘ নামিয়াছে, নৈর্ঋত কোণ হইতে যে মৃদুমন্দ বাতাস বহিতে শুরু করিয়াছে, তাহাতে বর্ষার বর্ষণ নামিতে আর দেরি নাই। গ্রাম মাঠ ঘাট ভাসিয়া ময়ূরাক্ষীতে ঢল নামিবে—সেই ঢলের স্রোতে খোকন-বিলুর চিতার চিহ্ন, যতীনের পায়ের দাগ নিঃশেষে মুছিয়া যাইবে—সেই মুছিয়া যাওয়া দেখিবার ইচ্ছা তাহার ছিল। কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাড়ীর আহ্বান সে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না। যতীন তাহাকে জীবনে দিয়াছে একটি সুস্পষ্ট আদর্শ আর ন্যায়রত্ন তাহার জীবনে দিয়াছেন এক পরম সান্ত্বনা। তাঁহার সে গল্প যে ভুলিবার নয়। ঠাকুরমশাই

আজ তাহাকে বিশেষ করিয়া আহ্বান জানাইয়াছেন। তাহার একটি বিশেষ কারণও আছে। স্নেহ তো আছেই, কিন্তু যে কারণ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন—সেই কথাটিই দেবু ভাবিতেছিল।

সরকারী জরীপ আইন অনুযায়ী এ অঞ্চলে সেটেলমেণ্ট সার্ভে হইয়া গেল। রেকর্ড অব্ রাইটসের ফাইনাল পাব্লিকেশনও হইয়া গিয়াছে। সেটেলমেণ্টের খরচের অংশ দিয়া প্রজারা 'পরচা' লইয়াছে। এইবার জমিদারের খাজনা-বৃদ্ধির পালা। সর্বত্র সকল জমিদারই এক ধুয়া তুলিয়াছে—খাজনা-বৃদ্ধি। আইন-সম্মতভাবে—তাহারা প্রতি দশ বৎসর অন্তর নাকি খাজনায় বৃদ্ধি পাইবার হকদার। আজ বহু দশ বৎসর পর সেটেলমেণ্টের বিশেষ সুযোগে তাহারা খাজনা বৃদ্ধি করাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। ফসলের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে—এইটাই হইল খাজনা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। রাজসরকারে প্রতিভূস্বরূপে জমিদারের প্রাপ্য নাকি ফসলের অংশ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আমলে জমিদারেরা সেই প্রাপ্য ফসলের তৎকালীন মূল্যকেই টাকা-খাজনায় রূপান্তরিত করিয়াছিল। সুতরাং আজ যখন ফসলের মূল্য সেকাল হইতে বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছে, তখন জমিদার বৃদ্ধি পাইবার হকদার। তা ছাড়া আরও একটা প্রকাণ্ড সুবিধা জমিদারদের হইয়াছে; সেটেলমেণ্ট আইনের পাঁচধারা অনুযায়ী স্থানে স্থানে সাময়িক আদালত বসিবে। সেখানে কেবল এই খাজনাবৃদ্ধির উচিত-অনুচিতের বিচার হইবে। অতি অল্প খরচে বৃদ্ধির মামলা দায়ের করা চলিবে, বিচারও হইবে অল্প সময়ের মধ্যে। তাই আজ ছোট বড় সমস্ত জমিদারই একসঙ্গে বৃদ্ধি-বৃদ্ধি করিয়া কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছে।

প্রজারাও বসিয়া নাই; 'বৃদ্ধি দিব না' এই রব তুলিয়া তাহারাও মাতিয়া উঠিয়াছে। হ্যাঁ, 'মাতন' বই কি! যুক্তি আছে তাহাদের, তর্কও তাহারা করে। তাহারা বলে—ফসলের দাম বাড়িয়াছে সে কথা ঠিক, কিন্তু আমাদের সংসার-খরচ কত বাড়িয়াছে দেখ! জমিদার বলে—সে দেখিবার কথা আমাদের নয়; আমাদের সম্পর্ক রাজভাগ ফসলের দামের সঙ্গে। এ সূক্ষ্ম যুক্তি প্রজারা বুঝিতে পারে না—বুঝিতে চায় না। তাহারা বলিতেছে—আমরা 'দিব না'। এই 'দিব

না' কথাটির মধ্যে তাহারা আস্বাদ পায় এক অদ্ভুত তৃপ্তির। একক কেহ পাওনাদারের প্রাপ্য দিব না বলিলে সমাজে সে নিন্দিত হয়, কিন্তু ওইটিই মানুষের যেন অন্তরের কথা। না দিলে আমার যখন বাড়িবে—অন্তত কমিয়া যাওয়ার দুঃখ হইতে বাঁচিব—তখন না-দিবার প্রবৃত্তিই অন্তরে জাগিয়া উঠে। তবে একক বলিলে সমাজে নিন্দা হয়, আদালতে পাওনাদার দেনাদারের কাছে সহজেই প্রাপ্য আদায় করিয়া লয়। কিন্তু আজ যখন সমাজসুদ্ধ সকলেই দিব না রব তুলিয়াছে, তখন এ আর নিন্দার কথা কোথায়? আজ দাঁড়াইয়াছে দাবীর কথা। রাজদ্বারে পাওনাদার করুক নালিশ; কিন্তু আজ তাহারা একখানি বাঁশের কঞ্চি নয়, আজ তাহারা কঞ্চির আঁটি—মুট করিয়া অনায়াসে ভাঙিয়া যাইবার ভয় নাই। 'ভয় নাই' এই উপলব্ধির মধ্যে যে শক্তি আছে, যে মাতন আছে, সেই মাতনেই তাহারা মাতিয়া উঠিয়াছে। এখনকার প্রায় সকল গ্রামের প্রজারাই ধর্মঘট করিবে বলিয়া সংকল্প করিয়াছে। এখন প্রয়োজন তাহাদের নেতার। প্রায় প্রতি গ্রাম হইতে দেবু নিমন্ত্রণ পাইয়াছে। তাহাদের গ্রাম শিবকালীপুরের লোকেরা তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এ সব ব্যাপারে দেবুর আর নিজেকে জড়াইয়া ফেলিবার ইচ্ছা ছিল না। বারবার সে তাহাদের ফিরাইয়া দিতেই চাহিয়াছে—তবু তাহারা শুনিবে না। এদিকে মহাগ্রামের লোকে শরণাপন্ন হইয়াছিল ন্যায়রত্ন মহাশয়ের। ন্যায়রত্ন পত্র লিখিয়া তাহাদিগকে দেবুর কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন। লিখিয়াছেন, "পণ্ডিত আমার শাস্ত্রে ইহার বিধান নাই। ভাবিয়া দেখিলাম—তুমি বিধান দিতে পার; বিবেচনা করিয়া তুমি ইহার বিধান দিও।"

আজ এই রথযাত্রা উপলক্ষে পঞ্চগ্রামের চাষী মাতব্বরেরা ন্যায়রত্নের ঠাকুর-বাড়ীতে সমবেত হইবে। মহাগ্রামের উদ্যোক্তারা এই সুযোগে ধর্মঘটের উদ্যোগ-পর্বের ভূমিকাটা সারিয়া লইতে চায়। তাই বারবার দেবুকে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিয়াছে। ন্যায়রত্ন নিজেও আবার লিখিয়াছেন—"পণ্ডিত আমার আশীর্বাদ জানিবে। ঠাকুরের রথযাত্রা, অবশ্যই আসিবে। আমাকে বিপদ হইতে ত্রাণ কর। আমার ঠাকুরের রথ চলিবে সংসার সমুদ্র পার হইয়া পরলোকে। ইহলোকে যাহাদের প্রভুর রথ সুখ-সম্পদময় মাসীর ঘরে যাইবে, তাহারা আমাকে

লইয়া টানাটানি করিতেছে। দায়িত্বটা তুমি লইয়া আমাকে মুক্তি দাও। তোমার হাতে ভার দিতে পারিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি। কারণ মানুষের সেবায় তুমি সর্বস্ব হারাইয়াছ; তোমার হাতে ঘটনাচক্রে যদি লাভের পরিবর্তে ক্ষতিও হয়—তবু সে ক্ষতিতে অমঙ্গল হইবে না বলিয়া আমার প্রত্যয় আছে।" দেবু এ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারে নাই। তাই স্ত্রী-পুত্রের চিতা-চিহ্নের বিপুল আকর্ষণ, বন্ধু যতীনের বিদায়-বেদনার অবসাদ—সমস্ত ঝাড়িয়া ফেলিয়া সে মহাগ্রাম অভিমুখে চলিয়াছে।

ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধের উপর হইতে সে মাঠের পথে উত্তরমুখে নামিল। খানিকটা দূর গিয়াই মহাগ্রাম। ঢাকের শব্দ উচ্চতর হইয়া উঠিয়াছে। পথ-চলার গতি আরও খানিকটা দ্রুততর করিয়া, জনতার ভিড় ঠেলিয়া শেষে সে ন্যায়রত্নের ঠাকুর-বাড়ীর আটচালায় আসিয়া উঠিল। পূজার স্থানে প্রজ্বলিত হোমবহ্নির সম্মুখে বসিয়াই ন্যায়রত্ন তাহাকে স্মিতহাস্যে সস্নেহে নীরব আহ্বান জানাইলেন।

দেবু প্রণাম করিল।

চাষী মাতব্বরেরাও দেবুকে সাগ্রহে সস্নেহে আহ্বান করিল।—এস এস, পণ্ডিত এস। এই-এই এইখানে বস। সকলেই তাহাকে বসিতে দিবার জন্য জায়গা ছাড়িয়া দিয়া কাছে পাইতে চাহিল। দেবু কিন্তু সবিনয়ে হাসিয়া এক পাশেই বসিল; বলিল—এই বেশ বসেছি আমি।—তবে তাহাদের আহ্বানের আন্তরিকতা তাহার বড় ভাল লাগিল। স্ত্রী-পুত্র হারাইয়া সে যেন এ অঞ্চলের সকল মানুষের স্নেহ-প্রীতির পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। দুইবিন্দু জল তাহার চোখের কোণে জমিয়া উঠিল। তাহার সমস্ত অন্তরটা অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। মানুষের এত প্রেম!

আসিয়াছে অনেকে। মহাগ্রামের মুখ্য ব্যক্তি শিবু দাস, গোবিন্দ ঘোষ, মাখন মণ্ডল, গণেশ গোপ প্রভৃতি সকলে তো আছেই—তাহা ছাড়া শিবকালীপুরের হরেন্দ্র ঘোষাল আসিয়াছে, জগন ডাক্তারও আসিবে। দেখুড়িয়ার তিনকড়ি দাস আসিয়াছে, সঙ্গে আরও কয়েকজন; বালিয়াড়ার বৃদ্ধ কেনারাম, গোপাল ও গোকুলকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। কেনারাম সে-কালে গ্রাম্যপাঠশালার পণ্ডিতি

করিত, এখন সে বৃদ্ধ এবং অন্ধ ; প্রাচীনকালের অভ্যাসবশেই বোধ করি দৃষ্টিশক্তি-হীন চোখে এদিক হইতে ওদিক পর্যন্ত চাহিয়া দেখিল, তারপর সঙ্গী গোপালকে মৃদুস্বরে ডাকিল—গোপাল !

গোপাল পাশেই ছিল, সে বৃদ্ধের কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল—পণ্ডিত, দেবু ঘোষ !

কুব্জ বৃদ্ধ সোজা হইয়া বসিয়া ডাকিল—দেবু ? কই, দেবু কই ?

দেবু আপনার স্থান হইতেই উত্তর দিল—ভাল আছেন ?

—এইখানে—এইখানে, আমার কাছে এস তুমি।

এ আহ্বান দেবু উপেক্ষা করিতে পারিল না, সে উঠিয়া আসিয়া বৃদ্ধের কাছে বসিয়া পায়ে হাত দিয়া স্পর্শ জানাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—প্রণাম করছি।

আপনার দুইখানি হাত দিয়া দেবুর মুখ হইতে বুক পর্যন্ত স্পর্শ করিয়া বৃদ্ধ বলিল—তোমাকে দেখতেই এসেছি আমি। পরক্ষণেই হাসিয়া বলিল—চোখে দেখতে পাই না, দৃষ্টি নাই, তাই তোমাকে গায়ে মুখে হাত বুলিয়ে দেখছি।

দেবু এই বৃদ্ধের কথার অন্তরালে যে সমবেদনা এবং প্রশংসার গাঢ় মধুর আস্বাদ অনুভব করিল, সে উচ্ছ্বাসকে এড়াইবার জন্যই প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করিয়া বলিল—চোখের ছানি কাটিয়ে ফেলুন না। এই তো 'বেনাগড়ে'তে পাদ্রীদের হাসপাতালে একছার ছানি কাটিয়ে আসছে লোকে। সত্যি-সত্যিই ওখানে অপারেশন খুব ভাল হয়।

—অপারেশন ? অস্ত্র করাতে বলছ ?

—হ্যাঁ। সামান্য অপারেশন—হয়ে গেলেই পরিষ্কার দেখতে পাবেন।

—কি দেখব ?—বৃদ্ধ অদ্ভুত হাসিয়া প্রশ্ন করিল—কি দেখব ? তোমার শূন্য ঘর ? তোমার চোখের জল ? চোখ গিয়েছে ভালই হয়েছে দেবু। অকাল-মৃত্যুতে দেশ ছেয়ে গেল। সেদিন আমার একটা ভাগ্নে ম'ল, বোনটা বুক ফাটিয়ে কাঁদলে—কানে শুনলাম, কিন্তু তার মরা মুখ তো দেখতে হ'ল না ! এ ভাল, দেবু এ ভাল ! এখন কানটা কালা হয় তো এ সব আর শুনতেও হয় না।

বৃদ্ধের দৃষ্টিহীন বিস্ফারিত চোখ হইতে জলের ধারা মুখের কুঞ্চিত লোম চর্ম

সিক্ত করিয়া মাটির উপর ঝরিয়া পড়িল। ম্লান হাসিমুখে দেবু চুপ করিয়া রহিল—কোন উত্তর দিতে পারিল না। সমবেত সকলের কথাবার্তাও বন্ধ হইয়া গেল। শুধু ন্যায়রত্নের মন্ত্রধ্বনি একটা সঙ্গীতময় পরিবেশের সৃষ্টি করিয়া উচ্চারিত হইয়া ফিরিতে লাগিল।

ঠিক এই সময়েই 'টোল-বাড়ী'র আটচালার বাহিরে খোলা উঠানে রাস্তা হইতে আসিয়া উঠিল আধুনিক সুদর্শন তরুণ, দেবুরই সমবয়সী। তাহার পিছনে একটি কুলির মাথায় ছোট একটি সুটকেস্ ও একটি ফলের ঝুড়ি। দেবু সাগ্রহে উঠিয়া দাঁড়াইল—বিশু-ভাই!

দেবুর বিশু-ভাই—বিশ্বনাথ—ন্যায়রত্নের পৌত্র।

ন্যায়রত্নের তখন কথা বলিবার অবকাশ ছিল না, শুধু তাঁহার ঠোঁটের কোণে মন্ত্রোচ্চারণের ছেদের মধ্যে একটু সস্নেহ হাসি ফুটিয়া উঠিল।

দুই

শিবকালীপুর অঞ্চলে—শিবকালীপুরেই প্রথম খাজনা-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ধর্মঘটের আগুন জ্বলিয়া উঠিল!

আগুন জ্বলিলেই প্রাকৃতিক নিয়মে বায়ুস্তরে প্রবাহ জাগিয়া উঠে। শুধু তাই নয়, আগুনের আশপাশের বস্তুগুলির ভিতরের দাহিকা শক্তি অগ্নির স্পর্শ লইবার জন্য উন্মুখ হইয়া যেন অধীর আগ্রহে কাঁপে। খড়ের চালে যখন আগুন জ্বলে, তখন পাশের-ঘরের চালের খড় উত্তাপে স্বর্ণপুষ্পের গর্ভকেশরের মত ফুলিয়া বিকশিত হইয়া উঠে। অগ্নিকণার স্পর্শ না পাইলেও—উত্তাপ গ্রাস করিতে করিতে সে চালও এক সময় দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। আগুন জ্বলে, সে আগুনের উত্তাপে আশ-পাশের ঘরেও আগুন লাগে। তেমনি ভাবেই শিবকালীপুরের ধর্মঘট চারিপাশের গ্রামেও ছড়াইয়া পড়িল। দিন কয়েকের মধ্যেই এ অঞ্চলে প্রায় সকল গ্রামেই ধুয়া উঠিল—খাজনা-বৃদ্ধি দিতে পারিব না। দিব না। কেন বৃদ্ধি? কিসের বৃদ্ধি?—অন্যদিকে শিবকালীপুরের নূতন পত্তনীদার চাষী-হইতে-জমিদার শ্রীহরি ঘোষও

লাজিল। সে পাকা মামলাবাজ গোমস্তা, সদরের প্রধান দেওয়ানী-আইনবিদ্ উকীল এবং পাইক-লাঠিয়াল লইয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া সে ঘোষণা করিল—তাহাদের স্বপক্ষে আইনের সপ্তসিন্ধু উত্তাল হইয়া অপেক্ষা করিতেছে, তাহার অপরিমেয় অর্থশক্তি দ্বারা সেই সিন্ধু-সলিল ক্রয় করিয়া আনিয়া সে এই ক্ষুদ্র শিবকালীপুরকে প্লাবিত করিয়া দিবে। খাজনা-বৃদ্ধির মামলা লইয়া সে হাইকোর্ট পর্যন্ত লড়িবে। আশপাশের জমিদারেরাও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া উঠিল। তাহারাও শ্রীহরিকে আশ্বাস দিল।

রথযাত্রার কয়েকদিন পর।

এই কয়েক দিনের মধ্যেই ধর্মঘটের উত্তাপ গ্রীষ্মের উত্তাপের মত ছড়াইয়া পড়িল। প্রবল বর্ষণে মাঠ ভরিয়া উঠিয়াছে। চাষের কাজ শুরু হইয়া গেল ঝপ করিয়া। রাত্রি থাকিতে চাষীরা মাঠে গিয়া পড়ে। চারিপাশের গ্রামগুলির মধ্যস্থলে মাঠের মধ্যেই কাজ করিতে করিতে ধর্মঘটের আলোচনা চলিতেছিল।

জলভরা মাঠের আইল কাটিতে কাটিতে ক্লান্ত হইয়া একবার তামাক খাইবার জন্য শিবু আসিয়া বসিল। চকমকি ঠুকিয়া শোলায় আগুন ধরাইয়া তামাক সাজিয়া বেশ জুত করিয়া বসিতেই আশপাশ হইতে কয়েকজন আসিয়া জুটিয়া গেল। কুসুমপুরের রহম শেখই প্রথমটা আরম্ভ করিল।

—চাচা, তোমরা লাগালছ শুনলাম ?

শিবু দাস বিজ্ঞের মত একটু হাসিল।

এই সেদিন ন্যায়রত্নের বাড়ীতে ধর্মঘট করা ঠিক হইয়াছে।

দেবু তাহাদের সব বুঝাইয়া বলিয়াছে। বাধা-বিপত্তি দুঃখ-কষ্ট অনিবার্যরূপে যাহা আসিবে, তাহারই কথা সে বারবার বলিয়াছে। বিগত একশত বৎসরের মধ্যেই এই পঞ্চগ্রামে যত ধর্মঘট হইয়াছে তাহার কাহিনী শুনাইয়া জানাইয়াছে—কত চাষী জমিদারের সঙ্গে ধর্মঘটের দ্বন্দ্বে সর্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছে। বারবার বলিয়াছে, আইন যেখানে জমিদারের স্বপক্ষে, সেখানে 'বৃদ্ধি দেব না' এ কথা বলা ভুল, আইন অনুসারে অন্যায়। প্রজা ও জমিদারের অর্থ-শক্তির কথা এবং

আইনানুযায়ী অধিকারের কথা স্মরণ করিয়া সে প্রকারান্তরে নিষেধই করিয়াছিল।

সকলে দমিয়া গিয়াছিল; কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পৌত্র বিশু সেখানে উপস্থিত ছিল, সে হাসিয়া বলিয়াছিল—আইন পাল্টায় দেবু-ভাই। আগে গভর্নমেণ্টের মতে জমির মালিক ছিল জমিদার; প্রজার অধিকার ছিল শুধু চাষ-আবাদের। প্রজা কাউকে জমি বিক্রি করলে জমিদারের কাছে খারিজ-দাখিল করে হুকুম নিতে হত। জমির উপর মূল্যবান্ গাছের অধিকারও প্রজার ছিল না। কিন্তু সে আইন পাল্টেছে। প্রজারা যদি 'বৃদ্ধি দেব না' বলে—না-দেবার দাবীটাকে জোরালো করতে পারে, সঙ্গত যুক্তি দেখাতে পারে—তবে বৃদ্ধির আইনও পাল্টাবে।

কথাটা বলিবামাত্র সমস্ত লোকের মনে একটিমাত্র যুক্তি স্ফীতকলেবর বিন্ধ্য-পর্বতের মত মাথা ঠেলিয়া আকাশস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছিল—কোথা হইতে দিব? দিলে আমাদের থাকিবে কি? আমরা কি খাইয়া বাঁচিব? সরকারের এমন আইন কি করিয়া ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে?

অন্ধ বৃদ্ধ পণ্ডিত কেনারাম হাসিয়া বলিয়াছিল—কিন্তু বিশুবাবু, মারে হরি তো রাখে কে?

বৃদ্ধের কথায় সমস্ত মজলিসটা ক্ষোভে ভরিয়া উঠিয়াছিল। জীব-জীবনের ধাতুগত প্রকৃতি অনুযায়ী একজন অপরজনকে দ্বন্দ্বে পরাভূত করিয়া শোষণ করিয়া আপনাকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তোলে। যে পরাজিত হয়, শোষিত হয়, শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুক্তির প্রচেষ্টায় সে বিরত হয় না; সে-ক্ষেত্রে ক্ষোভ বা অভিমান সে করে না। কিন্তু প্রতিবিধানের জন্য—সে যাহার উপর নির্ভর করে, সে-ও যদি আসিয়া ওই শোষণকারীকেই সাহায্য করে, তাহার শক্তির চাপ চাপাইয়া দেয় প্রাণপণ মুক্তি-প্রচেষ্টার বুকে, তবে শোষিতের শেষ সম্বল—দুটি-বিন্দু অশ্রুসিক্ত মর্মান্তিক ক্ষোভ; শুধু ক্ষোভ নয়—অভিমানও থাকে। সেই ক্ষোভ; সেই অভিমান তাহাদের জাগিয়া উঠিল।

বিশু এবার বলিয়াছিল—হরি যদি ন্যায়বিচার না করে মারতেই চায়, তবে এ হরিকে পাল্টে অন্য হরিকে পুজো করব আমরা।

দেবু শিহরিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল—কি বলছ বিশু-ভাই! না—না, ও কথা

তোমার মুখে শোভা পায় না।

শুধু দেবু নয়, গোটা মজলিসটা শিহরিয়া উঠিয়াছিল। বিশু কিন্তু হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল—বংশীধারী বা চক্রধারী গোকুল বা গোলকবিহারী হরির কথা বলছি না দেবু-ভাই, তিনি যেমন আছেন তেমনি থাকুন মাথার ওপর। আমি বলছি আইন যাঁরা করেন তাঁদের কথা। যাঁরা আইন করেন—তাঁরা যদি আমাদের দুঃখের দিকে না চান, তবে আসছে-বারে আমরা তাঁদের ভোট দেব না। ভোট তো আমাদের হাতে!

এই সময় ন্যায়রত্ন আসিয়া বিশ্বনাথকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ন্যায়রত্ন পাশের ঘরেই ছিলেন; তিনি সবই শুনিতেছিলেন। বলিয়াছিলেন—বিশ্বনাথের সংসার জ্ঞান নেই। ওর যুক্তিতে তোমরা কান দিও না। তোমাদের ভাল-মন্দ তোমরা পাঁচজনে বিচার করে যা হয় কর।

বিশ্বনাথ চলিয়া গেলেও তুমুল তর্ক-কোলাহলের মধ্যে তাহাদের অন্তরের অকপট অভিলাষই জয়লাভ করিল—বৃদ্ধি দিব না।

দেবু বলিল—তবে আমি এর মধ্যে নেই। আমাকে রেহাই দাও।

—কেন?

—আমার মত—'বৃদ্ধি দেব না' এ কথা ঠিক হবে না। যা ন্যায়সঙ্গত তার বেশী দেব না এই কথাই বলা উচিত। এর জন্যে ধর্মঘট করতে হয়—আমি রাজী আছি।

—কিন্তু বিশুবাবু যে বললেন—'আমরা দেব না' বললে বৃদ্ধি-আইন পাল্টে যাবে!

মৃদু হাসিয়া দেবু বলিয়াছিল—ঠাকুরমশায় যে বললেন—বিশু-ভাইয়ের সংসার-জ্ঞান নেই, আমিও তাই বলি। কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর-সংসার আমাদের, বৃদ্ধি দেব না—পণ ধরলে, আমাদের জমি-জেরাত এক ছটাক কারও থাকবে না। অবশ্যি তারপর হয়ত আইন পাল্টাতে পারে।

জগন উঠিয়া বলিল—এটা তোমার কাপুরুষের মত কথা। সবাই যদি ধর্মঘট করে, তবে জমি কিনবে কে?

—কিনবে কে? হাসিয়া দেবু স্মরণ করাইয়া দিল কঙ্কণার এবং আশ-পাশের

ভদ্রলোক বাবুদের কথা—জংশনের গদিওয়ালা মহাজনদের কথা।

জগনও এবার মাথা নিচু করিয়া বসিয়াছিল।

অবশেষে দেবুর মতেই সকলে রাজী হইয়াছে। কিন্তু স্থির হইয়াছে—ও কথাটা ভিতরের কথা, প্রথমত বলা হইবে 'দিব না—বৃদ্ধি দিব না।'

শিবু দাস ওই ভিতর বাহিরের কথা জানে,—তাই বিজ্ঞের মত একটু হাসিল।

আমাদের তো কাল জুম্মার নমাজ—মছজেদেই সব ঠিক হবে আমাদের।

শিবু এবার প্রশ্ন করিল—দৌলত শেখ? শেখজী রাজী হয়েছে?

দৌলত শেখ চামড়ার ব্যবসায়ী ধনী লোক। অতীতের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়া শিবু দাসের সন্দেহ জাগিয়া উঠিল দৌলত শেখ সম্বন্ধে। তাহাদের গ্রামেও ঠিক ওই একই ব্যাপার ঘটিয়াছে। ভদ্রলোকেরা ধর্মঘটে যোগ দিতে রাজী হয় নাই। তাহাদের অধিকাংশই ব্যক্তিগতভাবে মামলা-মকদ্দমা করিবে স্থির করিয়াছে। কেহ-কেহ আপোষে বৃদ্ধি দিবে বা দিয়াছে। ভদ্রলোকেরা নিজ হাতে চাষ করে না বলিয়া তাহারা জমিদারকে ধরিয়াছে। প্রথমেই তাহারা বৃদ্ধি দিতেছে বলিয়া ভদ্রতা এবং আনুগত্যের দাবীও তাহাদের আছে। ইহারা সকলেই চাকুরে এবং গরীব ভদ্র গৃহস্থ।

রহম হাসিয়া বলিল—ত্যালে আর পানিতে কখনও মিশ খায় চাচা? ওরা আলাদা মামলা করবে। সবারই সঙ্গে সি নাই।

কুসুমপুরের পাশেই দেখুড়িয়া গ্রাম, দেখুড়িয়ার তিনকড়ি দাস দুর্ধর্ষ লোক, দুর্ধর্ষপনার জন্যই সে প্রায় সর্বস্বান্ত হইয়াছে। এখন সে অন্য লোকের জমি ভাগে চষিয়া খায়, শিবকালীপুরের এলাকার মধ্যেই কঙ্কণার ভদ্রলোকের জমিতে চাষ দিতে আসিয়াছিল, সে বলিল—আমাদের গাঁয়ের শালারা এখনও সব 'গুজুর গুজুর' করছে। আমি বলে দিয়েছি—যে দেবে সে দিতে পারে, আমি দোব না।

পরক্ষণেই হাসিয়া বলিল—জমি তো মোটে পাঁচ বিঘে। পঁচিশ বিঘে গিয়েছে, পাঁচ বিঘে আছে। যাক্ ও পাঁচ বিঘেও যাক্! তারপর তল্পী তল্পা নিয়ে বম্-বম্ করে পালাব একদিন!

রহম বলিল—তুরা সব তাক্ জানিস্ না; মেড়ার মতন ঢুঁ মারতেই জানিস্।

লড়াই কি শুধু গায়ের জোরে হয়? প্যাঁচ হল আসল জিনিস। 'আম্তি'র (অম্বুবাচীর) লড়ায়ে সিবার এইটুকুন জনাব আলি—কেমন দিলে—তুদের লগেন গয়লাকে দড়াম করে ফেলে—দেখেছিলি?

তিনকড়ি চটিয়া উঠিল। সিধা হইয়া দাঁড়াইল।

দেখুড়িয়ার তিনকড়ি যেমন গোঁয়ার, দৈহিক-শক্তিতেও সে তেমনি বলশালী লোক—তাহার উপর সে নামজাদা লাঠিয়ালও বটে। রহমের এই শ্লেষে সে চটিয়া উঠিল। চটিয়া উঠিবার হেতুও আছে। দেখুড়িয়ার লোকের সঙ্গে কুসুমপুরের সাধারণ চাষী মুসলমানদের শক্তি-প্রতিযোগিতা বহুকাল চলিয়া আসিতেছে। দেখুড়িয়ার বাসিন্দাদের অধিকাংশই ভল্লাবাগ্দী; ভল্লাবাগ্দীদের শক্তি বাংলা দেশে বিখ্যাত। তিনকড়ি চাষী সদ্গোপ হইলেও ওই ভল্লাবাগ্দীদের নেতৃত্ব করিয়া থাকে। এ অঞ্চলে তাহার গ্রামের শক্তি তাহার অহঙ্কার। তাহার সেই অহঙ্কারে রহম ঘা দিয়াছে। শিবু দাস কিন্তু বিব্রত হইয়া উঠিল। দুজনে বুঝি লড়াই বাধিয়া যায়। সহসা বাঁ দিকে চাহিয়া শিবু আশ্বস্ত হইয়া বলিল—চুপ কর তিনকড়ি—চৌধুরী আসছেন!

ও-দিক হইতে দ্বারিকা চৌধুরী আসিতেছিল চাষের তদ্বিরে। সাদা কাপড় দিয়া ডবল করা ছাতাটি মাথায়, লাঠি হাতে বৃদ্ধ ব্যক্তিকে এ অঞ্চলে সকলেই দূর হইতে চিনিতে পারে। তা ছাড়া লোকটিকে সকলেই শ্রদ্ধা সম্মান করে। শিবু দাস দূর হইতে চৌধুরীকে দেখিয়া বলিল—চৌধুরী আসছেন, চুপ কর।

চৌধুরীরা একপুরুষ পূর্বে জমিদার ছিল, এখন জমিদারী নাই। চৌধুরী বর্তমানে চাষবাস বৃত্তিই অবলম্বন করিয়াছে, বৃত্তি অনুসারে চাষীই বলিতে হয়, তবুও চৌধুরীরা, বিশেষতঃ বৃদ্ধ চৌধুরী এখনও সাধারণ হইতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলে, লোকও বৃদ্ধ চৌধুরীকে একটু বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখে।

চৌধুরী কাছে আসিয়া অভ্যাস মত মৃদু হাসিয়া বলিল—কি গো বাবা সকল, তামাক খেতে বসেছেন সব?

আপনার সম্ভ্রম বজায় রাখিতে চৌধুরী এমনি ভাবেই সকলকে সম্ভ্রম করিয়া চলে। আপনি বলিয়া সম্বোধন করিলে প্রত্যুত্তরে তুমি এ সংসারে কেহ বলিতে পারে না।

শিবু দাস উঠিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—পেন্নাম। এইবার তাহলে সেরে উঠেছেন ?

চৌধুরী বললে—হ্যাঁ বাবা, উঠলাম। পাপের ভোগ এখনও আছে—সেরে উঠতে হল।—কিছুদিন পূর্বে শিবকালীপুরের নূতন পত্তনীদার শ্রীহরি ঘোষ ও দেবু ঘোষের মধ্যে একটা গাছ কাটা লইয়া দাঙ্গা বাঁধিয়াছিল। শ্রীহরি ঘোষ—দেবু ঘোষকে জব্দ করিবার জন্য তাহার পিতামহের প্রতিষ্ঠা করা গাছ কাটিয়া লইতে উদ্যত হইয়াছিল; দেবু নির্ভয়ে উদ্যত কুড়ুলের সামনে দাঁড়াইয়া বাধা দিয়াছিল। সেই দাঙ্গায় উভয় পক্ষকে নিরস্ত করিতে গিয়া—চৌধুরী শ্রীহরি ঘোষের লাঠি-য়ালের লাঠিতে আহত হইয়া কয়েক-মাসই শয্যাশায়ী ছিল। ঘটনায় সকলেই হায় হায় করিয়াছে।

শিবু দাস বলিল—কালকের মজলিসের কথা শুনেছেন ?

চৌধুরী হাসিয়া বলিল—শুনলাম বৈকি। জগন ডাক্তার মশায় গিয়েছিলেন আমার কাছে।

ব্যগ্র হইয়া শিবু প্রশ্ন করল—কি হল ?

চৌধুরী চুপ করিয়া রহিল, উত্তর দিবার অভিপ্রায় তাহার ছিল না। প্রসঙ্গট সে এড়াইয়া যাইতে চায়।

শিবু কিন্তু আবার প্রশ্ন করিল—চৌধুরী মশায় ?

চৌধুরী হাসিয়া বলিল—বাবা, আমি বুড়ো মানুষ, সেকেলে লোক; একেলে কাণ্ড-কারখানা বুঝিও না, সহ্যও হয় না। ও-সবে আমি নাই।

কথাটা শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত অশোভন নীরবতার মধ্যে কাটিবার পর চৌধুরী অন্য প্রসঙ্গ আনিবার জন্যই হাসিয়া বলিল—জল তো এবার ভাল—সকাল-সকালই বর্ষা নামল—এখন শেষরক্ষে করলে হয়!

রহম শেখ কথা বলিবার একটা সূত্র খুঁজিতেছিল—পাইবামাত্র সে সেলাম করিয়া বলিল—সেলাম গো চৌধুরী জ্যাঠা! শেষ-রক্ষে কিন্তু হবে না—ই একে-বারে খাঁটি কথা!

—সেলাম। কি রকম ? শেষ-রক্ষে হবে না কি ক'রে বলছেন শেখজী ?

—পাপ। পাপের লেগে বলছি। আল্লার ত্বনিয়া পাপে ভরে গেল। বড়-লোকের গোড়ের তলায় ত্বনিয়াশুদ্ধ মানুষ কুত্তার মতন লেজ নাড়ছে; পাপের আবার বাকী আছে চৌধুরী মশায়?

—তা বটে। তবে বড়লোক, গরীবলোক—সে তো আল্লাই করে পাঠান শেখজী।

—তা পাঠান, কিন্তু বড়লোকের পা চাটতে তো বলেন নাই আল্লা। এই ধরুন, আপনার মতো লোক; এককালে আপনারাও আমীর ছিলেন, জমিদার ছিলেন। ছিরে চাষা আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে—আপনি তার ভয়ে দশ-জনার ধর্মঘটে আসছেন নাই। ইতে কি আল্লা দয়া করেন, না, শেষরক্ষে হয়?

চৌধুরী তবুও হাসিল। কিন্তু একথার কোন উত্তর দিল না। কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া পাশ কাটাইয়া চলিতে চলিতে বলিল—আচ্ছা, তাহলে চলি এখন।

চৌধুরী ধীরে ধীরে পথ চলিতে চলিতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—হরি নারায়ণ, পার কর প্রভু!

একান্ত অন্তরের সঙ্গেই সে এ কামনা করিল। রহমের কথার শ্লেষ তাহাকে আঘাত করিয়াছে একথা সত্য, কিন্তু ওটাই একমাত্র হেতু নয় কিছুদিন হইতেই সে জীবনে একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছে। সে অস্বাচ্ছন্দ্য দিন দিন যেন গভীর এবং প্রবল হইয়া উঠিতেছে। একালের সঙ্গে সে কিছুতেই আপনাকে খাপ খাওয়াইতে পারিতেছে না। রীতি-নীতি, মতি-গতি, আচার-ধর্ম সব পাল্টাইয়া গেল। তাহারই পুরানো পাকা বাড়ীটার মত সব যেন ভাঙিয়া পড়িবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। ঝুর-ঝুর করিয়া অহরহ যেমন বাড়ীটার চুনবালি ঝরিয়া পড়িতেছে—তেমনিভাবেই সেকালের সব ঝরিয়া পড়িতেছে। লোক আর পরকাল মানে না, দেব-দ্বিজে ভক্তি নাই, প্রবীণকে সমীহ করে না, রাজা জমিদার-মহাজনের প্রতি শ্রদ্ধা নাই; ভক্ষ্যাভক্ষণেও দ্বিধা নাই। পুরোহিতের ছেলে সাহেবী ফ্যাসানে চুল ছাটিয়া টিকি কাটিয়া কি না করিতেছে? কঙ্কণার চাটুজ্জেদের ছেলে চামড়ার

ব্যবসা করে। গ্রামের কুমোর পলাইয়াছে, কামার ব্যবসা তুলিয়া দিল, বায়েন ঢাক বাজানো ছাড়িল ; ডোমে আর তালপাতা-বাঁশ লইয়া ডোম-বৃত্তি দেয় না, নাপিত আর ধান লইয়া ক্ষৌরি করে না, তেলে ভেজাল, ঘিয়ে চর্বি, মুনের ভিতর মধ্যে মধ্যে হাড়ও বাহির হয়। সকলের চেয়ে খারাপ—মানুষের সঙ্গে মানুষের অমিল। প্রত্যেক লোকটিই একালে স্বাধীন—প্রধান ; কেহ কাহাকেও মানিতে চাহে না। এই প্রজা ধর্মঘট সে-কালেও হইয়াছে, নূতন নয়, কিন্তু এইবারের ধর্মঘটের যাহা আরম্ভ—তাহার সহিত কত প্রভেদ! জমিদার সেকালে অত্যাচার করিলে বা অন্যায় দাবী করিলে ধর্মঘট হইত; কিন্তু এবার জমিদার যে বৃদ্ধি দাবী করিতেছে—চৌধুরী অনেক বিবেচনা করিয়াও সে দাবীকে অন্যায় বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিতে পারে নাই। তাহার বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী একটা বৃদ্ধি জমিদারের প্রাপ্য হইয়াছে। আইনে বিশ বৎসর অন্তর জমিদার শস্য-মূল্যের বৃদ্ধির অনুপাতে একটা বৃদ্ধি পাইবার হক্‌দার। অবশ্য পরিমাণ মত পাইতে হইবে জমিদারকে। অন্যায্য দাবী করিলে—'ন্যায্য প্রাপ্যের বেশী দিব না' একথা লোকে বলিতে পারে, কিন্তু একেবারে দিব না একথা বলিতেছে কোন্ ধর্ম-বুদ্ধিতে, কোন্ বিবেচনায় ?

আপনাকে ঐ প্রশ্নটা করিয়া চৌধুরী পরক্ষণেই আপনার মনে হাসিল। ধর্ম-বুদ্ধি ? তাহাদের পুরানো বাড়ীটার পলেস্তারা-খসা ইট-বাহির-করা দেওয়ালের মত মানুষের ধর্মবুদ্ধি লুপ্ত হইয়া লোভ, ক্ষুধা আর স্বার্থ-সর্বস্ব দাঁতগুলিই একালে মানুষের সার হইয়াছে। ধর্ম-বুদ্ধি ? তাও যদি উদরসর্বস্ব স্বার্থসর্বস্ব হইয়া পেটটাকে ভরাইতে পাইত—তবুও একটা সান্ত্বনা থাকিত। একালে কয়টা লোকের ঘরে ভাত আছে ? জমিদারের ঘর ফাঁক হইয়া গেল, চাষীর গোলায় আর ধান ওঠে না ; সমস্ত ধান কয়টা মহাজনের ঘরে গিয়া ঢুকিল। ছিরু পাল মহাজনী করিতে করিতে শ্রীহরি ঘোষ হইল—জমিদারের গোমস্তা হইল—অবশেষে পত্তনীদার হইয়া বসিয়াছে। একালকে সে কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছে না। এই সময় মানে মানে যাওয়াই ভাল। অন্তরের সঙ্গেই সে হরিকে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করিল—পার কর প্রভু !

চারিপাশ জলে ভরিয়া গিয়াছে, ও মাঠ হইতে পাশে নিচু মাঠে কলকল

শস্যে জল বহিয়া চলিয়াছে। আবারও আজ আকাশে মেঘ জমিয়াছে। মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প বর্ষণও রহিয়াছে। চৌধুরী সন্তর্পণে পিছল আলপথের উপর দিয়া চলিতেছিল। তাহার নিজের জমির মাথায় দাঁড়াইয়া চৌধুরী দেখিল গরু দুইটার পিঠে পাঁচন-লাঠির আঘাতের দাগ ফুটিয়া রহিয়াছে মোটা দড়ির মত। চৌধুরীর রাগ সহজে হয় না, কিন্তু গরু দুইটার পিঠের দাগ দেখিয়া সে আজ অকস্মাৎ রাগে একেবারে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। রহম শেখের কথার জ্বালা—জীবনের উপর বিতৃষ্ণা এমনি একটা নির্গমন পথের সুযোগ পাইয়া অগ্নিশিখার মত বাহির হইয়া পড়িল। চৌধুরী জলভরা জমিতে নামিয়া পড়িয়া কৃষাণটার হাতের পাঁচনটা কাড়িয়া লইয়া বলিল—দেখবি? দেখবি?

কৃষাণটা আশ্চর্য হইয়া বলিল—ওই! কি? করলাম কি গো?

—গরু দুটাকে এমনি করে মেরেছিস্ যে—?

চৌধুরী পাঁচন উদ্যত করিয়াছিল, কিন্তু পিছন হইতে কে ডাকিল—হাঁ, হাঁ, চৌধুরী মশায়!

চৌধুরী পিছন ফিরিয়া দেখিল, দেবু ঘোষ আর একটি বাইশ-তেইশ বৎসরের ভদ্রযুবা। চৌধুরী লজ্জিত হইয়াই পাঁচনটা ফেলিয়া দিল। বলিল—দেখ দেখি বাবা, গরু দুটোকে কি রকম মেরেছে দেখ দেখি? অবোলা জীব, গরু—ভগবতী!

ভদ্র যুবকটি হাসিয়া বলিল—ও লোকটার কিন্তু গরু দুটোর সঙ্গে খুব তফাত নেই চৌধুরী মশায়। তফাত কেবল—অবোলা নয়, আর ভগবতী নয়।

চৌধুরী আরও লজ্জিত হইয়া বলিল—তা বটে। ভয়ানক অন্যায় হতে। কিন্তু আপনাকে তো চিনতে পারলাম না?

দেবু বলিল—মহাগ্রামের ঠাকুর মশায়ের নাতি।

তৎক্ষণাৎ চৌধুরী সেই কর্দমাক্ত আলপথের উপরেই মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—ও রে বাপ রে! বাপ রে! আজ আমার মহাভাগ্যি, আপনার পুণ্যেই আজ আমি মহা অন্যায় করতে করতে বেঁচে গেলাম।

বিশ্বনাথ কয়েক পা পিছাইয়া গেল, তারপর বলিল—না—না—না! এ কি

করছেন আপনি!

চৌধুরী সবিস্ময়ে বলিল—কেন?

—আপনি আমার দাদুর বয়সী। আপনি এভাবে প্রণাম করলে—শুধু লজ্জাই পাই না, অপরাধও স্পর্শ করে।

—আপনি এই কথা বলছেন?

—হ্যাঁ বলছি।—বলিয়া বিশ্বনাথ তাহাকে প্রতিনমস্কার করিল।

চৌধুরী বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গিয়াছিল। এ অঞ্চলের মহাগুরু বলিয়া পূজিত স্থায়রত্বের পৌত্রের মুখে এ কি কথা! কিছুদিন পূর্বে শিবকালীপুরে যতীনবাবু ডেটিন্যু, তিনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনিও তাহাকে ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু চৌধুরী সেদিন এত বিস্মিত হয় নাই, তাহার অন্তরের সংস্কারে এতখানি আঘাত লাগে নাই। সেদিন সে আপনাকে সান্ত্বনা দিয়াছিল—যতীনবাবু কলিকাতার ছেলে, তাহার এ ম্লেচ্ছভাব আশ্চর্যের নয়। কিন্তু স্থায়রত্বের পৌত্র এ অঞ্চলের ভাবী মহাগুরু, তিনি যদি নিজ হইতে এই ভাবে সমাজের কর্ণধারত্ব ত্যাগ করেন—তবে কি গতি হইবে সমাজের?

দেবু অগ্রসর হইয়া বলিল—আপনার ওখানে কাল যাব চৌধুরী মশায়।

—এঁ্যা?—সচকিত হইয়া চৌধুরী প্রশ্ন করিল—এঁ্যা?

—কাল আমরা আপনার ওখানে যাব।

—সে আমার ভাগ্য। কিন্তু কারণটা কি? ধর্মঘট?

—হ্যাঁ।

—আমি ও ধর্মঘটে নেই বাবা। আমাকে বাবা ক্ষমা করো।—বলিয়াই সে সঙ্গে সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিল।

দেবু পিছন হইতে ডাকিল—চৌধুরী মশায়!

অগ্রসর হইতে হইতেই চৌধুরী হাত নাড়িয়া বলিল—না বাবা।

হাসিয়া বিশ্বনাথ বলিল—এস, পরে হবে। প্রণাম না নেওয়াতে বুড়ো চটে গেছে।

দেবু বলিল—ও কথা বলেই বা তোমার কি লাভ হল বল তো? আর

প্রণাম নেবে নাই বা কেন ? তুমি ব্রাহ্মণ।

—পৈতে আমি ফেলে দিয়েছি দেবু।

—পৈতে ফেলে দিয়েছ ?

হাসিয়া বিশ্বনাথ বলিল—ফেলেই দিয়েছি, তবে বাক্সে রাখি। যখন বাড়ী আসি গলায় পরে নিই। দাদুকে আঘাত দিতে চাই নে।

—কিন্তু সে তো প্রতারণা কর তুমি! ছি!

বিশ্বনাথ হাসিয়া উঠিল—ও আলোচনা পরে করা যাবে। এখন চল।

—না। দেবু দৃঢ়স্বরে বলিল—না। আগে ওই মীমাংসাই হোক তোমার সঙ্গে। তারপর দুজনে একসঙ্গে পা ফেলব। নইলে ধর্মঘটের ভার তুমি নাও, আমি সরে দাঁড়াই। কিম্বা—তুমি সরে দাঁড়াও।

—সেটা তুমিই ভেবে দেখ। তুমি যা বলবে তাই আমি করব।—বিশ্বনাথ তখনও হাসিতেছিল।

দেবু বিশ্বনাথের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোন উত্তর দিতে পারিল না।

ঠিক এই সময়েই তাহাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল রহম শেখ।—আদাব গো দেবুবাপ!

চিন্তান্বিত মুখেই একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া দেবু প্রত্যভিবাদন জানাইল—আদাব চাচা।

রহম বলিল—হাল ছেড়্যা আসতে লারছি, আর তুমরাও আচ্ছা গুজুর গুজুর লাগালছ যা হোক। তা আমাদের গাঁয়ে যাবা কবে বল দেখি ?

—যাব চাচা, আজই যাব।

—হ্যাঁ। যাইও। কাল শুকুর বারে জুম্মার নামাজ হবে। মছজেদেই সব কায়েম হয়ে যাবে। তুমি বরং আজই উবেলাতেই যাইও [illegible]।

—আচ্ছা। দেবু একটু হাসিল।

—আর শুন। ওই তুমাদের ঠাকুরের নাতি—উয়াকে নিয়া যাইও না। আমাদের তাসের মিয়া—জান তো তাসের মিয়া [illegible] কলকাতায় কলেজে পড়ে [illegible]
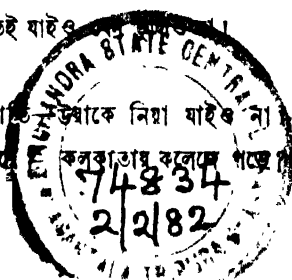
উ বুলছিল—ঠাকুরের নাতি নাকি স্বদেশী করে। তা ছাড়া আমাদের ইরসাদ মৌলভী বুলছিল—উনি বামুন ঠাকুর মানুষ—উয়ারে তুমরা হিঁদুরা মানতি পার, আমরা মানব কেনে ?

—না, না, তুমি জান না রহম চাচা—বিশু-ভাই আমাদের সে-রকম নয়।—দেবু অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল।

দুর্দান্ত রূঢ়ভাষী রহম—আন্দাজে বিশুকে চিনিয়াই কথাগুলি বলিয়াছিল—এবার সে হাসিয়া বলিল—অ ! তুমিই বুঝি ঠাকুরের নাতি ?

হাসিয়া বিশু বলিল—হ্যাঁ।

—তুমি যাইও না ঠাকুর, তুমি যাইও না।—বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই সে ফিরিল আপনার জমির দিকে।

বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল—মীমাংসা হয়ে গেল দেবু ভাই। আমি তাহলে ফিরলাম।

দেবু কাতর দৃষ্টিতে বিশ্বনাথের দিকে চাহিয়া রহিল।

হাসিয়া বিশ্বনাথ বলিল—দরকার হলেই ডাক দিও—আমি তৎক্ষণাৎ আসব।

রিম-ঝিম বৃষ্টি নামিয়া আসিল। তাহারই ভিতর দুজনে দুজনের কাছ হইতে সামান্য দূরত্বের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

রহম রূঢ় সত্য প্রকাশ করিয়া মনের আনন্দে লাঙল ঠেলিতে ঠেলিতে তখন গান ধরিয়া দিল—

"হোসেন হাসান দু'টি ভাই -এই দুনিয়ায় পয়দা হয়,
তাদের মত খাস বান্দা এই দুনিয়ায় নাই।
ফতেমা-মা, মা-জননী—তাঁর কাহিনী বলি আমি,
তাঁহার স্বামী হজরৎ আলি বলিয়া জানাই।"

তিন

মহুগ্রাম বা মহাগ্রাম এককালে সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল। বহুসংখ্যক মাটির এবং ইটের বাড়ীর পড়ো-ভিটা গ্রামখানির প্রাচীনত্ব এবং বিগত সমৃদ্ধির প্রমাণ-হিসাবে আজও দেখা যায়। গ্রামখানি এখনও আকারে অনেক বড়, কিন্তু বসতি অত্যন্ত ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত। মধ্যে মধ্যে বিশ-পঁচিশ, এমন কি পঞ্চাশ-ষাট ঘর বসতির উপযুক্ত স্থান পতিত হইয়া পড়িয়া আছে; খেজুর, কুল, আঁকড়, সেওড়া প্রভৃতি গাছে ও ছোট ছোট ঝোপ-জঙ্গলে ভরিয়া 'ঠিয়াছে। এগুলি এককালে নাকি বসতি-পরিপূর্ণ পাড়া ছিল। বসতি নাই কিন্তু এখনও দুই-চারিটার নাম বাঁচিয়া আছে। জোলা-পাড়া ধোপাপাড়ায় একঘরও বসতি নাই; পালপাড়ায় মাত্র দুই ঘর কুমোর অবশিষ্ট; খাঁ-য়ের পাড়ায় খাঁ উপাধিধারী হিন্দু পরিবার এককালে রেশমের দালালী করিয়া সম্পদশালী হইয়াছিল; রেশমের ব্যবসায়ের পতনের সঙ্গে তাহাদের সম্পদ গিয়াছে, খাঁয়েরাও কেহ নাই; আছে কেবল খাঁ মহাজনদের ভাঙা বাড়ীর ইটের বনিয়াদের চিহ্ন। খাঁয়ের পাড়া পার হইয়া বিশ্বনাথ আপনাদের বাড়ীতে আসিয়া উঠিল।

ন্যায়রত্ন—শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্ন—এ অঞ্চলের মহামাননীয় ব্যক্তি, মহামহো-পাধ্যায় পণ্ডিত। বহুকাল হইতেই বংশটি পাণ্ডিত্য এবং নিষ্ঠার জন্য এ অঞ্চলে বিখ্যাত। দেশ-দেশান্তর হইতে তাঁহাদের টোলে বিদ্যার্থী-সমাগম হইত। এখনও টোল আছে, ন্যায়রত্নের মত মহামহোপাধ্যায় গুরুও আছেন কিন্তু এ-কালে বিদ্যার্থীর সংখ্যা নিতান্তই অল্প। বাড়ীর প্রথমেই নারায়ণশিলার খড়ো-ঘরের সম্মুখে খড়ের আটচালায় টোল বসে। এক পাশে লম্বা একখানি ঘরে ছাত্রদের থাকিবার ব্যবস্থা। ঘরখানি প্রকাণ্ড; সুদৃশ্য এবং মনোরম না হইলেও বাস করিবার স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব নাই; সেকালে কুড়ি জন পর্যন্ত ছাত্র এই ঘরে বাস করিত, এখন থাকে মাত্র দুই জন। বিশ্বনাথ যখন আসিয়া আটচালায় ঢুকিল তখন তাহারাও কেহ ছিল না; বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন তাহাদের দুইজনকেই চাষের কাজ দেখিতে মাঠে পাঠাইয়াছেন! কেবল একটা কুকুর ন্যায়রত্নের বসিবার আসন ছোট চৌকিটার উপর কুণ্ডলী পাকাইয়া

বসিয়া বাদলের দিনে পরম আরাম উপভোগ করিতেছিল। বিশ্বনাথ দেখিয়া শুনিয়া বিষম চটিয়া গেল। দাদুর প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি, সেই দাদুর আসনে আসিয়া বসিয়াছে একটা রোঁয়া ওঠা কুকুর! এদিক-ওদিক চাহিয়া কিছু না পাইয়া সে হাতের ছাতাটা উদ্যত করিয়া কুকুরটার পিছন দিক হইতে অগ্রসর হইল। ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই ভিতরবাড়ীর দরজায় ন্যায়রত্নের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিল—ভো ভো রাজন্ আশ্রমমৃগোইয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ!

মুখ ফিরাইয়া দাদুর দিকে চাহিয়া বিশ্বনাথ বলিল—এ ব্যাটা যদি আপনার কৃষ্ণসার আশ্রমমৃগ হয় তবে ঋষিবাক্যও আমি মানব না। ব্যাটা ঘেয়ো কুকুর—

হাসিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—ও আমার কাঙালীচরণ।

কাঙালী আপন নাম শুনিয়া মুখ তুলিয়া ছত্রপাণি বিশ্বনাথকে দেখিয়াও নড়িবার নাম করিল না, শীর্ণ-কাঠির মত লেজটা জলচৌকির উপর আছড়াইয়া পটপট শব্দ-মুখর করিয়া তুলিল। ন্যায়রত্ন অগ্রসর হইয়া আসিতেই সে চিত হইয়া শুইয়া পা চারিটা উপরের দিকে তুলিয়া দিল। এবার বিশ্বনাথ না হাসিয়া পারিল না। ন্যায়রত্ন হাসিয়া বলিলেন—এক ঘা খেলেই তো মরে যেতো। যা ছাতা তুমি তুলেছিলে!

বিশ্বনাথ উদ্যত ছাতাটা নামাইয়া বলিল—মাথা রাখবার জন্য ছাতার ব্যবস্থা দাদু, ওর বাঁট আর শিক যতই মজবুত হোক—মাথা ভাঙবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। মাথা ওর ভাঙত না, এক ঘা ওটাকে দেওয়াই আমার উচিত ছিল। যাক্ গে—হঠাৎ ও ব্যাটা জুটল কি করে? কি নাম বললেন ওর?

—কাঙালীচরণ। নামটা দিয়েছি আমিই। নামেই পরিচয়, কেমন করে কোথা থেকে এসে জুটলেন উনি। কিন্তু এই বাদলা মাথায় করে গিয়েছিলে কোথায়?

—গিয়েছিলাম দেবুর সঙ্গে। বলছি। দাঁড়ান আগে জামা গেঞ্জি খুলে আসি আমি।

বিশ্বনাথ ভিতরে চলিয়া গেল।

দেবুর নামে ন্যায়রত্নের মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। পরমুহূর্তেই তিনি স্বাভাবিক প্রসন্নমুখে বাড়ীর ভিতরেই চলিয়া গেলেন।

ভিতরে প্রবেশ করিতেই ন্যায়রত্ন শুনিলেন নারীকণ্ঠের কথা—আর বলো না,

বুড়ীর জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছি। কানে বদ্ধ কালা—বকলেও শুনতে পায় না; একবার কাপড় নিলে পনর দিনের আগে দেবে না। জবাব দিতেও মায়া লাগে।

বিশু বলিল—তাই বলে এই রকম ময়লা কাপড় পরে থাকবে! ছি!

—তা বটে। লোকজনের সামনে বেরুতে লজ্জা।

ন্যায়রত্ন হাসিয়া বাড়ীর উঠানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

"সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।"

সখি শকুন্তলে, মধুরাণাং আকৃতিনাং মণ্ডনং শোভনং কিমিব ন! তোমার সুন্দর বরতনুতে এই ময়লা কাপড়খানিই অপরূপ শোভন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোমার দুষ্মন্ত ওতেই মুগ্ধ হয়েছেন।

বিশ্বনাথ কথা বলিতেছিল স্ত্রীর সঙ্গে। সুন্দর একটি খোকাকে কোলে করিয়া তরুণী জয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া ছিল; সেও লজ্জিত হইয়া দ্রুতপদে রান্না-ঘরের ভিতরে গিয়া ঢুকিল। বিশ্বনাথও হাসিতে হাসিতে বাহিরে চলিয়া গেল।

শূন্য উঠানে দাঁড়াইয়া ন্যায়রত্ন আবার গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যে টলিতে টলিতে বাহির হইয়া আসিল খোকাটি। সুন্দর খোকা! মনোরম একটি লাবণ্য যেন সর্বাঙ্গ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে। বছরখানেক বয়স, সে আসিয়া বলিল—ঠাকুল!

জয়া তাহাকে শিখাইয়াছে কথটি; প্রপিতামহ ন্যায়রত্নকে সে বলে ঠাকুর।

ন্যায়রত্ন পৌত্রের সহিত ভাই সম্বন্ধ ধরিয়া প্রপৌত্রকে বলেন—বাবা, বাপি।

ছেলেটি আবার ডাকিল—ঠাকুল!

মুহূর্তে ন্যায়রত্নের মুখ প্রসন্ন হাসিতে ভরিয়া উঠিল—তিনি দুই হাত প্রসারিত করিয়া তাহাকে বুকে তুলিয়া বলিলেন—বাপি!

—আবা কোলো, আবা গান কোলো। অর্থাৎ আবার গান করো। ন্যায়রত্নের শ্লোক আবৃত্তির মধ্যে যে সুরটি থাকে—শুনিয়া শুনিয়া শিশু সেই সুরের মাধুর্যটিকে চিনিয়াছে, একবার শুনিয়া তাহার তৃপ্তি হয় না, সে বলে—আবা গান কোলো। ন্যায়রত্ন শিশুর অনুরোধ উপেক্ষা করেন না, আবার তিনি শ্লোক আবৃত্তি করেন। শিশুটির নাম অজয়, অজয় আবারও বলে—আবা কোলো।

ন্যায়রত্ন তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরেন। আনন্দে তাঁহার চোখ জলে ভরিয়া ওঠে। তাঁহার মনে হয়—এ সেই। হারানো ধন তাঁহার ফিরিয়া আসিয়াছে।

ন্যায়রত্নের হারানো ধন, তাঁহার একমাত্র পুত্র শশিশেখর, বিশ্বনাথের বাপ। সৌম্যকান্তি সুপুরুষ শশিশেখর এমনি তীক্ষ্ণধী ছিলেন এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দর্শনশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। শুধু হিন্দুদর্শন নয়, বৌদ্ধদর্শন, এমন কি বাপকে লুকাইয়া ইংরাজী শিখিয়া পাশ্চাত্য দর্শনও তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাই হইয়াছিল সর্বনাশের হেতু।

সে আমলে শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্ন ছিলেন আর এক মানুষ। প্রাচীন কাল এবং সনাতন ধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি মহাকালের তপোবনরক্ষী শূলহস্ত নন্দীর মত ভ্রূভঙ্গি করিয়া তর্জনী উদ্যত করিয়া সদাজাগ্রত ছিলেন। সেই হিসাবে তিনি ম্লেচ্ছ ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। শশিশেখরও আপনার ইংরাজী শিক্ষার কথা সযত্নে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ সে কথা একদিন প্রকাশ হইয়া পড়িল। সে সময় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন একজন ইংরেজ। ভদ্রলোক আই-সি-এস কর্মচারী হইলেও রাজনীতি অপেক্ষা বিদ্যানুশীলনেই বেশী অনুরাগী ছিলেন। আপন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন দর্শনশাস্ত্রের কৃতী ছাত্র। ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই জেলায় আসিয়া তিনি মহামহোপাধ্যায় শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্নের নাম শুনিয়া একদা নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন ন্যায়রত্নের টোলে। সাহেবের সঙ্গে ছিলেন জেলা স্কুলের হেডমাস্টার। দোভাষীর কাজ করিবার জন্যই সাহেব তাঁহাকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। শশিশেখর তখন সবে নবদ্বীপ হইতে দর্শনশাস্ত্র পড়া শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন। ন্যায়রত্ন সাদর অভ্যর্থনার ক্রটি করিলেন না। শশীর কিন্তু এতটা ভাল লাগিল না। তবু সে চুপ করিয়াই রহিল। সাহেবও একটু সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন। জেলা স্কুলের হেডমাস্টার ন্যায়রত্নকে বলিল—আপনি ব্যস্ত হবেন না ন্যায়রত্ন মশায়—সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে আপনার এখানে আসেন নি। উনি এসেছেন আপনার সঙ্গে আলাপ করতে।

ন্যায়রত্ন হাসিয়া বলিলেন—আলাপের ভূমিকাই হল অভ্যর্থনা। আর এটা আমার আতিথ্য-ধর্ম। রাজার দরবারে পণ্ডিত ব্যক্তির সম্মান যেমন প্রাপ্য—পণ্ডিতের কাছে রাজা রাজপুরুষের সম্মানও তেমনি প্রাপ্য। এ আমার কর্তব্য।

অতঃপর আরম্ভ হইল আলাপ। আলাপ আলোচনা শেষ করিয়া সাহেব উঠিয়া হাসিয়া ইংরাজীতে হেডমাস্টারকে কি বলিলেন। মাস্টারটি ন্যায়রত্নকে কথাটা অনুবাদ করিয়া না শুনাইয়া পারিলেন না। বলিলেন—সাহেব কি বলছেন জানেন?

ন্যায়রত্ন কোন আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, শুধু একটু হাসিলেন।

হেডমাস্টার বলিলেন—গ্রীক বীর আলেকজান্দার আমাদের দেশের এক যোগী-পুরুষকে দেখে বলেছিলেন, আমি যদি আলেকজান্দার না হতাম তবে এই ভারতের যোগী হবার কামনা করতাম। সাহেবও ঠিক তাই বলছেন। বলছেন যে, ইংলণ্ডে না জন্মালে আমি ভারতবর্ষে এমনি শিবশেখরেশ্বর হয়ে জন্মগ্রহণের কামনা করতাম।

ন্যায়রত্ন হাসিয়া বলিলেন—আমার এ ব্রাহ্মণজন্ম না হলেও আমি কিন্তু এই দেশের কীটপতঙ্গ হয়ে জন্মাতে কামনা করতাম, অন্যত্র জন্ম কামনা করতাম না।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ন্যায়রত্নের কথার মর্ম শুনিয়া হাসিয়া ইংরেজীতে মাস্টার মহাশয়কে বলিলেন—ইনফিরিয়রিটির এ এক ধারার বিচিত্র প্রকাশ! এটা যেন ভারতবাসীর প্রকৃতিগত।

মাস্টারটির মুখ লাল হইয়া উঠিল কিন্তু সাহেবের কথার প্রতিবাদ করিবার সাহস তাঁহার হইল না। ন্যায়রত্ন ইংরাজী বুঝিলেন না, কিন্তু বক্তার হাসির রূপ ও কথার সুর শুনিয়া ব্যঙ্গের শ্লেষ অনুভব করিলেন। তবুও তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু শশিশেখর দৃঢ়স্বরে ঈষৎ উষ্ণতার সহিত ইংরাজীতেই বলিয়া উঠিলেন—না, ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স এ নয়। এই তার এবং ভারতীয় মনীষীদের অন্তরের বিশ্বাস। তোমাদের পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা মনের অতিরিক্ত কিছু বোঝে না—বিশ্বাস করে না, আমরা মনের সীমানা অতিক্রম করে অন্তর এবং আত্মাকে বিশ্বাস করি। মন ও চিত্তকে জয় করে আত্মোপলব্ধির সাধনাই আমাদের সাধনা। আমাদের আত্মাকে মন পরিচালিত করে না, আত্মার নির্দেশে মনকে চলতে হয় বাহনের মত। সুতরাং তোমাদের মনোবিশ্লেষণে আমাদের ভারতীয়

সাধক মনীষীদের কম্‌প্রেস্ক-বিচার মূঢ়তা ছাড়া আর কিছু নয়।

সাহেব সপ্রশংস দৃষ্টিতে শশীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; মাস্টারটি ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন, রাজপুরুষের সপ্রশংস দৃষ্টিকেও তিনি বিশ্বাস করেন না। ন্যায়রত্ন বিপুল বিস্ময়ে বিস্মিত হইয়া পুত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শশী ম্লেচ্ছভাষায় অবলীলাক্রমে কথা বলিয়া গেল! শশীর মুখে ম্লেচ্ছভাষা!

এই লইয়াই পিতাপুত্রে বিরোধ বাধিয়া গেল।

ন্যায়রত্ন কালধর্মকে শিবের তপোবনে ঋতুচক্রের আবর্তনকে ঠেকাইয়া রাখার মত দূরে রাখিয়া সনাতন মহাকালধর্মকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু অকস্মাৎ দেখিলেন কখন কোন এক মুহূর্তে সেখানে অকাল বসন্তের মত কালধর্ম বিপর্যয় বাধাইয়া তুলিয়াছে। তাঁহারই ঘরে শশীর মধ্য দিয়া ম্লেচ্ছ বিদ্যার ভাবধারা সনাতন মহাকালধর্মকে ক্ষুণ্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। অপর দিকে শশিশেখর, এই আকস্মিক আত্মপ্রকাশের ফলে, সঙ্কোচশূন্য হইয়া আত্মবিশ্বাস এবং আত্মসংস্কৃতিমস্ত জীবন নিয়ন্ত্রণে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল।

তারপর সে এক ভয়ঙ্কর পরিণতি। ন্যায়রত্ন শূলপাণি নন্দীর মতই কঠিন নির্মম হইয়া উঠিলেন। শশিশেখর স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের জন্য গৃহত্যাগ করিল। ন্যায়রত্ন তাহাকে বাধা দিলেন না। কিন্তু বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পুত্রবধূ ও পৌত্রকে লইয়া যাইতে দিলেন না। সংকল্প করিলেন, শশী যে সংস্কৃতির ধারাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে সেই ধারাকে সংস্কার করিবার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবেন ঐ পৌত্রকে; এক বৎসর পরে ঘটিল এই ঘটনার চরম পরিণতি। এক পণ্ডিত-সভায় পিতা-পুত্রে শাস্ত্রবিচার লইয়া বিতর্ক উপলক্ষ করিয়া প্রকাণ্ড বিরোধ বাধিয়া গেল। শশিশেখরের সেই দীপ্ত চক্ষু, স্ফুরিত অধর, প্রতিভার বিস্ফোরণ আজও ন্যায়রত্নের চোখের উপর ভাসে। তাঁহার চোখে জল আসে।

সভার শেষে পিতা পুত্রকে বলিলেন—আজ থেকে জানব আমি পুত্রহীন। সনাতন ধর্মকে যে আঘাত করতে চেষ্টা করে, সে ধর্মহীন। ধর্মহীন পুত্রের মৃত্যু অপেক্ষা বরণীয় কল্যাণ আর কিছু কামনা করতে পারি না আমি।

শশীর চোখ জলিয়া উঠিল, সে বলিল—তা হলেই কি সনাতন ধর্ম রক্ষা হবে

আপনার ?

—হবে।

সেই দিনই শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্ন পুত্রহীন হইয়া গেলেন। শশিশেখর আত্ম-হত্যা করিল।

শিবশেখরেশ্বর স্তম্ভিত হইয়া কিছুকালের জন্য যেন সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিলেন। মদনকে ভস্ম করিয়া মহাকাল অন্তর্হিত হইলে নন্দীর যেমন অবস্থা হইয়াছিল—ন্যায়রত্নেরও তেমনি অবস্থা হইল। তারপর অকস্মাৎ একদা তিনি মহাকালকে—ওই নন্দীর মতই গিরিভবন-পথে বরবেশী মহাকালকে আবিষ্কারের মতই—আবিষ্কার করিলেন। কালের পরিবর্তনশীলতাকে মহাকালের লীলা বলিয়া যেন প্রত্যক্ষ করিলেন; সতীপতি মহাকাল সেই লীলায় গৌরীপতি; কিন্তু সেই-খানেই কি তাঁহার লীলার শেষ হইয়া গিয়াছে? এককালে তাই তিনি বিশ্বাস করিতেন বটে। কিন্তু আজ অনুভব করেন—সতী-গৌরীরূপিণী মহাশক্তি কত নূতন রূপে মহাকালকে বরণ করিয়াছেন, কিন্তু সে লীলা প্রত্যক্ষ করিবার মত দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যাসদেব আবির্ভূত হইয়া আর নব-পুরাণ রচনা করেন নাই।

বিশ্বনাথের পড়িবার বয়স হইতেই তিনি বিশ্বনাথকেই প্রশ্ন করিয়াছিলেন—দাদুর কোথায় পড়তে মন? আমার টোলে—না কলকাতার ইস্কুলে?

ছয়-সাত বৎসর বয়সের বিশ্বনাথ বলিয়াছিল—বাড়ীতে তোমার কাছে পড়ব দাদু আর ভাত খেয়ে ইস্কুলে যাব। টোলের নামও করে নাই।

ন্যায়রত্ন সেই ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন।···বিশ্বনাথ আজ এম-এ পড়ে। ন্যায়-রত্নের স্ত্রী মারা গিয়াছেন, পুত্রবধূ বিশ্বনাথের মা-ও নাই। বিশ্বনাথের বিবাহ দিয়া ন্যায়রত্ন আজ সংসার করিতেছেন, আর কালধর্মকে প্রণাম করিয়া মুগ্ধ দ্রষ্টার মত তাঁহার চরণক্ষেপের দিকে চাহিয়া আছেন।

কিন্তু তবু আজ দুই দুইবার তাঁহার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল, ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। বিশ্বনাথ এ কি করিতেছে? স্থানীয় বৈষয়িক গণ্ডগোলে আপনাকে জড়াইতেছে কেন? নিরস্ত হইবার জন্যই তিনি ঘরে গিয়া পুঁথি লইয়া বসিলেন।

সমস্ত দুপুর চিন্তা করিয়াও তিনি নিরস্ত এবং নিস্পৃহ হইতে পারিলেন না। অপরাহ্ণে পৌত্রের ঘরের দরজায় আসিয়া ডাকিলেন—বিশু!

ঘরের ভিতর হইতে উত্তর দিল শিশু অজয়—ঠাকুল! কোলে চাপি বাড়ী যাই।—বাড়ী যাই অর্থাৎ বাহিরে যাই।

হাসিয়া ন্যায়রত্ন ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলেন—বিশ্বনাথ ঘরে নাই। অজয়কে কোলে তুলিয়া লইয়া পৌত্রবধূকে প্রশ্ন করিলেন—হলা রাজ্ঞী শউন্তলে! রাজা দুষ্মন্ত কোথায় গেলেন?

হাসিয়া মাথার ঘোমটা অল্প বাড়াইয়া দিয়া জয়া বলিল—কি জানি কোথায় গেলেন।

ন্যায়রত্ন অজয়কে আদর করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন; তারপর অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন—তোমার সংসার-জ্ঞান আর কখনও হবে না।—বলিয়া প্রপৌত্রকে পৌত্রবধূর কোলে দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন চণ্ডীমণ্ডপে। বিশ্বনাথ নাটমন্দিরেই বসিয়াছিল।

ন্যায়রত্ন ডাকিলেন—বিশ্বনাথ!

'বিশ্বনাথ' ডাকে বিশ্বনাথ চকিত হইয়া উঠিল। দাদু তাহাকে ডাকেন 'দাদু' বা 'বিশু' নামে অথবা সংস্কৃত নাটক-কাব্যের নায়কদের নামে—কখনও ডাকেন রাজন্, কখনও রাজা দুষ্মন্ত, কখনও অগ্নিমিত্র ইত্যাদি—যখন যেটা শোভন হয়। বিশ্বনাথ নামে দাদু কখনও ডাকিয়াছেন বলিয়া তাহার মনে পড়িল না। চকিত হইয়া সে সসম্ভ্রমেই উত্তর দিল—আমাকে ডাকছেন?

ন্যায়রত্ন বলিলেন—হ্যাঁ। খুব ব্যস্ত আছ কি?

ন্যায়রত্ন অকস্মাৎ আজ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। পুত্র শশিশেখরের আত্মহত্যার পর হইতে তিনি নিরাসক্তভাবে সংসারে বাস করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। স্ত্রী বিয়োগে তিনি একফোঁটা চোখের জল ফেলেন নাই, এমন কি মনের গোপনতম কোণেও একবিন্দু বেদনাকে জ্ঞাতসারে স্থান দেন নাই। তারপর পুত্রবধূ মারা গেলে—সেদিনও তিনি অচঞ্চলভাবেই আপনার কর্তব্য করিয়াছিলেন। নিজে হাতে রান্না করিয়া দেবতার ভোগ দিয়াছেন, পৌত্র বিশ্বনাথকে খাওয়াইয়াছেন,

গৃহকর্ম করিয়াছেন ; স্থিরতা কখনও হারান নাই। আজ কিন্তু অন্তরে অস্থির, বাহিরে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন।

এখানে যে প্রজা-ধর্মঘট লইয়া আন্দোলন উঠিয়াছে—সে সংবাদ বিশ্বনাথ কলিকাতায় বসিয়া কেমন করিয়া পাইল ? এবং প্রজা-ধর্মঘটে সে কেন আসিল ?

তাহার এই আসা রথযাত্রা উপলক্ষে হইলেও ধর্মঘটের ব্যাপারটাই যে এই আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য একথা স্পষ্ট। দেশ-কালের পরিচয় তাঁহার অজ্ঞাত নয়, রাজনীতিক আন্দোলনের সংবাদ তিনি রাখিয়া থাকেন ; দেশের বিপ্লবাত্মক আন্দোলন ধীরে ধীরে প্রজা-জাগরণের মধ্যে কেমন করিয়া সঞ্চারিত হইতেছে—তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। তাই আজ দেবু ঘোষের সহিত বিশ্বনাথের এই যোগাযোগে তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। অকস্মাৎ অনুভব করিলেন যে, এতকালের নিরাসক্তির খোলসটা আজ যেন খসিয়া পড়িয়া গেল ; কখন আবার ভিতরে ভিতরে আসক্তির নূতন ত্বক সৃষ্ট হইয়া নিরাসক্তির আবরণটাকে জীর্ণ পুরাতন করিয়া দিয়াছে।

ন্যায়রত্ন পৌত্রের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন ; তারপর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিলেন—বাঁকা কথা কয়ে লাভ নেই দাদু—আমি সোজা কথাই বলতে চাই। প্রজা-ধর্মঘটের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি ? দেবু ঘোষের এই হাঙ্গামার খবর তোমাকে জানালেই বা কে ?

বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল—আজকাল টেলিগ্রাফের কল এখানে টিপ্‌লে হাজার মাইল দূরের কল সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয়, আর কলকাতায় খবরের কাগজ বের হয় দুবেলা। তা ছাড়া আপনি তো জানেন যে, দেবু আমার ক্লাসফ্রেণ্ড।

—আমি তো বলেছি বিশ্বনাথ, আমি সোজা কথা বলছি, উত্তরে তোমাকেও সোজা কথা বলতে অনুরোধ করছি। আর আমার ধারণা তুমি অন্তত আমার সামনে সত্য কখনও গোপন কর না।

ন্যায়রত্নের কণ্ঠস্বর আন্তরিকতায় গভীর ও গম্ভীর। বিশ্বনাথ পিতামহের দিকে চাহিল—দেখিল মুখখানা আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। বহুকাল পূর্বে ন্যায়রত্নের এ মুখ দেখিলে এ অঞ্চলের সকলেই অন্তরে অন্তরে কাঁপিয়া উঠিত। তাঁহার বিদ্রোহী

পুত্র শশিশেখর পর্যন্ত এ মূর্তির সম্মুখে চোখে চোখ রাখিয়া কথা বলিতে পারিতেন না। পিতার সহিত, তিনি বিদ্রোহ করিয়াছেন তর্ক করিয়াছেন,—কিন্তু সে সবই করিয়াছেন নতমুখে মাটির দিকে চোখ রাখিয়া। ন্যায়রত্নের সেই মুখের দিকে চাহিয়া বিশ্বনাথ ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেল। ন্যায়রত্ন আবার বলিলেন—কথার উত্তর দাও ভাই!

বিশ্বনাথ মৃদু হাসিয়া বলিল—আপনার কাছে মিথ্যে কখনও বলি নি, বলবও না। এখানে—মানে, ওই শিবকালীপুর গ্রামে—একজন রাজবন্দী ছিল জানেন? যাকে এখান থেকে ক'দিন হল সরিয়ে দিয়েছে? খবর দিয়েছিল সে-ই।

—তার সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?

—আছে।

—তাহলে —ন্যায়রত্ন পৌত্রের মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—তোমরা তাহলে একই দলভুক্ত?

—এককালে ছিলাম। কিন্তু এখন আমরা ভিন্ন মত ভিন্ন আদর্শ অবলম্বন করেছি।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—তোমাদের মত, তোমাদের আদর্শটা কি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার বিশ্বনাথ?

পিতামহের মুখের দিকে চাহিয়া বিশ্বনাথ বলিল—আমার কথায় আপনি কি দুঃখ পেলেন দাদু?

—দুঃখ?—ন্যায়রত্ন অল্প একটু হাসিলেন, তারপর বলিলেন—সুখ-দুঃখের অতীত হওয়া সহজ সাধনার কাজ নয় ভাই। দুঃখ একটু পেয়েছি বই কি।

—আপনি দুঃখ পেলেন দাদু! কিন্তু আমি তো অন্যায় কিছু করি নি। সংসারে যারা খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়, তাদেরই একজন হবার আকাঙ্ক্ষা আমার নেই বলে দুঃখ পেলেন?

—বিশ্বনাথ, দুঃখ পাব না, সুখ অনুভব করব না, এই সংকল্পই তো শশীর মৃত্যুর দিন গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু জয়াকে যেদিন তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ঘরে আনলাম, আজ মনে হচ্ছে সেইদিন শৈশব কালের মত গোপনে চুরি করে

আনন্দরস পান করেছিলাম—তারপর এল অজুমণি, অজয়। আজ দেখছি—শশীর মৃত্যুদিনের সংকল্প আমার ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। জয়া আর অজয়ের জন্যে চিন্তার, দুঃখের যে সীমা নেই।

বিশ্বনাথ চুপ করিয়া রহিল।

ন্যায়রত্নও কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—তোমার আদর্শের কথা তো আমাকে বললে না ভাই?

—আপনি সত্যিই শুনতে চান দাদু?

—হ্যাঁ, শুনব বই কি।

বিশু আরম্ভ করিল—তাহার আদর্শের কথা, অর্থাৎ মতবাদের কথা। ন্যায়রত্ন নীরবে সমস্ত শুনিয়া গেলেন, একটি কথাও বলিলেন না। রুশ দেশের বিপ্লবের কথা, সে দেশের বর্তমান অবস্থার কথা বর্ণনা করিয়া বিশ্বনাথ বলিল—এই আমাদের আদর্শ দাদু। কম্যুনিজম্, মানে সাম্যবাদ।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—আমাদের ধর্মও তো অসাম্যের ধর্ম নয় বিশ্বনাথ। যত্র জীব তত্র শিব, এ তো আমাদেরই কথা, আমাদের দেশের উপলব্ধি।

বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল—আপনার সঙ্গে কাশী গিয়েছিলাম দাদু, শুনেছিলাম শিবময় কাশী। দেখলাম সত্যিই তাই। বিশ্বনাথ থেকে আরম্ভ করে মন্দিরে, মঠে, পথে, ঘাটে, কুলুঙ্গীতে শিবের আর অন্ত নাই, অগুন্তি শিব। কিন্তু ব্যবস্থায় দেখলাম বিশ্বনাথের বিরাট রাজসিক ব্যবস্থা—ভোগে, শৃঙ্গারবেশে, বিলাসে, প্রসাধনে—বিশ্বনাথের ব্যবস্থা বিশ্বনাথের মতই। আবার দেখলাম কুলুঙ্গিতে শিব রয়েছেন—গুনে চারটি আতপ চাল আর একটি বেলপাতা তাঁর বরাদ্দ। আমাদের দেশের 'যত্র জীব তত্র শিব' ব্যবস্থাটা ঠিক ওই রকম ব্যবস্থা। সেইজন্যেই তো এখানে-ওখানে ছড়ানো ছোটখাটো শিবদের নিয়ে বিশ্বনাথের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান!

—থাক্ বিশ্বনাথ, ধর্ম নিয়ে রহস্য করো না ভাই; ওতে অপরাধ হবে তোমার।

—অঙ্কশাস্ত্র আর অর্থশাস্ত্রই আমাদের সর্বস্ব দাদু, ধর্ম আমাদের—

—উচ্চারণ কর না বিশ্বনাথ—উচ্চারণ কর না!

ন্যায়রত্নের কণ্ঠস্বরে বিশ্বনাথ এবার চমকিয়া উঠিল। ন্যায়রত্নের আরক্তিম মুখে-চোখে এবার যেন আগুনের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বহুকালের নিরুদ্ধ আগ্নেয়গিরির শীতল গহ্বর হইতে যেন শুধু উত্তাপ নয়, আলোকিত ইঙ্গিতও ক্ষণে ক্ষণে উঁকি মারিতেছে।

নারায়ণ, নারায়ণ!—বলিয়া ন্যায়রত্ন উঠিয়া পড়িলেন। বহুকাল পরে তাঁহার খড়মের শব্দ কঠোর হইয়া বাজিতে আরম্ভ করিল। ঠিক এই সময়েই জয়া অজয়কে কোলে করিয়া বাড়ী ও নাটমন্দিরের মধ্যবর্তী দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—নাতি-ঠাকুর্দায় খুব তো গল্প জুড়ে দিয়েছেন, এ দিকে সন্ধ্যে যে হয়ে এল!

চার

কয়েক দিন পর দেবু চলিয়াছিল কুসুমপুর।

পাঁচখানা গ্রাম—মহাগ্রাম, শিবকালীপুর, বালিয়াড়া-দেখুড়িয়া, কুসুমপুর ও কঙ্কণা এই লইয়া এককালে হিন্দুসমাজের পঞ্চগ্রাম গঠিত ছিল। তারপর কবে, কেমন করিয়া সমগ্র কুসুমপুর পুরাপুরি মুসলমানের গ্রাম হইয়া দাঁড়াইয়াছে সে ইতিহাস অজ্ঞাত না হইলেও বর্তমান ক্ষেত্রে অবান্তর। হিন্দু-সামাজিক বন্ধন হইতে কুসুমপুর দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন, কিন্তু তবুও একটা নিবিড় বন্ধন ছিল কুসুমপুরের সঙ্গে। এককালে কুসুমপুরের মিঞা-সাহেবরাই এ অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। কুসুমপুরের মিঞাদের প্রদত্ত লাখেরাজ, ব্রহ্মোত্তর এবং দেবোত্তরের জমি এ অঞ্চলে বহু ব্রাহ্মণ এবং বহু দেবস্থান আজও ভোগ করিতেছে। আবার কুসুমপুরের প্রান্তে যে মসজিদটি দেখা যায়, সেটির নিম্নাংশ যে এককালে কোন দেব-মন্দির ছিল—সে কথা দেখিবামাত্র বুঝা যায়। ধর্মকর্ম, পাল-পার্বণ এবং বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে দুই সমাজের মধ্যে নিমন্ত্রণ এবং লৌকিকতার আদান প্রদানও ছিল; বিশেষ করিয়া বিবাহাদি ব্যাপারে দুই পক্ষের সহযোগিতা ছিল নিবিড়। সেকালে মিঞাসাহেবদের পাল্কী ছিল চার-পাঁচখানি। এ অঞ্চলের যাবতীয় বিবাহে সেই পাল্কীই ব্যবহৃত হইত। সামিয়ানা, শতরঞ্জি মিঞাদের বাড়ী হইতেই আসিত।

বিবাহে মিঞারা লৌকিকতা করিতেন। বিবাহ-বাড়ী হইতে নিমন্ত্রিত মিঞাসাহেবদের বাড়ীতে অধিকাংশ স্থলেই পান-সুপারী এবং চিনির সওগাত পাঠান হইত ; ক্ষেত্র বিশেষে অবস্থাপন্ন হিন্দুর বাড়ী হইতে যাইত সিধা—ঘি, ময়দা, মাছ, মিষ্টান্ন ইত্যাদি। মিঞাসাহেবদের বাড়ীর বিবাহ-উৎসবে হিন্দুদের বাড়ীতেও অনুরূপ উপঢৌকন আসিত। হিন্দুদের পূজা-অর্চনায়, পূজার ব্যাপার চুকিয়া গেলে, মুসলমানেরা প্রতিমা দেখিতে আসিত, বিসর্জনের মিছিলে যোগ দিত ; এককালে মিঞাসাহেবদের দলিজার সম্মুখ পর্যন্ত বিসর্জনের মিছিল যাইত, মিঞাসাহেবরা প্রতিমা দেখিতেন, ; হিন্দুদের জন্য সেখানে তামাকের বন্দোবস্ত থাকিত। মুসলমানদের মহরমের মিছিলও হিন্দুদের গ্রামে আসিত, তাজিয়া নামাইয়া তাহারা লাঠি খেলিত, তামাক খাইত। সে-কালে হিন্দুদের পূজা-পার্বণে বাদ্যকর, প্রতিমা-বিসর্জনের-বাহক, নাপিত, পরিচারক প্রভৃতিদের, মিঞাসাহেবদের সেরেস্তায় পার্বণী বা বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। হিন্দুদের অনেক বাড়ীতেও মহরমের পর আসিত লাঠিয়ালের দল, তাহারা সেখানে বৃত্তি পাইত। লাঠিয়ালদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দুই-ই থাকিত। পীরের দরগায় হিন্দুবাড়ীর মানসিক চিনি-মিষ্টির নৈবেদ্যের রেওয়াজ এখনও একেবারে উঠিয়া যায় নাই। কঠিন শূলরোগের জন্য দেখুড়িয়া কালীবাড়ীতে মুসলমান রোগী আজও আসিয়া থাকে।

বর্তমান কালে কিছুদিন হইতে এসব কথা ক্রমে লোপ পাইতেছে, বিশেষ করিয়া এই ভোটপ্রথা প্রচলিত হইবার পর। ইহা ছাড়া কারণ অবশ্য লোকের বৈষয়িক অবস্থার অবনতি ; মিঞারা আজ প্রায় সর্বস্বান্ত। অন্যান্য হিন্দু-মুসলমানের অবস্থাও ক্রমশঃ খারাপ হইয়া আসিয়াছে। যাহাদের নূতন অভ্যুত্থান হইয়াছে, তাহাদেরও ধারা-ধরণ নূতন রকমের। আপনাদের সমাজ, আপনাদের জাতির মধ্যেও তাহাদের বন্ধনটা নিতান্তই লৌকিক। এখনকার দেশকাল সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। তবুও বন্ধন কিছু আছে, সেটুকু—গ্রাম্য-জীবন-যাপন করিতে হইলে ছিন্ন করা অসম্ভব। সমস্তটুকুই চাষের ব্যাপার লইয়া। কামার-ছুতারের বাড়ীতে এখনও বর্ষার সময় দুই দলই ভিড় করিয়া একত্র বসে—গল্প করে। জমিদারের কাছারীতে কিস্তীর সময় পাশাপাশি বসিয়া খাজনা দেয়, অজন্মার

বৎসর খাজনা ও সুদ লইয়া উভয় পক্ষ একত্রিত হইয়া পরামর্শ করিয়া জমিদার সেরেস্তায় একসঙ্গে দাবী উত্থাপন করে। যাত্রা ও কবিগানের আসরে উভয় পক্ষ ভিড় করিয়া আসে। কঙ্কণার বাবুদের থিয়েটার দেখিতে দুই পক্ষের ভদ্র-শিক্ষিতেরা সমবেত হন। অম্বুবাচী উপলক্ষে চাষীদের যে সার্বজনীন কুস্তী প্রতিযোগিতা হয়, তাহাতে উভয় পক্ষের চাষীরাই যোগদান করে। হিন্দুর আখড়ায় মুসলমান লড়িতে আসে, মুসলমানের আখড়ায় হিন্দুরা যায়। তবে আজকাল একটু সাবধানে দল বাঁধিয়া যায়। মারামারি হইবার ভয়টা যেন ইদানীং বাড়িয়াছে। উভয় পক্ষের গানের দলের প্রতিযোগিতা এখনও হয়। হিন্দুরা গায় ঘেঁটুগান, মুসলমানদের আছে আলকাটার কাপ, মেরাচিনের দল! মনসার ভাসানের গান দুইদলেই গায়।

বর্তমানে কুসুমপুরের চামড়ার ব্যবসায়ী দৌলত শেখ সর্বাপেক্ষা অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। শেখ ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর। গ্রামে ঢুকিতেই পড়ে তাহার দলিজা। সে আপনার দলিজায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল, পথে দেবুকে দেখিয়া সে ডাকিল —আরে দেবু পণ্ডিত নাকি? কুথাকে যাবে বাপজান? আরে শুন শুন!

দেবু একটু ইতস্তত করিয়া উঠিয়া আসিল। দৌলত শেখ সহৃদয়তার সঙ্গেই তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া দলিজায় বসাইল। তারপর বিনা ভূমিকায় সে বলিল —ই কাম তুমি ভাল কর্‌ছ না বাপজান।

দেবু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শেখের দিকে চাহিল। শেখ বলিল—খাজনা বৃদ্ধি নিয়া হাঙ্গামা করছ, ধর্মঘট বাধাইছ—ই কাম তুমি ভাল করছ না।

সবিনয়ে হাসিয়া দেবু বলিল—কেন?

দাড়িতে হাত বুলাইয়া দৌলত বলিল—আপন কামে কলকাতায় গেছিলাম। লাটসাহেবের মেম্বরদের সঙ্গে মুলাকাত হয়েছিল আমার। আমার মক্কেল আমারে নিয়া গেছিল মিনিস্টরের বাড়ী। হক সাহেবের পেয়ারের লোক মুসলমান মিনিস্টর, তাঁর বাড়ী। আমি শুধালাম। মিনিস্টর আমারে বললেন মিটমাট করে নিবার লেগে।

দেবু চুপ করিয়া রহিল। দৌলতই বলিল—তুমি বহুত কৈফতে পড়বা পণ্ডিত, ই কাম তুমি করিও না। শেষ .েশ সকল হুজ্জত তোমার উপর গিয়ে পড়বে। বেইমানরা তখন ঘরের কোণে জরুর আঁচল ধরে গিয়ে বসবে। মিনিস্টার আমারে বললেন—সরকারী আইনে যখন জমিদার বৃদ্ধি পাবার হক্‌দার হইছে, তখন ঠেকাবে কে? তার চেয়ে মিটমাট করে নেন গিয়া—সেই ভাল হবে। হুজ্জত বাধাইলে সরকারের ক্ষতি সরকার সহ্য করবে না।

দেবু এবার বলিল—কিন্তু যে বৃদ্ধি জমিদার দাবী করছেন, সে দিতে গেলে আমাদের থাকবে কি? আমরা খাব কি?

দৌলত মৃদুস্বরে বলিল—ঘোষের সাথে আমি কথা বলেছি বাপজান। আমারে ঘোষ পাকা কথা দিছে। তুমি বল—তুমারও আমি সেই হারে করে দিব। টাকায় আনা। ব্যস্! দৌলত অত্যন্ত বিজ্ঞের মত হাসিতে লাগিল।

—তাতে তো আমরা এক্ষুনি রাজী। আজই আমি ডেকে বলছি সব—

বাধা দিয়ে দৌলত বলিল—সবার কথা বাদ দিতে হবে, ই আমি তুমার কথা বুলছি।

দেবু এবার সমস্ত কথা এক মুহূর্তে বুঝিয়া লইল। সে ঈষৎ হাসিয়া সবিনয়ে বলিল—মাফ করবেন চাচা, একলা মিটমাট আমি করব না। আপনি চার পয়সা বলছেন?—আমি জানি,·এদের পক্ষ আমি যদি ছেড়ে দি—শ্রীহরি টাকায় এক পয়সা বৃদ্ধি নিয়ে আমার সঙ্গে মিটমাট করবে, কিন্তু সে আমি পারব না।—দেবু উঠিয়া দাঁড়াইল।

দৌলত তাহার হাত ধরিয়া বলিল—বস, বাপজান বস!

দেবু বসিল না, কিন্তু হাতও ছাড়াইয়া লইল না, দাঁড়াইয়া থাকিয়াই বলিল—বলুন।

—দেখ বাপ, আমার বয়স তিন কুড়ি হয়ে গেল—দুনিয়ার অনেক দেখলাম, অনেক শুনলাম। ই কাম তুমি করিয়ো না দেবু। আমি তোমাকে বুলছি, ই কাম তুমি করিয়ো না। শুন দেবু, দুনিয়াতে মানুষ বড় হয় ধনদৌলতে, আর বড় হয় আপনার এলেমে। ভাল কাম যে করে, আল্লা তাকে বড় করে। বাপজান, প্রথম

বয়সে খালি পায়ে ছাতা মাথায় বিশ কোশ হেঁটেছি—মুচীদের বাড়ী গিয়ে খাল কিনেছি, জমিদারে সেলাম ঠুকেছি, তুমার লদ্দিরে বুলেছি চাচা। আজ আল্লার মেহেরবানিতে ক্ষেত-খামার করলাম—নগদ টাকা জমালাম,—এখন যদি আমারে আমি কদর না করি, তবে দশজনা ছোট আদমিতেই বা আমার খাতির করবে কেনে, আর আল্লাই বা আমার উপর মেহেরবানি রাখবে কেনে? তোমার গাঁয়ের ঘোষেরে দেখ, দেখ তার চাল চলন। আরও শুন, কঙ্কণার মুখুর্জাদের কর্তার সবে তখন ব্যবসার পত্তন। তখন মুখুর্জা রায়বাবুদের, বাঁড়ুজ্জা বাবুদের সালাম বাজাত, পায়ের ধূলা নিত। আবার দেখলাম—লাখ-টাকা রোজগার করলে, মুখুর্জাকর্তাই মুলুকের সেরা আদমি হল; তখুনি নিজে বসত চেয়ারে, রায়বাবুদের বসতে দিত তক্তপোশে! ইজ্জত রাখতে হয়। বাপজান, তুমার বেটা গেছে—বহুত মাজুল তুমি দিছ, [illegible] জন্যে দশজনা তুমাকে ধন্যি করছে। আমার রইস থেকে ছোট-লোক সবাই ভাল বুলছে। এই সময় নিজের ইজ্জত তুমার নিজেকে বুঝতে হবে। ছোটলোক-হারামীদের সাথে উঠা-বসা তুমি করিও না। কঙ্কণার বাবু, পেসিডেন্ বাবু বুল ছস—দেবু ঘোষ যদি ইবার বোডে দাঁড়ায় তবে মুশকিল করবে। বোডে দাঁড়াও তুমি। ব্যবসা-পাত কর, এখুন তুমাকে খাতির করে বহুত মাহাজন মাল দিবে; আমি বুলছি দিবে। সাদি কর, ঘর-সংসার কর।

দেবু ধীরে ধীরে হাতখানি টানিয়া লইল। অভিবাদন করিয়া বলিল—সেলাম চাচা, রাত্রি হয়ে যাচ্ছে, আমি যাই।

দৌলত এবার স্পষ্টই বলিয়া ফেলিল—তুমি ব্যবসা কর, ই[illegible]রি ঘোষ মাহাজনের কাছে তোমার লাগি জামিন থাকবে।

হাত জোড় করিয়া দেবু বলিল—সে হয় না চাচা, কিছু মনে করবেন না আপনি।

সে আসিয়া উঠিল চাষী মুসলমানদের পাড়ায়। সেখানে তখন অনেক লোক জুটিয়াছে। সমবেত হওয়ার আনন্দে উৎসাহে তাহারা তাহাদের পাড়ার গানের দলটাকে লইয়া গান-বাজনার ব্যবস্থাও করিয়াছে। শ্রমিক ও শ্রমিক-চাষীদের গান-বাজনার দল। পশ্চিম-বাংলায় এই [illegible]নের দলকে বলে—ছ্যাচড়ার দল

কয়েকটি সুকণ্ঠ ছেলে ধুয়া ধরিয়া গান গাহিতেছিল, মূল গায়েন ইট-পাড়াইয়ের ঠিকাদার ওস্‌মান—মূল গানটা গাহিয়া চলিয়াছে। বাংলাদেশের বহু প্রাচীন কালের গান। ছেলেগুলি ধুয়া গাহিতেছে—

"—সজনি লো—দেখে যা—এত রেতে চরকায় ঘর্‌ঘরানী—
সজনি—লো—!"

ওসমান গাহিয়া চলিয়াছিল—

"কোন্ সজনি বলে রে ভাই চরখার নাইক হিয়া—
চরখার দৌলতে আমার সাতটি বেটার বিয়া।
কোন্ সজনি বলে রে ভাই চরখার নাইক পাতি—
চরখার দৌলতে আমার দোরে বাঁধা হাতি
কোন্ সজনি বলে রে ভাই চরখার নাইক নোরা—
চরখার দৌলতে আমার দোরে বাঁধা ঘোড়া।"

দেবু আসিতেই গান থামিয়া গেল। কয়েকজনে একসঙ্গেই বলিল—এই যে, আসুন—পণ্ডিত সাহেব আসুন।

রহম বলিল—বুড়ো শয়তান তুমাকে কি বুলছিল চাচা?

দেবু হাসিল, কোন উত্তর দিল না।

চাষীদের মাতব্বর, কুসুমপুর মক্তবের শিক্ষক ইরসাদ বলিল—বসেন ভাই সাহেব। দৌলত শেখ যা বুলছিল—সে আমরা জানি। আমাদের গাঁয়ে মজলিশের কথা শুনে—ছিরু ঘোষও যে এসেছিল আজ দৌলত শেখের কাছে।

দেবু এ-কথার কোন উত্তর দিল না।

ইরসাদ বলিল—আপনি বুড়াকে কি বললেন?

—ওর কথা থাক্ ভাই ইরসাদ। এখানে আমাকে ডেকেছেন যার জন্যে, সেই কথা বলুন।

ইরসাদ স্থির দৃষ্টিতে দেবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। উদ্ধত দুর্ধর্ষ রহম মুহূর্তে উগ্র উত্তেজনায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আলবাৎ বুলতে হবে তুমাকে।

দেবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—না।

—আলবাৎ বুলতে হবে।

দেবু এইবার প্রশ্ন করিল ইরসাদকে—ইরসাদ ভাই ?

ইরসাদ রহমকে ধমক দিয়া বলিল—রহম চাচা, করছ কি তুমি ? বস, চুপ করে বস।

রহম বসিল, কিন্তু দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করিয়া আপন মনেই বলিল—যে হারামী বেইমানী করবে, তার নলীটা আমি দু ফাঁক করে ময়ূরাক্ষীর পানিতে ভাসায়ে দিব, হ্যাঁ ! যা থাকে আমার নসীবে।

দেবু এবার হাসিয়া বলিল—সে যদি করি রহম চাচা, তবে তুমি তাই করো। সে সময়ে যদি চেঁচাই কি তোমাকে বাধা দিই, তবে আজকের কথা তুমি আমাকে মনে করিয়ে দিও। আমি তোমাকে বাধা দেব না, চেঁচাব না, কাঁদব না, গলা বাড়িয়ে দেব।

সমস্ত মজলিশটা স্তব্ধ হইয়া গেল। হ্যাঁচড়ার দলের ছোকরা কয়টি বিড়ি টানিতে টানিতে মৃদুস্বরে রসিকতা করিতেছিল—তাহারা পর্যন্ত সবিস্ময়ে দেবু ঘোষের মুখের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। অনুত্তেজিত শান্ত স্বরে উচ্চারিত কথা কয়টি শুনিয়া সকলেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল—এবং কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখে আশ্চর্য সে এক মিষ্ট হাসি ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া তাহাদের বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না। এই কথাগুলা বলিয়া মানুষ এমন করিয়া হাসিতে পারে ? রহম যে রহম, সেও একবার দেবুর মুখের দিকে চাহিয়া, পরমুহূর্তেই মাথাটা নিচু করিল, এবং অকারণে নখ দিয়া মাটির উপর হিজিবিজি দাগ কাটিতে আরম্ভ করিল।

কিছুক্ষণ পর ইরসাদ বলিল—আপনি কিছু মনে করবেন না দেবু-ভাই। রহম চাচাকে তো আপনি জানেন।

—না—না—না, আমি কিছু মনে করি নাই।—দেবু হাসিল।—এখন কাজের কথা বলুন ইরসাদ ভাই। রাত্রি অনেক হয়ে গেল।

ইরসাদ বিড়ি বাহির করিয়া দেবুকে দিল ; দেবু হাসিয়া বলিল—ওসব আমি ছেড়ে দিয়েছি।

—ছেড়ে দিয়েছেন ?—ইরসাদ নিজে একটা বিড়ি ধরাইয়া ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—আপনি ফকির হয়ে গেলেন দেবু-ভাই।

খাজনা-বৃদ্ধি সম্পর্কিত কথাবার্তা শেষ করিতে রাত্রি অনেকটা হইয়া গেল। কথা হইল, কুসুমপুরের মুসলমান প্রজারা আলাদাভাবেই ধর্মঘট করিবে ; হিন্দুদের সঙ্গে সম্পর্ক এইটুকু থাকিল যে, পরস্পরে পরামর্শ না করিয়া কোন সম্প্রদায় পৃথক্‌ভাবে জমিদারের সঙ্গে মিটমাট করিতে পারিবে না। মামলা-মকদ্দমায় দুই পক্ষেরই পৃথক উকীল থাকিবেন, তবে তাঁহারাও পরামর্শ করিয়া কাজ করিবেন।

ইরসাদ বলিল—সদরে নূরউল মহম্মদ সাহেবকে জানেন তো ? আমাদের জেলার লীগের সভাপতি ; উনাকেই আমরা ওকালতনামা দিব। আমাদের সুবিধা করে দিবেন।

—বেশ, তাই হবে। আজ তাহলে আমি উঠি !—বলিয়া কথা শেষ করিয়া দেবু উঠিল।

—রাত্রি অনেক হয়েছে দেবু ভাই, দাঁড়ান, আলো নিয়ে লোক সঙ্গে দি আপনার।

—দরকার হবে না। বেশ চলে যাব আমি।

—না, না। বর্ষার সময়, আঁধার রাত, সাপ-খোপের ভয়। তা ছাড়া তোমার ঘোষকে বিশ্বাস নাই। ঘোষের সাথে দৌলত শেখ জুটেছে। উহু !

সম্মুখের প্রাঙ্গণটায় লোকজন তখনও দাঁড়াইয়া ছিল। সেই ভিড়ের মধ্যে হইতে অগ্রসর হইয়া আসিল রহম চাচা, এক হাতে হ্যারিকেন, অন্যহাতে এক-গাছা লাঠি।—আমি যাচ্ছি ইরসাদ, আমি যাচ্ছি। চল বাপজান।—বলিয়া সে একমুখ হাসিল।

রহম দুর্দান্ত গোঁয়ার হইলেও চাষীদের মধ্যে একজন মাতব্বর ব্যক্তি। তাহার পক্ষে এইভাবে কাহাকেও আগাইয়া দেওয়া অগৌরবের কথা। দেবু ব্যস্তভাবে প্রতিবাদ করিয়া বলিল—না না, চাচা,—সে কি, তুমি কেন যাবে ?

—আরে বাপজান, চল। দেখি তুমার দৌলতে যদি পথে ঘোষ কি শেখের

লোকজনের সাথে মুলাকাৎ হয় তো একপ্যাচ আমুত্তির লড়াই করে লিব।··· সে পরম গৌরবে হাসিতে আরম্ভ করিল। দেবু আর আপত্তি করিল না। ইরসাদও বাধা দিল না। অন্যায় সন্দেহে আকস্মিক ক্রুদ্ধ-মুহূর্তে সে দেবুকে যে কটু কথা বলিয়াছে, তাহারই অনুশোচনায় সে এমনভাবে লাঠি-আলো লইয়া এই রাত্রে দেবুর সঙ্গে যাইতে উদ্যত হইয়াছে; আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও 'মাফ কর' কথাটা তাহার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই; সে তাই মমতাময় অভিভাবকের মত আপনার সকল সম্মান খর্ব করিয়া তাহাকে সর্ব বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া বুঝাইতে চায়—সে তাহাকে কত ভালবাসে, সে তাহার কত বড় আত্মীয়!

ইরসাদ বলিল—যাও চাচা—তাই তুমিই যাও।···

মাঠে পড়িয়াই রহম উচ্চকণ্ঠে গান ধরিয়া দিল—

"কালো [illegible] মেঘ রে, পানি নিয়া আয়
আমার জান জুড়ায়ে দে।"

হাসিয়া দেবু বলিল—আর জল নিয়ে করবে কি চাচা? মাঠ যে ভেসে গেল।

রহম একটু অপ্রস্তুত হইল। চাষের সময় এই মাঠের মধ্যে তাহার এই গান-টাই মনে আসিয়া গিয়াছে। বলিল—ব্যাঙের সাদীর গান চাচা! বলিয়াই আবার দ্বিতীয় ছত্র ধরিল—

"বেঙীর সাদী দিব রে মেঘ, ব্যাঙের সাদী দিব,
হুড়-হুড়ায়ে দে-রে জল, হুড়-হুড়ায়ে দে।
আমার জান জুড়ায়ে দে।"

আষাঢ়-শ্রাবণে অনাবৃষ্টি হইলে এ অঞ্চলে ব্যাঙের বিবাহ দিবার প্রথা আছে। ব্যাঙের বিবাহ দিলে নাকি আকাশ ভাঙিয়া বৃষ্টি নামে। বাল্যকালে দেবুও দল বাঁধিয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া ব্যাঙের বিবাহ দিয়াছে। ব্যাঙের বিবাহে তাহার প্রিয়তমা বিলুরও বড় উৎসাহ ছিল। তাহার মনে পড়িল, বিলু একবার একটা ব্যাঙকে কাপড়-চোপড় পরাইয়া অপূর্ব নিপুণতার সঙ্গে কনে সাজাইয়াছিল। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

বিলু ও খোকা! তাহার জীবনের সোনার লতা ও হীরার ফুল। ছেলেবেলায়

একটি রূপকথা শুনিয়াছিল—রাজার স্বপ্নের কথা। স্বপ্নে তিনি দেখিয়াছিলেন—এক অপূর্ব গাছ, রূপার কাণ্ড সোনার ডাল-পালা, তাহাতে ধরিয়াছে হীরার ফুল। আর সেই গাছের উপর পেখম ধরিয়া নাচিতেছে হীরা-মোতি-পান্না-প্রবাল-পোখ্‌-রাজ-নীলা প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণের মণিমাণিক্যময় এক ময়ূর। বিলু ছিল তাহার সেই গাছ, খোকা ছিল সেই ফুল, আর সেই গাছে নাচিত যে ময়ূর—সে ছিল তাহার জীবনের সাধ-সুখ-আশা-ভরসা, তাহার মুখের হাসি, তাহার মনের শান্তি! সে নিজে, হাঁ নিজেই তো, সেই গাছ কাটিয়া ফেলিয়াছে। আজ সে শুধু ধর্ম, কর্তব্য, সমাজ লইয়া কেবল ছুটিয়া বেড়াইতেছে। তাই যদি সে ভগবানকে ডাকিতে পারিত!

রাজবন্দী যতীনবাবু এখান হইতে চলিয়া যাওয়ার পর মধ্যে মধ্যে কতদিন তাহার মনে হইয়াছে যে, সব ছাড়িয়া সে কোন তীর্থে চলিয়া যায়। কিন্তু সে যেন পথ পাইতেছে না। যেদিন যতীনবাবু চলিয়া গেলেন, সেই দিনই ন্যায়রত্ন মহাশয় চিঠি পাঠাইলেন—"পণ্ডিত, আমাকে বিপদ হইতে ত্রাণ কর।"

খাজনা-বৃদ্ধি লইয়া জমিদার-প্রজায় যে বিরোধ বাধিবার উপক্রম হইয়াছে সে বিরোধ প্রজাপক্ষের সমস্ত দায়িত্ব, বিপুল-ভার পাহাড়ের মত তাহার মাথায় আজ চাপিয়া বসিয়াছে। খাজনা বৃদ্ধি! প্রজার অবস্থা চোখে দেখিয়াও জমিদার কেমন করিয়া যে খাজনা-বৃদ্ধি চায়, তা সে বুঝিতে পারে না।

প্রজার কি আছে? ঘরে ধান নাই, বৈশাখের পর হইতেই চাষী প্রজা ধান ধার করিয়া খাইতে শুরু করিয়াছে। গোটা বৎসর পরনে তাহাদের চারিখানার বেশী কাপড় জোটে না অসুখে লোকে বিনা চিকিৎসায় মরে। চালে খড় নাই, গোটা বর্ষার জলটা তাহাদের ঘরের মেঝের উপর ঝরিয়া পড়ে। ইহা দেখিয়াও খাজনা-বৃদ্ধি দাবী কেমন করিয়া করে তাহারা? এ অঞ্চলের জমিদারেরা একটা যুক্তি দেখাইয়াছেন যে ময়ূরাক্ষী নদীর বন্যারোধী বাঁধ তাঁহারা তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন, তাহার ফলে এখানকার জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বাড়িয়াছে। এত বড় মিথ্যা কথা আর হয় না। এ বাঁধ তৈয়ারী করিয়াছে প্রজারা। জমিদার মাথা হইয়া তত্ত্বাবধান করিয়াছে, চাপরাসী দিয়া প্রজাদের

ধরিয়া আনিয়া কাজ করিতে বাধ্য করিয়াছে। আজও প্রজারাই প্রতি বৎসর বাঁধ মেরামত করে। ইদানীং অবশ্য চাষী-প্রজারা অনেকে বাঁধ মেরামতের কাজে যায় না। এখন আইনও কিছু কড়া হইয়াছে বলিয়া জমিদার সদ্‌গোপ প্রভৃতি জাতির প্রজাকে ধরিয়া-বাঁধিয়া কাজ করাইতে সাহসও করে না; কিন্তু বাউরী, মুচী, ডোম প্রভৃতি শ্রেণীর প্রত্যেককে আজও বেগার খাটাইয়া লয়। সেটেলমেণ্ট রেকর্ড অব রাইট্‌সে পর্যন্ত ওই বেগার দেওয়াটাই তাহাদের বসতবাটির খাজনা হিসাবে লেখা হইয়াছে। 'ভিটার খাজনা বৎসরে তিনটি মজুর'—একটি বাঁধ মেরামতের জন্য একটি চণ্ডীমণ্ডপের জন্য অপরটি জমিদারের নিজের বাড়ীর জন্য।

—দেবু চাচা! ইবার আমি যাই?…এতক্ষণ ধরিয়া রহম শেখ সেই গানটাই গাহিতেছিল, অকস্মাৎ গান বন্ধ করিয়া দেবুকে বলিল—গাঁয়ের ভিতরে আমি আর যাব না। লণ্ঠন ও লাঠি হাতে দেবুর সঙ্গী হিসাবে রহম এ গ্রামে ঢুকিতে চায় না।

দেবু চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—গ্রামপ্রান্তে মুচীপাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সে বলিল—হাঁ হাঁ, এবার তুমি যাও চাচা।

—আদাব।

—আদাব চাচা।

—আমার কথায় তুমি যেন কিছু মনে করিও না বাপজান!…রহম এতটা পথ লাঠি ও লণ্ঠন হাতে দেবুর সঙ্গে আসিয়া রূঢ় কথার অপরাধ-বোধের গ্লানি হইতে অনেকখানি মুক্ত হইয়াছে, হাল্কা মনে এবার সে সহজভাবেই কথাটা বলিয়া ফেলিল।

দিব্যহাস্যে দেবুর মুখ ভরিয়া উঠিল, বলিল—না, না, চাচা! ছেলেপিলেকে কি শাসন করি না? বলি না—খারাপ কাজ করলে খুন করব?

—তাহলে আমি যাই?

—হাঁ, যাও তুমি।

—নাঃ, চল তুমারে বাড়ীতে পৌছায়ে দিয়া তবে যাব।…দেবুর মিষ্টহাস্যে, তাহার ওই পরম আত্মীয়তা-সূচক কথাতে রহমের মনের গ্লানি তো মুছিয়া গেলই উপরন্তু সেই আনন্দের উচ্ছ্বাসে মুহূর্তে মান-অপমানের প্রশ্নটাও মুছিয়া গেল। সে বলিল—আপন ছেলেকে পৌছায়ে দিতে আসছি—তার আবার শরম কিসের? চল।

দেবুর বাড়ীর দাওয়ায় লণ্ঠন জ্বলিতেছিল। দেবু বিস্মিত হইয়া গেল। আপনজনহীন বাড়ী,—সেখানে কাহারা এমন করিয়া বসিয়া আছে? এত রাত্রিতে কোথা হইতে কাহারা আসিল? কুটুম্ব নয় তো? অম্বুবাচী ফেরত গঙ্গাস্নানের যাত্রী হওয়াও বিচিত্র নয়।

বাড়ীর দুয়ারে আসিতেই পাতু মুচী বলিল—এই যে এসে গিয়েছেন পণ্ডিত।

দাওয়ার উপরে বসিয়া ছিল হরেন ঘোষাল, তারা নাপিত, গিরিশ ছুতার এবং আরও কয়েকজন। শঙ্কিত হইয়াই দেবু প্রশ্ন করিল—কি হল?

হরেন বলিল—This is very bad পণ্ডিত, very bad;—এই জল-কাদা, সাপ-খোপ, অন্ধকার রাত্রি, তার ওপর জমিদারদের সঙ্গে এইসব চলছে। তুমি সন্ধ্যাবেলায় আসবে বলে গেলে, তারপর এত রাত্রি পর্যন্ত আর নো পাত্তা!

দরজার মুখের অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া আসিল দুর্গা, সে হাসিয়া বলিল—জামাই তো কাউকে আপন ভাবে না ঘোষাল মশায়, যে মনে হবে আমার লেগে কেউ ভাবছে!

দেবু মৃদু হাসিল।

পাতু বলিল—আমি এই বেরুচ্ছিলাম লণ্ঠন নিয়ে।

দুর্গা বলিল—রাত হল দেখে কামার-বৌকে দিয়ে রুটি করিয়ে রেখেছি। মুখ-হাতে জল দাও, দিয়ে—চপ খেয়ে আসবে। আজ আর রান্না করতে হবে না।

এই দুর্গা আর কামার বউ পদ্ম! দেবুর স্বজনহীন জীবনে শুধু পুরুষেরাই নয়, এই মেয়ে দুটিও অপরিমেয় স্নেহমমতা লইয়া অযাচিত-ভাবে আসিয়া তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া দিতে চায়। কামার-বউ তাহার মিতেনী। অনি-ভাই যে দেশ ত্যাগ করিয়া কোথায় গেল! কামার-বউ পদ্ম এখন তাহার পোষ্যের সামিল, স্বামী-পরিত্যক্তা বন্ধ্যা মেয়েটার মাথাও খানিকটা খারাপ হইয়া গিয়াছে। পদ্মকে লইয়া সে যে কি করিবে ভাবিয়া পায় না।

ভাবিতে ভাবিতে সে দুর্গার সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। দুর্গা বলিল—দেবতা ললপাচ্ছে। রাতে জল হবে। ওঃ কি মেঘ!

পাঁচ

পদ্ম প্রতীক্ষা করিয়াই বসিয়া ছিল।

প্রতীক্ষা করিয়া থাকিয়া অনেকদিন পর আজ আবার সে তৃপ্তি পাইয়াছে। একসময় অনিরুদ্ধের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া কতদিন সারারাত জাগিয়া থাকিত। তারপর আসিয়াছিল যতীন।

পদ্মর রিক্ত জীবনে যতীনের আসাটা যেন একটা স্বপ্ন। ছেলেটি হঠাৎ আসিয়াছিল। বিধাতা যেন ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। ভাবিতেও বিস্ময় লাগে হঠাৎ থানার লোক আসিয়া তাহাদের একখানা ঘর ভাড়া লইল। কে নজরবন্দী আসিবে। তাহার পর আসিল যতীন।

অনিরুদ্ধের একখানা ঘর ভাড়া লইয়া পুলিশ-কর্তৃপক্ষ কলিকাতার এই ছেলেটিকে এই সুদূর পল্লীগ্রামের উত্তেজনাহীন আবেষ্টনীর মধ্যে আনিয়া রাখিয়াছিল। কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত হইয়া ভাবিয়াছিল বাংলার মুমূর্ষু সমাজের অসুস্থ নিঃশ্বাস ইহাদের অন্তরেও সংক্রামিত হইয়া পড়িবে বর্ষার জলভরা মেঘের প্রাণশক্তিকে নিষ্ফল করিবার জন্য মরুভূমির আকাশে পাঠাইয়াছিলেন যেন ক্রুদ্ধ দেবতা। কিন্তু একদিন দেবতা সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন প্রাণশক্তি ব্যর্থ হয় নাই; ঊষর-মরুবুকে মধ্যে মধ্যে সবুজের ছোপ ধরিয়াছে, ওয়েসিস্ জাগিয়াছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন পল্লীগ্রামের তাপতৃষ্ণাময় নিরুদ্যম জীবনে এই রাজবন্দীগুলির প্রাণশক্তির স্পর্শে মরূদ্যান-আবির্ভাবের মত নবজাগরণের আভাস ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল। দেখিয়া-শুনিয়া সরকার রাজবন্দীদের এই পল্লীনির্বাসন প্রথা তুলিয়া দিয়া তাহাদিগকে সরাইয়া লইলেন। বাংলাদেশের সরকারী রিপোর্টে এবং বাংলার রাজনীতিক ইতিহাসে এ তথ্য স্বীকৃত এবং সত্য।

সে কথা থাক্। পদ্মের কথা বলি। পদ্ম তখন অপ্রকৃতিস্থ ছিল। রাজবন্দী যতীনবাবুকে লইয়া পদ্ম কয়েকদিন পর প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল, সে সাজিয়া বসিয়াছিল তাহার মা। মেয়েদের মা সাজিবার শক্তি সহজাত। তিন-চার বছরের মেয়ে

যেমন তাহার সমান আকারের সেলুলয়েডের পুতুল লইয়া মা সাজিয়া খেলা করে—তেমনি করিয়াই পদ্ম কয়েকদিন যতীনকে লইয়া খেলা-ঘর পাতিয়াছিল। যতীন আবার জুটাইয়াছিল এই গ্রামেরই পিতৃমাতৃহীন একটা বাচ্চাকে—উচ্চিংড়েকে। উচ্চিংড়ে আবার আনিয়াছিল আর একটাকে—সেটার নাম ছিল গোবরা।

দিনকতক খেলা-ঘর জমিয়া উঠিয়াছিল। হঠাৎ ঘরটা ভাঙিয়া গেল। পুলিশ-কর্তৃপক্ষ যতীনকে সরাইয়া লইতেই পদ্মর জীবনে আর এক বিপর্যয় আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার একমাত্র আর্থিক সংস্থান ঘরভাড়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে উচ্চিংড়ে এবং গোবরাও পদ্মকে ছাড়িয়া পলাইয়াছে। কারণ আহারের কষ্ট সহ্য করিতে তাহারা রাজী নয়। জীবনে ইহারই মধ্যে তাহারা উপার্জনের পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে। ময়ূরাক্ষীর ওপারে বড় রেলওয়ে জংশন-স্টেশন। ব্যবসায় সেখানে দিন-দিন সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে; মাড়োয়ারী মহাজনদের গদী—বড় বড় ধান-কল, তেল-কল, ময়দা-কল, মোটর-মেরামতের কারখানা প্রভৃতিতে অহরহ টাকা-পয়সার লেনদেন চলিতেছে—বর্ষার জলের মত, মাঠের মাছের মত বন্যার জলের সন্ধান পাইয়া উচ্চিংড়ে ও গোবরা সেইখানে গিয়া জুটিয়াছে। কয়েকদিন ভিক্ষা করে, কয়েকদিন চায়ের দোকানে ফাই-ফরমাশ খাটে; কখনও মোটর-সার্ভিসের বাস ধুইবার জন্য জল তুলিয়া দেয়; আর সুযোগ পাইলে গভীর রাত্রে স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে ঘুমন্ত যাত্রীদের দুই-একটা ছোটখাটো জিনিস লইয়া সরিয়া পড়ে।

পদ্ম যে তাহাদের ভালবাসিয়াছিল, সেও বোধ হয় তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। কোন দিন একবারের জন্যও তাহারা আসে না। অনিরুদ্ধ জেলে। পদ্ম আবার বিশ্ব-সংসারে একা হইয়া পড়িয়াছে, ধীরে ধীরে তাহার মানসিক অসুস্থতা আবার বাড়িতেছিল। একা উদাসদৃষ্টিতে জনহীন বাড়ীটার মাথার উপরের আকাশের দিকে চাহিয়া সে এখন নিথর হইয়া বসিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে খুট্খাট্ শব্দ ওঠে। বিড়াল অথবা ইঁদুরে শব্দ করে; অথবা কাক আসিয়া নামে। সেই শব্দে দৃষ্টি নামাইয়া সেদিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া একটুকরা বিচিত্র হাসিয়া আবার সে আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া তাকায়। উচ্চিংড়ে-গোবরা যে পরের ছেলে, তাহারা যে চলিয়া গিয়াছে এ কথাটা তাহার মনে পড়িয়া যায়।

একমাত্র দুর্গা-মুচিনী তাহার খোঁজখবর করে। দুর্গা তাহাকে বলে, মিতেনী। এককালে স্বৈরিণী দুর্গা অনিরুদ্ধের সঙ্গে মিতে পাতাইয়াছিল; শ্লেষ এবং ব্যঙ্গ করিবার জন্যই পদ্মকে তখন সে মিতেনী বলিত। কিন্তু এখন সম্বন্ধটা হইয়া উঠিয়াছে পরম সত্য। দুর্গাই দেবু ঘোষকে পদ্মের সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়াছিল। বলিয়াছিল—একটা উপায় না করলে তো চলবে না জামাই!

দেবু চিন্তিত হইয়া উত্তর দিয়াছিল—তাই তো দুর্গা!

—তাই তো বলে চুপ করলে তো হবে না। তোমার মত লোক গাঁয়ে থাকতে একটা মেয়ে ভেসে যাবে?

—কামার-বউয়ের বাপের বাড়ীতে কে আছে?

—মা-বাপ নাই, ভাই-ভাজ আছে—তারা বলে দিয়েছে ঠাঁইটুনো তারা দিতে পারবে না।

—তাহলে?

—তাই তো বলছি। শেষকালে কি ছিরু পালের—

—ছিরু পালের? দেবু চমকিয়া উঠিয়াছিল।

হাসিয়া দুর্গা বলিয়াছিল—ছিরু পালকে তো জান? ঢের দিন থেকে তার নজর পড়ে আছে কামার-বউয়ের ওপর। ওর দিকে নজর দিয়ে আমাকে ছেড়েছিল সে। তাই তো আমি ইচ্ছে করে ওকে দেখাবার জন্যে অনিরুদ্ধের সঙ্গে মিতে পাতিয়েছিলাম।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দেবু বলিয়াছিল—খাওয়া-পরার কথা আমি ভাবছি না দুর্গা একটি অনাথা মেয়ে, তার ওপর অনি-ভাই আমার বন্ধু ছিল, বিলুও কামার-বউকে ভালবাসত। খাওয়া-পরার ভার না-হয় আমি নিলাম, কিন্তু ওকে দেখবে-শুনবে কে? একা মেয়েলোক—

শুনিয়া লঘু হাস্য ফুটিয়াছিল দুর্গার মুখে।

দেবু বলিয়াছিল—হাসির কথা নয় দুর্গা।

এ কথায় দুর্গা আরও একটু হাসিয়া বলিয়াছিল—জামাই, তুমি পণ্ডিত মানুষ। কিন্তু—

সহসা সে আপনার আঁচলটা মুখে চাপা দিয়া বেশ খানিকটা হাসিয়া লইয়া বলিয়াছিল—এই সব ব্যাপারে আমি কিন্তু তোমার চেয়ে বড় পণ্ডিত।

দেবু স্বীকার করিয়া হাসিয়াছিল।

—পোড়ার মুখের হাসিকে আর কি বলব?—বলিয়া সে হাসি সংবরণ করিয়া অকৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গেই বলিয়াছিল—জান জামাই! মেয়েলোক নষ্ট হয় পেটের জ্বালায় আর লোভে। ভালবেসে নষ্ট হয় না—তা নয়, ভালবেসেও হয়। কিন্তু সে আর ক'টা? একশোটার মধ্যে একটা। লোভে পড়ে—টাকার লোভে, গয়না-কাপড়ের লোভে মেয়েরা নষ্ট হয় বটে। কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, পণ্ডিত। তুমি তাকে পেটের জ্বালা থেকে বাঁচাও। কর্মকার পেটের ভাত রেখে যায় নাই, কিন্তু একখানা বগি-দা রেখে গিয়েছে; বলত, এ দা দিয়ে বাঘ কাটা যায়। সেই দাখানা পদ্ম-বউ পাশে নিয়ে শুয়ে থাকে। কাজ করে, কর্ম করে—দাখানা রাখে হাতের কাছাকাছি। তার লেগে তুমি ভেবো না। আর যদি দেহের জ্বালায় সে থাকতে না পারে, খারাপই হয় তা হলে তোমার ভাত আর সে তখন খাবে না। চলে যাবে।

দেবু সেই দিন হইতে পদ্মের ভরণপোষণের ভার লইয়াছে। দুর্গা দেখাশুনা করে। আজ পদ্মের বাড়ীতেই দুর্গা ময়দা কিনিয়া দিয়া দেবুর জন্য রুটি গড়াইয়া রাখিয়াছে।

খাবারের আয়োজন সামান্যই, রুটি, একটা তরকারি, দুই টুকরা মাছ, একটু মসুরকলাইয়ের ডাল ও খানিকটা গুড়। কিন্তু আয়োজনের পারিপাট্য একটু অসাধারণ রকমের। থালা-গেলাস-বাটিগুলি ঝকঝক করিতেছে রুপার মত; ছেঁড়া কাপড়ের পাড়ের সুতা দিয়া তৈরী-করা আসনখানি ভারি সুন্দর। তাহার নিজের হাতের তৈরী। কয়েকটি কচি পদ্মপাতা সুনিপুণভাবে গোল করিয়া কাটিয়া জলের গেলাসের ঢাকা করিয়াছে, ডালের বাটিও পদ্মপাতায় ঢাকা, সব চেয়ে ছোট যেটি সেটির উপর দিয়াছে একটু নুন, ইহাতেই সামগ্রী যেন অসামান্য হইয়া উঠিয়াছে; প্রথম দৃষ্টিতেই মন অপূর্ব প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠে। পদ্মের ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া,

ভক্তি-শ্রদ্ধা-মাখা এই আয়োজন দেখিয়া দেবু বেশ একটু লজ্জিত হইল।

—আরে বাপ রে! মিতেনী এসব করেছে কি দুর্গা?

দাওয়ার উপর এক প্রান্তে দুর্গা বসিয়া ছিল, সে হাসিয়া বলিল—আর বলো না বাপু, শুন দেবে কিসে—এই নিয়ে ভেবে সারা। আমি বললাম—একটু শালপাতা ছিঁড়ে তারই উপর দাও—উহুঁ। শেষে এই রাত্তিরে গিয়ে পদ্মপাতা নিয়ে এল। তারপর ওই সব তৈরী হল।

পদ্ম খাবারের থালা নামাইয়া দিয়া, রান্নাঘরের দরজার পাশে দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কথাগুলি শুনিয়া তাহার মাথাটা অবসন্ন হইয়া দেওয়ালের গায়ে হেলিয়া পড়িল, স্থির-উদাস দৃষ্টিভরা বড় চোখ দুটিও মুহূর্তে বন্ধ হইয়া আসিল, দেহ-মন যেন বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, চোখে স্বস্তির ঘুম জড়াইয়া আসিতেছে।

আসনে বসিয়া দেবুরও বড় ভাল লাগিল। বহুদিন—বিলুর মৃত্যুর পর হইতে এমন যত্ন করিয়া তাহাকে কেহ খাইতে দেয় নাই। গ্রাসে জল গড়াইয়া হাত ধুইয়া সে হাসিয়া বলিল—দুর্গা, বিলু যাওয়ার পর থেকে এত যত্ন করে আমাকে কেউ খেতে দেয় নাই।

দুর্গা দেবুকে কোন জবাব দিল না, রান্নাঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিল—শুনছ হে মিতেনী, তোমার মিতে কি বলছে? ঘরের মধ্যে পদ্মর মুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল। দুর্গা দেবুকে বলিল—বেশ মিতেনী তোমার, জামাই! খেতে দিয়ে ঘরে ঢুকেছে। কি চাই—কোন্‌টা ভালো হয়েছে, শুধোবে কে বল তো?

দেবু বলিল—না, না, আমার আর কিছু চাই না। আর রান্না সবই ভালো হয়েছে।

—তা হলেও এসে দুটো কথা বলুক। গল্প না করলে খাওয়া হবে কি করে?

—তুই বড় ফাজিল দুর্গা।

—আমি যে তোমার শালী গো!—বলিয়া সে হাসিয়া সারা হইল, তারপর বলিল—আমার হাতে তো তুমি খাবে না ভাই, নইলে দেখতে এর চেয়ে কত ভালো করে খাওয়াতাম তোমাকে।

দেবু কোন উত্তর দিল না, গম্ভীর ভাবে খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িল; বলিল—আচ্ছা, এখন চললাম।

আলোটা তুলিয়া লইয়া দুর্গা অগ্রসর হইল। দেবু বলিল—তোকে যেতে হবে না, আলোটা আমাকে দে।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দুর্গা আলোটা নামাইয়া দিল। বাড়ী হইতে দেবু বাহির হইতেই কিন্তু সে আবার ডাকিয়া বলিল—শোন জামাই, একটু দাঁড়াও!

দেবু দাঁড়াইয়া বলিল—কি?

দুর্গা অগ্রসর হইয়া আসিল, বলিল—একটা কথা বলছিলাম।

—বল।

—চল, যেতে যেতে বলছি।

একটু অগ্রসর হইয়া দুর্গা বলিল—কামার-বউকে কিছু ধানভানা কোটার কাজ দেখে দাও, জামাই। একটা পেট তো, ওতেই চলে যাবে। তারপর যদি কিছু লাগে তা বরং তুমি দিও।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দেবু শুধু বলিল—হুঁ!

আরও কিছুটা আসিয়া দুর্গা বলিল—এ গলির পথে আমি বাড়ী যাই।

দেবু কোনও উত্তর দিল না। দুর্গা ডাকিল—জামাই!

—কি?

—আমার উপর রাগ করেছ?

দেবু এবার তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল—না।

—হুঁ, রাগ করেছ। রাগ যদি না করেছ তো কই হাস দেখি একটুকুন্।

দেবু এবার হাসিয়া ফেলিল, বলিল—যা, ভাগ্।

কৃত্রিম ভয়ে দুর্গা বলিয়া উঠিল—বাবা রে! এইবারে জামাই মারবে বাবা! পালাই।—বলিয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া এক-হাত কাচের চুড়িতে যেন বাজনার ঝঙ্কার তুলিয়া গলি-পথের অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া গেল।

দেবু সস্নেহে একটু হাসিল। তারপর ধীরে ধীরে আসিয়া সে যখন বাড়ীতে পৌঁছিল, তখন দেখে পাতু শুইতে আসিয়া বসিয়া আছে। দুর্গার দাদা পাতু মুচী

দেবুর বাড়ীতেই শোয়।

বিছানায় শুইয়াও দেবুর ঘুম আসিল না।

যাহাকে বলে খাঁটি চাষী, সেই খাঁটি চাষীর ঘরের ছেলে সে। বাপ তাহার নিজের হাতে লাঙল ধরিয়া চাষ করিত; কাঁধে করিয়া বাঁক বহিত, সারের ঝুড়ি মাথায় তুলিয়া গাড়ী বোঝাই করিত, ধানের বোঝা মাঠ হইতে মাথায় বহিয়া ঘরে আনিত, গরুর সেবা করিত। দেবুও ছেলেবেলায় ভাগের রাখালের পালে গরু দিয়া আসিয়াছে, গরুর সেবা সে-ও সে-সময় নিয়মিত করিত, চাষের সময় বাপের জন্ম জলখাবার মাঠে লইয়া যাইত। তাহার বাপ জল খাইতে বসিলে—বাপের ভারী কোদালখানা চালাইয়া অভ্যাস করিত; বাড়ীতে কোদালের যাহা কিছু কাজকর্ম সে-বয়সে সে-ই করিয়া যাইত। তারপর একদা গ্রাম্য পাঠশালা হইতে সে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় বৃত্তি পাইল। পাঠশালায় পণ্ডিত ছিল ওই বৃদ্ধ, বর্ত-মানে দৃষ্টিহীন কেনারাম। কেনারামই সেদিন তাহার বাপকে বলিয়াছিল—তুমি ছেলেকে পড়তে দাও দাদা। ছেলে হতে তোমার দুঃখ ঘুচবে। দেবু যেমন-তেমন বৃত্তি পায় নাই, গোটা জেলার মধ্যে ফার্স্ট হয়েছে: কঙ্কণার ইস্কুলে মাইনে লাগবে না, তার ওপর মাসে দু-টাকা বৃত্তি পাবে। না পড়লে বৃত্তিটা পাবে না বেচারী।...

কেনারামই কঙ্কণার স্কুলে তাহার মণ্ডল উপাধি বাদ দিয়া ঘোষ লিখাইয়াছিল। তারপর প্রতিবারই সে ফার্স্ট অথবা সেকেণ্ড হইয়া ফার্স্ট ক্লাস পর্যন্ত উঠিয়াছে। এই কালটির মধ্যে তাহার বাপ তাহাকে কোন কাজ করিতে দেয় নাই। তাহার বাপ হাসিয়া তাহার মাকে কতবার বলিয়াছে—দেবু আমার হাকিম হবে।...দেবুও সেই আশা করিত।...

কথাগুলা মনে করিয়া দেবু আজ বিছানায় শুইয়া হাসিল।

তারপর—অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত তাহার জীবনে নামিয়া আসিল জীবনের প্রথম দুর্যোগ. বাপ-মা প্রায় একসঙ্গেই মারা গেলেন। ফার্স্ট ক্লাস হইতেই দেবুকে বাধ্য হইয়া পড়া ছাড়িতে হইল। তাহাকে অবলম্বন করিতে হইল তাহার পৈতৃক-বৃত্তি। হাল-গরু লইয়া বাপ-পিতামহের মত সে চাষ আরম্ভ করিল।

তারপর পাইয়া গেল সে ইউনিয়নবোর্ডের ফ্রী প্রাইমারী পাঠশালার পণ্ডিতের পদটি। বেশ ছিল সে। শান্ত-শিষ্ট বিনুর মত স্ত্রী, পুতুলের মত খোকামণি, মাসিক বারো টাকা বেতন, তাহার উপর চাষবাসের আয়। মরাইয়ে ধান, ভাঁড়ারে মাটির জালায় কলাই, গম, তিল, সরিষা, মসুরে; গোয়ালে গাই, পুকুরে মাছ, দুই চারিটা আম-কাঁঠালের গাছ, রাজার চেয়েও সুখ ছিল তাহার। অকস্মাৎ তাহার দুর্মতি জাগিল। দুর্মতিটা অবশ্য সে কঙ্কণার স্কুল হইতেই আয়ত্ত করিয়াছিল। পৃথিবীতে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার দুর্মতি স্কুল হইতে তাহাকে নেশার মত পাইয়া বসিয়াছিল। সেই নেশায়—সেটল্‌মেন্টের কানুনগোর অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে গিয়া—কানুনগোর চক্রান্তে জেল খাটিল।

জেল হইতে ফিরিয়া নেশাটা যেন পেশা হইয়া ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে। নেশা ছাড়িলেও ছাড়া যায়, কিন্তু পেশা ছাডাটা মানুষের সম্পূর্ণ নিজের হাতে নয়। ব্যবসা বা পেশা ছাড়িব বলিলেই ছাড়া যায় না, যাহাদের সঙ্গে দেনা-পাওনার সম্বন্ধ আছে তাহারা ছাড়ে না। চাষ যাহার পেশা; সে ছাড়িলে জমিদার বাকী-খাজনার দাবী ছাড়ে না। জমি বিক্রয় হইয়া গেলেও খাজনার দায়ে অস্থাবরে টান পড়ে। সংসারে শুধু কি পাওনাদারেই ছাড়ে না? দেনাদারেও ছাড়ে না যে! মহাজন যদি বলে—মহাজনী ব্যবসা করিব না, তবে দেনাদারেরা যে কাতর অনুরোধ জানায়—সেও তো নৈতিক দাবী, সে-দাবী আদালতের দাবী হইতে কম নয়। আজ তাহারও হইয়াছে সেই দশা। আজ সংসারে তাহার নিজের প্রয়োজন কতটুক? কিন্তু পাঁচখানা গ্রামের প্রয়োজন তাহার ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে।

ছাড়িয়া দিব বলিলে একদিকে লোক ছাড়ে না, অন্যদিকে পাওনাদার ছাড়ে না। তাহার পাওনাদার ভগবান। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গল্প মনে পড়িল;—মেছুনীর ডালা হইতে শালগ্রামশিলা আনিয়াছিলেন এক ব্রাহ্মণ। সেই শিলারূপী ভগবানের পূজার ফলে ব্রাহ্মণ সংসারে নিঃস্ব হইয়াও শিলাটিকে পরিত্যাগ করেন নাই। ন্যায়রত্ন বলিয়াছেন, এই দুর্গত মানুষের মধ্যে যে ভগবান, তিনি এই মেছুনীর ডালার শিলা।...তাহার বিনু গিয়াছে, খোকন গিয়াছে, এখন তাহাকে লইয়া তাহার অন্তর-দেবতা কি খেলা খেলিবেন তিনিই জানেন।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দেবু মনে মনেই বলিল—তাই হোক ঠাকুর, দেখি তোমার দৌড়টা কতদূর! স্ত্রী-পুত্র নিয়েছ, এখন পাঁচখানা গ্রামের লোকের দায়ের বোঝা হয়ে তুমি আমার মাথায় চেপে বসেছ! বস, তাই বস।...

বাহিরে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। বর্ষার জলভরা মেঘের গুরুগম্ভীর ডাক। গাঢ় ঘন অন্ধকারের মধ্যে অবিরাম ঝিমিঝিমি বর্ষণ চলিয়াছে। বড় বড় ব্যাঙগুলা পরমানন্দে ডাক তুলিয়াছে। ঝিঁঝিঁর ডাক আজ শোনা যায় না। এতক্ষণ দেবুর এ সম্পর্কে সচেতনতা ছিল না। সে চিন্তার মধ্যে ডুবিয়াছিল। সে জানলার বাহিরের দিকে তাকাইল। বাহিরে ঘন অন্ধকার। কিছুক্ষণ পর সেই অন্ধকারের মধ্যে আলো ভাসিয়া আসিল। রাস্তায় কেহ আলো লইয়া চলিয়াছে। এত রাত্রে এই বর্ষণের মধ্যে কে চলিয়াছে? চলায় অবশ্য এমন আশ্চর্যের কিছু নাই। তবু সে ডাকিল—কে? কে যাচ্ছ আলো নিয়ে?

উত্তর আসিল—আজ্ঞে পণ্ডিত মশাই, আমরাই গো; আমি সতীশ।

—সতীশ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মাঠে একটা কাটি বাঁধতে হবে। ভেবেছিলাম কাল বাঁধব। তা যে রকম দেবতা নেমেছে, রাতে রেতেই না বাঁধলে—মাটি-কাটি সব খুলে চেঁচে নিয়ে যাবে।

সতীশরা চলিয়া গেল, দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, নিতান্তই অকারণেই ফেলিল। সংসারে সবচেয়ে দুঃখী ইহারাই। চাষী গৃহস্থ তো ঘরে ঘুমাইতেছে, এই গরীব কৃষাণেরা ভাগীদারেরা গভীর রাত্রে চলিয়াছে ভাঙন হইতে তাহাদের জমি রক্ষা করিতে। অথচ ইহাদিগকে খাদ্য হিসাবে ধান ধার দিয়া তাহার উপর সুদ নেয় শতকরা পঞ্চাশ। প্রথাটির নাম 'দেড়ী'।

অন্ধকারের দিকে চাহিয়া দেবু এই কথাই ভাবিতেছিল। আজ এই ঘটনাটি এই মুহূর্তে তাহার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। অথচ চাষীর গ্রামে এ অতি সাধারণ ঘটনা।

কিছুক্ষণ পর জানলার নিচে দাঁড়াইয়া ভয়ার্ত মৃদুস্বরে চুপি চুপি কে ডাকিল—পণ্ডিত মশাই!

কণ্ঠস্বরে ভয়ার্ততার স্পর্শে দেবু চমকিয়া উঠিয়া বলিল—কে ?

—আমি সতীশ।

—সতীশ ? কি সতীশ ?

—আজ্ঞে, মৌলকিনীর বটতলায় মনে হচ্ছে 'জমাট-বস্তী' হয়েছে।

—'জমাট-বস্তী' ? সে কি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। গাঁ থেকে বেরিয়েই দেখি মাঠের মধ্যে আলো, আজ্ঞে এই জলের মধ্যেও বেশ জোর আলো। লাল বরণ আলো দপ দপ করে জ্বলছে। ঠাওর করে দেখলাম, মৌলকিনীর পাড়ে বটতলায় মশালের আলো জ্বলছে।

'জমাট-বস্তী'—অর্থাৎ রাত্রে আলো জ্বালাইয়া ডাকাতের দলের সমাবেশ। দেবু দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল, বলিল—তুমি ভূপাল চৌকিদারকে তাড়াতাড়ি ডাক দেখি!

—আপনি ঘরের ভেতরে যান পণ্ডিত মশায়। আমি এখুনি ডেকে আনছি।

দেবু অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বলিল—আচ্ছা, তুমি যাও, শীগগির যাবে। আমি ঘরেই দাঁড়িয়ে আছি।

সতীশ চলিয়া গেল, দেবু অন্ধকারের মধ্যেই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। 'জমাট-বস্তী'! বিশ্বাস নাই। বর্ষার সময় এখন গরীবদের ঘরে ঘরে অভাব-অনটন ঘনাইয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর আকাশে মেঘ, বর্ষণ রাত্রিকে দুর্যোগময়ী করিয়া তুলিয়াছে। চুরি-ডাকাতি যাহারা করে, সংসারের অভাব-অনটনে তাহাদের সুপ্ত আক্রোশ যখন এই হিংস্র পাপ-প্রবৃত্তিকে খোঁচা দিয়া জাগায়, তখন বহির্জগতের এই দুর্যোগের সুযোগ তাহাদের হাতছানি দিয়া ডাকে, ক্রমে তাহারা পরস্পরের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করে। তারপর একদিন তাহারা বাহির হইয়া পড়ে নিষ্ঠুর উল্লাসে। নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া একজন হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়া অদ্ভুত এক রুদ্র রব তুলিয়া ধ্বনিটাকে ছড়াইয়া দেয় স্তব্ধরাত্রে দিগ্‌দিগন্তরে। সেই সঙ্কেতে সকলে আসিয়া সমবেত হয় ঠিক স্থানটিতে, তারপর তাহারা অভিযানে বাহির হইয়া পড়ে। সে সময় তাহাদের মায়া নাই, দয়া নাই, চোখে জ্বলিয়া উঠে এক পরুষ কঠিন বিস্মৃতিময় দৃষ্টি—তখন আপন সন্তানকেও তাহারা চিনিতে পারে না, দেহে

মনে জাগিয়া উঠে এক ধ্বংসশক্তির দুর্বার চাঞ্চল্য। তখন যে বাধা দেয়, তাহার মাথাটা ছিঁড়িয়া লইয়া তাহারা গেণ্ডুয়ার মত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয় অথবা নিজেরাই মরে। নিজেদের কেহ মরিলে তাহারা মৃতের মাথাটা কাটিয়া লইয়া চলিয়া যায়।

কথাগুলো ভাবিতে ভাবিতে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া দেবু শিহরিয়া উঠিল। এখনি কোথায় কোন পল্লীতে হা-হা শব্দে একটা ভয়ানক অট্টশব্দ তুলিয়া উহারা ঝাঁপাইয়া পড়িবে। ভূপাল এখনও আসিতেছে না কেন? ভূপালের আসিবার পথের দিকে সে স্থির ব্যগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বর্ষণ-মুখর রাত্রি, একটানা ব্যাঙের ডাক, কোথায় জলে ভিজিয়া পেঁচা ডাকিতেছে। দুর্যোগময়ী রজনী যেন ওই নিশাচরদের মতই উন্মাদময়ী হইয়া উঠিয়াছে। পা হইতে মাথা পর্যন্ত তাহার শরীরে একটা উত্তেজনার প্রবাহ ক্রমশ তেজোময় হইয়া উঠিতেছে।...কিন্তু ভগবান, তোমার পৃথিবীতে এত পাপ কেন? কেন মানুষের এই নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর প্রবৃত্তি? কেন তুমি মানুষকে পেট পুরিয়া খাইতে দাও না? তুমিই তো নিত্যনিয়মিত প্রতিটি জনের জন্য আহারের ব্যবস্থা কর! মহামারীতে, ভূমিকম্পে, জলোচ্ছ্বাসে, অগ্নিদাহে, ঝড়ে তুমি নিষ্ঠুর খেলা খেল, তুমি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠ,—বুঝিতে পারি; তখন তোমাকে হাতজোড় করিয়া ডাকি—হে প্রভু, তোমার এ রুদ্র রূপ সংবরণ কর। সে ডাক তুমি না শুনিলেও সে বিরাট মহিমময় রুদ্র রূপের সম্মুখে নিতান্ত অসহায় কীটের মত মরিয়া যাই, তাহাতে আক্ষেপ করিবার মত শক্তিও থাকে না। কিন্তু মানুষের এ ভয়ঙ্কর প্রকাশকে তো তোমার সে রুদ্র রূপ বলিয়া মানিতে পারি না। এ যে পাপ! এ পাপ কেন? কোথা হইতে এ পাপ মানুষের মধ্যে আসিল?

কিছুক্ষণ পর

ভূপাল ডাকিল—পণ্ডিত মশাই!

—হ্যাঁ চল।—দেবু লাফ দিয়ে পথে নামিল।

—হাঁক্ দোব পণ্ডিত?

—না, আগে চল, গ্রামের ধারে দাঁড়িয়ে দেখি, ব্যাপার কি!

—দাঁড়ান গো।—পিছন হইতে সতীশ বাউরী ডাকিল। সে তাহার পাড়ার আরও কয়েকজনকে জাগাইয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে।

ছয়

দুর্যোগময়ী রাত্রির গাঢ় অন্ধকার আবরণে ঢাকা পৃথিবী, আকাশে জ্যোতির্লোক বিলুপ্ত, গাছপালা দেখা যায় না, গ্রামকে চেনা যায় না, একটা প্রগাঢ় পুঞ্জীভূত অন্ধকারে সব কিছুর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। উৎকণ্ঠিত মানুষ কয়টি আপনাদের ঘন-সান্নিধ্য হেতু স্পর্শবোধ এবং মৃদু কথাবার্তার শব্দবোধের মধ্যেই পরস্পরের কাছে বাঁচিয়া আছে। এই অখণ্ড অন্ধকারকে কোন একস্থানে খণ্ডিত করিয়া জ্বলিতেছে একটা নর্তনশীল অগ্নিশিখা; উৎকণ্ঠিত মানুষগুলির চোখে শঙ্কিত দৃষ্টি। দেবু ঠিক সম্মুখেই দাঁড়াইয়া ছিল, এই সব বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া অন্ধকারের মধ্যে সে স্থানটা নির্ণয় করিতেছিল। এই গ্রাম, এই মাঠ, এখানকার দিগ্‌দিগন্তের সঙ্গে তাহার নিবিড় পরিচয়! সে যদি আজ অন্ধ হইয়া যায়, তবুও সে স্পর্শে, গন্ধে, মনের পরিমাপের হিসাবে সমস্ত চিনিতে পারিবে চক্ষুষ্মানের মত। তাহার উপর বর্তমানে এই অঞ্চলের মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছে অহরহ কর্মস্পন্দনে মুখরিত এক নূতন পুরী, এই দুর্যোগ-ভরা অন্ধকারের মধ্যেও সে সমানে সাড়া দিতেছে। ময়ূরাক্ষীর ওপারে জংশন স্টেশন; স্টেশনের চারিপাশে কলকারখানা, সেখানে মাল-গাড়ী-শান্টিংয়ের শব্দ—মিল এঞ্জিনের শব্দ উঠিতেছে, মধ্যে মধ্যে বাজিয়া উঠিতেছে রেল-এঞ্জিনের বাঁশী।

দেবুর সম্মুখের দিকেই এই বাম কোণে পশ্চিম-দক্ষিণে জংশনের সাড়া উঠিতেছে। জংশনের উত্তর প্রান্তে ময়ূরাক্ষী নদী। জংশন সৃষ্টির আগে এমন অন্ধকার রাত্রে এই পল্লীর মানুষকে ময়ূরাক্ষীই দিত দিক-নির্ণয়ের সাড়া। দেবুদের বামপাশে দক্ষিণ দিকে পূর্ব-পশ্চিমে বহমানা ময়ূরাক্ষী।

এই ময়ূরাক্ষীকে ধনুকের জ্যার মত রাখিয়া অর্ধ-চন্দ্রাকারে এই কঙ্কনা। পাশে কঙ্কনার উত্তর-পূর্বে কুসুমপুর, তাহার পাশে মহগ্রাম, মহগ্রামের পাশে শিবকালী-

পুর, শিবকালীপুরের পূর্ব-দক্ষিণে ময়ূরাক্ষীর কোল ঘেঁষিয়া বালিয়াড়া-দেখুড়িয়া। অর্ধ-চন্দ্রাকার বেষ্টনীটার মধ্যে প্রকাণ্ড এই মাঠখানা দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয় মাইল, প্রস্থে চার মাইলের অল্প কিছু কম। মাঠখানার নামই পঞ্চগ্রামের মাঠ। পাঁচখানার মৌজার সীমানারই জমি আছে এই মাঠে। এই বিস্তীর্ণ মাঠখানার বুকের মধ্যে এক জায়গায় এই ঝিমি-ঝিমি বর্ষণের মধ্যেও আগুনের রক্তাভ শিখা যেন নাচিতেছে, বোধ হয় বাতাসে কাঁপিতেছে। অন্ধকারের মধ্যে দেবু হিসাব করিয়া বুঝিল, সতীশ ঠিক অনুমান করিয়াছে, জায়গাটা মৌলকিনীর বটতলাই বটে।

কোন্ বিস্মৃত অতীতকালে কেহ মৌলকিনী নামে এই দীঘিটা কাটাইয়াছিল। দীঘিটা প্রকাণ্ড। দীঘিটা এককালে এই পঞ্চগ্রামের মাঠের একটা বৃহৎ অংশে সেচনের জল যোগাইয়াছে, এই দীঘিটার পাড়ের উপর প্রকাণ্ড বটগাছটাও বোধ হয় দীঘি কাটাইবার সময়ই লাগানো হইয়াছিল। আজও রৌদ্রতপ্ত তৃষ্ণার্ত পথিক ও কৃষাণ, গরু-বাছুর, কাকপক্ষী দীঘিটার জল খায়, এই গাছের ছায়ায় দেহ জুড়াইয়া নেয়, কিন্তু রাত্রে সন্ধ্যা হইতেই এই বটতলাতে মধ্যে মধ্যে জমাট-বস্তীর আলো জ্বলিয়া উঠে। জমাট-বস্তীর আরও কয়েকটা স্থান আছে—ময়ূরাক্ষীর বাঁধের উপর অর্জুনতলায়, কুসুমপুরের মিত্রদের আম-বাগানের অন্ধকারে রাত্রে এমনই ভাবে আলো জ্বলে। অধিকাংশ আলো কিন্তু মৌলকিনীর বটগাছতলাতেই জ্বলিতেছে।

দেবু বলিল—মৌলকিনীর বটতলাই বটে, ভূপাল। মশালের আলোও বটে

ভূপাল বলিল—আজ্ঞে হাঁ। ভল্লার দল

—ভল্লার দল?

—হঁ। একেবারে নিয্যস। মশাল জ্বেলে ভল্লারা ছাড়া অন্য দল তো আগে-ভাগে মশাল জ্বেলে জমায়েত হয় না।

ভল্লা—অর্থাৎ বাগ্দীর দল। বাংলাদেশে ভল্লা বাগ্দীরা বহু বিখ্যাত শক্তিমান সম্প্রদায়। দৈহিক শক্তিকে, লাঠিয়ালির সুনিপুণ কৌশলে, বিশেষ করিয়া সড়্কি চালনার নিপুণতায় ইহারা এককালে ভয়ঙ্কর দুর্ধর্ষ ছিল। এখনও দৈহিক শক্তি ও লাঠিয়ালির কৌশলটা পুরুষপরম্পরায় ইহাদের বজায় আছে। ডাকাতিটা এক-কালে ইহাদের গৌরবের পেশা ছিল। ইংরেজ আমলে—বাংলাদেশের অভিজাত

সম্প্রদায়ের নব-জাগরণের সময় নব্য আদর্শে অনুপ্রাণিত সমাজ নেতাদের সহযোগিতায় শাসক সম্প্রদায় বাংলার নিম্নজাতির দুর্ধর্ষ সম্প্রদায়ের সঙ্গে এই ভল্লাদের বহুল পরিমাণে দমন করিয়াছেন। তবুও তাহারা একেবারে মরে নাই। আজ অবশ্য তাহাদের শক্তির ঐতিহ্য তাহারা অত্যন্ত গোপনে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। মেয়েদের মত ঘাঘরা-কাঁচুলী পরিয়া রায়বেঁশের দল গড়িয়া নাচিয়া বেড়ায়। ক্ষেত্র-বিশেষে একটু বেশী পুরস্কার পাইলে—দৈহিক শক্তি ও লাঠিখেলায় নিপুণতার কসরৎ দেখায়। সাধারণত এখনও ইহারা চাষী, বাহ্যত অত্যন্ত শান্তশিষ্ট, কিন্তু মধ্যে মধ্যে—বিশেষ করিয়া এই বর্ষাকালে কঠিন অভাবের সময় তাহাদের সুপ্ত দুষ্প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। তখন তাহারা পরস্পরের সঙ্গে কয়েকদিন অভাব-অভিযোগের দুঃখ-ব্যথার কথা বলিতে বলিতে কখন যে ডাকাতির পরামর্শ আঁটিয়া বসে, সে কথা নিজেরাও বুঝিতে পারে না। পরামর্শ পাকিয়া উঠিলে তাহারা একদা বাহির হইয়া পড়ে। ভল্লা বাগ্দী ছাড়াও অবশ্য এই ধারার সম্প্রদায় আছে, ডোম আছে, হাড়ি আছে। মুসলমানসম্প্রদায়ের মধ্যেও এই শ্রেণীর দল আছে. আবার সকল সম্প্রদায়ের লোক লইয়া মিশ্রিত দলও আছে।

ভূপাল বলিল—এ ভল্লা বাগ্দীর দল। দেখুড়িয়া গ্রামখানা ভল্লা বাগ্দীর গ্রাম। গ্রামে অন্য বর্ণের বাসিন্দারাও কিছু কিছু আছে, কিন্তু ভল্লারাই সংখ্যায় প্রধান। পূর্বকালে দেখুড়িয়ার ভল্লারাই ছিল পঞ্চগ্রামের বাহুবল আজ দুইশত বৎসরের অধিককাল তাহারা লুঠেরা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মানুষ কয়টি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মধ্যে মধ্যে মৃদুস্বরে কয়েকটি কথা হইতেছে, আবার চুপ হইয়া যাইতেছে। ওদিকে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে সেই দূরে একই স্থানে জ্বলিতেছে মশালের আলোটা। দেবু না থাকিলে ইহারা অবশ্য আপন বুদ্ধিমত যাহা হয় করিত। দেবুর প্রতীক্ষাতেই সকলে চুপ করিয়া আছে

সতীশ বাউড়ী বলিল—পণ্ডিত মশায় ?

—হুঁ।

—হাঁক মারি ?

হাঁক মারিলে জাগ্রত মানুষের সাড়া পাইয়া নিশাচরের দল চলিয়া যাইতে

পারে। অন্ততঃ এ গ্রামের দিকে আসিবে না বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু উহারা যদি মাতিয়া উঠিয়া থাকে, তবে আর মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া এ গ্রাম বাদ দিয়া অপর কোন প্রসুপ্ত পল্লীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

ভূপাল বলিল—ঘোষ মশায়কে একটা খবর দি পণ্ডিত মশায়, কি বলেন?

—শ্রীহরিকে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বন্দুক নিয়েছেন, বন্দুক আছে। কালু শেখ আছে ঘোষ মশায়ের বাড়ীতে। তা ছাড়া—ঘোষ মশায় ঠিক বুঝতে পারবেন—এ কীর্তি কার। —বলিয়া ভূপাল একটু হাসিল।

শ্রীহরি ঘোষ এখন গ্রামের পত্তনীদার, সে এখন গণ্যমান্য ব্যক্তি। কিন্তু এক-কালে সে যখন ছিরু পাল বলিয়া খ্যাত ছিল, তখন দুর্ধর্ষতায় সে এই নিশাচরদেরই সমকক্ষ ছিল। অনেকে বলে—চাষ এবং ধান দাদন করিয়া জমিদার হওয়ার অসম্ভব কাহিনীর অন্তরালে এই সব নিশাচর সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কাহিনী লুক্কায়িত আছে। সে আমলে ছিরু নাকি ডাকাতির বামালও সামাল দিত। অনিরুদ্ধ কর্মকারের ধান কাটিয়া লওয়ার জন্য একবার মাত্রই তাহার ঘর খানা-তল্লাশ হয় নাই, তাহারও পূর্বে আরও কয়েকবার এই সন্দেহে তাহার ঘর-সন্ধান হইয়াছিল। এখন অবশ্য সে জমিদার—প্রভাবশালী ব্যক্তি, এখন শ্রীহরি আর এই সব সংস্রবে থাকে না। কিন্তু সে ঠিক চিনিতে পারিবে—এ কাহার দল। হয়তো দুর্দান্ত কালু শেখকে সঙ্গে লইয়া বন্দুকহাতে নিঃশব্দে আলো লক্ষ্য করিয়া অন্ধকারের মধ্যে অগ্রসর হইয়া, এক সময় হঠাৎ বন্দুকটা দাগিয়া দিবে।

দেবু বলিল—এ রাতে দুর্যোগে তাঁকে আবার কষ্ট দিয়ে কাজ নাই ভূপাল। তার চেয়ে এক কর। সতীশ, তুমি তোমাদের পাড়ার নাগরা নিয়ে, নাগরা পিটিয়ে দাও। কটা নাগরা আছে তোমাদের?

—আজ্ঞে, দুটো।

—বেশ। তবে দুজনে দুটো নাগরা নিয়ে—গাঁয়ের এ-মাথায় আর ও-মাথায় দাঁড়িয়ে পিটিয়ে দাও।

নাগরার শব্দ—বিশেষ করিয়া বর্ষার রাত্রে নাগরার শব্দ এ অঞ্চলে আসন্ন বন্যার

বিপদ-জ্ঞাপন সংকেত-ধ্বনি। ময়ূরাক্ষীর বন্যায় বাঁধ ভাঙিলে এই নাগরার ধ্বনি উঠে; পরবর্তী গ্রাম জাগিয়া উঠে, সাবধান হয়, তাহারাও নাগরা বাজায়—সে ধ্বনিতে সতর্ক হয় তাহার পরবর্তী গ্রাম।

ডাকাতি হইলেও এই নাগরাধ্বনির নিয়ম ছিল এবং আছেও। কিন্তু সব সময়ে এ নিয়ম প্রতিপালিত হয় না। গ্রামে ডাকাত পড়িয়া গেলে তখন সব ভুল হইয়া যায়। তা ছাড়া নাগরা দিলেও ভিন্ন গ্রামে লোক জাগে বটে, কিন্তু সাহায্য করিতে আসে না। কারণ পুলিস-হাঙ্গামায় পড়িতে হয়, পুলিসের কাছে প্রমাণ দিতে হয় যে সে ডাকাতি করিতে আসে নাই, ডাকাত ধরিতে আসিয়াছিল।

নাগরার কথাটা সতীশদের ভালই লাগিল। সতীশ সঙ্গে সঙ্গে দলের দুজনকে পাঠাইয়া দিল। কিন্তু ভূপাল ক্ষুন্ন হইয়া বলিল—ঘোষ মশায় বোর্ডের মেম্বর লোক। খবরটা ওঁকে না দিলে ফৈজতে পড়তে হবে আমাকে।

শ্রীহরিকে সংবাদ দিতে দেবুর মন কিছুতেই সায় দিল না। একটুখানি নীরব থাকিয়া বলিল—চল, আমরাই আর একটু এগিয়ে দেখি।

—না, আর এগিয়ে যেও না।

স্ত্রীলোকের দৃঢ়তাব্যঞ্জক চাপা কণ্ঠস্বরে সকলে চমকিয়া উঠিল। দেবুও চমকিয়া উঠিল,—গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে নারীকণ্ঠে কে কথা বলিল? বিলু! বিলু' অশরীরী আত্মা!

আবার নারীকণ্ঠ বলিয়া উঠিল—বিপদ হতে বেশিক্ষণ লাগে না জামাই।

দেবু এবার সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—কে? দুর্গা?

—হ্যাঁ।

সমস্বরেই প্রায় সকলে প্রশ্ন করিয়া উঠিল—দুগ্‌গা?

—হ্যাঁ।—বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই সে রসিকতা করিয়া বলিল—ভয় নাই, পেত্নী নই, মানুষ, আমি দুগ্‌গা।

—তুই কখন্ এলি?

দুর্গা বলিল—সতীশদাদা থানাদারকে ডাকলে, পাড়ায় ডাকলে, আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে থাকতে নারলাম, ওই সতীশদাদাদের পিছু পিছু উঠে এলাম।

—বলিহারি বুকের পাটা তোমার দুগ্‌গা !—ভূপাল ঈষৎ স্নেহভরেই বলিল।

—বুকের পাটা না থাকলে, থানাদার, রাত-বিরেতে পেসিডেনবাবুর বাংলাতে নিয়ে যাবার জন্য কাকে পেতে বল দেখি ? বকশিশটি তোমার মিলত কি করে ? আর চাকরির 'কৈফৎ'ই বা কাটাতে কি করে ?

কথাটার মধ্যে অনেক ইতিহাসের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট, ভূপাল লজ্জিত হইয়া স্তব্ধ হইয়া গেল !

ঠিক এই মুহূর্তেই গ্রামের দুই প্রান্তে নাগরা বাজিয়া উঠিল। দুর্যোগময়ী স্তব্ধ রাত্রির মধ্যে ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্ ধ্বনি দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িল। দেবু হাঁক দিয়া উঠিল—আ—আ-হৈ ! সঙ্গে সঙ্গে সকলেই হাঁক দিয়া উঠিল সমস্বরে—আ—আ—আ—হৈ ! আ—হৈ ! দূরে অন্ধকারের মধ্যে যে আলোটা বাতাসে কাঁপিয়া যেন নাচিতেছিল সে আলোটা অস্বাভাবিক দ্রুততায় কাঁপিয়া উঠিল। আবার দেবু এবং সমবেত সকলে হাঁক দিয়া উঠিল—আ—হৈ, আ—হৈ ! ওদিকে গ্রামের ভিতরে ইহারই মধ্যে সাড়া জাগিয়া উঠিল। স্পষ্ট শোনা যাইতেছে স্তব্ধ রাত্রে পরস্পর পরস্পরকে ডাকিতেছে। একটা উচ্চ কণ্ঠের প্রহরা-ঘোষণার শব্দ উঠিল। এ শব্দটা শ্রীহরির লাঠিয়াল কালু শেখের হাঁক। ওদিকে নাগরা দুইটা ডুগ্-ডুগ্ শব্দে বাজিয়াই চলিয়াছে।

এবার দূরে মাঠের বুকে অন্ধকারের মধ্যে জলন্ত আলোটা হঠাৎ নিম্নমুখী হইয়া অকস্মাৎ যেন মাটির বুকের ভিতর লুকাইয়া গেল। স্পষ্ট বুঝা গেল মশালের আলোটা কেহ জলসিক্ত নরম মাটির মধ্যে গুঁজিয়া নিভাইয়া দিল। ওদিকে আরও দূরে আরও একটা নাগরা অন্য কোথাও, সম্ভবতঃ বালিয়াড়া-দেখুড়িয়ায় বাজিয়া উঠিল।

এতক্ষণে দেবু বলিল—এবার তুমি ঘোষ মশায়কে খবর দিয়ে এস ভূপাল। কাজ কি কৈফিয়তের মধ্যে গিয়ে।

পিছন হইতে কাহার গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল—ভূপাল !

হ্যারিকেনের আলো একটা আসিতেছে। ভূপাল চমকিয়া উঠিল—এ যে স্বয়ং ঘোষ মশায় !...তাঁহার নিকটে আসিতেই হাতজোড় করিয়া সসম্ভ্রমে বলিল—হুজুর।

—কি ব্যাপার ?

—আজ্ঞে, মাঠের মধ্যে জমাট-বণ্ডী।

—কোথায় ?

—মৌলকিনীর পাড়ে মনে হল। আলো জলছিল এতক্ষণ, আমাদের নাগরার শব্দ আর হাঁক শুনে আলো নিভিয়ে দিয়েছে।

—আমাকে খবর দিস নাই কেন ?

দেবু বলিল—দেবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। তুমি নিজে এসে পড়লে।

—কে ? দেবু খুড়ো ?

—হ্যাঁ।

—হুঁ। কারা, কিছু বুঝতে পারলে ?

—কি করে বুঝব ? তবে মশালের আলো দেখে ভূপাল বলছিল ভল্লার দল। হঠাৎ বন্দুকের শব্দে সকলে চমকিয়া উঠিল। বন্দুকের মধ্যে কার্টিজ পুরিয়া আকাশ-মুখে পর পর দুইটা ফাঁকা আওয়াজ করিয়া দিল শ্রীহরি। তীক্ষ্ণ উচ্চ শব্দ দুইটা রাত্রির অন্ধকারকে যেন চিরিয়া ফাড়িয়া দিল। চেম্বার খুলিয়া ফায়ার-করা কার্টিজ দুইটা বাহির করিয়া, শ্রীহরি বলিল—দেবু খুড়ো, এ সব হল গিয়ে তোমাদের ধর্ম-ঘটের ধুয়োর ফল।

দেবু স্তম্ভিত হইয়া গেল। সবিস্ময়ে সে বলিল—ধর্মঘট ধুয়োর ফল ? মানে ?

—হ্যাঁ। এ তোমার দেখুড়ের তিনকড়ি মোড়লের কাণ্ড। তিনকড়ি তোমাদের ধর্মঘটের একজন পাণ্ডা। ভল্লাদের দল অনেক দিনের ভাঙা দল। এই হুজুগে সে-ই আবার জুটিয়েছে। আমি খবরও পেয়েছি। তিনকড়ি মাঠের মধ্যে চাস করতে করতে কি বলেছে জান ? বলেছে—বুকের শখ একদিন মিটিয়ে দোব। আমার নাম করে বলেছে, তাকে দোব একদিন মুলোর মত মুচড়ে।

দেবু ধীর ভাবেই বলিল—ও সব কথার কোন দাম নাই শ্রীহরি। তুমিও তো বলেছ শুনতে পাই—যারা বেশী চালাকি করবে, তাদের তুমি গুলি চালিয়ে শেষ করে দেবে।

অকস্মাৎ পিছনের দিকে একটা চটাস্ করিয়া শব্দ উঠিল—কে যেন কাহাকে

প্রচণ্ড জোরে চড় মারিয়াছে ; সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণকণ্ঠে দুর্গা বলিয়া উঠিল—আমার হাত ধরে টানিস, বদমাস—পাজী !

শ্রীহরি হারিকেনটা তুলিয়া ধরিল। দুর্গার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া আছে শ্রীহরির পাঠিয়াল কালু। শ্রীহরি ঈষৎ হাসিয়া বলিল—কে দুর্গা ?

দুর্গা সাপিনীর মত ফোঁস্ করিয়া উঠিল—তোমার লোক আমার হাত ধরে টানে ?

শ্রীহরি কালুকে ধমক দিল—কালু, সরে আয় ওখান থেকে। তারপর আবার ঈষৎ হাসিয়া বলিল—এই এখানে কোথায় এত রাতে ?...পরমুহূর্তেই নিজের উত্তরটা আবিষ্কার করিয়া বলিল—অ ! দেবু খুড়োর সঙ্গে এসেছিল্ বুঝি !

দেবু কয়েক মুহূর্ত শ্রীহরির মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া দুর্গাকে বলিল—আয় দুর্গা, বাড়ী আয়। এত রাত্রে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করে না। সতীশ, এস, তোমরাও এস।

তাহারা সকলেই চলিয়া গেল, কেবল ভূপাল শ্রীহরি ঘোষকে ফেলিয়া যাইতে পারিল না। শ্রীহরি বলিল—কালই থানায় ডায়রি করবি। বুঝলি ?

—যে আজ্ঞে।

—দেখুড়ের তিনকড়ির নামে আমার ডায়রি করা আছে। দারোগাবাবুকে মনে করিয়ে দিবি কথাটা। বলিস কাল সন্ধ্যের দিকে আমি থানায় যাব।

ভূপালও জাতিতে বাগ্দী, পুলিসের চাকরি তাহার অনেক দিনের হইয়া গেল ; তাহার অনুমান সত্য—স্থানটাও মৌলিকিনী দীঘির পাড়ের বটতলায়ই বটে এবং জমায়েত যাহারা হইয়াছিল তাহারাও ডল্লা বাগ্দী ছাড়া আর কেহ নয় কিন্তু নেতৃত্ব তিনকড়ির নয়, শ্রীহরির অনুমান ভ্রান্তও বটে, আক্রোশ-প্রসূতও বটে। তিনকড়ি জাতিতে সদ্গোপ, শ্রীহরির সঙ্গে দূর সম্পর্কের আত্মীয়তাও আছে ; কিন্তু শ্রীহরির সঙ্গে বিবাদ তাহার অনেকদিনের। তিনকড়ি দুর্ধর্ষ গোঁয়ার। পৃথিবীতে কাহারও কাছে বাধা-বাধকতার খাতিরে মাথা নিচু করে না। কঙ্কণার লক্ষপতি বাবু হইতে শ্রীহরি পর্যন্ত—ওদিকে সাহেব সুবো হইতে দারোগা পর্যন্ত

কাহাকেও সে হেঁট-মুণ্ডে জোড়হস্তে প্রণাম জানায় না। এজন্য বহু দুঃখ-কষ্টই সে ভোগ করিয়াছে।

দেখুড়িয়ার ডল্লা বাগ্দীদের নেতা সে বটে ; কিন্তু তাহাদের ডাকাতি কি চুরির সহিত তাহার কোনও সংস্রব নাই। ডাকাতি করার জন্য সে ডল্লাদের তিরস্কার করে, অনেক সময় রাগের মাথায় মারিয়াও বসে। সে তিরস্কার, সে প্রহার ডল্লারা সহ্য করে, কারণ তাহাদের পাপের ধনের সহিত সংস্রব না রাখিলেও মানুষগুলির সঙ্গে তিনকড়ির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য, বিপদের সময় সে কখনও তাহাদের পরিত্যাগ করে না। ডাকাতি কেসে, বি-এল কেসে তিনকড়িই তাহাদের প্রধান সহায়, সে-ই তাহাদের মামলা মকদ্দমার তদ্বির তদারক করিয়া দেয়, তাহাদের পাপার্জিত ধন দিয়াই করে, কিন্তু একটি পয়সার তঞ্চকতা কখনও করে না। অবশ্য তদ্বির করিতে গিয়া ঐ পয়সা হইতেই সে অল্পস্বল্প ভালমন্দ খায়—বিড়ির বদলে সিগারেটও কেনে, মামলা জিতিলে মদও খায়, কিন্তু তাহার অতিরিক্ত কিছু নয়। যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার পাই-পয়সাটি সে ডল্লাদের ফিরাইয়া দেয়। লোকে এই কারণেই সন্দেহ করে—ডল্লাদের গোপন পাপ-জীবনযাত্রারও নেতা ওই তিনকড়ি। পুলিসের খাতায় বহুস্থানে তাহার উল্লেখ আছে। ডল্লাদের প্রায় প্রতিটি কেসেই পুলিস তিনকড়িকে জড়াইতে চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারে নাই। ডল্লাদের মধ্যে কবুল-খাওয়া লোকের সংখ্যা অতি অল্প। কালেভদ্রে নিতান্ত অল্পবয়সী নতুন কেহ হয়তো পুলিসের ভীতিপ্রলোভনময় কসরতে কাবু হইয়া কবুল করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের মুখ হইতেও কখনও তিনকড়ির নাম বাহির হয় নাই।

বি-এল কেস—এসব ক্ষেত্রে পুলিসের মোক্ষম অস্ত্র। কিন্তু বি-এল কেসে অর্থাৎ 'ব্যাড লাইভ্লিহুড্' বা অসদুপায়ে জীবিক-উপার্জনের অভিযোগের পথে প্রথম ও প্রধান অন্তরায় তিনকড়ির পৈতৃক জোত জমা। জোত-জমা তাহার বেশ ভালই ছিল। এবং গোঁয়ার হইলেও তিনকড়ি নিজে খুব ভাল চাষী, এ অঞ্চলের কোন সাক্ষীই একথা অস্বীকার করিতে পারে নাই। এ বিষয়ে তাহার কয়েকটা ব্রহ্মাস্ত্রের মত প্রমাণ আছে। জেলার সদর শহরে অনুষ্ঠিত সরকারী কৃষি-শিল্প ও গবাদি-পশু প্রদর্শনীতে চাষে উৎপন্ন কপি, মূলা, কুমড়া প্রভৃতির জন্য সে বহু পুরস্কার

পাইয়াছে, সার্টিফিকেট পাইয়াছে। বার দুয়েক মেডেলও পাইয়াছে,—ভাল বলদ, দুধালো গাইয়ের জন্যও তাহার প্রশংসাপত্র আছে। সেইগুলি সে দাখিল করে।

এতদিনে অবশ্য পুলিসের চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। চাষে এমন উৎপাদন সত্ত্বেও তিনকড়ির জোত-জমার অধিকাংশ জমিই নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। পঁচিশ বিঘার মধ্যে মাত্র পাঁচ বিঘা তাহার অবশিষ্ট আছে।

তিনকড়ির একসময় প্রেরণা জাগিয়াছিল—সে তাহাদের গ্রামের অধীশ্বর বৃক্ষতল-অধিবাসী বাবা মহাদেবের একটা দেউল তৈয়ারী করাইয়া দিবে। সেই সময় তাহার হাতে কতকগুলা নগদ টাকাও আসিয়াছিল। তাহাদের গ্রামের খানিকটা সীমানা ময়ূরাক্ষীর ওপার পর্যন্ত বিস্তৃত—ওপারের জংশন স্টেশনে নতুন একটা ইয়ার্ড তৈয়ারী করিবার প্রয়োজনে সেই সীমানার অধিকাংশটাই রেল-কোম্পানী গভর্নমেণ্টের ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশন আইন অনুসারে কিনিয়া লয়। ওই সীমানার মধ্যে তিনকড়িরও কিছু জমি ছিল—বাবা দেবাদিদেবেরও ছিল। বাবার জমির মূল্যটা বাবার অধীশ্বর জমিদার লইয়াছিলেন, টাকাটা খুব বেশী নয়—দুই শত টাকা। তিনকড়ি পাইয়াছিল শ'চারেক। তাহার উপর তখন তাহার ঘরে ধানও ছিল অনেকগুলি। এই মূলধনে তিনকড়ি উৎসাহিত হইয়া গাছতলাবাসী দেবাদিদেবকে গৃহবাসী করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল! জমিদারের কাছে গিয়া প্রস্তাব করিল, দেবাদিদেবের জমির টাকাটা হইতে বাবার মাথার উপর একটা আচ্ছাদন তুলিয়া দেওয়া হউক! জমিদার বলিলেন—দুশো টাকায় দেউল হয় না।

তিনকড়ির অদম্য উৎসাহ, সে বলিল—আমরা চাঁদা তুলব, আপনি কিছু দেন, ভল্লারা গতরে খেটে দেবে—হয়ে যাবে একরকম করে। আরম্ভ করুন আপনি।

জমিদার বলিলেন—তোমরা আগে কাজ আরম্ভ কর, চাঁদা তোল—তারপর এ টাকা আমি দেব।

তিনকড়ি সে কথাই স্বীকার করিয়া লইল এবং ভল্লাদের লইয়া কাজে লাগিয়া গেল। প্রায় হাজার ত্রিশেক কাঁচা ইট তৈয়ারী করিয়া ফেলিয়া জমিদারকে গিয়া বলিল—কয়লা চাই, টাকা দেন।

জমিদার আশ্বাস দিলেন—একেবারে কয়লা-কুঠী থেকে কয়লা আনবার ব্যবস্থা করব।

কয়লা আসিবার পূর্বে বর্ষা আসিয়া পড়িল, ত্রিশ হাজার কাটা ইট গলিয়া আবার মাটির স্তূপে পরিণত হইল, বহু তালপাতা কাটিয়া ঢাকা দিয়াও তিনকড়ি তাহা রক্ষা করিতে পারিল না। রাগে ফুলিয়া উঠিয়া এবার সে জমিদারকে আসিয়া বলিল—এ ক্ষতিপূরণ আপনাকে লাগবে।

জমিদার তৎক্ষণাৎ তাহাকে খেদাইয়া দিলেন।

তিনকড়ি ক্ষিপ্ত হইয়া দেবোত্তরের অর্থ আদায়ের জন্য জমিদারের নামে নালিশ করিল। দুই শত টাকা আদায় করিতে মুন্সেফী আদালত হইতে জজ আদালত পর্যন্ত সে খরচ করিল সাড়ে তিনশত টাকা। ইহাতেই শুরু হইল তাহার জমি-বিক্রয়। টাকা আদায় হইল না, উপরন্তু জমিদার মামলা খরচ আদায় করিয়া লইলেন। লোকে তিনকড়ির দুর্বুদ্ধির অজস্র নিন্দা করিল, কিন্তু তিনকড়ির কোন-দিন আফসোস করিল না। সে যেমন ছিল তেমনি রহিল, শুধু ওই দেবাদিদেবকে প্রণাম করা ছাড়িল,—আজকাল যতবার ঐ পথে সে যায়-আসে, ততবারই বাবাকে দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া যায়।

দেবাদিদেবের উদ্ধার চেষ্টার পরও তাহার যাহা ছিল—তাহাতেও তাহার জীবন স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। কিন্তু ইহার পরই শিবু দারোগার নাকে ঘুঁষি মারার মামলায় পড়িয়া সে প্রায় তিন বিঘা জমি বেচিতে বাধ্য হইল। শিবু দারোগা আসিয়াছিল তাহার ঘর সার্চ করিতে। কোনও কিছু সন্দেহজনক না পাইয়া শিবচন্দ্রের মাথায় খুন চড়িয়া গেল, ক্ষুব্ধ আক্রোশে যথেচ্ছ হাত-পা চালাইয়া তিনকড়ির ঘরের চাল-ডাল-নুন-তেল চালিয়া মিশাইয়া সে একাকার করিয়া দিল। খানাতল্লাশিতে তিনকড়ি আপত্তি করে নাই, বরং মনে মনে সকৌতুকে হাসিতে-ছিল। এমন সময় শিবু দারোগার এই প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডব দেখিয়া সে ও ক্ষেপিয়া গেল। খাঁ করিয়া বসাইয়া দিল শিবচন্দ্রের নাকে এক ঘুঁষি। প্রচণ্ড ঘুঁষি—দারোগার নাকের চশমাটা একেবারে নাক-কাটিয়া বসিয়া গেল। দারোগার নাকে সে দাগটা আজও অক্ষয় হইয়া আছে। সেই ব্যাপার লইয়া পুলিশ তাহার নামে

মামলা করিল। সঙ্গে সঙ্গে সে-ও দারোগার নামে মামলা করিল—ওই তাণ্ডব নৃত্যের অভিযোগে। গ্রামের ভল্লারা সকলেই তিনকড়ির সাক্ষী, প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্যের কথাটা সকলেই একবাক্যে নির্ভয়ে বলিয়া গেল। পুলিশ সাহেব আপোসে মামলা মিটাইয়া লইলেন। ততদিনে কিন্তু তিনকড়ির আরও তিন বিঘা জমি চলিয়া গিয়াছে।

বর্তমানে তিনকড় ও প্রজা সর্বঘটে মাটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ভল্লা-দের লইয়া শ্রীহরির ঘরে ডাকাতি করিবার মত মনোবৃত্তি তাহার নয়। অবশ্য সে মাঠেও এ-কথাটা বলিয়াছিল—দোব ছিরেকে একদিন মুলোর মত মুচড়ে।... কথাটা নেহাতই কথার কথা। তাহার কথাই এই ধারা; তাহার স্ত্রী যদি একটু উচ্চস্বরে কথা বলে, তবে তৎক্ষণাৎ সে গর্জন করিয়া উঠে—টুঁটিতে পা দিয়ে দোব তোর 'নেতার' মেরে, দেখবি?...

সেদিন দেখুড়িয়ায় যে নাগরা বাজিল সে নাগরা তিনকড়িই বাজাইতেছিল।

এই গভীর দুর্যোগের রাত্রে নাগরার শব্দ শুনিয়া তিনকড়ির স্ত্রীর ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। তিনকড়ির ঘুম অসাধারণ ঘুম। খাইয়া-দাইয়া বিছানায় পড়িবামাত্র তাহার চোখ বন্ধ হয়, এবং মিনিট কয়েকের মধ্যেই নাক ডাকিতে শুরু করে। নাকডাকা আবার যেমন-তেমন নয়, ধ্বনি-বৈচিত্র্যে যেমন বিচিত্র, গর্জনগাম্ভীর্যে তেমনি গুরুগম্ভীর। রাত্রিতে প্রসুপ্ত পল্লীপথে তিনকড়ির বাড়ীর অন্তত আধ রশি দূর হইতে সে ধ্বনি শোনা যায়। একবার এ অঞ্চলের থানার নূতন জমাদার প্রথম দিন দেখুড়িয়ায় রোঁদে আসিয়া তিনকড়ির বাড়ীর আধ রশিটাক দূরে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া চৌকিদারটাকে বলিয়াছিল—এই! দাঁড়া!

চৌকিদারটা কিছু বুঝিতে পারে নাই, তাহার কাছে অস্বাভাবিক কিছুই ঠেকে নাই, সে একটু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিল—আজ্ঞে?

জমাদার দুই পা পিছাইয়া গিয়া চারিদিকে চাহিয়া গর্জনের স্থান নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, নাক খিঁচাইয়া বলিল—সাপ,—হারামজাদা, শুনতে পাচ্ছ না? গোঙাচ্ছে?...তারপরই বলিয়াছিল—সাপে নেউলে বোধ হয় লড়াই লেগেছে।

শুনতে পাচ্ছিস ?

এতক্ষণে চৌকিদারটা ব্যাপার বুঝিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল—আজ্ঞে না।

—না ? মারব বেটাকে এক থাপ্পড়।

—আজ্ঞে না, উ তিনকড়ি মোড়লের নাক ডাকছে।

—নাক ডাকছে ?

—আজ্ঞে হঁ্যা। তিনকড়ি মোড়লের।

জমাদার বিস্ফারিত-নেত্রে আবার একবার প্রশ্ন করিয়াছিল—নাক ডাকছে ?

এবার চৌকিদারটা আর হাসি সামলাইতে পারে নাই, খুক্ খুক্ করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল—আজ্ঞে হঁ্যা, নাক।

—কোন্ তিনকড়ি ? পুলিশ সস্পেক্ট্ যে লোকটা ?

—আজ্ঞে হঁ্যা।

—রোজ ডাকিস্ লোকটাকে ?

চৌকিদারটা চুপ করিয়াছিল, কোনদিনই ডাকে না, ওই নাকডাকার শব্দ হইতেই তিনকড়ির বাড়ীতে থাকার প্রমাণ লইয়া চলিয়া যায়।

জমাদার বলিয়াছিল—থাক্, ডাকিস্ না বেটাকে। যেদিন নাক না-ডাকবে সেইদিন খবর করিস্।—কিছুক্ষণ পর আবার বলিয়াছিল—বেটা বড় সুখে ঘুমোয় রে !

এমনি ঘুম তিনকড়ির। এ ঘুম ভাঙাইলে আর রক্ষা থাকে না। কিন্তু আজ এই নিশীথরাত্রে নাগরার শব্দ শুনিয়া তিনকড়ির স্ত্রী লক্ষ্মীমণি স্থির থাকিতে পারিল না। সে চাষীর মেয়ে, নাগরার ধ্বনির অর্থ সে জানে, তাহার মনে হইল, ময়ূ-রাক্ষীতে বুঝি বন্যা আসিয়াছে। তিনকড়ির একটি ছেলে, একটি মেয়ে, ছেলেটির বয়স বছর ষোল, মেয়েটির বয়স চৌদ্দ। তাহাদেরও ঘুম ভাঙিয়াছিল। মেয়েটি মায়ের কাছেই শোয়, ছেলে শোয় পাশের ঘরে। তিনকড়ি শুইয়া থাকে বাহিরের বারান্দায় ; পাশে থাকে একটা টেটা ; একখানা খুব লম্বা হেঁসো দা এবং একগাছা লাঠি।

দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া তিনকড়ির স্ত্রী তাহাকে ঠেলা দিয়া জাগাইল—

ওগো—ওগো—ওগো!

প্রবল ঝাঁকুনিতে তিনকড়ি একটা চীৎকার করিয়া উঠিয়া বসিল—এ্যাঁও! কে রে?—সঙ্গে সঙ্গে সে হাত বাড়াইল হেঁসো দা-খানার জন্য।

লক্ষীমণি খানিকটা পিছাইয়া গিয়া বার বার বলিল—আমি—আমি—ওগো আমি, ওগো আমি। আমি লক্ষ্মী-বউ! আমি মন্নর মা!

—কে? লক্ষ্মী-বউ?

—হ্যাঁ।

—কি?

—নাগরা বাজছে, বোধ হয় বান এসেছে।

—বান?

—ওই শোন নাগরা বাজছে।

তিনকড়ি কান পাতিয়া শুনিল। তারপর বলিল—হুঁ।

লক্ষীমণি বলিল—ঘর-দোর সামলাই?

তিনকড়ি উত্তর না দিয়া সেই দুর্যোগের মধ্যেই বারান্দার চালে উঠিয়া বারান্দার চাল হইতে তাহার কোঠা ঘরের চালে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কান পাতিল। নাগরা বাজিতেছে। হাকও উঠিতেছে। কিন্তু এ হাঁক তো বন্যা-ভয়ের হাঁক নয়।—আ—আ—হৈ! এ যে চৌকিদারী হাঁক। এদিকে ময়ূরাক্ষী হইতে তো কোন গোঁ-গোঁ ধ্বনি উঠিতেছে না। নদীর বুকে ডাক নাই। তবে তো এ ডাকাতির ভয়ের জন্য নাগরা বাজিতেছে! কাহারা? এ কাহারা?

তাহার গ্রামের পথেও চৌকিদার এবার হাঁকিয়া উঠিল—আ—আ—হৈ।

তিনকড়ি বার বার আপন মনে ঘাড় নাড়িল—হুঁ! হুঁ! হুঁ! ডাকাতির ভয়ে গ্রামে গ্রামান্তরে নাগরা বাজিতেছে, আর দেখুড়িয়ার ভল্লাদের সাড়া নাই! তাহারা লাঠি হাতে বাহির হয় নাই, বদমাশ পাষণ্ডের দল সব!—সে চালের উপর হইতেই হাঁক মারিল—আ—আ—হৈ!

চৌকিদারটা প্রশ্ন করিল—মোড়ল মশাই?

—হ্যাঁ। দাঁড়া। তিনকড়ি কোঠার চাল হইতে বারান্দার চালে লাফ দিয়া

পড়িল, সেখান হইতে লাফাইয়া পড়িল একেবারে উঠানে। দেরি তাহার আর সহিতেছিল না। দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া সে বলিল—ভল্লাপাড়ায় কে কে নাই রে? ডেকে দেখেছিস?

চৌকিদারও জাতিতে ভল্লা। সে চুপি চুপি বলিল—রাম নাই একেবারে নিয্যস। গোবিন্দ, রংলেলে (রঙলাল), বিন্দেবন, তেরে (তারিণী) এরাও নাই। আর সবাই বাড়ীতে আছে।

—থানার কেউ রোঁদে আসবে না তো আজ?

—আজ্ঞে না।

তিনকড়ি আপন মনে দাঁতে দাঁত ঘষিতে আরম্ভ করিল। ওদিকে দুর্যোগময়ী রাত্রির পুঞ্জীভূত অন্ধকারটা যেন চিরিয়া-ফাড়িয়া পর পর দুইটা বন্দুকের শব্দ ময়ূরাক্ষীর কূলে কূলে ছুটিয়া চলিয়া গেল। তিনকড়ি শঙ্কিত হইয়া বলিল—বন্দুকের শব্দ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

পিছন হইতে তিনকড়ির ছেলে ডাকিল—বাবা।

ছেলে গৌর এবং মেয়ে স্বর্ণ বাপের বড় প্রিয়। গৌর মাইনর স্কুলে পড়ে, বাপের সঙ্গে চাষেও খাটে। ছেলের ধার তেমন নাই, নতুবা তিনকড়ি তাহাকে বি-এ, এম-এ পর্যন্ত পড়াইত। মধ্যে মধ্যে আক্ষেপ করিয়া বলে—গৌরটা যদি মেয়ে হত, আর স্বর্ণ যদি আমার ছেলে হত।

সত্যই স্বর্ণ ভারি বুদ্ধিমতী মেয়ে, মেয়েটি তাহাদের গ্রাম্য পাঠশালা হইতে এল-পি পরীক্ষা দিয়া মাসে দুই টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইয়াছিল। কিন্তু তারপর তাহার পড়ার উপায় হয় নাই। তবু সে দাদার বই লইয়া আজও নিয়মিত পড়ে, মাকে গৃহকর্মে সাহায্যও করে। চমৎকার সুশ্রী মেয়ে, কিন্তু হতভাগিনী। স্বর্ণ সাত বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছে। তিনকড়ির ঐ ক্ষুব্ধ কামনার মধ্যে বোধ হয় এ দুঃখও লুকানো আছে। স্বর্ণ যদি ছেলে হইত আর গৌর যদি মেয়ে হইত, তবে তো তাহাকে কন্যার বৈধব্যের দুঃখ সহ্য করিতে হইত না, গৌর তো স্বর্ণের ভাগ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিত না। ছেলে গৌর তাহার অত্যন্ত প্রিয়। বাপের মতই বলিষ্ঠ। ভোররাত্রি হইতে বাপের সঙ্গে মাঠে যায়, বেলা নয়টা পর্যন্ত তাহাকে

সাহায্য করে ; তারপর সে স্নান করিয়া খাইয়া জংশনের স্কুলে পড়িতে যায়। বাবু-দের স্কুল বলিয়া তিনকড়ি তাহাকে কঙ্কণায় পড়িতে দেয় নাই। যে বাবুরা দেবতার সম্পত্তি মারিয়া দেয়, তাহাদের স্কুলে পড়িলে তাহার ছেলেও পরের সম্পত্তি মারিয়া দিতে শিখিবে—এই তাহার ধারণা। চারিটায় বাড়ী ফিরিয়া গৌর আবার সন্ধ্যা পর্যন্ত বাপকে সাহায্য করে, তাহার পর সন্ধ্যায় বাড়ীর একটি মাত্র হ্যারিকেন জ্বালিয়া রাত্রি দশটা পর্যন্ত পড়ে।

ছেলের ডাকে তিনকড়ি উত্তর দিল—কি বাবা?

—ঘর-দোর সামলাতে হবে না?

—না। তোমরা ঘরে গিয়ে শোও। আমি আসছি। ভয় নাই, কোন ভয় নাই। বানের ঢেঁড়া নয়।—বলিয়া চৌকিদার রতনকে ডাকিল—রতন, আয়।

গ্রামের প্রান্তে মাঠের ধারে আসিয়া তাহারা দাঁড়াইল জমাট-বস্তীর সন্ধানে। চারিদিকে অন্ধকার থমথম করিতেছে। সঠিক কিছু বুঝা যাইতেছে না। হঠাৎ তিনকড়ি বলিল—রতন।

—আজ্ঞে।

—আঠারো সালের বান মনে আছে?

আঠারো সালের বন্যা ময়ূরাক্ষীর তটপ্রান্তবাসীদের ভুলিবার কথা নয়। যাহারা সে বন্যা দেখিয়াছে, তাহারা তো ভুলিবেই না, যাহারা দেখে নাই, তাহারা সে বানের গল্প শুনিয়াছে, সে গল্পও ভুলিবার কথা নয়। রতন বাগ্দীর পক্ষে তো আঠারো সালের বন্যা তাহার জীবনের একটা বিশেষ ঘটনা। আঠারো সালের বন্যা আসিয়াছিল গভীর রাত্রে এবং আসিয়াছিল অতি অকস্মাৎ। তখন রতনের ঘর ছিল গ্রামের প্রান্তে—ময়ূরাক্ষীর অতি নিকটে। গভীর রাত্রে এমন অকস্মাৎ বান আসিয়াছিল যে, রতন স্ত্রী-পুত্র লইয়া শুধু হাতে-পায়েও ঘর ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই, সপরিবারে আপনার ঘরের চালে উঠিয়া বসিয়া ছিল। ভোরবেলায় ঘর ধসিয়া চালখানা ভাসিল, ভাসিয়া চলিল বন্যার স্রোতে। দুর্দান্ত স্রোত। রতন নিজে সাঁতার দিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিত, কিন্তু স্ত্রী-পুত্রকে লইয়া সে স্রোতে সাঁতার দিবার মত ক্ষমতা তাহার ছিল না। সেদিন তিনকড়ি এবং ওই রামভল্লা

অনেকগুলি লাঙলাদড়ি বাঁধিয়া এক এক করিয়া সাঁতার দিয়া আসিয়া চালে দড়ি বাঁধিয়াছিল। শুধু তাই নয়, ঠিক সেই মুহূর্তেই রতনের স্ত্রী টলিয়া পড়িয়া গিয়াছিল বন্যার জলে। রামভল্লা ও তিনকড়ি ঝাঁপ দিয়া বন্যার জলে পড়িয়া তাহাকেও টানিয়া তুলিয়াছিল। সে কথা কি রতন ভুলিতে পারে? সেই অন্ধকারেই রতন হাত বাড়াইয়া তিনকড়ির পা ছুঁইয়া নিজের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—সে কথা ভুলতে পারি মোড়ল মশাই? আপুনি তো—

—আমার কথা নয় রতন। রামার কথা বলছি। যদি ভালোয় ভালোয় ফিরে আসে।

রতন বলিল—ওই দেখুন, আল্‌পথ ধরে ওই কালো কালো সব গাঁ ঢুকছে।

সাত

শ্রীহরি ঘোষ বাড়ী ফিরিয়া বাকী রাত্রিটা জাগিয়া কাটাইয়া দিল। কিছুতেই ঘুম আসিল না, জমাট-বস্তী দেখিয়া সে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার মনে হইতেছে—এই পঞ্চগ্রামের সমস্ত লোক তাহার বিরুদ্ধে কঠিন আক্রোশে ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিতে চাহিতেছে। উহারা তাহাকে পিষিয়া মারিয়া ফেলিতে চায়। পরশ্রীকাতর হিংসুক লোভীর দল সব! পূর্ব-জন্মের পুণ্যফলে, এ জন্মের কর্মফলে মা লক্ষ্মী তাহার উপর কৃপা করিয়াছেন—তাহার ঘরে আসিয়া পায়ের ধূলা দিয়াছেন, সে অপরাধ কি তাহার? সে কি লক্ষ্মীকে অপরের ঘরে যাইতে বারণ করিয়াছে? সে এই অঞ্চলের জন্য তো কম কিছু করে নাই? প্রাইমারী ইস্কুলের ঘর করিয়া দিয়াছে, রাস্তা করিয়াছে, কুয়া করিয়াছে, পুকুর কাটাইয়াছে, মাটির চণ্ডীমণ্ডপও সে-ই পাকা করিয়া দিয়াছে, লোকের পিতৃ-মাতৃদায়ে, কন্যাদায়ে, অভাব অনটনে সে-ই টাকা ঋণ দেয়, ধান 'বাড়ি' দেয়। অকৃতজ্ঞের দল সে কথা মনেও করে না। তাহার বিরুদ্ধে কে কি বলে—সে সব খবর রাখে।

অকৃতজ্ঞেরা বলে—ইউনিয়ন বোর্ডের স্কুল ঘর, বোর্ডই তৈরী করে দিত। আমরাও তো ট্যাক্স দি।...

ওরে মূর্খের দল—ট্যাক্স থেকে কটা টাকা ওঠে ?...

বলে—নইলে ছেলেরা আমাদের গাছতলায় পড়ত।...

তাই উচিত ছিল।

রাস্তা সম্বন্ধেও তাহাদের ওই কথা।

চণ্ডীমণ্ডপ সম্বন্ধে বলে—ওটা তো শ্রীহরি ঘোষের কাছারী।

কাছারী নয়—শ্রীহরি ঘোষের ঠাকুর বাড়ী। চণ্ডীমণ্ডপ যখন জমিদারের, আর সে যখন গ্রামের জমিদারী-স্বত্ব কিনিয়াছে—তখন একশোবার তাহার। আইন যখন তাহাকে স্বত্ব দিয়াছে, সরকার যখন আইনের রক্ষক, তখন সে স্বত্ব উচ্ছেদ করিবার তোরা কে ? দেবু ঘোষের বাড়ীর মজলিশে মহাগ্রামের ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নাতি নাকি বলিয়াছে—চণ্ডীমণ্ডপের সৃষ্টিকালে জমিদারই ছিল না, তখন চণ্ডীমণ্ডপ তৈয়ারী করিয়াছিল গ্রামের লোকে,—গ্রামের লোকেরই সম্পত্তি ছিল চণ্ডীমণ্ডপ। ন্যায়রত্ন মহাশয় দেবতুল্য ব্যক্তি, কিন্তু তাঁহার এই নাতিটির পাখনা গজাইয়াছে। পুলিশ তাহার প্রতি-পদক্ষেপের খবর রাখে। চণ্ডীমণ্ডপ যদি গ্রামের লোকেরই ছিল, তবে জমিদারকে তাহারা দখল করিতে দিল কেন ?

পুকুর কাটাইয়াছে শ্রীহরি, লোকে পুকুরের জল খায়, অথচ বলে—জল তো ঘোষের নয়, জল মেঘের। শ্রীহরি মাছ খাবার জন্যে পুকুর কাটিয়াছে, আম-কাঁঠাল খাবার জন্যে চারিদিকে বাগান লাগিয়েছে—আমাদের জন্যে নয়। বারণ করে, খাবি না পুকুরের জল।...

বারণই তাহার করা উচিত। না, তাহা সে কখনও করিবে না। আবার পরজন্ম তো আছে। জন্মান্তরেও সে এই পুণ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। আগামী জন্মে সে রাজা হইবে।

ঋণের জন্য তাহারা বলে—ঋণ দেয়, সুদ নেয়।

আশ্চর্য কথা, অকৃতজ্ঞের উপযুক্ত কথা। ওরে, সেই বিপদের সময় দেয় কে ? ঋণ লইলেই সুদ দিতে হয়—এই আইনের কথা, শাস্ত্রের কথা। উঃ, পাষণ্ড অকৃতজ্ঞের দল সব।...

চিন্তা করিতে করিতে শ্রীহরি তিন কল্কে তামাক খাইয়া ফেলিল। আজকাল

তামাক তাহাকে নিজে সাজিতে হয় না, তাহার স্ত্রীও সাজে না ; বাড়ীতে শ্রীহরি চাকর রাখিয়াছে, সেই সাজিয়া দেয়।

সকালে উঠিয়াই সে জংশন-শহরে রওনা হইল। গত রাত্রের জমাট-বস্তার কথা থানায় ডায়রি করিবে ; লোক পাঠাইয়া কাজটা করিতে তাহার মন উঠিল না। কর্মচারী ঘোষ অবশ্য পাকা লোক, তবুও নিজে যাওয়াই সে ঠিক মনে করিল। সংসারে অনেক জিনিসই ধারে কাটে বটে, কিন্তু ভার না থাকিলে অনেক সময় শুধু ধারে কাজ হয় না। ক্ষুদ্র পোঁচ দিয়ে নালি কাটা যায়, কিন্তু বলিদান দিতে হইলে গুরু-ওজনের দা চাই। সে নিজে গেলে দারোগা-জমাদার বিষয়টার উপর যে মনোযোগ দিবে, ঘোষ গেলে তাহার শতাংশের একাংশ দিবে না।

টাপর বাঁধিয়া গরুর গাড়ী সাজান হইল। জংশন-শহরে আজকাল পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া-আসা সে বড় একটা করে না। গাড়ীর সঙ্গে চলিল কালু শেখ। কালু শেখ মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়াছে। গাড়ীর মধ্যে শ্রীহরি লইয়াছে কিছু ডাব, এক-কাঁদি মর্তমান কলা, দুইটি ভাল কাঁঠাল। বড় আকারের হৃষ্টপুষ্ট বলদ দুইটা দেখিতে ঠিক একরকম, দুইটার রঙই সাদা, গলায় কড়ির মালার সঙ্গে পিতলের ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধা। টুং-টাং ঘণ্টা বাজাইয়া গাড়ী কাঁধে বলদ দুইটা জোর-কদমে চলিল।

শ্রীহরি ভাবিতেছিল—ডায়রির ভিতর কোন কোন্ লোকের নাম দিবে সে? তিনকড়ির নাম তো দিতেই হইবে। থানার দারোগা নিজেই এ-নামটার কথা বলিবে। পুলিশ-কর্তৃপক্ষ নাকি পুনরায় তিনকড়ির বিরুদ্ধে বি এল কেসের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। দারোগা নিজে বলিয়াছে, লোকটা যদি নিজে ডাকাত না-হয়, ডাকাতির মালও যদি না সামলায়, তবুও ও যখন উহাদের কেসের তদ্বির করে, তখন যোগাযোগ নিশ্চয় আছে!

ভল্লাদের মধ্যে রামভল্লা নেতা। অন্য ভল্লাদের নাম সন্দেহ করিয়া পুলিশই বাহির করিবে। আর কাহার নাম? রহম শেখ? ও লোকটাও পুলিশের সন্দেহভাজন ব্যক্তি। ভল্লা না হইলেও—হয়ত, প্রধান ডাকাতের দলে না থাকিতে পারে এমন নয়। প্রজা-ধর্মঘটের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে ওই লোকটার প্রচণ্ড

উৎসাহ এবং লোকটা পাষণ্ডও বটে ! সুতরাং ধর্মঘটীদের মধ্যে দুর্ধর্ষ পাষণ্ড যাহারা, তাহারা যদি এই সুযোগে তাহার বাড়ীতে ডাকাতির মতলব করিয়া থাকে, তবে তাহাদের সঙ্গে রহমের সংস্রব থাকা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। ভদ্র-প্রধান ডাকাত-দলের মধ্যে মুসলমানও থাকে। মুসলমান-প্রধান দলে দু-একজন ভল্লার সন্ধানও বহুবার মিলিয়াছে। তিনকড়ি, রহম—আর কে ?

অকস্মাৎ গাড়ীখানার একটা ঝাঁকিতে তাহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল ; 'আঃ', বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়াই সে দেখিল—গাড়ীখানা রাস্তার মোড়ে বাঁক ফিরিতেছে, ডাইনের সতেজ সবল গরুটা তেজে মোচড় খাইয়া লাফ দিয়া বাঁক ফিরিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, ভাল তেজী গরুর লক্ষণই এই ! টাকা বেশী কম লাগে নাই, সাড়ে তিনশো টাকা জোড়াটার দাম দিতে....। মনের কথাও কথায় শেষ হইল না। সম্মুখেই অনিরুদ্ধের দাওয়া, দাওয়াটার উপর কামার-বউ একটা নয় দশ বছরের ছেলেকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছে, ছেলেটা প্রাণ-পণ শক্তিতে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টায় একহাতে কামার-বউয়ের চুল ধরিয়া টানিতেছে, অন্য হাতে তাহাকে ঠেলিতেছে। কামার-বউয়ের মাথায় অবগুণ্ঠন নাই, দেহের আবরণও বিস্রস্ত, চোখে উন্মত্ত দৃষ্টি, শীর্ণ পাণ্ডুর মুখখানা রক্তোচ্ছ্বাসে যেন থম থম করিতেছে।

শ্রীহরির বুকের ভিতরটা কয়েক মুহূর্তের জন্য ধক্ ধক্ করিয়া প্রচণ্ডবেগে লাফাইয়া উঠিল। তাহার অন্তরের মধ্যে পুরাতন ছিরু উঁকি মারিল, তাহার বহু-দিনের নিরুদ্ধ বাসনা উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীহরি আপনাকে সংযত করিল। সে জমিদার, সে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তা'ছাড়া পাপ সে আর করিবে না। পাপের সংসারে লক্ষ্মী থাকেন না। কিন্তু তবু সে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল বিস্রস্ত-বাস অনবগুণ্ঠিতা পদ্মের দিকে।

সহসা পদ্মের দৃষ্টিও পড়িল তাহার দিকে। বলদের গলায় ঘণ্টার শব্দে গাড়ীর দিকে চাহিয়া সে দেখিল শ্রীহরি ঘোষ, সেই ছিরু পাল, তাহার দিকে চাহিয়া আছে নিষ্পলক দৃষ্টিতে। সঙ্গে সঙ্গে সে ছেলেটাকে ছাড়িয়া দিল। ছেলেটা সেই উচ্চিংড়ে। সকাল বেলাতেই সে জংশন হইতে গ্রামে আসিয়াছে। আজ ছিল

লুণ্ঠন-ষষ্ঠী। ষষ্ঠীর দিন মা-মণিকে তাহার মনে পড়িয়াছিল। পড়িবার কারণও ছিল—পূর্বে ষষ্ঠীর দিন মা-মণি খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করিত প্রচুর। কিন্তু এবার কোনও আয়োজনই নাই দেখিয়া সে পলাইয়া যাইতেছে। মুখে কিছু বলে নাই। বোধ হয় লজ্জা হইয়াছে। নজরবন্দী যতীনবাবু যখন এখানে পদ্মের বাড়ীতে থাকিত—তখন যতীনবাবু পদ্মকে বলিত 'মা-মণি'; উচ্চিংড়েও তখন যতীনবাবুর কাছে পেট পুরিয়া ভাল খাইতে পাইত বলিয়া এইখানেই পড়িয়া থাকিত, পদ্মকে সে-ও মা-মণি বলিত। আজ মা-মণি, তাহাকে বার বার অনুরোধ করিল—এইখানে থাকিতে, অবশেষে পাগলের মত তাহাকে এমনি ভাবে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল।

ছাড়া পাইয়া উচ্চিংড়ে দাওয়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বোঁ বোঁ করিয়া ছুটিয়া পলাইল। পদ্ম আপনাকে সম্বৃত করিয়া ঘরে গিয়া ঢুকিল। গাড়ীখানাও কামার-বাড়ী পার হইয়া গেল।

শ্রীহরির অনেক কথা মনে হইল। অনিরুদ্ধ কামার শয়তান, তাহার ঠিক হইয়াছে। জেল খাটিতে হইয়াছে, দেশত্যাগী হইতে হইয়াছে। সে সময় এই কামারণীটির উপর তাহার লুব্ধদৃষ্টি ছিল, আজও বোধ হয়...কিন্তু মেয়েটার চলে কেমন করিয়া? দেবু ধান দেয় বলিয়া শুনিয়াছে সে। কেন? দেবু ধান দেয় কেন? মেয়েটাই বা নেয় কেন? সে-ও তো দিতে পারে ধান; অনেক লোক-কেই সে ধান দান করে। কিন্তু কামার-বউ তাহার ধান কখনই লইবে না। শুধু তাহার কেন—দেবু ছাড়া বোধ হয় অন্য কাহারও কাছে ধান লইবে না।

গ্রাম পার হইয়া, কঙ্কণা ও তাহাদের গ্রামের মধ্য-পথে একটা বড় নালা, দুই-খানা গ্রামের বর্ষার জল এই নালা বাহিয়া ময়ূরাক্ষীতে গিয়া পড়ে। বেশী বর্ষা হইলে নালাটাই হইয়া উঠে একটা ছোটখাটো নদী। তখন এই নালাটার জন্য তাহাদের গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাওয়া একটা দুর্ঘট ব্যাপার হইয়া উঠে। সম্প্রতি জংশন-শহরের কলওয়ালারা এবং গদীওয়ালারা ইহার উপর একটা সাঁকো বাঁধিবার জন্য ইউনিয়ন বোর্ডকে বলিয়াছে। তাহারা যথেষ্ট সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়াছে। সাঁকোটা বাঁধা হইলে—বর্ষার সময়েও এদিককার ধান-চাল—রেলওয়ে ব্রীজের উপর দিয়া জংশনে যাইতে পারিবে।

শ্রীহরি আপন মনেই বলিল—আমি বাধা দেব। দেখি কি করে সাঁকো হয়। এ গাঁয়ের লোককে আমি না-খাইয়ে মারব।

আজও নালাটায় এক কোমর গভীর জল খরস্রোতে বহিতেছে! গতকাল বোধ হয় সাঁতার-জল হইয়াছিল। নালাটার দুইধারে পলির মত মাটির স্তর পড়িয়াছে। গাড়ী নালায় নামিল। পলি-পড়া জায়গাগুলিতে একহাঁটু কাদা। কিন্তু শ্রীহরির বলদ দুইটা শক্তিশালী জানোয়ার, তাহারা অবলীলাক্রমে গাড়ীটা টানিয়া ও পারে লইয়া উঠিল; এই কাদায় বেটা চাষাদের হাড়-পাঁজরা-বাহির-করা-বলদ-বাহিত বোঝাই গাড়ি যখন পড়িবে—তখন একটা বেলা অন্তত এইখানেই কাটিবে। নিজেরাও তাহারা চাকায় কাঁধ লাগাইয়া গাড়ি ঠেলিবে, পিঠ বাঁকিয়া যাইবে ধনুকের মত; কাদায়, ঘামে ও জলে ভূতের মত মূর্তি হইবে। শ্রীহরির মুখখানা গাম্ভীর্য-পূর্ণ ক্রোধে থম্ থম্ করিতে লাগিল।

নালাটার পরে খানিকটা পথ অতিক্রম করিয়াই রেলওয়ে ব্রীজ। শ্রীহরির গাড়ী ব্রীজে আসিয়া উঠিল। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা—পুরনো কালের খিলান-করা ব্রীজ। একদিকে রাশি-রাশি বেলে-পাথর-কুচির বন্ধনীর মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে রেলের লাইন—লাইনের পাশ দিয়া অন্য দিকে মানুষ যাইবার পথ। শ্রীহরির জোয়ান গরু দুইটা লাইন দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিল—ফোঁস-ফোঁস শব্দে বার বার ঘাড় নাড়িতে আরম্ভ করিল। কচি বয়স হইতে তাহারা অজ পাড়াগাঁয়ে কোন গরীব চাষীর ঘরে, মেটে ঘর, মেঠো নরম মাটির পথ, শান্ত-স্তব্ধ পল্লীর জনবিরলতার মধ্যে লালিত-পালিত হইয়াছে, মাত্র কয়েক মাস হইল আসিয়াছে শ্রীহরির ঘরে। এই ইট-পাথরের পথ, লোহার চকচকে রেল-লাইন—এ সব তাহাদের কাছে বিচিত্র বিস্ময়; অজানার মধ্যে বিস্ময়ে ভয়ে গরু দুইটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ব্রীজ পার হইয়া খেয়াঘাট পার হইতে হইবে।

শ্রীহরি গাড়োয়ানকে বলিল—হুঁশ করে চালা।—বলিয়া সে হাসিল। জংশন-শহর তাহাদের কাছেও বিস্ময়। তাহার বয়স পঁয়তাল্লিশ পার হইল। মূল রেল-লাইনটা অবশ্য অনেক দিনের, স্টেশনটা তখন একটা ছোট স্টেশন ছিল। গ্রামটাও ছিল নগণ্য পল্লীগ্রাম। তাহার বয়স যখন বারো-তেরো বৎসর, তখন স্টেশনটা

পরিণত হইল বড় জংশনে। দুই-দুইটা ব্রাঞ্চ লাইন বাহির হইয়া গেল। সে-সব তাহার বেশ মনে আছে। পূর্বকালে শ্রীহরি মূল লাইনের গাড়ীতে চড়িয়া কয়েক-বার গঙ্গাস্নানে গিয়াছে—আজিমগঞ্জ, খাগড়া প্রভৃতি স্থানে। তখন ঐ স্টেশনটায় কিছুই মিলত না। স্টেশনের পাশে মিলিত শুধু মুড়ি-মুড়কী-বাতাসা। তখন এ অঞ্চলের বাবুদের গ্রাম, ওই কঙ্কণা ছিল—তখনকার বাজারে-গ্রাম। ভাল মিষ্টি, মনিহারীর জিনিস, কাপড় কিনিতে লোকে কঙ্কণায় যাইত। তারপর ব্রাঞ্চ লাইন পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে স্টেশনটা হইল জংশন। বড় বড় ইমারত তৈয়ারী হইল, বিস্তীর্ণ মাঠ ভাঙিয়া রেল-ইয়ার্ড হইল, সারি সারি সিগ্‌নালের স্তম্ভ বসিল, প্রকাণ্ড বড় মুসাফিরখানা তৈয়ার হইল। কোথা হইতে আসিয়া জুটিল দেশ-দেশান্তরের ব্যব-সায়ী,—বড় বড় গুদাম বানাইয়া এই অঞ্চলটার ধান, চাল কলাই, সরিষা, আলু কিনিয়া বোঝাই করিয়া ফেলিল। আমদানীও করিল কত জিনিস—হরেক রকমের কাপড়, যন্ত্রপাতি, মশলা, দুর্লভ মনিহারী বস্তু। হ্যারিকেন লণ্ঠন ওই জংশ-নের দোকানেই তাহারা প্রথম কিনিয়াছে; হ্যারিকেন, দেশলাই, কাচের দোয়াত, নিবের হোল্ডার কলম, কাসির বাড়, হাড়ের বাঁটের ছুরি, বিলাতি কাঁচি, কার-খানায়-তৈয়ারী ঢালাই-লোহার কড়াই, বালতি, কাল-কাপড়ের ছাতা, বার্নিশ করা জুতা, এমন কি কারখানার তৈয়ারী চাষের সমস্ত সরঞ্জাম; টামনা,—বিলাতি গাঁইতি, খন্তা, কুড়ুল, কোদাল, ফাল পর্যন্ত। বড় বড় কল তৈয়ারী হইল—ধান-কল, তেল-কল, ময়দা-কল। ভানাড়ী কলু মরিল—ঘরের জাঁতা উঠিল। ছোট-লোকের আদর বাড়িল—দলে দলে আশ-পাশের গ্রাম খালি করিয়া সব কলে আসিয়া জুটিয়াছে।

শ্রীহরির গাড়ী স্টেশন-কম্পাউণ্ডের পাশ দিয়া চলিয়াছিল। অদ্ভুত গন্ধ উঠিতেছে; তেল-গুড়-ঘি, হরেক রকম মশলা—ধনে, তেজপাতা, লঙ্কা, গোলমরিচ, লবঙ্গের গন্ধ একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে চেনা যাইতেছে—তামাকের উগ্র গন্ধ। অদূরের ধান-কল হইতে ইহার সঙ্গেই আবার ভাসিয়া আসিয়া মিশিতেছে—সিদ্ধ ধানের গন্ধ। স্টেশন-ইয়ার্ড হইতে মধ্যে মধ্যে এক এক ঝলকা কয়লার ধোঁয়াও আসিয়া মিশিতেছে তাহার শ্বাসরোধী গন্ধ লইয়া। রেল-

গুদামের চারিটা পাশে—ওই সমস্ত জিনিস পড়িয়া চারিদিকের মাটি ঢাকিয়া গিয়াছে।

গাড়োয়ানটা সহসা বলিয়া উঠিল—ওরে বাপ্ রে। গাঁট কত রে?

শ্রীহরি মুখ বাড়াইয়া দেখিল—সত্যই দশ-বারোটা কাপড়ের বড় গাঁট পড়িয়া আছে। পাশে পড়িয়া আছে প্রায় পঞ্চাশটা চটের গাঁট। গাড়োয়ানটা সবগুলো-কেই কাপড় মনে করিয়াছে। এক পাশে পড়িয়া আছে—কতকগুলা কাঠের বাক্স; নূতন কাপড় এবং চটের গন্ধের সঙ্গে—ওষুধের ঝাঁঝালো গন্ধ উঠিতেছে; তাহার সহিত মিশিয়াছে—চায়ের পাতার গন্ধ।

গুদামটায় দুমাদুম শব্দ উঠিতেছে, মালগাড়ী হইতে মাল খালাস হইতেছে। রেল-ইয়ার্ডে ইঞ্জিনের স্টীমের শব্দ, বাঁশীর শব্দ, দ্রুত চলন্ত বিশ-পঞ্চাশ-শত-দেড়শত জোড়া লোহার চাকার শব্দ, কলগুলার শব্দ, মোটর-বাসের গর্জন,—মানুষের কলরবে চারিদিক মুখরিত।

দিন দিন শহরটা বাড়িতেছে। রাস্তার দুপাশে পাকাবাড়ীর সারি বাড়িয়াই চলিয়াছে। ফটকে নাম লেখা হরেক ছাঁদের একতলা দোতলা বাড়ী; দোকানের মাথায় বিজ্ঞাপন, দেওয়ালে বিজ্ঞাপন।

গাড়োয়ানটা বলিয়া উঠিল—ওঃ, পায়রার ঝাঁক দেখো দেখি!…প্রায় দুইশত-খানেক পায়রা রাস্তার উপর নামিয়া শস্যকণা খুঁটিয়া খাইতেছে। লোক কিংবা গাড়ী দেখিয়াও তাহারা ওড়ে না, অল্প-স্বল্প সরিয়া যায় মাত্র। জংশনশহর তাহা-দের কাছেও এখন বিস্ময়ের বস্তু। সহসা শ্রীহরির একটা কথা মনে হইল,—এখান-কার কলওয়ালা কয়েকজন এবং গদীওয়ালা মহাজনগুলি তাহাদের অর্থাৎ জমি-দারের বিরুদ্ধে প্রজাদের পক্ষ লইয়া কতখানি উস্কানী দিতেছে, সন্ধান লইতে হইবে। সে তাহাদের জানে। উহাদের জন্য চাষী-প্রজারা এতখানি বাড়িয়াছে। ছোটলোকগুলা তো কলের কাজ পাইয়াই চাষের মজুর ছাড়িয়াছে। তাহাদের শাসন করিতে গেলে—বেটারা পলাইয়া আসিয়া কলে ঢুকিয়া বসে; কলের মালিক তাহাদের রক্ষা করে। কত জনের কাছে তাহার ধানের দাদন এইভাবে পড়িয়া

গেল তাহার হিসাব নাই। চাষ-বাস করা ক্রমে ক্রমে কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতেছে। চাষীদের দাদন দেয় ইহারাই, জমিদারের সঙ্গে বিরোধে তাহাদের পক্ষ লইয়া আপনার লোক সাজে। মূর্খেরা গলিয়া গিয়া দাদন নেয়; ফসলের সময় পাঁচ টাকা দরের মাল তিন টাকায় দেয়—তবু মূর্খদের চৈতন্য নাই! এখনও একমাত্র ভরসার কথা—মিলওয়ালারা, গদীওয়ালারা ধান ঋণ দেয় না, দেয় টাকা। ধানের জন্য চাষী-বেটাদের এখনও জমিদার-মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হয়।

গাড়ীটা রাস্তা হইতে মোড় ঘুরিয়া থানা-কম্পাউণ্ডের ফটকে ঢুকিল।

দারোগা হাসিয়া সম্ভাষণ করিলেন—আরে, ঘোষ মশাই যে! কি খবর? এদিকে কোথায়?

শ্রীহরি বিনয় করিয়া বলিল—হুজুরদের দরবারেই এসেছি। আপনারা রক্ষে করেন তবেই, নইলে তো ধনে-প্রাণে যেতে হবে দেখছি।

—সে কি!

—খবর পেয়েছেন নাকি কাল রাত্রে জমাট-বন্দী হয়েছিল—মৌলকিনীর বটতলায়? ভূপাল-রতন আসে নাই?

—কই না—বলিয়া পর মুহূর্তেই হাসিয়া দারোগা বলিলেন—আর মশাই, থানা-পুলিশের ক্ষমতাই নাই তা আমরা করব কি? এখন তো মালিক আপনারাই—ইউনিয়ন-বোর্ড। ভূপাল-রতনের আজ ইউনিয়ন-বোর্ডে কাজের পালি। কাজ সেরে আসবে।

—আমি কিন্তু বার বার করে সকালেই আসতে বলেছিলাম।

—বসুন, বসুন। সব শুনছি।

শ্রীহরি কালু শেখকে বলিল—কালু, ও-গুলো নামা।

কালু নামাইল—কলা, কাঁঠাল ইত্যাদি।

দারোগা বক্রভাবে সেগুলির উপর চকিতে দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া বলিলেন,—চা খাবেন তো? তিনি বারান্দায় দাঁড়াইয়া রাস্তার ও-পারের চায়ের দোকানীকে হাঁকিয়া বলিলেন—এই, দু কাপ চা, জলদি!

শ্রীহরিকে লইয়া তিনি অফিসে গিয়া বসিলেন। চা খাইয়া বলিলেন—সিগারেট

বের করুন। সিগারেট ধরিয়ে শোনা যাক্ কাগজের কথা।

শ্রীহরি বাড়ীতেও সিগারেট খায় না, কিন্তু রাখে; দারোগা হাকিম প্রভৃতি ভদ্র লোকজন আসিলে বাহির করে। বাহিরে গেলে সঙ্গে লয়, আজও সঙ্গে আনিয়াছিল। সে সিগারেটের প্যাকেট বাহির করিল। দারোগা দ্বাররক্ষী কনেস্টবলকে বলিলেন—দরজাটা বন্ধ করে দাও।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে শ্রীহরি থানার অফিস-ঘর হইতে বাহির হইল। দারোগাও বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—ও আপনি ঠিক করেছেন, কোন ভুল হয় নি—অন্যায়ও হয় নি। ঠিক করেছেন!

শ্রীহরি একটু হাসিল—শুষ্ক হাসি।

সে গত রাত্রের জমাট-বন্দীর কথা ডায়রি করিয়া, ঐ সঙ্গে তাহার যাহাদের উপর সন্দেহ হয়, তাহাদের নামও দিয়াছে। রাম ভল্লা, তিনকড়ি মণ্ডল, রহম শেখ-এর নামগুলি তো বলিয়াছেই, উপরন্তু সে দেবু ঘোষের নামও উল্লেখ করিয়াছে। তাহাকে তাহার সন্দেহ হয়। গোটা-ব্যাপারটাই যদি প্রজা-ধর্মঘটের ফেঁকড়া হয়, তবে দেবুকে বাদ দেওয়া যায় না; দেবুই সমস্তের মূল—সে-ই সমস্ত মাথায় করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে, পিছন হইতে প্রেরণা যোগাইতেছে।

দারোগা প্রথমটা বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন—তা কি সম্ভব ঘোষ মশায়? দেবু ঘোষ—ডাকাতির ভেতর?

শ্রীহরি তখন বাধ্য হইয়া গতকাল গভীর রাত্রে সেই দুর্যোগের মধ্যেও গ্রাম-প্রান্তে দেবুর প্রতি দরদী দুর্গা মুচিনীর উপস্থিতির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিল—দেবু ছোঁড়ার পতন হয়েছে দারোগাবাবু।

—বলেন কি!

—শুধু দুর্গাই নয়, দেবু ঘোষ এখন অনিরুদ্ধ কামারের স্ত্রীর ভরণপোষণের সমস্ত ভার নিয়েছে তা খবর রাখেন?

দারোগা কিছুক্ষণ শ্রীহরির মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া খস্ খস্ করিয়া সমস্ত লিখিয়া লইয়া বলিয়াছিলেন—তবে আপনি ঠিকই সন্দেহ করেছেন।

শ্রীহরি চমকিয়া উঠিয়াছিল—আপনি লিখলেন নাকি দেবুর নাম?

—হ্যাঁ। চরিত্রদোষ যখন ঘটেছে, তখন অনুমান ঠিক।

—না—না। তবু ভাল করে জেনে লিখলেই ভাল হত—

দারোগা হাসিয়া বার বার তাহাকে বলিলেন—কোন অন্যায় হয় নি আপনার। ঠিক ধরেছেন আর ঠিক করেছেন আপনি।

ফিরিবার পথে দুই-চারিজন গদীওয়ালা মহাজন ও মিল-মালিকদের ওখানেও সে গেল। কিন্তু কোন সঠিক সংবাদ মিলিল না। কেবল একজন মিলওয়ালা বলিল—টাকা আমরা দোব বৈকি মশায়। জমি হিসেব করে টাকা দোব। আপনাদের সঙ্গে প্রজাদের বিরোধ বেধেছে, আমাদের লাভের এই তো মরসুম।—সে দর্পের হাসি হাসিল।

শ্রীহরি মনে মনে ক্রুদ্ধ হইল—কিন্তু মুখে কিছু বলিল না। সে-ও একটু হাসিল।

মিলওয়ালা ভদ্রলোকটি বেঁটে-খাটো মানুষ, বড়লোকের ছেলে; জংশন শহরে তাহার দুইটা কল—একটা ধানের, একটা ময়দার। অনেকটা সায়েবী চালের ধারা-ধরণ; কথাবার্তা পরিষ্কার স্পষ্ট, তাহার মধ্যে একটু দাম্ভিকতার আভাস পাওয়া যায়। সে-ই আবার বলিল—কলের মজুর নিয়ে আপনারা তো আমাদের সঙ্গে হাঙ্গামা কম করেন না। কথায় কথায় আপন আপন এলাকার মজুরদের আটক করেন। প্রজাদের বলেন—কলে খাটতে যাবি নে, গদীওয়ালার দাদন নিতে পারবি নে, তাদিকে ধান বেচতে পারবি নে। এখন আপনাদের সঙ্গে তাদের বিরোধ বেধেছে, এই তো আমাদের পক্ষে সুবিধের সময় তাদের আরো আপনার করে নেবার।

শ্রীহরির অন্তরটা গর্তের ভিতরকার খোঁচা-খাওয়া ক্রুদ্ধ আহত সাপের মত পাক খাইতেছিল, তবুও সে কোনমতে আত্মসম্বরণ করিয়া লইল ও নমস্কার করিয়া উঠিয়া পড়িল।

মিলওয়ালা বলিল—কিছু মনে করবেন না, স্পষ্ট কথা বলেছি আমি।

শ্রীহরি ঘাড় নাড়িয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

মিলওয়ালা বাহিরে আসিয়া আবার বলিল—আপনি কোন্‌টা চাচ্ছেন? আমরা টাকা না দিলে প্রজারা টাকার অভাবে মামলা করতে পারবে না, তা হলেই

বাধ্য হয়ে মিট্‌মাট্ করবে! না তার চেয়ে আমরা টাকা দিই প্রজাদের? মামলা করে যাক্ তারা আপনাদের সঙ্গে, শেষ পর্যন্ত তারা তো হারবেই; একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে হারবে! তখন আপনাদের আরও সুবিধে। লোকটি বিজ্ঞতার হাসি হাসিতে লাগিল।

শ্রীহরি কোন উত্তর না দিয়া গাড়োয়ানকে বলিল—কঙ্কণায় চল্।

মিলওয়ালা সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল—জমিদার-কনফারেন্স নাকি?

শ্রীহরি চকিত দৃষ্টি ফিরাইয়া একবার মিলওয়ালার দিকে চাহিল, তারপর সে ধীরে ধীরে গাড়ীতে উঠিল। তেজী বলদ দুইটা লেজে মোচড় খাইয়া লাফাইয়া গাড়ীখানাকে লইয়া ঘুরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

মিলের বাঁধানো উঠানে মেয়ে-মজুরদের কয়েকজন তাহাকেই দেখিতেছিল। শ্রীহরি দেখিল—তাহারই গ্রামের একদল মুচি ও বাউড়ীর মেয়ে। মিলের বাঁধানো প্রাঙ্গণে মেয়েমজুরেরা পায়ে পায়ে সিদ্ধ ধান ছড়াইয়া চলিয়াছে—আর মৃদুস্বরে একসঙ্গে গলা মিলাইয়া গান গাহিতেছে।

শ্রীহরি আসিয়া উঠিল মুখুয্যেদের কাছারীতে।

মুখুয্যেবাবুরা লক্ষপতি ধনী। বৎসরে লক্ষ টাকার উপর তাঁহাদের আয়। শুধু এ অঞ্চলের নয়, গোটা জেলাটার অন্যতম প্রধান ধনী। কঙ্কণা অবশ্য বহুকালের প্রাচীন ভদ্রলোকের গ্রাম, কিন্তু বর্তমান কঙ্কণার যে রূপ এবং জেলার মধ্যে যে খ্যাতি, সে এই মুখুয্যেবাবুদের কীর্তির জন্যই। বড় বড় ইমারত, নিজেদের জন্য বাগান-বাড়ী, সাহেব-সুবার জন্য অতিথি-ভবন, সারি সারি দেবমন্দির, স্কুল, হাসপাতাল, বালিকা-বিদ্যালয়, ঘাটবাঁধানো বড় বড় পুকুর ইত্যাদি—মুখুয্যেবাবুদের অনেক কীর্তি। জমিদারী সম্পত্তি সবই প্রায় দেবোত্তর। দেবোত্তর হইতেই প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয়ভার নির্বাহ হয়। সাহেবদের জন্য মুর্গি কেনা হয়, মদ কেনা হয়, বাবুর্চির বেতন দেওয়া হয়, খেমটা-নাচওয়ালী-বাইজী আসে, রামায়ণ, ভাগবত প্রভৃতির দল আসে। বাবুদের ছেলেরাও রঙ-চঙ মাখিয়া থিয়েটার করে। দেবোত্তরের আয়ও প্রচুর। ন্যায্য আয়ের উপরেও আবার উপরি আয় আছে। দেবোত্তরের সকল আদান-প্রদানেই টাকায় এক পয়সা হিসাবে দেবতার পার্বণী

আছে ; টাকা দিতে গেলে টাকায় এক পয়সা বাড়তি দিতে হয় দেনাদারকে, টাকা নিতে গেলে টাকায় এক পয়সা কম নিতে হয় পাওনাদারকে। মুখুয্যে-কর্তা হিসেবী বুদ্ধিমান লোক। শ্রীহরি মুখুয্যে-কর্তার পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল।

মুখুয্যে-কর্তা বলিলেন—তাই তো হে, তুমি হঠাৎ এসে ? আমি ভাবছিলাম একটা দিন ঠিক করে আরও সব যাঁরা জমিদার আছেন তাঁদের খবর দোব। সকলে মিলে কথাবার্তা বলে একটা পথ ঠিক করা যাবে।

শ্রীহরি বলিল—আমি এসেছি আপনার কাছে উপদেশ নিতে। অন্ত জমিদার যাঁরা আছেন, তাঁদের দিয়ে কিছু হবে না বাবু। অবস্থা তো সব জানেন !

মুখুয্যে-কর্তা হাসিয়া বলিলেন—সেই জন্মেই তো।

শ্রীহরি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কর্তা বলিলেন—ওঁরা সব বনেদী জমিদার। জেদ চাপলে বুদ্ধির মামলা করবেন বই কি। জেদ চাপিয়ে দিতে হবে।

শ্রীহরি হাসিয়া সবিনয়ে বলিল—প্রজারা ধর্মঘট করে খাজনা বন্ধ করলে—কদিন মামলা করবেন সব ?

—টাকা ঠিক করে রাখ তুমি। ছোটখাটো যারা তাদের তুমি দিয়ো। বড় যারা তাদের ভার আমার উপর রইল। টাকা-আদায় সম্পত্তি থেকেই হবে।

শ্রীহরি অবাক হইয়া গেল।

কর্তা বলিলেন—এতে করবার বিশেষ কিছু নাই ; এক কাজ কর। তুমি তো ধানের কারবার কর ? এবার ধান দাদন বন্ধ করে দাও। কোন চাষীকে ধান দিয়ো না।—বলিয়া তিনি হাঁকিয়া গদী-ঘরের কর্মচারীদের উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—কে আছ, পাঁজীটা দিয়ে যাও তো হে।

পাঁজী দেখিয়া তিনি বলিলেন—হুঁ। মুসলমানদের রমজানের মাস আসছে। রোজার মাস। রোজা ঠাণ্ডার দিন, ইদল্‌ফেতর পরব। ধান দিয়ো না, মুসলমানদের কায়দা করতে বেশী দিন লাগবে না—আবার তিনি হাসিয়া বলিলেন—পেটে খেতে না পেলে বাঘও বশ মানে।

শ্রীহরি প্রণাম করিয়া বলিল—যে আজ্ঞে, তাহলে আজ আমি আসি।

কর্তা হাসিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—মঙ্গল হোক তোমার! কিছু ভয় করো না। একটু বুঝে-সমঝে চলবে। ঘরে টাকা আছে, ভয় কি তোমার? আর একটা কথা। শিবকালীপুরের পত্তনীর খাজনা কিস্তি কিস্তি দিচ্ছ নাকি তুমি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, পাই-পয়সা দিয়ে দিয়েছি।

—গভর্নমেণ্ট রেভিন্যু তুমি দাও—না, জমিদার দেয়?

শ্রীহরি এবার বুঝিয়া লইল। হাসিয়া বলিল—আশ্বিন কিস্তিতে আর দেব না।

পথে আসিতে শ্রীহরি দেখিল পথের পাশেই বেশ একটা ভিড় জমিয়া গিয়াছে। তিনকড়ি মণ্ডল একটা পাচন-লাঠি হাতে লইয়া ক্রুদ্ধবিক্রমে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার সম্মুখে নতমুখে বসিয়া আছে একজন অল্পবয়সী ভল্লা। ভল্লাটির পিঠে পাচন-লাঠির একটা দাগ লম্বা মোটা দড়ির মত ফুলিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীহরি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল—কি হয়েছে? ওকে মেরেছ কেন অমন করে?

তিনকড়ি বলিল—কিছু হয় নাই। তুমি যাচ্ছ যাও।

শ্রীহরি ভল্লাটিকে বলিল—এই ছোকরা, কি নাম তোর?

সে এবার উঠিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—আজ্ঞে, আমরা ভল্লারা···

—হ্যাঁ, হ্যাঁ! কি নাম তোর?

—আজ্ঞে, ছিদাম ভল্ল!

—কে মেরেছে তোকে?

—ছিদাম মাথা চুলকাইয়া বলিল—আজ্ঞে না। মারে নাই তো কেউ।

—মারে নাই? পিঠে দাগ কিসের?

—আজ্ঞে না। উ কিছু লয়।

—কিছু নয়?

—আজ্ঞে না।

তিনকড়ি নিতান্ত অবজ্ঞাভরেই আবার বলিল—যাও—যাও, যাচ্ছ কোথা যাও। হাকিমী করতে হবে না তোমাকে। মেরেছি—কি বেশ করেছি। সে

বুঝবে ও—আর বুঝব আমি।

শ্রীহরি বাড়ী ফিরিয়াই বৃত্তান্তটি লিখিয়া কালু শেখকে থানায় পাঠাইয়া দিল।

আট

যে তরুণ ডল্লা-যোয়ানটিকে তিনকড়ি ঠেঙাইয়াছিল, সে গত রাত্রিতে গ্রামে অনুপস্থিত ডল্লাদের একজন। রাত্রির অন্ধকারে আল-পথে কালো কালো ছায়ামূর্তির মত যাহারা ফিরিয়াছিল—তাহাদের মধ্যে ছিদামও ছিল। ওই ছেলেটা যে উহাদের সঙ্গে জুটিতে পারে—এ ধারণা তিনকড়ির ছিল না। রাম ডল্লা প্রৌঢ় হইয়াছে, এ অঞ্চলে তাহার মত শক্তিশালী লাঠিয়াল, ক্ষিপ্রগামী পুরুষ নাই। একবার সে সন্ধ্যায় শহর হইতে রওনা হইয়া এখানে আসিয়া মধ্যরাত্রে ডাকাতি করিয়াছিল এবং অবশিষ্ট ঘণ্টাচারেক সময়ের মধ্যে গিয়া হাজির হইয়াছিল সদর শহরে। সে জীবনে বার তিনেক জেল খাটিয়াছে। তারিণী, বৃন্দাবন, গোবিন্দ, রঙলাল, ইহারাও কম যায় না। সকলেই রামের যৌবনের সহচর। এখনও প্রৌঢ়ত্ব সত্ত্বেও তাহারা বাঘ; তাদের সঙ্গে ওই ছোঁড়াটা জুটিয়াছিল জানিয়া তিনকড়ির বিস্ময় ও ক্রোধের আর সীমা ছিল না। ছিপ্‌ছিপে লম্বা—কচি চেহারার ছেলেটা দু'বছর আগেও মনসা ভাসানের দলে বেহুলা সাজিয়া গান গাহিত—

"কাক ভাই, বেউলার সম্বাদ লইয়া যাও।"

দুই বৎসরের মধ্যে সেই ছেলের এমন পরিবর্তন! বাল্যকালে ছোঁড়ার বাপ মরিয়াছিল, মা তাহাকে বহু কষ্টেই মানুষ করিয়াছে। সে সময় তিনকড়িই ছোঁড়াকে 'গাঁইটে' গরুর পাল করিয়া দিয়াছিল। 'গাঁইটে-পালে'র কাজটা হইল দশ-বারো ঘরের ভাগের রাখালের কাজ। সকলের গরু লইয়া ছোঁড়া মাঠে চরাইয়া আনিত, প্রত্যেক গরু-পিছু বেতন পাইত মাসিক দু'পয়সা। দশ-বারো ঘরে ত্রিশ-চল্লিশটা গরু চরাইয়া মাসে এক টাকা, পাঁচ সিকা নগদ উপার্জন হইত। এছাড়া পাইত প্রতিঘরে দৈনিক মুড়ির বদলে একপোয়া চাল; পূজায় প্রতিঘরে

একখানা কাপড়। সেই ছিদামের এই পরিণতি দেখিয়া সে ক্ষেপিয়া গিয়াছিল। কিন্তু রাত্রে তিনকড়ি ছিদামকে ধরিতে পারে নাই। তিনকড়ি সাড়া পাইবামাত্র সে সেই রাত্রেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ছুটিয়া পলাইয়াছিল।...

রাম এবং অন্য সকলের সঙ্গে রাত্রেই তার একচোট বচসা হইয়া গিয়াছে। বচসা বলিলে ভুল হইবে। বকিয়াছে সে নিজেই। হাজার ধিক্কার দিয়া বলিয়াছে —ছি! ছি! ছি! এত সাজাতেও তোদের চেতন হল না রে? রাম, এই সে-দিন তুই খালাস পেয়েছিস্, বোধ হয় গত বছর কার্তিক মাসে,—আর এ হল শ্রাবণ মাস, এরই মধ্যে আবার? রামা, কি বলব তোকে বল্? ছি! ছি! ছি!

রাম মাথা চুলকাইয়া হাসিয়া বলিয়াছিল—ওঃ, বড় রেগেছে মোড়ল। বস— বস। ওরে, তেরে, আন একটা বোতল বার করে আন্।

—না—না—। তোদের যদি আর আমি মুখ দেখি, তবে আমাকে দিব্যি রইল।...তিনকড়ি সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর দিকে ফিরিয়াছিল।

—মোড়ল, যেয়ো না, শোন! এ মোড়ল।

—না, না।

—না নয়, শোন! মোড়ল, ফিরলে না? বেশ, তাহলে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ শেষ।

এবার তিনকড়ি না ফিরিয়া পারে নাই। অত্যন্ত রাগের সঙ্গেই ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিল—কি বলছিস্ শুনি? বলি, বল্‌বি কি? বলবার আছে কি তোর?

রাম বলিয়াছিল—তোমার সর্বস্ব তো জমিদারের সঙ্গে মামলা করে ঘুচাইছ। এখন কার দোরে যাই—কি খাই বল দেখি?

—মরে যা, মরে যা, তোরা মরে যা।

—তার চেয়ে জ্যাল খাটা ভাল।—রামের উচ্চকণ্ঠের হাসিতে দুর্যোগের অন্ধকার রাত্রি শিহরিয়া উঠিয়াছিল।

—তাই বলে ডাকাতি করবি!

রাম আবার খানিকটা হাসিয়া বলিয়াছিল—তা না করে আর কি করব বল ? গোটা ভল্লা-পাড়ায় এক ছটাক ধান নাই কারুর ঘরে। তুমি বরাবর দিয়ে এসেছ —এবার তোমার ঘরেও নাই। গোবিন্দের ঘরে তিন দিন হাঁড়ি চাপে নাই। বেন্দার বেটার বউ বাপের বাড়ী পালিয়েছে ; বলে গিয়েছে—না খেয়ে ভাতারের ঘর করতে লারব। মাথার উপরে চাষের সময়। তোমরা ধর্মঘট জুড়েছ—জমিদারে ধান 'বাড়ি' দেবে না। মহাজনদের কাছে গিয়েছিলাম—তারা বলেছে —জমিদারের খাজনার রসিদ আন, তবে দোব। এখন আমরা করি কি ?

তিনকড়ি এবার আর কথার উত্তর দিতে পারে নাই।

রাম হাসিয়াই বলিয়াছিল—কদিন গেলাম এলাম শিবকালীপুর দিয়ে ; দেখলাম—ছিরু পালের ঘরে ধান-ধন মড়্ মড়্ করছে। আবার কেলে শ্যাখকে পাইক রেখেছে ; বেটা গোঁফে তা দিয়ে লাঠি-হাতে বসে আছে তাই সব আপনার মধ্যে বলাবলি করতে করতে মনে করলাম—দিই, ওই বেটার ঘরই মেরে দি। আমাদেরও পেট ভরুক ; আর ধর্মঘটেরও একটা খতম করে দি।

—তার পর ?—তিনকড়ি এবার ব্যঙ্গপূর্ণ তিরস্কারের সুরে বলিয়াছিল—তার পর ?

—তারপর তুমি সবই জান ! বেটা ঘা খেলে মামলা-মকর্দ্দমা আর করত না, করতে পারত ?

—ওরে শুয়ার, তার যা হত তাই হত। তোদের কি হত একবার বল্ দেখি ?

—সে তখন দেখা যেত।—রাম বেপরোয়ার হাসি হাসিতে লাগিল।

তিনকড়ি এবার গাল দিয়াছিল—শুয়ার, তোরা সব শুয়ার। একবার অখাদ্যি খেলে শুয়ার যেমন জীবনে তার স্বাদ ভুলতে লারে, তোরাও তেমনি শুয়ার, আস্ত শুয়ার।

এবার সকলেই সশব্দে হাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। 'শুয়ার' গাল তিনকড়ির নরম মেজাজের গালাগাল।

রাম বলিয়াছিল—তেরে, তোকে বললাম না একটা বোতল আনতে—হল কি শুনি ?

—না, না, থাক্।…তিনকড়ি বাধা দিয়াছিল।

—থাকবে কেনে ?

—তোদের ঘরে এমন করে ধান ফুরিয়েছে, খেতে পাচ্ছিস্ না, আমাকে বলিস্ নাই কেনে ? সত্যিই গোবিন্দের বাড়ীতে তিন দিন হাঁড়ি চড়ে নাই ?

গোবিন্দ ঝুঁকিয়া দেহখানা অগ্রসর করিয়া তিনকড়ির পায়ে হাত দিয়া বলিয়াছিল—এই তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি।

বৃন্দাবন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিল—বেটার বউটা পালিয়ে গেল মোড়ল ; বেটাকে পাঠিয়েছিলাম আনতে, তা বলেছে—উপোস করে আধপেটা খেয়ে থাকতে লারব। এমন ভাতারের ঘরে আমার কাজ নাই।

তিনকড়িও এবার প্রচণ্ড একটা দীর্ঘ-শ্বাস ফেলিয়াছিল। মনে মনে ধিক্কার দিয়াছিল নিজেকে। একটা পাথরের মোহে সে সব ঘুচাইয়া বসিল! শিব-ঠাকুরকে সে এখন পাথর বলে। যতবার এই পথ দিয়া যায় আসে—শিব-ঠাকুরকে সে আপনার বুড়ো-আঙুল দেখাইয়া যায়। পাথর নয় তো কি ? জমিদার তাহার সম্পত্তির মূল্যের টাকাটা আত্মসাৎ করিল—পাথর তাহার কি করিল ? আর সে গিয়াছিল পাথরের উপর দেউল তুলিতে—তাহারই জমি বিকাইয়া গেল!

নহিলে আজ তাহার ভাবনা কি ছিল ? নিজের পঁচিশ বিঘা জমিতে বিঘা প্রতি চার বিশ হারে একশত বিশ অর্থাৎ আড়াইশো মণ ধান প্রতি বৎসর ঘরে উঠিত। তাহার জমি ডাকিলে সাড়া দেয়—এমন জমি ; শুক-হাজা ছিল না। তাহারই ধানে তখন গোটা ভল্লা-পাড়ার অভাব পূরণ হইত। কুক্ষণে সে দেবোত্তরের টাকা উদ্ধারের জন্য জমিদারের সঙ্গে মামলা জুড়িয়া ছিল। আর, মামলা এক মজার কল বটে! হারিলে তো ফতুর বটেই—জিতিলেও তাই। উকীল-মোক্তার-মুহুরী-আমলা-পেশকার-পেয়াদা—মায় আদালতের সামনের বটগাছটা পর্যন্ত সকলেরই এক রব—টাকা, টাকা, সিকি, সিকি !…বটগাছটার তলায় একটা পাথরে সিঁদুর মাখাইয়া বসিয়া থাকে এক বামুন—মাদুলি বেচে। ওই মাদুলিতে নাকি মামলায় জয় অনিবার্য। যে জেতে সে-ও মাদুলি নেয়, যে হারে সে-ও মাদুলি ধারণ করে। তিনকড়িও একটি মাদুলি লইয়াছিল। প্রতি

মামলার দিন একটি করিয়া পয়সা দিয়া সিঁদুরেরও কৌটাও লইয়াছিল; তবু হারিয়াছে। হারিয়া সে দুরন্ত ক্রোধে বামুনের কাছে গিয়া কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছিল। বামুন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়াছিল—অশুদ্ধ কাপড়ে মাদুলি পরলে কি ফল হয় বাবা? কই, দিব্য করে বল দেখি—অশুদ্ধ কাপড়ে মাদুলি পর নি তুমি?

তিনকড়ি হলফ করিয়া বলিতে পারে নাই। কিন্তু বামুনের ধাপ্পাবাজি সম্বন্ধে তাহার আর সন্দেহ গেল না।

আজ তাহার ঘরে ধান অতি সামান্য। যাহা আছে তাহাতে তাহার সংসারেরই বৎসর—অর্থাৎ নূতন-ধান-উঠা পর্যন্ত—চলিবে না। তাহার উপর আবার মাথার উপর বৃদ্ধির মামলা আসিতেছে। এ মামলা না করিয়া উপায় নাই! জমিদার বলিতেছে—উৎপন্ন ফসলের মূল্য বাড়িয়াছে, সুতরাং আইন অনুসারে সে বৃদ্ধি পাইবেই। প্রজা বলিতেছে—মূল্য যেমন বাড়িয়াছে, চাষের খরচও তেমনি বাড়িয়াছে; তা ছাড়া অনাবৃষ্টি বন্যা প্রভৃতির জন্য ফসল নষ্ট হইতেছে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী, সুতরাং জমিদার বৃদ্ধি তো পাইবেই না, প্রজাই খাজনা কম পাইবে। দুই-ই আছে আইনে ......চুলায় যাক আইন। ভাবিয়াও গোলক-ধাঁধার কূল-কিনারা নাই! যাহা হইবার হইবে। সে নড়িয়া-চড়িয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিয়াছিল—রাম, কাল বিকেলের দিকে যাস্, এক টিন করে ধান দোব। তারপর যা হয় ব্যবস্থা করব।

রাম বলিয়াছিল—দেবো বলছ, দিয়ো। কিন্তু এর পর তুমি নিজে কি করবে?

—তার লেগে এখন থেকে ভেবে কি করবে? যা হয় হবে।

—তবে আমার ধানটা আধা-আধি করে গোবিন্দকে বেন্দাকে দিয়ো।

—কেনে, তোর চাই না?

হাসিয়া রাম বলিয়াছিল—আমার এখন চলবে।

—চলবে? তা হলে তুই বুঝি—

—তোমার দিব্য। এবার জ্যাল থেকে এসে কখনও কিছু করি নাই। খাইবি

বলছি, আগেকার ছিল।

—আগেকার ছিল? আমাকে ন্যাকা পেলি রামা? তিন বছর মেয়াদ খেটে বেরিয়েছিস্ আজ আট-ন'মাস—সেই টাকা এখনও আছে?

—গুরুর দিব্যি। ছেলে-পোতা বাঁশের তালগাছ-তলায় পুঁতে রেখেছিলাম কুড়ি টাকা; বলে গিয়েছিলাম মাগীকে ইশেরাতে যে, যদি খুব অভাব হয় কখনও তবে আষাঢ় মাসে অংশনের কলে যখন দশটার ভোঁ বাজবে, বাঁধের একানে তালগাছটার মাথা খুঁজে দেখিস্। নেহাৎ বোকা, তালগাছে উঠে মাথা খুঁজেছে। আষাঢ় মাসে দশটার ভোঁ বাজলে—গাছের মাথার ছায়াটা যেখানে পড়েছিল—ঠিক সেইখানে পুঁতেছিলাম। বুঝতে পারে নাই। আষাঢ় মাসে সেদিন খুঁড়ে দেখলাম ঠিক আছে, আমার এখন চলবে কিছুদিন।

তিনকড়ি এবার খুশি না হইয়া পারে নাই। বলিয়াছিল—তুমি চোরা ভাই একটি বাস্তুঘুঘু!—বলিয়া সে উঠিয়াছিল, আসিবার সময়েও বলিয়াছিল—তুই কাল যাস্—গোবিন্দ, বেন্দা, তেরে—যাস্ কাল বিকেলে। কিন্তু—খবরদার! এসব আর লয়। ভাল হবে না আমার সঙ্গে।

আজ তিনকড়ি কঙ্কণার মাঠে হঠাৎ ছিদামকে পাইয়া গেল। সকালে তিনকড়িকে সে নিজ-গ্রামের মাঠে চাষ করিতে দেখিয়া মহুগ্রাম, শিবকালীপুর, কুসুমপুর পার হইয়া কঙ্কণার দিকে আসিয়াছিল মজুরীর সন্ধানে। কঙ্কণা ভদ্রলোক-প্রধান গ্রাম। তাহারা কেবল জমির মালিক। অনেকে ঘরে হাল, বলদ ও কুষাণ রাখিয়া চাষ করায়, অনেকে আশপাশের গ্রামের চাষীকে জমি বর্গা-ভাগে দিয়া থাকে। চাষ করিয়া ধান কাটিয়া চাষী ঘাড়ে করিয়া বহিয়া বাবুদের ঘরে মজুত করে, অর্ধেক ভাগ মালিক পায়, অর্ধেক পায় চাষী। এমনি এক বর্গায়েৎ-চাষীর কাছে ছিদাম জন খাটিতেছিল। এমন সময় তিনকড়ি সেখানে আবির্ভূত হইল।

তাহার গরুর পালের মধ্যে একটা অত্যন্ত বদ্ স্বভাবের বক্‌না আছে। সেটা সমস্তদিন বেশ শান্ত-শিষ্ট থাকে, কিন্তু সন্ধ্যায় গোয়ালে পুরিবার সময় হইবামাত্র লেজ তুলিয়া হঠাৎ ঘোড়ার ছাওক চালের মত চালে—চার পায়ে লাফ দিয়া ছুটিয়া

পালায়। সমস্ত রাত্রি স্বেচ্ছামত বিচরণ করিয়া আবার ভোরবেলা গৃহে ফিরিয়া শিষ্টভাবে শুইয়া পড়ে অথবা দাঁড়াইয়া রোমন্থন করে। কিন্তু কাল সন্ধ্যায় পলাইয়াও সে আজ পর্যন্ত ফেরে নেই। এটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার। জলখাবার বেলার সময় সে খবর পাইয়াছে সেটা নাকি কঙ্কণার বাবুদের বাড়ীতে বাঁধা পড়িয়াছে। ফুলগাছ খাওয়ার জন্য তাহারা গরুটাকে নাকি এমন প্রহার দিয়াছে যে, চার-পাঁচ জায়গায় চামড়া ফাটিয়া রক্ত পড়িয়াছে ; তিনকড়ি সঙ্গে সঙ্গে চাষ ছাড়িয়া পাচন হাতে কঙ্কণায় চলিয়াছে। হঠাৎ তাহার নজরে পড়িয়া গেল ছিদাম। পলাইবার আর পথ ছিল না। একে বাবুদের উপর রাগে সে গর্-গর্ করিতেছিল, তাহার উপর অপরাধী ছিদামকে কাল রাত্রে ডাকিয়া বাড়ীতে পায় নাই ; কাজেই ছিদাম ভয়ে-ভয়ে কাছে আসিতেই সে তাহার পিঠে হাতের পাচন-লাঠিটা বেশ প্রচণ্ড বেগেই ঝাড়িয়া দিল—হারামজাদা !

ছিদাম দুই হাতে তাহার পা দুইটা ধরিল। মুখে যন্ত্রণাসূচক এতটুকু শব্দ করিল না বা কোন প্রতিবাদ করিল না।

তিনকড়ি আরও এক লাঠি ঝাড়িয়া দিল—পাজী শুয়ার !

ঠিক এই সময়ে শ্রীহরি ঘোষের গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল।...

ছোঁড়াটাকে খানিকটা দূর সঙ্গে আনিয়া সে সহসা তাহার কব্জিটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—ছাড়িয়ে নে দেখি।

ছিদাম অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

ধমক দিয়া তিনকড়ি বলিল—নে, ছাড়িয়ে নে, দেখি। হারামজাদা, শুয়ার, তুমি যে রামা ভল্লার সঙ্গে রাত্রে বের হতে শিখেছ, কত জোর হয়েছে বেটার দেখি। নে, ছাড়িয়ে নে।

ছোড়াটার মুখে সপ্রতিভ হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিল—তাই পারি ?

—তবে শুয়ারের ব চ্চা ?

—কি করব বলেন ?...ছিদাম এবার বলিল—ঘরে খেতে নাই। পাঁইটে পালের চাল উঠিয়ে দিয়েছে লোকে। তা ছাড়া—মা বিয়ের সম্বন্ধ করছে, টাকা লাগবে। বললাম রাম কাকাকে, তা রাম কাকা বললে—কি আর করবি,

আমাদের সঙ্গে বেরুতে শেখ্।

—হুঁ। তিনকড়ি এবার তাহার হাতখানা ছাড়িয়া দিল।

ওদিক হইতে কে হাঁকিতেছে—হো—ই। হো—ই। ও তিনু—ভা—ই!

কে? তিনকড়ি ও ছিদাম চাহিয়া দেখিল, রাস্তার মাঝখানের সেই নালাটায় একখানা গাড়ী পড়িয়াছে, শিবপুরের দোকানী বৃন্দাবন দত্ত হাঁকিতেছে। তাহারা দুজনেই দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গেল। বোঝাই গাড়ীখানার চাকা দুইটা কাদায় বসিয়া গিয়াছে। বৃন্দাবন জংশন হইতে মাল লইয়া আসিতেছে। পনের-ষোল মণ মাল, গরু দুইটা বুড়া—একটা তো কাদায় বসিয়া পড়িয়াছে। তিনকড়ি বৃন্দাবনের উপর ভয়ানক চটিয়া গেল। বলিল—খুব ব্যবসা করতে শিখেছ যা হোক। বেনেরা যে হাড়কিপ্পিন—তা তুমিই দেখালে দত্ত। এই বুড়ো গরু দুটোকে বাদ দিয়ে দুটো ভাল গরু কিনতে পার না? না—টাকা লাগবে?

দত্ত বলিল—কিনব রে কিনব। নে—নে, এখন একবার ধর্ ভাই ওরে—কি নাম তোর—ওরে বাবা—তুই বরং ওই গরুটির জায়গায় জোয়ালটা ধর্। হারামজাদা গরু এমন বজ্জাত—কাদায় শুয়েছে দেখ না। বেটার খাওয়া যদি দেখিস্! নে নে বাবা! ওই ভাই তিনু।

বিরক্তির সঙ্গেই তিনু বলিল—ধর্ ছিদেম, ধর্? জোয়াল ধরতে পারবি তুই? তুই বরং চাকাতে হাত দে।

—না, আজ্ঞে আপনি চাকাতে ধরেন।—বলিয়া ছিদাম হাত ভাঁজিয়া সেই হাতের ভাঁজে বোঝাই গাড়ীর জোয়াল তুলিয়া বুক দিয়া ঠেলিতে আরম্ভ করিল। তিনকড়ি অবাক হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে ছিদামের চেহারা যেন পাথরের চেহারা হইয়া উঠিল। নিজে সে চাকা ঠেলিতে গিয়া বুঝিল—কি প্রচণ্ড শক্তিতে ছিদাম আকর্ষণ করিতেছে। অথচ ঠেলিতেছে খাড়া সোজা হইয়া, পায়ের গোড়ালী হইতে মাথা পর্যন্ত যেন একখানা পাকা বাঁশের খুঁটির মত সোজা। ওপাশে ঠেলিতেছে—গরু, গাড়োয়ান এবং দত্ত স্বয়ং। তবুও এই দিকটাই আগে উঠিল।

দত্ত ট্যাঁক হইতে দুটি পয়সা বাহির করিয়া ছিদামের হাতে দিল, বলিল—

একদিন আসিস্—বাড়ী থেকে চারটি মুড়ি নিয়ে যাস্।

তিনকড়ি ছিদামের হাত হইতে পয়সা দুইটা কাড়িয়া লইয়া দত্তের দিকে ছুঁড়িয়া দিল। ছিদামকে বলিল—বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করিস্। আর খবরদার, ওই কিপ্‌টের দুটো পয়সা নিবি না।

হন্ হন্ করিয়া পথ চলিতে চলিতে সে ছিদামের কথাই ভাবিতেছিল, ছোঁড়া যদি পেট পুরিয়া খাইতে পাইত, তবে সত্যই একটা অসুর হইত।

কথায় আছে "একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর"। গরুটাকে প্রহার করা এবং আটকাইয়া রাখার জন্য ঝগড়া করিতে তিনকড়ি একাই একশ' ছিল, আবার হঠাৎ পথে রহমও তাহার সঙ্গে জুটিয়া গেল।

রহম ফিরিতেছিল জংশন হইতে। শ্রাবণের রৌদ্রে এক গা ঘামিয়া—কাঁধের চাদরখানা দিয়া বাতাস দিতেছিল আপনার গায়ে। তিনকড়ির একেবারে খাঁটি মাঠের পোশাক;—পরনে পাঁচহাতি মোটা সুতার কাপড, সর্বাঙ্গে কাদা তো ছিলই, তাহার উপর দত্তের গাড়ীর চাকা ঠেলিয়া দেহখানা হইয়া উঠিয়াছে পঙ্কপল্বলাচারী মহিষের মত—হাতে পাচনী।

রহমই বলিল—ওই, তিনু-ভাই, এমন কর‍্যা কুথাকে যাবা হে? এক্কারে মাঠ থেকে মালুম হচ্ছে?

তিনকড়ি বলিল—যাব কঙ্কনায়। বাবু-বেটাদের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। আমার একটা বকনাকে বেটারা নাকি মেরে খুন করে ফেলাছে।

—খুন করে ফেলাছে!—রহম উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

—বাবুদের ফুলের গাছ খেয়েছে। ফুলের মালা পরবে বেটারা! তাই বলি দেখে আসি একবার।

—চল। আমিও যাব তুমার সাথে। চল।

এতক্ষণে তিনকড়ি প্রশ্ন করিল—তুমি আজ হাল জুড়লে না?

চাষের সময় চাষী হাল জুড়ে নাই—এ একটা বিস্ময়ের কথা। এখন একটা দিনের দাম কত! একই জমিতে আজিকার পোঁতা ধানের গুচ্ছ আগামী কালের

পোঁতা গুচ্ছ হইতে অন্তত বিশ-পচিশটা ধান বেশী ফলন দিবে।

রহম বলিল—আর বুলিস্ কেনে ভাই! আল্লার দুনিয়া শয়তানে দখল করা্যা নিলে। "যে করবে ধরম-করম—তার মাথাতেই বাঁশ মারণ"। চাষের সময় ঘরে ধান ফুরাল্ছে, যা আছে শাঙনটা চলবে টেনে-ছেঁচিড়ে। ইহার উপর পরব এসেছে। খরচ আছে। ছেলে-পিলাকে কাপড়-পিরানটা দিতে হবে। মেয়ে-গুলিকে দিতে হবে। 'ক কার বল! তাই গেছিলাম সন্ধ্যায়।

তিনকড়ি বলিল—হ্যাঁ, তোমাদের রোজা চলছে বটে। একমাস রোজা, নয়?

—হ্যাঁ ভামাম্ রমজানের মাস। মাঝে পুন্নিমে যাবে—তা বাদে অমাবস্তে। অমাবস্তের পর চাঁদ দেখা যাবে, রোজা ঠাণ্ডা হবে! ইদল্‌ফেতর পরব।

তিনকড়ি এ পর্বের কথা জানে, তাই বলিল—এ তো তোমাদের মস্ত বড় পরব।

—হ্যাঁ। ইদল্‌ফেতর বড় পরব। খানা পিনা আছে, গরীব-দুঃখীকে খয়রাৎ করতে হয়, সাধু-ফকীর-মেহমানদের খাওয়াতে হয়। অনেক খরচ ভাই তিনকড়ি। অথচ দেখ কেনে—অভদ্রা বর্ষাকাল—ঘরে ধান নাই, হাতে পয়সা নাই।

তিনকড়ি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ওকথা আর বল কেনে রহম ভাই, চাকলার লোকের ও এক অবস্থা। কারুর ঘরে খাবার নাই। জমিদার ধান দেবে না। বলে, বৃদ্ধি দিলে তবে দেবে। মহাজন বলছে—জমির খাজনার হাল-ফিল্ রসিদ আন, পাকা খত লেখ।

—আমাদের আবার ইয়ার উপরে পরব।

তিনকড়ি একথার কি উত্তর দিবে, সে নীরবেই পথ চলিতে আরম্ভ করিল।

রহম বলিল—তুদের পরবগুলা কিন্তুক বেশ ধান-পানের মুখে। দুগ্‌গা পূজা সেই ঠিক আশ্বিনে হবেই। আমাদের মাসগুলান পিছায়ে পিছায়ে বড় গোল বাধায়।

তিনকড়ি বলিল—হ্যাঁ, তোমাদের মাসগুলান্ পিছিয়ে পিছিয়ে যায় বটে।

—হু। বড় পেঁচ্ ভাই। এক-এক বছর এমন দুখ হয় তিনকড়ি, কি বুলব? এই দেখ, আমার যা কিছু দেনা তার অর্ধেক পরবের দেনা। মান-ইজ্জৎ আছে,

ইদল্‌ফেতর—মহরম—ই দুটি পরবে দশ টাকা খরচ না করলে—মানবে কেনে লোকে?

তিনকড়ি বলিল—তা বটে হ্যাঁ! আমাদের দুগ্‌গা-পুজো কালীপুজোতে খরচা না করলে চলে? যে যেমন—তেমনি খরচ করতে তো হবেই।

অভাবের দুঃখের কথা বলিতে বলিতে দুইজনেরই মন কেমন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কঙ্কণার বাবুদের বাড়ীতে তাহারা যখন গিয়া দাঁড়াইল, তখন সেই ভারাক্রান্ত মনের কারণেই রাম-সুগ্রীবের মত প্রথমেই একটা লঙ্কাকাণ্ড বাধাইয়া বসিল না। সামনে যে চাকরটা ছিল তাহাকে বলিল—তোমাদের বাবু কোথা? বল—দেখুড়ের তিনকড়ি মোড়ল এসেছে। ক্রোধোন্মত্ততা না থাকিলেও বেশ গম্ভীরভাবেই কথাটা সে বলিল।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন—বাড়ীর মালিক—তরুণ একটি ভদ্রলোক। তিনি বেশ মিষ্ট কথাতেই বলিলেন—তুমিই তিনকড়ি মোড়ল?

—হ্যাঁ। আমার গরু আপনি মেরে জখম করেছেন কেন? ধরেই বা রেখেছেন কোন্ আইনে?—তিনকড়ি কিছু কিছু করিয়া মনে উত্তাপ সঞ্চয় করিতেছিল।

রহম বলিল—গরুটাকে মেরে জখম কর‍্যা খুন বার কর‍্যা দিছ শুনলাম? হিন্দু—বেরাহ্মন্ তুমি?

ভদ্রলোকটি সবিনয়ে বলিলেন—দেখ, আমি দোষ স্বীকার করছি। তবে এইটুকু বিশ্বাস কর—আমার হুকুমে হয় নি ব্যাপারটা। একজন নতুন হিন্দুস্থানী মালী রাগের বশে করে ফেলেছে, আমি তাকে জবাবও দিয়েছি।

তিনকড়ি রহম দুজনেই অবাক হইয়া গেল। কঙ্কণার ভদ্রলোক এমন মোলায়েম ভদ্রভাবে চাষীর সঙ্গে কথা কয়—এ তাহাদের বড় আশ্চর্য মনে হইল।

ভদ্রলোকটি আবার বলিলেন—দেখ গরুটি জখম হয়েছিল; যদি আমার ইচ্ছে থাকত ব্যাপারটা স্বীকার না করার, তাহলে গরুটাকে ওই অবস্থাতেই তাড়িয়ে দিতাম—বেঁধে রেখে সেবা-যত্ন করতাম না।

সত্য সত্যই গরুটির যথাসাধ্য যত্ন লওয়া হইয়াছে। রক্তপাত হইয়াছিল একটা

শিঙ্ ভাঙিয়া। ঔষধ দিয়া কাপড় জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে আহত স্থানটি; ডাবাটায় তখনও মাড়, ভুষি, খইলের অবশেষ রহিয়াছে। দেখিয়া তিনকড়ি এবং রহম দুজনেই খুশী হইল। ইহার জন্য আর কোন কটু কথাও তাহারা বলিতে পারিল না।

ভদ্রলোকটি অনুরোধ করিয়া বলিলেন—মুখ-হাত ধুয়ে একটু জল খেয়ে যাও।

তিনকড়ি অনুরোধ ঠেলিতে পারিল না; রহম হাসিয়া বলিল—আমার রোজা।

তিনকড়ি প্রশ্ন করিল—আপনারা তো কলকাতায় থাকেন?

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন—হ্যাঁ—।

রহম মাথা নাড়িয়া বলিল—হুঁ!—অর্থাৎ ব্যবহারটা সেইজন্যেই এমন।

তিনকড়ি বাতাসা চিবাইয়া জল খাইয়া বলিল—কবে এলেন দেশে?

—দিন পাঁচেক হল।

—এখন থাকবেন?

—না:। ধান বেচতে এসেছি, ধান বেচা হয়ে গেলেই চলে যাব।

—ধান বেচবেন? বেচে দেবেন?

—হ্যাঁ—দরটা এই সময়ে উঠেছে, বেচে দেব। আমরা কলকাতায় থাকি। সেখানে চাল কিনে খাই। এখানে মজুত রেখে কি করব? প্রতি বৎসরই আমরা বেচে দিই।

—বেচে দেন? তা—তিনকড়ি কথা শেষ করিতে পারিল না।

রহম বলিল—তা আমাদিগে দাদন দেন না কেনে? ধান উঠলে 'বাড়ি' সমেত শোধ দিব।

তিনকড়ি বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ! শুধু আমরা কেনে—এ চাকলাটা তা হলে খেয়ে বাঁচবে; দু হাত তুলে আপনাকে আশীর্বাদ করবে।

বাবু হাসিয়া বলিলেন—না বাবু, ও-সব ফেসাদের মধ্যে নেই আমি।

ব্যগ্রভাবে রহম বলিল—একটি ছটাক ধান আপনার ডুববে না।

—না। আমি কারুর উপকার করতেও চাই না, সুদেও আমার দরকার নেই।

রহম বলিল—শুনেন, বাবু শুনেন—

তাহার কথা সমাপ্ত হইবার পূর্বেই ভদ্রলোক ঘরে ঢুকিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন—না-না। এসবের মধ্যে আমি নেই!

তাহারা অবাক হইয়া গিয়াছিল। এ ধারার মানুষের সঙ্গে তাহাদের পরিচয় নাই। এ দেশের সুদখোর মহাজনকে তাহারা বুঝে, অত্যাচারী জমিদারকেও জানে, কিন্তু শহরবাসী এই শ্রেণীর মানুষ তাহাদের কাছে দুর্বোধ্য। সুদও লইবে না, উপকারও করিতে চায় না। ইহাকে তাহারা বলিবে কি? ভাল না মন্দ? কঙ্কণায় এই শ্রেণীর লোক নেহাত কম নয়, তাহাদের সহিত ইহার পূর্বে এমন ভাবে তিনকড়ি-রহমের পরিচয় হয় নাই। ইহারা ধান এমনি করিয়াই বৎসর বৎসর বিক্রয় করিয়া দিয়া যায়।

তিনকড়ি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ওই ধরনের মানুষ—ভালতেও নাই, মন্দতেও নাই।

রহম বুঝিতে পারিল না এই লোকটি সম্বন্ধে কি মন্তব্য করা উচিত। গরু জখম করার অপরাধে মালীকে বরখাস্ত করে, ধনী ভদ্রলোক হইয়া চাষীদের কাছে দোষ স্বীকার করে; অথচ এত ধান থাকিতেও লোককে দিতে চায় না, সুদের প্রলোভন নাই!—এ লোককে কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া সে বলিল—মরুক গে! লে আয়, ঘর আয়। আমাদের আবার ইরসাদের বাড়ীতে মজলিশ হবে, পা চালিয়ে চল ভাই।

—মজলিশ! সেদিন শুনলাম—দেবু পণ্ডিত এসেছিল, মজলিশ হয়েছিল তোমাদের। আবার মজলিশ? ধর্মঘটের নাকি?

—ইবার মজলিশ—প্যাটের। ধানের ব্যবস্থা চাই তো। দৌলত ছিরুর সঙ্গে ভিতরে ভিতরে কয়সালা করেছে। সঙ্গে সঙ্গে ধুয়া ধরেছে—ধান দিবে না। তাই একটা ব্যবস্থা করতে হবে। ইদিকে মাথার উপর পরব!

—তবে তুমি সকাল বেলায় গিয়েছিলে কোথা?

—জংসনে। মজলিশের লেগ্যা তো একবেলার বাদে চাষ কামাই হবেই। তাই গিয়েছিলাম জংশনে। মিলওয়ালা কলকাতার বাবু ঘর বানাইছে, তা ভাল

তালগাছ খুঁজছে। সেই ধন্ধে গেছিলাম। ওই যি—মাঠের মধ্যি হাঁড়া গাছটা। বাবার হাতের গাছ—ওটাই দিব বললাম।

দূর হইতে আজানের শব্দ আসিতেছিল। রহম ব্যস্ত হইয়া বলিল—তু আয় ভাই আমি যাই। জুম্মার নামাজ আজ।

ইরসাদের বাড়ীতে মজলিশ বসিয়াছিল। সমগ্র মুসলমান চাষী সম্প্রদায়ই আসিয়া জুটিয়াছে। সকলের মুখেই চিন্তার ছাপ। ঘরে সকলেরই ধান নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে। আউশ ধান উঠিতে এখনও পুরা দুইটা মাস। দুই মাসের খাদ্য চাই। খাদ্যের সন্ধানে ঘুরিবারও অবকাশ নাই। মাঠে জল থৈ-থৈ করিতেছে, চাষের সময় বহিয়া যাইতেছে। জলের তলায় সার-খাওয়া চষা-মাটি গলিয়া ঘষা-চন্দনের মত হইয়া উঠিয়াছে, গোটা মাঠময় উঠিতেছে সোঁদা সোঁদা গন্ধ। বীজ-ধানের চারাগুলি প্রতিদিন এখন আঙুলের এক পর্বের সমান বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন কি চাষীর বসিয়া থাকিবার সময়?

তিনকড়িও গরুটাকে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া মজলিশের অদূরে বসিল। তাহাকে আবার এইভাবে ধানের জন্য ঘুরিতে হইবে। চাষ বন্ধ থাকিবে। শ্রাবণের দশদিন পার হইয়া গেল। চাষ করিবার সময় অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে। "শাওনের পুরো, ভাদ্রের বারো, এর মধ্যে যত পারো।" পুরা শ্রাবণ মাসটাই চাষের সেরা সময়—ও দিকে ভাদ্রের বারো দিন পর্যন্ত কোন রকমে চলে। তাহার পর চাষ করা আর বেগার খাটা সমান। "থোড় তিরিশে, ফুলোয় বিশে, থোড়া মুখ তের দিন জান, বুঝে কাট ধান।" আশ্বিনের তিরিশে ধানের চারাগুলি বৃদ্ধি একেবারে শেষ হইয়া যাইবে, ভিতরে শস্য-শীষ সম্পূর্ণ হইয়া কুড়ি দিনের মধ্যেই সেগুলি বাহির হইয়া পড়িবে। তারপর ধানগুলি পরিপুষ্ট হইতে লাগে তের দিন। ধানগাছগুলির বৃদ্ধি তিরিশে আশ্বিনের মধ্যেই শেষ; এখন এক-একটা দিনের দাম যে লক্ষ টাকা!

বিপদটা এবার তাহাদের চেয়েও রহম ভাইদের বেশী। ঘরে খাবার নাই, ভরা চাষের সময়, তাহার উপর তাহাদের পরব লাগিয়াছে। আশ্বিনের প্রথমে যেবার

দুর্গাপূজা হয়—সেবার তাহাদের যে নাকাল হয় সে কথা বলিবার নয়। তবু তো তখন কিছু কিছু আউশ উঠিয়া থাকে। তিনকড়ি মনে মনে বলিল—হায় ভগবান, এমনি করেই কি পাল-পার্বণের দিন করতে হয়! মুসলমান সম্প্রদায়ের এই চাষীশ্রেণীর মানুষগুলি তাহাদের পবিত্র 'ঈদল্‌ফেতর' পর্বের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সত্ত্বেও উৎসাহ বোধ করিতে পারিতেছে না, সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে।

চান্দ্র বৎসর গণনায় ইসলামীয় পর্বগুলি নির্ধারিত হয় বলিয়া—সৌর প্রভাবে আবর্তিত ঋতুচক্রের সঙ্গে পর্বগুলির কোন সম্বন্ধ নাই। আরব দেশে উদ্ভূত ইসলামীয় ধর্মে চান্দ্রমাস গণনায় কোন অসুবিধা ছিল না। উত্তপ্ত মরুভূমিতে সৌর সম্বন্ধ বর্জন করিয়া সুস্নিগ্ধ চন্দ্রালোকের মধ্যে জীবন ভালবাসিত করিয়াছে বেশী। মানুষের অর্থনৈতিক সঙ্গতির উপর পক্ষপাত অনাবৃত-পাহাড়ে ঘেরা, বালু-কঙ্কর-প্রস্তরপ্রধান মৃত্তিকাময় আরবে কৃষির প্রাধান্য—এমন কি প্রভাব, মোটেই নাই। সুতরাং অগ্নিবর্ষী সূর্য এবং বৈচিত্র্যহীন ঋতুচক্রের সঙ্গে সম্বন্ধহীন বর্ষ-গণনায় কোন অসুবিধা হয় নাই। প্রখরতম গ্রীষ্মের মধ্যে কয়েক দিনের জন্য স্বল্প কয়েক পশলা বর্ষণ আর কয়েক দিনের কুয়াশায় শীতের আবির্ভাব জীবনে ঋতু-মাধুর্যের এবং সম্পদের কোন প্রভাব আনিতে পারে না—ইহা স্বাভাবিক। একমাত্র ফল-সম্পদ খেজুর; সে সারা বৎসরই থাকে শুকাইয়া। খাদ্য-ব্যবস্থায় সেখানে শস্যের অপেক্ষা মাংসের স্থান অধিক; আবার খাদ্যোপযোগী পশুর জীবনের সঙ্গেও ঋতুচক্রের কোন সম্বন্ধ নেই। সেখানে চান্দ্র-গণনায় মাস পিছাইয়া যায়, কিন্তু তাহাতে আর্থিক সঙ্গতির তারতম্য হয় না; সেখানে পর্বগুলি চন্দ্রালোকের স্নিগ্ধ রশ্মির মধ্যে তারতম্যহীন সমারোহে প্রাণের উচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠে। কিন্তু কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে কৃষির উপর পূর্ণ-নির্ভরশীল মুসলমান চাষী সম্প্রদায় স্থানোপযোগী বর্ষ গণনার অসঙ্গতিতে মহা অসুবিধায় পড়িয়াছে। অগ্রহায়ণ-পৌষ-মাঘ-ফাল্গুনে যখন ঈদল্‌ফেতর মহরম হয়, তখন তাহারা যে আনন্দোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—সেও খানিকটা আতিশয্যময়। আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্রে নিষ্ঠুর অভাবের মধ্যে—চাষের অবসরহীন কর্মব্যস্ততার মধ্যে পর্বগুলি ম্রিয়মাণ হইয়া চলিয়া যায়—পৌষ মাঘের উচ্ছ্বাসের আতিশয্য তাহারই খানিকটা প্রতিক্রিয়ার ফলও বটে। এবার

'রমজান' মাস পড়িয়াছে শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষে, শেষ হইবে ভাদ্রের শুক্লপক্ষের প্রারম্ভে। এদিকে ভরা চাষের সময়, চাষীর ঘরে পৌষের সঞ্চিত খাদ্য শেষ হইয়া আসিয়াছে, ওদিকে জমিদারের সঙ্গে খাজনা-বৃদ্ধি লইয়া বিরোধ বাধিয়াছে, তাহার উপর ঈদল্‌ফেতর পর্ব। পর্বের দিন দান-খয়রাত করিতে হয়, সাধু-সজ্জন-আত্মীয়দিগকে আহারে পরিতৃপ্ত করিতে হয়, ছেলে-মেয়েদের নূতন কাপড়-পোশাক চাই; জরীর টুপি, রঙীন জামা, নক্সীপাড় কাপড়, বাহারে একখানা রুমাল পাইয়া কচি মুখগুলি হাসিতে ভরিয়া উঠিবে—তবে তো। তবে তো পর্ব সার্থক হইবে, জীবন সার্থক হইবে!

মক্তবের মৌলবী ইরসাদ মিয়া ইহাদের নেতা! সে ভাবিতেছিল—এতগুলি লোকের কি উপায় হইবে? মধ্যে মধ্যে সে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কথা ভাবিতেছিল।

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক! এখানকার কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান—কঙ্কণার লক্ষপতি মুখুয্যেবাবুর বড় ছেলে, সেক্রেটারীও কঙ্কণার অন্য বাবুদের একজন। তাহাদের গ্রামের চামড়ার ব্যবসায়ী ধনী দৌলত হাজী, শিবকালীপুরের শ্রীহরি ঘোষ—ইহার মেম্বার।

ইরসাদ তবুও বলিল—দেখি একখানা দরখাস্ত করে।

রহম বলিল—শুন, ইরসাদ বাপ—ই-দিকে শুন একবার।

রহম একটা কথা ফিসফিস করিয়া বলিতে ভুলে নাই। আপনাদের কথা ভাবিয়াই কথাটা বলিয়াছে নাকি। ওপারের জংশনের কলওয়ালা শিবকালীপুরের বাবুটি বলিয়াছে—টাকা ধার দেবে সে। কিন্তু আমার সঙ্গে পাকা এগ্রিমেন্ট করতে হবে—যারা টাকা নেবে, তাদের আমার টাকার পরিমাণের ধান আগে শোধ করতে হবে। আর আমি যখন অসময়ে টাকা দেব, তখন কবুল করে বলতে হবে তোমাদের, যখন যা ধান বেচবে আমাকেই বেচবে।

—দর?

—সি বাপ তুমি না হলে হবে না। পাঁচ জনাকে নিয়া একদিন চল সাঁঝবেলাতেই যাই।

কিছুক্ষণের মধ্যে কথাটা কানাকানি হইতে আরম্ভ করিল। তিনকড়ি শুনিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে সেও উঠিল।

ওই সংবাদটা পাইয়াই সে বাড়ী ফিরিল বেশ খুশী মনে। যাক, উপায় তাহা হইলে একটা মিলিয়াছে। দাদন মিলিলে আর চাই কি? সোনাফলানো জমি, তাহার হাতের চাষ, ভাবনা কি তাহার? উঃ নিজের সব জমি আজ যদি তাহার থাকিত! পাথরের দায়ে সর্বস্ব গেল। যাক! আবার সে সব গড়িয়া তুলিবে। এবারেই সে কয়েকজন ভদ্রলোকের জমি ভাগে লইয়াছে। কাত্তিকে নদী নামিয়া গেলে এবার বাপ-বেটায় মিলিয়া ময়ূরাক্ষীর চরের জায়গাটা বেশ করিয়া কাটিয়া দস্তুরমত জমি করিয়া ফেলিবে। অগ্রিম আলু, কপি, মটরশুঁটির চাষ করিবে। টাকা একদফা তাহাকে উপার্জন করিতেই হইবে। গৌরকে সে দিয়া যাইবে কি? গৌরের চেয়েও ভাবনা তার স্বর্ণ মায়ের জন্য। সোনার প্রতিমা মেয়ে, স্বর্ণময়ী নাম তো সে মিথ্যা দেয় নাই। তাহারই ভাগ্যে মেয়েটা সাত বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছে। উহার একটা উপায় করিতে হইবে। তাহার জন্য কিছু জমি পাকাপাকিভাবে লেখা-পড়া করিয়া দেওয়া তাহার সব চেয়ে বড় কাজ।

বাড়ীতে ফিরিতেই স্বর্ণ তাহাকে তিরস্কার করিল—বাবা, এ তোমার ভারি অন্যায় কিন্তু। মাঠে হাল-গরু রেখে—ওই ছেঁড়া কাপড় পরে তুমি কলকাতা চলে গেলে! বেলা গড়িয়ে গেল খাওয়া নাই দাওয়া নাই—

হা-হা করিয়া হাসিয়া তিনকড়ি বলিল—ওরে বাপরে, বুড়ো মা হলি দেখছি।

—বাবুদের সঙ্গে ঝগড়া করে এলে তো?

—না রে না। লোকটি ইদিকে ভাল! কলকাতায় থাকে তো! মিষ্টি করেই বললে—অন্যায় হয়ে গিয়েছে। গরুটাকে খুব যত্ন করেছে। আমাকে জল খেতে দিলে। তবে টাকা ছাড়া আর কিছু চেনে না। উঃ, ওদের ধান কত স্বর! সব ধান বেচে দেবে!

স্বর্ণ চুপ করিয়া রহিল; আপনার ধান সে যদি বেচিয়া দেয়, তবে তাহার কি বলিবার আছে? তাহাদের নাই—কিন্তু তাহাতে সে বাবুর কি?

স্বর্ণের মা বলিল—ওগো, শিবকালীপুরের দেবু পণ্ডিত এসেছিল।

—দেবু পণ্ডিত ?

—হ্যাঁ।

—কেনে ? কিছু বলে গিয়েছে ?

—আমি তো কথা বলি নাই। স্বন্ন কথা বললে। কি বলেছে বল্ না স্বন্ন !

স্বর্ণ বলিল—বলে গিয়েছে, আবার আসবে, সে কথা তোমাকেই বলবে।

মা বলিল—তবে যে অনেকক্ষণ কথা বললি লো ?

স্বর্ণ আবার সলজ্জভাবে হাসিয়া বলিল—আমাকে পড়ার কথা বলছিল।

তিনকড়ি উৎসাহিত হইয়া উঠিল।—পড়ার কথা ? তোকে পড়া ধরেছিল নাকি ? বলতে পেরেছিলি ?

সলজ্জভাবে ঘাড় নাড়িয়া নীরবে স্বর্ণ জানাইল—সব বলিতে পারিয়াছে সে। তারপর বলিল—আমাকে বলছিল ইউ পি বৃত্তি পরীক্ষা দাও না কেনে তুমি ?

—তা দে না কেনে তুই স্বন্ন।—তিনকড়ির উৎসাহের আর সীমা রহিল না। কঙ্কণার মেয়ে-ইস্কুলে বাবুদের মেয়েরা পড়ে, স্বর্ণও পড়ুক না কেন ! ভাল, দেবু তো আসিবেই বলিয়াছে, তাহার সঙ্গেই সে পরামর্শ করিবে।

নয়

আগামী কল্য ঝুলনযাত্রা আরম্ভ। আজ শ্রাবণের শুক্লা দশমী তিথি, কাল একাদশী। একাদশীতে আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমায় বিষ্ণুর দ্বাদশযাত্রার অন্যতম "হিন্দোল-যাত্রা' শেষ হইবে। সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীতে ঝুলনের বিশেষ উৎসব নাই। শুধু পূর্ণিমার দিন হল-কর্ষণ নিষিদ্ধ। আকাশে আবার মেঘ জমিয়াছে। গরমও খুব। বর্ষণ হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে। এবার বর্ষণ শুক্লপক্ষে। বাংলার চাষীদের এদিকে দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ। আষাঢ় মাস হইতেই তাহারা লক্ষ্য করে, বর্ষণ এ বৎসর কোন্ পক্ষে। প্রতি বৎসরই বর্ষণের একটা নির্দিষ্ট সময় পরিলক্ষিত হয়। যেবার কৃষ্ণপক্ষে বর্ষণ হয়, সেবার কৃষ্ণপক্ষের মাঝামাঝি আরম্ভ হইয়া পূর্ণাতিথিতে অর্থাৎ অমাবস্যায় প্রবল বর্ষণ হইয়া যায়। আর শুক্লপক্ষের প্রথম

কয়েকদিন মৃদু বর্ষণের পর আকাশের মেঘ কাটে, দশ-পনরো বা আঠারো দিন অ-বর্ষণের পর আবার ঘটা করিয়া বর্ষা নামে! অতিবৃষ্টিতে অবশ্য ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়, কারণ ও দুইটাও ঋতুচক্রের প্রাকৃতিক গতির অস্বাভাবিক অবস্থা, নিয়মের মধ্যে অনিয়ম—ব্যতিক্রম।

এবার বর্ষা নামিয়াছে শুক্লপক্ষে। দশমীতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, দুই-চারি ফোঁটা বৃষ্টিও হইতেছে, পূর্ণিমায় প্রবল বর্ষণ হইবে হয়তো, বর্ষা এবার কিছু প্রবল হইলেও মোটের ওপর ভালই বলিতে হইবে। শ্রাবণ মাসে জলে প্রায় ছিরকুট করিয়া দিল: কর্কট রাশির মাস শ্রাবণ, সূর্য এখন কর্কট রাশিতে। বচনে আছে "কর্কট ছরকট, সিংহ (অর্থাৎ ভাদ্রে) শুকা, কন্যা (অর্থাৎ আশ্বিনে) কানে-কান, বিনা বায়ে তুলা, (অর্থাৎ কার্তিকে) বর্ষে কোথা রাখিবি ধান।"

ধানের গতিতে অর্থাৎ লক্ষণ এবার ভাল। জলের গুণও ভাল। এক এক বৎসর জল সচ্ছল হইলেও দেখা যায় ধানের চারা বেশ সতেজ জোরালো হইয়া উঠে না, খুব উর্বর জমিতেও না। এবার কিন্তু ধানের চারায় বেশ জোর ধরিয়াছে কয়েকদিনের মধ্যেই। এমন বর্ষা চাষীদের সুখের বর্ষা। মাঠ-ভরা জল, ক্ষেত-ভরা লকলকে চারা, দলদলে মাটি—আর চাই কি। প্রকৃতির আয়োজন-প্রাচুর্যের মধ্যে আপনাদের পরিশ্রম-শক্তিটুকু যোগ করিতে পারিলেই হইল।

এমন বর্ষায় চাষী মাঠে ঝাঁপাইয়া পড়ে পাটশের মাছের মত। অন্ধকার থাকিতে মাঠে যাইবে, জলখাবার বেলা, অর্থাৎ দশটা বাজিলে, একবার হাল ছাড়িয়া জমির আলের উপর বসিয়া পিতৃপুরুষের পাঁচপোয়ার খোরা-বাটিতে মুড়ি-গুড় খাইবে, তারপর এক ছিলিম কড়া-তামাক খাইয়া আবার ধরিবে হালের মুঠা। একটা হইতে দুইটার মধ্যে হাল ছাড়িয়া আরও ঘণ্টা তিনেক, অর্থাৎ পাঁচটা পর্যন্ত কোদাল চালাইবে। পাঁচটার পর বাড়ী আসিয়া স্নানাহার করিয়া আবার মাঠে যাইবে বীজ চারা তুলিতে, জলে কাদায় হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দুই হাতে চারা তুলিবে; প্রকাণ্ড চারার বোঝা মাথায় লইয়া বাড়ী ফিরিবে রাত্রি দশটায়। এমন বর্ষায় ভোর হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত গ্রামের মাঠ হাসি-তামাশা-আনন্দে মুখর হইয়া উঠে; ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সের প্রতিটি চাষী—তাহার কণ্ঠস্বর যেমনই

হউক না কেন—গলা ছাড়িয়া প্রাণ খুলিয়া গান গায়। সন্ধ্যার পর এই গান শোনা যায় বেশী এবং শোনা যায় হরেক রকমের গান।

দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। এবার এমন বর্ষাতেও মাঠে গান নাই। এমন বর্ষাতেও প্রতি চাষীরই এক বেলা করিয়া কাজ বন্ধ থাকিতেছে। চাষীর ঘরে ধান নাই। দেবুর বয়সের অভিজ্ঞতায় বর্ষায় চাষীর ঘরে ধান কোন বৎসরই থাকে না; তবে সে শুনিয়াছে, আগে থাকিত। যতীনবাবুকে একদিন বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরী যাহা বলিয়াছিল সেই কথা তাহার মনে পড়িল।

“—সেকালে গাই বিয়োলে দুধ বিলাতাম, পথের ধারে আম-কাঁঠালের বাগান করতাম, সরোবর-দীঘি কাটাতাম, দেবতার প্রতিষ্ঠা করতাম।—”

ছেলে-ঘুমপাড়ানী ছড়ায় আছে—“চাঁদো চাঁদো, পাতে ঘুমের ফাঁদো, গাই বিয়োলে দুধ দেবো, ভাত খেতে থালা দেবো—।” ভাত না থাকলে ভাত খাইবার থালা দিবে কোন্ হিসাবে? আর দিবে কোন্ ধন হইতে? ধানের বাড়া ধন নাই।

“গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গাই, পুকুরভরা মাছ; বাড়ীর পাঁদাড়ে গাছা, বউ বেটির কোলে বাছা, গাইয়ের কোলে নই, লক্ষ্মী বলেন ওখানেই রই।” আগেকার কালে এ সব ছিল ঘরে ঘরে। যদি না ছিল, তবে কথাটা আসিল কোথা হইতে? আজ এই পঞ্চগ্রামের মধ্যে এমন লক্ষণ শুধু শ্রীহরির ঘরে। কঙ্কণার বাবুদের লক্ষ্মী আছেন, কিন্তু এ সব নাই। জংশনে লক্ষ্মী আছেন, কিন্তু সেখানকার লক্ষ্মীর লক্ষণ একেবারে স্বতন্ত্র। কঙ্কণার বাবুদের তবু জমিদারি আছে। জংশনে আছে গদি, কল,—ক্ষেত-খামারের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। ধান সেখানে লক্ষ্মী নয়, গাদা হইয়া পড়িয়া আছে, ক্ষুর দিয়া উড়নাইয়া ধান সংগ্রহ হয়, অমাবস্যা-পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্রবার সকাল সন্ধ্যায় বেচা হইতেছে। [illegible] লক্ষ্মী সেখানে দাসীর মত খাটিতেছেন। চৈত্রলক্ষ্মীর ব্রতকথায় আছে—লক্ষ্মী একবার এক ব্রাহ্মণের ভূমি হইতে দুইটি তিলফুল তুলিয়া কানে পরিয়াছিলেন, ইহার জন্য তাঁহাকে তিনসন্ধ্যা খাটিতে হইয়াছিল ব্রাহ্মণের ঘরে। এই গদিওয়ালা কলওয়ালাদের কি ঋণ লক্ষ্মী করিয়াছেন কে জানে!…

একদল মাঠ-ফেরত চাষী কলরব করিয়া পথ দিয়া যাইতেছিল। কলরব রোজই করে, আজ যেন কলরব কিছু বেশী। দেবু লণ্ঠনের আলোর শিখাটা কিছু বাড়াইয়া দিল। চাষীর দল দেবুর দাওয়ার সম্মুখে আসিয়া নিজেরাই দাঁড়াইল।

—পেনাম পণ্ডিত মশায়—পেনাম।

—বসে আছেন?—সতীশ জিজ্ঞাসা করিল।

—হ্যাঁ।—দেবু বলিল—আজ গোল যেন বেশী মনে হল? ঝগড়া-টগড়া হল নাকি কারুর সঙ্গে?

—আজ্ঞে না।

—ঝগড়া নয় আজ্ঞে।

—সতীশ আজ খুব বেঁচে গিয়েছে আজ্ঞে।—উত্তেজিত স্বরে বলিল পাতু।

পাতু দুর্গার ভাই, সর্বস্বান্ত হইয়াছে, পেট ভরে না বলিয়া জাতি-ব্যবসা ছাড়িয়াছে। সে এখন মজুর খাটে। আজ ওই সতীশেরই ভাগের জমিতে মজুর খাটিতে গিয়াছিল।

—বেঁচে গিয়েছে? কি হয়েছিল?

—আজ্ঞে সাপ। কালো কস-কসে আলান। [illegible] হাত দুয়েক হবে।

সতীশ হাসিয়া বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। কি করে, বুঝেছেন, মুখ ঢুকিয়েছিল বীজচারার খোলা আঁটির মধ্যে। আমি জানি না। আঁটিটা বাঁধবার লেগে ধরেছি চেপে, কসে চেপে ধরেছিলাম—বুঝেছেন কিনা—নইলে ছাড়ে না। মুখে ধরেছি তো—হাতে সটান্ করে মেরে পাক। দিলাম কাস্তেতে করে পেঁচিয়ে, কি করব?

ব্যাপারটা এমন কিছু অসাধারণ ভীষণ নয়, মাঠে কাল-কেউটে যথেষ্ট। প্রতি বৎসরই দুই-চারিটা মারা পড়ে। মারা পড়ে অবশ্য এমনিধারা একটা সাক্ষাৎ অনিবার্য সংঘর্ষ বাধিলে, নতুবা তাহারা মাঠের আলের ভিতর থাকে। মাঠে চাষী চাষ করে, কেহই কাহাকেও অযাচিতভাবে আক্রমণ করে না। মারা পড়ে সাপই বেশী, কদাচিৎ মানুষ পরাজিত হয় দ্বন্দ্বের অসতর্ক মুহূর্তে।

পাতু বলিল—সতীশ দাদাকে এবার মা মনসার থানে পাঁঠা একটা দিতে হয়।

কি বলেন ?

সতীশ বলিল—সি হবে। চল্ চল্ তোরা এগিয়ে চল্ দেখি! আমি যাই।

দলটি আগাইয়া চলিয়া গেল। সতীশ দাওয়াতে বসিল।

দেবু প্রশ্ন করিল—কিছু বলছ নাকি সতীশ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাকে না বললে আর কাকে বলি।

—বল।

—বলছিলাম আজ্ঞে, ধানের কথা।

দেবু বলিল—সেই তো ভাবছি সতীশ।

—আর যে আজ্ঞে, চলে না পণ্ডিত মশায়।

দেবু চুপ করিয়া রহিল।

সতীশ বলিল—এক-আধ জনা নয়। পাঁচখানা গেরামের তামাম লোক। কুসুমপুরের শেখদের তো ইয়ার উপর পরব। আজ দেখলাম—একখানা হাল মাঠে যায়নি নাই।

দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—উপায় তো একটা করতেই হবে সতীশ। দিবা-রাত্রি ভাবছি আমি। বেশী ভেবো না, যা হয় একটা উপায় হবেই

সতীশ প্রণাম করিয়া বলিল—বাস্, তবে আর ভাবনা কি ? আপনি অভয় দিলেই হল।...সে চলিয়া গেল।

দেবু সন্ধ্যা হইতেই ভাবিতেছিল। সন্ধ্যা হইতে কেন, কয়েকদিন হইতে এ ভাবনার তাহার বিরাম নাই। ঐ জমাট-বর্ষার রাত্রির পরদিন হইতেই সে চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছে। ঐ জমাট-বর্ষার উদ্যোক্তা ভল্লারাই হউক বা হাড়িরাই হউক অথবা মুসলমান সম্প্রদায়ের অপরাধ-প্রবণ ব্যক্তিরাই হউক, এই উদ্যোগের মধ্যে তাহাদের অপরাধপ্রবণতা যেমন সত্য, উদরান্নের নিষ্ঠুর একান্ত অভাব তাহার চেয়ে বড় সত্য। অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিগুলি সমাজের স্থায়ী বাসিন্দা, তাহারা বারো মাসই আছে, দুর্যোগ, অন্ধকার—তাহাও আছে। কিন্তু এই অপরাধ তাহারা নিয়মিত করে না, বিশেষ করিয়া কার্তিক মাস হইতে ফাল্গুন পর্যন্ত ডাকাতি হয়

না। কার্তিক হইতে ফাল্গুন পর্যন্ত এ দেশে সকলেরই সচ্ছল অবস্থা। তখন ইহারা এ নৃশংস পাপ করা দূরে থাক—ব্রত করে, পুণ্য কামনা করিয়া স্বেচ্ছায় সানন্দে উপবাস করে, ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেয়; ডাকাতের নাতি, ডাকাতের ছেলে—এই সব ডাকাতেরা তখন তো ডাকাতি করে না। অপরাধপ্রবণতা হইতেও অভাবের জ্বালাটাই বড়। মনে মনে সে লক্ষ্মীকে প্রণাম করিল। বলিল—মা, তুমি রহস্যময়ী তুমি থাকিলেও বিপদ, না থাকিলেও বিপদ। কঙ্কণায় তুমি বাঁধা আছ। সেখানে তোমারই জন্য বাবুদের এই বাবু-বৃত্তি! ওরা গরীবদের সর্বস্ব গ্রাস করে নানা ছলে—খাজনার সুদে, ঋণের সুদে, চক্রবৃদ্ধি হারের সুদে; এমন কি মানুষকে অন্যায়ভাবে শাসন করিবার জন্য—মিথ্যা মামলা-মকদ্দমা করিতে তাহারা দ্বিধা করে না, এগুলোকে অধর্ম বলিয়া মনে করে না, তাহার মূলেও তুমি। আবার ভল্লারা ডাকাতি করে—যাহারা কোন পুরুষে কেহ ডাকাতি করে নাই, তেমন নূতন মানুষও ডাকাতের দলে যোগ দেয়, তাহার কারণ তোমার অভাব। মাগো, তোমার অভাবেই হতভাগাদের পাপ-বুদ্ধি এমন করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। জাগিয়া যখন উঠিয়াছে, তখন রক্ষা নাই। কোন্ দিন কোন্ গ্রামে ডাকাতি হইল বলিয়া। এইজন্যই সে সেদিন তিনকড়ির বাড়ী গিয়াছিল। তিনকড়ির সঙ্গে দেখা হয় নাই, দেখা হইয়াছে তাহার মেয়েটির সঙ্গে। মেয়েটি যেমন শ্রীমতী, তেমনি বুদ্ধিমতী।

তিনকড়ির সঙ্গে দেখা না হইলেও দেখুড়িয়ার নিদারুণ অভাবের ব্যাপার সে স্বচক্ষে দেখিতে আসিয়াছে। শুধু দেখুড়িয়ায় নয়—অভাব সমগ্র অঞ্চলটায়। অথচ এমন দুর্দশায় চাষীদের ধানের অভাব হওয়ার কথা নয়, মহাজন যাচিয়া ধান ঋণ দেয়। এবার ধর্মঘটের জন্য মহাজনরা ধান-'বাড়ি' দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। শ্রীহরির তো বন্ধ করিবারই কথা। ভাতে মারিয়া প্রজাদের শায়েস্তা করিতে চায়। কঙ্কণার বাবুদের বন্ধ করিবার কারণও তাই। অন্য মহাজনে বন্ধ করিয়াছে জমিদারের ভয়ে এবং কায়দা করিয়া বেশী সুদ আদায়ের জন্য। তাহা ছাড়া দাদন পড়িয়া যাইবার ভয়ও আছে। সকল গ্রাম হইতেই চাষীরা আসিতেছে—কি করা যায় পণ্ডিত?

দেবু কি উত্তর দিবে ?

তাহারা তবু বলে—একটা উপায় কর, নইলে চাষও হবে না, ছেলেমেয়ে-গুলান্‌ও না খেয়ে মরবে।

সতীশকে আজ সে অভয় দিয়া ফেলিল অকস্মাৎ। সতীশ খুশী হইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু দেবু অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। দায়িত্ব যেন আরও গুরুভার হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হইল তাহার।

হঠাৎ গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে অত্যন্ত সবল কোন ব্যক্তি সশব্দ পদক্ষেপে অদূরের বাঁকটা ফিরিয়া দেবুর দাওয়ার সম্মুখে দাঁড়াইল। মাথায় পাগড়ী, হাতে লাঠি থাকিলেও তিনকড়িকে চিনিতে দেবুর বিলম্ব হইল না। সে ব্যস্ত হইয়া বলিল—তিনু-কাকা! আসুন, আসুন।

তিনু দাওয়ায় উঠিয়া সশব্দে তক্তাপোশটার উপর বসিল, তারপর বলিল—হ্যাঁ, এলাম। স্বর্ন বলছিল, তুমি সেদিন গিয়েছিলে। তা কদিন আর সময় করতে কিছুতেই পারলাম না।

দেবু বলিল—হ্যাঁ, কথা ছিল একটু।

—বল। তোমার সঙ্গে আমারও কথা আছে।

দেবু একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—সেদিন জমাট-দখলের কথা জানেন ?

—হ্যাঁ জানি। বেটাদিগে আমি খুব শাসিয়ে দিয়েছি। তোমার কাছে বলতে বাধা নাই, এ এই ভল্লা বেটাদের কাজ।

—শ্রীহরি থানাতে আপনার নামেও বোধ হয় ডায়েরি করেছে।

তিনকড়ি হা-হা করিয়া হাসিয়া সারা হইল, হাসি খানিকটা সংবরণ করিয়া বলিল—আমার উ কলঙ্কনী নাম তো আছেই বাবাজী, উ আমি গেরাহ্যি করিনা। ভগবান আছেন। পাপ যদি না করি আমি, কেউ আমার কিছু করতে পারবে না।

দেবু একটু হাসিল; তারপর বলিল—সে কথা ঠিক; কিন্তু তবু একটু সাবধান হওয়া ভাল।

—সাবধান আর কি বল? চাষবাস করি, খাটি-খুটি, খাই-দাই ঘুমোই। এর চেয়ে আর কি সাবধান হব ?

এ কথার উত্তর দেবু দিতে পারিল না, সত্যিই তো, সৎপথে থাকিয়া যথানিয়মে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিয়া যাওয়া সত্ত্বেও যদি তাহার উপর সন্দেহের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হয়, তবে সে কি করিবে? সৎপথে সংসার করার চেয়ে আর বেশী সাবধান কি করিয়া হওয়া যায়!

—উ বেটা ছিরে যা মনে লাগে করুক। না হয় জেলই হবে। বেটারা বি-এল করার তালে আছে, সে আমি জানি। উ জন্যে আমি ভাবি না। গৌর আমার বড় হয়েছে; দিব্যি সংসার চালাতে পারবে। জেলের ভাতই না হয় খেয়ে আসব কিছুদিন।—বলিয়া তিনকড়ি আবার হা-হা করিয়া পরুষ হাসি হাসিয়া উঠিল।

দেবু বুঝিল, তিনকড়ি কিছু উত্তেজিত হইয়া আছে। সঙ্গে সঙ্গে সে-ও একটু হাসিল।

হঠাৎ তিনকড়ির হাসি থামিয়া গেল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল —ভগবান-টগবান একদম মিছে কথা দেবু। নইলে তোমার সোনার সংসার এমনি করে ভেঙে যায়? না—আমার স্বর্ণর মত সোনার পিতিমে সাত বছরে বিধবা হয়? আমি ওই পাথরটার সেগে কি কম করলাম? কি হল? আমারই টাকাগুলান গেল—জমি গেল। আমি বেটা গাধা বনে গেলাম। ভগবান-টগবান মিছে কথা, শুধু ফাঁকি, ফাঁকি!

দেবু শ্রদ্ধার সঙ্গে তিরস্কার করিয়া বলিল—ছিঃ তিনু-খুড়া, আপনার মত লোকের ও-কথা মুখ দিয়ে বের করা উচিত নয়।

—কেনে?

—ভগবানকে কি এই সামান্য ব্যাপারে চেনা যায়? দুঃখ দিয়ে তিনি মানুষকে পরীক্ষা করেন।

—আহা-হা! তোমার ভগবান তো বেশ রসিক লোক হে! কেনে, সুখ দিয়ে পরীক্ষে করুন-না কেনে? দুখ দিয়ে পরীক্ষে করার শখ কেনে?

—তাও করেন বই কি। ওই কঙ্কণার বাবুদিগে দেখুন। সুখ দিয়ে পরীক্ষা করছেন সেখানে।

—তাতে তাদের খারাপটা কি হয়েছে ?

—কিন্তু আপনি কি কঙ্কণার বাবুদের মত হতে চান ? ওই সব বাবুদের মতন—শয়তান, চরিত্রহীন, পাষণ্ড ? দেশের লোকে গাল দিচ্ছে। মরণ তাকিয়ে রয়েছে। যারা মলে দেশের লোকে বলবে—পাপ বিদেয় হল, বাঁচলাম। তিনু-কাকা, মরলে যার জন্মে লোকে কাঁদে না—হাসে, তার চেয়ে হতভাগা কেউ আছে ! কানা, খোঁড়া—দুনিয়াতে যার কেউ নাই, সে পথে পড়ে মরে, তাকে দেখেও লোকের চোখে জল আসে। আর যাদের হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ টাকা জমিদারী, তেজারতি, লোক-লস্কর, গাড়ী-ঘোড়া, তারা মরে গেলে লোকে বলে—বাঁচলাম। এইবার ভেবে দেখুন মনে।

তিনকড়ি এবার চুপ করিয়া রহিল। দেবুর তীক্ষ্ণস্বরের ওই কথাগুলো অন্তরে গিয়া তাহার অভিমান-বিমুখ ভগবৎপ্রীতিকে তিরস্কারে সান্ত্বনার আবেগে অধীর করিয়া তুলিল। কিন্তু আবেগোচ্ছ্বাসে সে অত্যন্ত সংযত মানুষ। স্বর্ণ যেদিন বিধবা হয় সেদিনও তাহার চোখে একফোঁটা জল কেহ দেখে নাই। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তারপর বলিল—তোমার ভাল হবে বাবাজী, তোমার ভাল হবে। ভগবান তোমাকে দয়া করবেন।

দেবু চুপ করিয়া রহিল।

তিনকড়ি বলিল—শোন, তোমার কাছে কি জন্যে এসেছি, শোন।

—বলুন

—ধানের কথা !

দেবু ম্লান হাসিয়া বলিল—ধানের উপায় তো এখনও কিছু দেখতে পাচ্ছি না তিনু-কাকা। দু-চারজন নয়, পাঁচখানা গাঁয়ের লোক।

—কুসুমপুরের মুসলমানেরা ধানের যোগাড় করেছে। ধান নয়, টাকা। টাকা দাদন নিয়ে ধান কিনে নিয়ে এল। আজ মাঠে শেখেদের একখানা হালও আসে নাই।

দেবু বিস্মিত হইয়া গেল।

তিনকড়ি বলিল—জংশনের কলওয়ালারা টাকা দিলে, ধান কিনলে

গদীওয়ালাদের কাছে। কলওয়ালারা চাল দিতেও রাজী আছে। তবে তাতে ভানাড়ীর খরচ বাদ যাবে তো; তা ছাড়া তুষ, কুঁড়ো। আর তোমার ধর— কলের চাল কেমন জল-জল, উ আমাদের মুখে রুচবে না। তার চেয়ে টাকাই ভাল।

দেবু বলিল—কুসুমপুরের সব কলে দাদন নিলে?

—হ্যাঁ। দশ-পনেরো, বিশ-পঁচিশ যে যেমন লোক। আজ ক'দিন থেকেই ঠিক করেছে, কাউকে বলে নাই। তা আমি সেদিন ওদের মজলিশে ছিলাম। শুনে এসেছিলাম।

দেবু বলিল—তাই তো! সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

—আমিও গিয়েছিলাম বাবাজী, কথাবার্তা বলে এলাম। তুমি বরং চলো কাল-পরশু। আমি বলে এসেছি তোমার নাম। তা বললে—তার দরকার কি? তোমাদের কথা তোমরা নিজেরাই বল। দেবু পণ্ডিত টাকা নেবে না। সে একা লোক—তার ঘরে ধানও আছে।

—আমার সঙ্গে কলওয়ালাদের দেখা হয়েছে তিনু-খুড়ো। আমার কাছে তো লোক পাঠিয়েছিল।

—তোমার সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে?

—হয়েছে। আমি রাজী হতে পারি নি।

—কেনে?

—হিসেব করে দেখেছেন, কি দেনা ঘাড়ে চাপছে? আমি হিসেব করে দেখেছি। দেড়া সুদে ধান-'বাড়ি'র চেয়ে ঢের বেশী। দাদনের টাকায় যে ধান কিনবেন, পৌষে ধান বিক্রি করবার সময় ঠিক তার ডবল ধান লাগবে।

—কিন্তু তা ছাড়া উপায় কি বল?

দেবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—ভেবে কিছু ঠিক করতে পারি নি তিনু-কাকা।

—কিন্তু ই-দিকে যে পেটের ভাত ফুরিয়ে গেল! মুনিষ-মান্দের—ধান-ধান করে মেরে ফেললে! ওরা বেটাদেরই বা রাখি কি করে?

—আজ আপনাকে কিছু বলতে পারলাম না তিনু-কাকা। কাল একবার

আমি ন্যায়রত্ন মশায়ের কাছে যাব। তারপর যা হয় বলব।

তিনকড়ি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। জংশন হইতে সে খুব খুশী হইয়াই আসিতেছিল। সে খুশীর পরিমাণটা এত বেশী যে, এই রাত্রেই কথাটা সে দেবুকে জানাইবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারে নাই। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল—তবে আজ আমি উঠি।

দেবু নিজেও উঠিয়া দাঁড়াইল।

তিনকড়ি দাওয়া হইতে নামিয়া, আবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আর একটা কথা বাবাজী।

—বলুন।

—আমার মেয়ে স্বর্ণর কথা। তুমি দেখেছ তাকে সেদিন?

—হ্যাঁ। বড় ভাল লাগল আমার, ভারি ভাল মেয়ে।

—পড়া-টড়া একটুকুন ধরেছিলে নাকি? বলতে-টলতে পারলে?

দেবু অকপট প্রশংসা করিয়া বলিল—মেয়েটি আপনার খুব বুদ্ধিমতী; নিজেই যা পড়াশুনো করেছে দেখলাম, তাতেই ইউ-পি পরীক্ষা দিলে নিশ্চয়ই বৃত্তি পায়।

তিনু উদাসকণ্ঠে বলিল—আমার অদৃষ্ট বাবা, ওকে নিয়ে যে আমি কি করব, ভেবে পাই না। তা স্বর্ণ যদি বিত্তি-পরীক্ষে দেয়—ক্ষতি কি?

—কিসের ক্ষতি? আমি বলছি তিনু-কাকা, তাতে মেয়ের আপনার ভবিষ্যৎ ভাল হবে।

তিনু তাহার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিল।—তা হলে বাবা, মাঝে মাঝে গিয়ে একটুকুন দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে হবে তোমাকে।

—বেশ, মধ্যে মধ্যে যাব আমি।

তিনু খুশী হইয়া বলিল—ব্যস্—ব্যস্! স্বর্ণ তা হলে ফাস্টো হবে—এ আমি জোর গলায় বলতে পারি।

তিনু চলিয়া গেল। লণ্ঠনটা স্তিমিত করিয়া দিয়া দেবু আবার ভাবিতে বসিল। রাজ্যের লোকের ভাবনা। খাজনা বৃদ্ধির ব্যাপারটা লইয়া দেশের লোক ক্ষেপিয়া

উঠিয়াছে। তিনকড়ি আজ যে পথের কথা বলিল, সে পথে লোকের নিশ্চিত সর্বনাশ। সে চোখের উপর তাহাদের ভবিষ্যৎ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে। এ সর্বনাশের নিমিত্তের ভাগী হইতে হইবে তাহাকে।

পাতু যথানিয়মে সস্ত্রীক শুইতে আসিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল—দুর্গা আসে নাই পণ্ডিত?

—কই, না।

—আচ্ছা বজ্জাত যাহোক্। সেই সন্ধে বেলায় বেরিয়েছে—

ঘোমটার ভিতর হইতে পাতুর বউ বলিল—রোজগেরে বুন রোজকার করতে গিয়েছে।

পাতু একটা হুঙ্কার দিয়া উঠিল। বলিল—হারামজাদী, তুই এতক্ষণ কোথা ছিলি? ঘোষালের কাণ্ড বুঝি কেউ জানে না—না?

দেবু বিরক্ত হইয়া ধমক দিল—পাতু!

—পণ্ডিত মশাই?—মৃদুস্বরে কে অদূরস্থ গাছতলাটা হইতে ডাকিল।

—কে?

—আমি তারাচরণ!—মৃদুস্বরেই তারাচরণ উত্তর দিল।

—তারাচরণ? কি রে?—দেবু উঠিয়া আসিল।

তারাচরণ নাপিতের কথাবার্তার ধরনই এইরূপ। কথাবার্তা তাহার মৃদুস্বরে। যেন কত গোপন কথা সে বলিতেছে। গোপন কথা শুনিয়া ও বলিয়াই অবশ্য অভ্যাসটা তাহার এইরূপ হইয়াছে। সে নাপিত, প্রত্যেক বাড়ীতেই তাহার অবাধ গতি! এই যাতায়াতের ফলে প্রত্যেক বাড়ীরই কিছু গোপন তথ্য তাহার কানে আসে। সেই তথ্য সে প্রয়োজন-মত অন্যের কাছে বলিয়া, মানুষের ঈর্ষাপালিত কৌতূহল-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিয়া আপনার কার্যোদ্ধার করিয়া লয়। আবার তাহারও গোপন মনের কথা জানিয়া লইয়া অন্যত্র চালান দেয়। এ অঞ্চলটার সকল গোপন তথ্য সর্বাগ্রে জানিতে পারে সে-ই। থানার দারোগা হইতে ছিরু ঘোষ, আবার দেবু ঘোষ হইতে তিনকড়ি মণ্ডল—এমন কি মহাগ্রামের ন্যায়রত্ন মহাশয়েরও সুখ-দুঃখের বহু গোপন কথা তাহার জানা আছে। তাহাকে

সকলেই সন্দেহের চক্ষে দেখে—তারাচরণ হাসে; সন্দেহের চোখে দেখিয়াও ধূর্ত তারাচরণের কাছে আত্মগোপন তাহারা করিতে পারে না। কিন্তু সারা অঞ্চলটার মধ্যে দুইটি ব্যক্তিকে তারাচরণ শ্রদ্ধা করে—একজন মহাগ্রামের ন্যায়রত্ন মহাশয়, অপর জন পণ্ডিত দেবু ঘোষ।

দেবু কাছে আসিতেই তারাচরণ মৃদুস্বরে বলিল—রাঙাদিদির শেষ অবস্থা। একবার চলুন।

—রাঙাদিদির শেষ অবস্থা। কে বললে?

—গিয়েছিলাম আজ্ঞে, ঘোষ মশায়ের কাছারিতে। ফিরছি—পথে দুর্গার সাথে দেখা হল। বললে—রাঙাদিদির নাকি ভারি অসুখ। আপনাকে একবার যেতে বললে।

রাঙাদিদি নিঃসন্তান, চাষী সদ্গোপদের কন্যা। এখন সে প্রায় সত্তর বৎসর বয়সের বৃদ্ধা। দেবুদের বয়সীরা তাহাকে রাঙাদিদি বলিয়া ডাকে, সেই বৃদ্ধা মরণাপন্ন। দেবু পাতুকে বলিল—পাতু, তুমি শুয়ে পড়। আমি আসছি।

রাঙাদিদির সঙ্গে তাহার একটি মধুর সম্বন্ধ ছিল। সে যখন চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা করিত, তখন বৃদ্ধা স্নানের সময় নিয়মিত একগাছি ঝাঁটা হাতে আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপটি পরিষ্কার করিয়া দিত। এই ছিল তাহার পারলৌকিক পুণ্য-সঞ্চয়ের কর্ম। বৃদ্ধার সঙ্গে তাহার সুখ-দুঃখের কত কথাই হইত। সেটেলমেন্টের হাঙ্গামার সময় সে যেদিন গ্রেপ্তার হয়, সেদিন বৃদ্ধার ভাবাবেগ তাহার মনে পড়িল। সে জেলে গেলে, বিলুর খোঁজ-খবর সে নিয়মিতভাবে লইয়াছে। নিকটতম আত্মীয়জনের মত গভীর অকপট তাহার মমতা, বিলুর মৃত্যুর পর সমস্ত দিন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিত। তাহার ঘোলা চোখের সেই সজল বেদনাপূর্ণ দৃষ্টি সে জীবনে ভুলিতে পারিবে না।

পিছন হইতে তারাচরণ বলিল—একটুকুন ঘুরে যাওয়াই ভাল পণ্ডিত মশায়।

—কেন?

—ঘোষের কাছারির সামনে দিয়ে গেলে গোলমাল হয়ে যাবে।

—গোলমাল?—দেবু বিস্মিত হইয়া গেল। একটা মানুষ মরিতেছে, সেখানে

গোলমালের ভয় কিসের ? আত্মীয়স্বজনহীনা বৃদ্ধা মরিতে বসিয়াছে—তাহার আজ কত দুঃখ, সে কাহাকেও রাখিয়া যাইতেছে না। মৃত্যুর পর এ সংসারে কেহ তাহার নাম করিবে না, তাহার জন্য একফোঁটা চোখের জল ফেলিবে না। আজ তো সারা গাঁয়ের লোকের ভিড় করিয়া তাহার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে আসা উচিত ; বুড়ী দেখিয়া যাক—গোটা গ্রামের লোকই তাহার আপনার ছিল। সে বলিল—এর মধ্যে লুকোচুরি কেন তারাচরণ ? গোলমালের ভয় কিসের ?

একটু হাসিয়া তারাচরণ বলিল—আছে পণ্ডিত মশাই। বুড়ীর তো ওয়ারিশ নাই। মলেই শ্রীহরি ঘোষ এসে চেপে বসবে, বলবে—বুড়ী 'ফৌত' হয়েছে ; ফৌত প্রজার বিষয়-সম্পত্তি টাকা-কড়ি সমস্ত কিছুরই মালিক হল জমিদার। আসুন, এই গলি দিয়ে আসুন।

কথাটায় দেবুর খেয়াল হইল। তারাচরণ ঠিক বলিয়াছে—খাঁটি মাটির মানুষ সে, অদ্ভুত তাহার হিসাব, অদ্ভুত তাহার অভিজ্ঞতা। ওয়ারিশহীন ব্যক্তির সম্পত্তি জমিদার পায় বটে। আসলে প্রাপ্য রাজার বা রাজশক্তির ; কিন্তু এদেশে জমিদারকে রাজশক্তি এমনভাবে তাহার অধিকার সমর্পণ করিয়াছে যে, হক-হুকুম, অধঃ-ঊর্ধ্ব সবেরই মালিক জমিদার। জমি চাষ করে প্রজা, সেই প্রজার নিকট হইতে খাজনা সংগ্রহ করিয়া দেয় জমিদার। কাজ সে এইটুকু করে। কিন্তু জমির তলায় খনি উঠিলে জমিদার পায়, গাছ জমিদার পায়, নদীর মাছ জমিদার পায়। জমিদার খায়-দায়, ঘুমায়, অনুগ্রহ করিয়া কিছু দানধ্যান করে। কেহ নদীর বন্যা-রোধের জন্য বাঁধ-বাঁধিতে খরচ দেয়, সেচের জন্য দীঘি কাটাইয়া দেয় ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দাবী করে, খাজনা-বৃদ্ধি তাহার প্রাপ্য হইয়াছে !

যাহার ওয়ারিশ নাই—তাহার সম্পত্তির আসল মালিক দেশের লোক। দেশের লোকের সকল সাধারণ কাজের ব্যবস্থা করে তাহাদেরই প্রতিনিধি-হিসাবে রাজা বা রাজশক্তি ; সেই কারণে সকল সাধারণ সম্পত্তির মালিক ছিল রাজা। সেইজন্য চণ্ডীমণ্ডপ সাধারণে তৈয়ারী করিয়াও বলিত, রাজার চণ্ডীমণ্ডপ, সেইজন্য দেবতার সেবাইত ছিলেন রাজা, সেইজন্য ফৌত প্রজার সম্পত্তি যাইত রাজসরকারে। এসব কথা দেবু ন্যায়রত্ন এবং বিশ্বনাথের কাছে শুনিয়াছে।

তাহাদের কপাল! আজ রাজা জমিদারকে তাঁহার সমস্ত অধিকার দিয়া বসিয়া আছেন। জমিদার দিয়াছে পত্তনিদারকে। দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। কিন্তু আজ সে এমন গোপনে যাইবে কোন্ অধিকারে? সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

তারাচরণ বলিল—পণ্ডিত আসুন।

গলিটার ও-মাথা হইতে কে বলিল—পরামানিক, পণ্ডিত আসছে?—দুর্গার কণ্ঠস্বর।

তারাচরণ বলিল—দাঁড়ালেন কেন গো?

—আরও দু চারজনকে ডাক তারাচরণ।

—ডাকবে পরে। আগে তুমি এস জামাই—দুর্গা আগাইয়া আসিল।

দেবু বলিল—কিন্তু তুই জুটলি কি করে?

মৃদুস্বরে দুর্গা বলিল—কামার-বউয়ের বাড়ী এসেছিলাম। ক'দিন থেকেই একটুকুন করে জ্বর হচ্ছিল রাঙাদিদির, কামার-বউ যেত-আসত, মাথার গোড়ায় এক ঘটি জল ঢেকে রেখে আসত। রাঙাদিদিও কামার-বউয়ের অসময়ে অনেক করেছে। আমি দুধ দুয়ে দিতাম দিদির গরুর, বউ জাল দিয়ে দিয়ে আসত। বাকিটা আমি বেচে দিতাম। আজ দুপুরে গেলাম তো দেখলাম বুড়ীর হুঁশ নাই জ্বরে। কামার-বউ কপালে হাত দিয়ে দেখলে—খুব জ্বর। বিকেলে যদি দুজনায় দেখতে গেলাম তো দেখি—দাঁতি লেগে বুড়ী পড়ে আছে। চোখ-মুখে জল দিতে দিতে দাঁতি ছাড়ল, কিন্তু 'বিগার' বকতে লাগল। এখন গলগলিয়ে ঘামছে, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে।

দেবু বলিল—ডাক্তারকে ডাকতে হত। তারাচরণ, তুমি যাও, জগন-ভাইকে ডেকে আন আমার নাম করে।

—না।—বাধা দিয়া দুর্গা বলিল—আমরা বলেছিলাম, তা রাঙাদিদি বারণ করলে।

—বারণ করলে? এখন জ্ঞান হয়েছে নাকি?

—হ্যাঁ, খানিক আগে থেকে জ্ঞান হয়েছে। বললে—ডাক্তার-কোবরেজে কাজ নাই দুগ্‌গা, তুই আর ছেনালি করিস না। ডাকবি তো—দেবাকে ডাক্।

তা—কামার-বউকে একা ফেলে যেতেও পারি না, লোকও পাই না তোমাকে ডাকতে। শেষে পরামানিককে ডেকে বললাম।

দেবু একটু চিন্তা করিয়া বলিল—না তারাচরণ, তুমি ডাক্তারকে ডাক একবার।

বুড়ীর শেষ অবস্থাই বটে। হাত-পায়ের গোড়ার দিকটা বরফের মত ঠাণ্ডা। ঘোলা চোখ দুইটি আরও ঘোলাটে হইয়া আসিয়াছে। মাথার শিয়রে তাহার মুখের দিকে পদ্ম বসিয়া ছিল; দেবুকে দেখিয়া সে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল। তাহার জীবনেও এই বৃদ্ধা অনেকখানি স্থান জুড়িয়া ছিল। প্রায়ই খোঁজ-খবর করিত; গালি-গালাজও দিত, আবার নুন, তেল, ডাল—পদ্মর যখন যেটার হঠাৎ অভাব পড়িত, আসিয়া ধার চাহিলেই দিত; শোধ দিলে লইত, কিন্তু বিলম্ব হইলে কখনও কিছু বলিত না। নিজের বাড়ীতে শশা, কলা, লাউ যখন যেটা হইত—বুড়ী তাহাকে দিত। বুড়ীর যখন যাহা খাইতে ইচ্ছা করিত—তাহার উপকরণ-গুলি আনিয়া পদ্মের দাওয়ায় রাখিয়া দিয়া বলিত—আমাকে তৈরী করে দিস্। উপকরণগুলি তাহার একার উপযুক্ত নয়; দুই-তিনজনের উপযুক্ত উপকরণ দিত। বৃদ্ধা আজীবন দুধ বেচিয়া, ঘুঁটে বেচিয়া, ছাগল-গরু পালন করিয়া, বেচিয়া বেশ কিছু সঞ্চয় করিয়াছে। অবস্থা তাহার মোটেই খারাপ নয়। লোকে বলে—বুড়ীর টাকা অনেক। হায়দার শেখ পাইকার হিসাব দেয়—আমি রাঙাদিদির ঠেঁয়ে পাঁচ-পাঁচটা বলদ-বাছুর কিনেছি। পাঁচটাতে তিনশো টাকা দিছি। ছাগল—বকনা তো হামেশাই কিনেছি। উয়ার টাকার হিসাব নাই।

দেবু আসিয়া পাশে বসিয়া ডাকিল—রাঙাদিদি!

দুর্গা বলিল—জোরে ডাক, আর শুনতে পাচ্ছে না।

দেবু জোরেই ডাকিল—রাঙাদিদি! রাঙাদিদি!

বুড়ী স্তিমিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, দেখিয়া দেবু বলিল—আমি দেবু। বুড়ীর দৃষ্টিতে তবু কোন পরিবর্তন ঘটিল না। দেবু এবার কানের কাছে কণ্ঠস্বর উচ্চ করিয়া বলিল—আমি দেবা, রাঙাদিদি! দেবা!

এবার বুড়ী ক্ষীণ মৃদুস্বরে থামিয়া থামিয়া বলিল—দেবা! দেবু-ভাই!

—হ্যাঁ।

বুড়ী মৃদু হাসিয়া বলিল—আমি চললাম দাদা।

পরক্ষণেই তাহার পাণ্ডুর ঠোঁট দুইখানি কাঁপিতে লাগিল, ঘোলাটে চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল; সে বলিল—আর তোদিকে দেখতে পাব না।…একটু পরে বিচিত্র হাসি হাসিয়া বলিল—বিলুকে—তোর বিলুকে কি বলব বল্; সেখানেই তো যাচ্ছি!

দশ

পদ্ম মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া বুড়ী রাঙাদিদির জন্য কাঁদিতেছিল। বুড়ী সত্যই তাহাকে ভালবাসিত। পদ্ম অনেকদিন ভাল করিয়া কাঁদিবার কোন হেতু পায় নাই। সংসারে তাহার থাকিবার মধ্যে ছিল অনিরুদ্ধ—সে তাহাকে কবে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে; তাহার জন্য কান্না আর আসেও না। যতীন-ছেলে দিন কয়েকের জন্য আসিয়াছিল—সে চলিয়া গেলে কয়েক দিন পদ্ম কাঁদিয়াছিল। তাহাকে মনে পড়িলে এখনও চোখে জল আসে, কিন্তু বেশ প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে পারে না।

বুড়ী শেষরাত্রেই মরিয়াছে। মরিবার আগে জগন ডাক্তার প্রভৃতি পাঁচজনে বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—দিদি, তোমার শ্রাদ্ধশান্তি আছে। টাকা-কড়ি কোথায় রেখেছ বল, আমরা শ্রাদ্ধ করব। আর যাতে যেমন খরচ করতে বলবে, তাতেই তেমন করব।

বুড়ী উত্তর দেয় নাই। পাশ ফিরিয়া শুইয়াছিল। কিন্তু ডাক্তার আসিবার পূর্বেই দেবুকে বুড়ী বলিয়াছিল—তখন সেখানে ছিল কেবল সে ও দুর্গা। বলিয়াছিল—দেবা, ষোল কুড়ি টাকা আমার আছে, এই আমার বিছানা-বালিশের তলায় মেঝেতে পোঁতা আছে। কোনমতে আমার ছেরাদ্দটা করিস্, বাকীটা তুই নিস্—আর পাঁচ কুড়ি দিস্ কামারণীকে।

যে কথা বুড়ী তাহাকে একরূপ গোপনে বলিয়াছিল, সেই কথা দেবু ঘোষ ভোরবেলা সকলকে ডাকিয়া একরকম প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়া দিল। শ্রীহরি

ঘোষকে পর্যন্ত ডাকিয়া সে বলিয়া দিল—রাঙাদিদি এই বলিয়া গিয়াছে ; এবং টাকাটার গুপ্তস্থানটা পর্যন্ত দেখাইয়া দিল।

ফলে, যাহা হইবার হইয়াছে। জমিদার শ্রীহরি ঘোষ—তখন পুলিসে খবর দিয়া ওয়ারিশহীন বিধবার জিনিস-পত্র, গরু-বাছুর, টাকা-কড়ি সব দখল করিয়া বসিয়াছে। দেবুর কথা কানেই তোলে নাই। দুর্গা অযাচিতভাবে দেবুর কথার সত্যতা স্বীকার করিয়া সাক্ষ্য দিতে আগাইয়া আসিয়াছিল—জমাদার এবং শ্রীহরি ঘোষ তাহাকে একরূপ ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। পুনরায় ডাকাইয়া আনিয়া তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে তিরস্কার করিয়াছে। সে তিরস্কারের ভাগ পদ্মকেও লইতে হইয়াছে।

জমাদার দুর্গাকে পুনরায় ডাকাইয়া বলিয়াছিল—তুই মুচীর মেয়ে, আর বুড়ী ছিল সদ্গোপের মেয়ে ; তুই কি রকম তার মরণের সময় এলি ? তোকে ডেকে-ছিল সে ?

দুর্গা ভয় করিবার মেয়ে নয়, সে বলিয়াছিল—মরণের সময় মানুষ ভগবানকে ডাকতেও ভুলে যায়, তা বুড়ী আমাকে ডাকবে কী ? আমি নিজেই এসেছিলাম।

শ্রীহরি পরুষকণ্ঠে বলিয়াছিল—তুই যে টাকার লোভে বুড়ীকে খুন করিস্ নাই, তার ঠিক কি ?

দুর্গা প্রথমটা চমকিয়া উঠিয়াছিল—তারপর হাসিয়া একটি প্রণাম করিয়া বলিয়াছিল—তা বটে, কথাটা তোমার মুখেই সাজে পাল।

জমাদার ধমক দিয়া বলিয়াছিল—কথা বলতে জানিস্ না হারামজাদী ? ঘোষ মশায়কে 'পাল' বলছিস্, 'তোমার' বলছিস্ ?

দুর্গা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিল—লোকটি যে এককালে আমার ভালবাসার লোক ছিল, তখন পাল বলেছি, তুমি বলেছি, মাল খেয়ে তুইও বলেছি। অনেক দিনের অভ্যেস কি ছাড়তে পারি জমাদারবাবু ? এতে যদি তোমাদের সাজা দেবার আইন থাকে—দাও।

শ্রীহরির মাথাটা হেঁট হইয়া গিয়াছিল। জমাদারও আর ইহা লইয়া ঘাঁটাইতে সাহস করে নাই। কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল—সদ্গোপের

মেয়ের মৃত্যুকালে তার জাত-জাত কেউ এল না, তুই এলি, আর ওই কামার-বউ এল, ওর মানে কি ? কেন এসেছিলি বল ?

পদ্মর বুকটা এবার ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিয়াছিল।

দুর্গাকে এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই জমাদার বলিয়াছিল—কামার-বউকে জিজ্ঞাসা করছি—উত্তর দাও না গো।

সমবেত সমস্ত লোক এই অপ্রত্যাশিত সন্দেহে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। উত্তর দিয়াছিল দেবু পণ্ডিত ; সে এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, এবার সামনে আসিয়া বলিল—মশায়, পথের ধারে মানুষ পড়ে মরছে, সে হয়তো মুসলমান—কোন হিন্দু দেখে যদি তার মুখে জল দেয়, কি কোন মুমূর্ষু হিন্দুর মুখেই কোন মুসলমান জল দেয়, তবে কি আপনারা বলবেন—লোকটাকে খুন করেছে ? তাকে কি জিজ্ঞাসা করবেন—ওর কোন স্বজাতকে না ডেকে, তুই কেন ওর মুখে জল দিলি ?

জমাদার বলিয়াছিল—কিন্তু বুড়ীর টাকা আছে।

—পথের ধারে যারাই মরে—তারাই ভিখারী নয় ; পথিক হতে পারে, তাদের কাছেও টাকা থাকতে পারে।

—সে ক্ষেত্রে আমরা সন্দেহ করব বই কি, বিশেষ টাকা যদি না পাওয়া যায়।

—টাকার কথা তো আমি বলেছি আপনাদের।

—আরও টাকা ছিল না তার মানে কি ?

—ছিল, তারই বা মানে কি ?

—আমাদের মনে হয়, ছিল। লোকে বলে…বুড়ীর টাকা ছিল হাজার দরুণে।

—পরের ধন আর নিজের আয়ু—এ মানুষ কম দেখে না, বেশীই দেখে। সুতরাং বুড়ীর টাকা হাজার দরুণেই তারা বলে থাকে !

শ্রীহরি বলিল—বেশ কথা। কিন্তু যখন দেখলে বুড়ীর শেষ অবস্থা, তখন আমাকে ডাকলে না কেন ?

—কেন ? তোমাকে ডাকব কেন ?

—আমাকে ডাকবে কেন !—শ্রীহরি আশ্চর্য হইয়া গেল।

জমাদার উত্তর যোগাইয়া দিল—কেন-না, উনি গ্রামের জমিদার।

—জমিদার খাজনা আদায় করে সরকারের কালেকটারিতে জমা দেয়। মানুষের মরণকালেও তাকে ডাকতে হবে—এমন আইন আছে নাকি? না—ধর্ম-রাজ, যমরাজ, ভগবান এদের দরবার থেকেও তাকে কোন সনন্দ দেওয়া আছে? কামার-বউ প্রতিবেশী, দুর্গা কামার-বউয়ের বাড়ী এসেছিল, এসে রাঙাদিদির খোঁজ করতে গিয়ে—

—তাই তো বলছি, জাত-জ্ঞাত কেউ খোঁজ করলে না—শ্রীহরি ঘোষ মশায় জানলেন না, ওরা জানলে—ওরা খোঁজ করলে কেন?

—জাত-জ্ঞাত খোঁজ করলে না কেন—সেকথা জাত-জ্ঞাতকে জিজ্ঞাসা করুন। আপনার ঘোষ মশাই বা জানলেন না কেন সে কথা বলবেন আপনার ঘোষ। অন্যের জবাবদিহি ওরা কেমন করে করবে? ওরা খোঁজ করেছে সেটা ওদের অপরাধ নয়। আর অপরে খোঁজ কেন করলে না, সে কৈফিয়ৎ দেবার কথা তো ওদের নয়।

—তোমাকে খবর দিলে—ঘোষ মশাইকে খবর দিলে না কেন?

—আইনে এমন কিছু লেখা আছে নাকি যে, ঘোষকে অর্থাৎ জমিদারকেই এমন ক্ষেত্রে খবর দিতেই হবে? ওরা আমাকে খবর দিয়েছিল আমি ডাক্তার ডেকেছিলাম, মৃত্যুর পর ভূপাল চৌকিদারকে দিয়ে থানায় খবর পাঠিয়েছি। এর মধ্যে বার বার ঘোষ মশাই আসছে কেন?

জগন ডাক্তার এবার আগাইয়া আসিয়া বলিয়াছিল—আমি রাঙাদিদির শেষ সময়ে দেখেছি। মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু। বৃদ্ধ বয়স—তার ওপর জ্বর। সেই জ্বরে মৃত্যু হয়েছে। আপনাদের সন্দেহ হয়—লাস চালান দিন। পোস্টমর্টেম্ হোক, আপনারা প্রমাণ করুন অস্বাভাবিক মৃত্যু। তারপর এসব হাঙ্গামা করবেন। ফাঁসী, খুন,—দ্বীপান্তর যা হয়—বিচারে হবে।

শ্রীহরি বলিয়াছিল—ভাল, তাই হোক। না—জমাদারবাবু?

জমাদার এতটা সাহস করে নাই। অনাবশ্যকভাবে এবং যথেষ্ট কারণ না থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুটাকে অস্বাভাবিক মৃত্যু বলিয়া চালান দিয়া থানার কাজ বাড়াইতে গেলে তাহাকেই কৈফিয়ৎ খাইতে হইবে। তবুও সে নিজের জেদ একেবারে

ছাড়ে নাই। শ্রীহরিকে বলিয়া—জংশনের পাস-করা এম-বি ডাক্তারকে 'কল' পাঠাইয়াছিল এবং হাঙ্গামাটা আরও খানিকক্ষণ জিয়াইয়া রাখিয়াছিল।

জংশনের ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া-শুনিয়া একটু আশ্চর্য হইয়াই বলিয়াছিল—আনন্যাচারাল ডেথ ভাববার কারণটা কি শুনি?

শ্রীহরি উত্তর দিতে পারে নাই। উত্তর দিয়াছিল—জমাদার।—মানে, বুড়ীর টাকা আছে কিনা। দেবু ঘোষ, দুর্গা মুচীনী বলছে—সে টাকার একশো টাকা দিয়ে গেছে কামার-বউকে, আর বাকীটা দিয়ে গেছে দেবু ঘোষকে।

ডাক্তার ইহাতেও অস্বাভাবিক কিছুর সন্ধান পায় নাই। সে বলিয়াছিল—বেশ তো!

—বেশ তো নয়, ডাক্তারবাবু। এর মধ্যে একটু লট্-খটি ব্যাপার আছে। মানে—দেবু ঘোষই আজকাল অনিরুদ্ধের স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করে। তার মধ্যে আছে দুর্গা মুচীনী। এখন বুড়ীর মৃত্যুকালে এল কেবল দুর্গা মুচীনী আর কামার-বউ। তারা এসেই ডাকলে দেবু ঘোষকে। দেবু এল, ডাক্তারকে খবর পাঠালে। বুড়ীর মুখে-মুখে উইল কিন্তু হয়ে গেল ডাক্তার আসবার আগেই। সন্দেহ একটু হয় না কি?

হাসিয়া ডাক্তার বলিয়াছিল—সেটা তো উইলের কথায়। তার সঙ্গে অস্বাভাবিক মৃত্যু বলে—ব্যাপারটাকে অনাবশ্যক—আমার মতে অনাবশ্যকভাবেই ঘোরালো করে তুলেছেন আপনারা।

—অনাবশ্যক বলছেন আপনি?

—বলছি। তা ছাড়া জগনবাবু নিজে ছিলেন উপস্থিত।

—বেশ। তা হলে—মৃতদেহের সৎকার করুন। টাকাকড়ি, জিনিসপত্র গরু-বাছুর আমি থানায় জিম্মা রাখছি। পরে যদি দেবু পণ্ডিত আর কামারণীর হক্ পাওনা হয়—বুঝে নেবে আদালত থেকে।

রাঙাদিদির সৎকারে দেবু শ্রীহরিকে হাত দিতে দেয় নাই। বলিয়াছিল—রাঙাদিদির দেহখানির ভেতরে সোনা-দানা নাই। রাঙাদিদির দেহখানা এখন আর কারও প্রজা নয়, খাতকও নয়। জমিদার হিসাবে তোমাকে সৎকার

করতে আমরা দোব না। আর যদি তুমি আমাদের স্বজাত হিসেবে আসতে চাও, তবে এস—যেমন আর পাঁচজনে কাঁধ দিচ্ছে, তুমিও কাঁধ দাও। মুখে আগুন আমি দোব। সে আমাকে বলে গিয়েছে। তার জন্যে কোন সম্পত্তি বা তার টাকা আমি দাবী করব না।

শ্রীহরি উঠিয়া পড়িয়া বলিয়াছিল—কালু, বস্ ঐখানে। জমাদারবাবু নমস্কার, আমি এখনই যাই। আপনি সব জিনিস-পত্রের লিষ্টি করে যাবেন তা হলে। আর, যাবার সময় চা খেয়ে যাবেন কিন্তু।

শ্রীহরির এই চলিয়া যাওয়াটাকে—লোকে তাহার পলাইয়া যাওয়াই ধরিয়া লইল। জগন ঘোষ খুশী হইয়াছিল সকলের চেয়ে বেশী। কিন্তু তাহার চেয়েও খুশী হইয়াছিল পদ্ম নিজে। এই বর্বর চেহারার লোকটাকে দেখিলেই সে শিহরিয়া উঠে! সেদিনকার সেই নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সাপের মত চাহিয়া থাকার কথাটা মনে পড়িয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া সে দেবুর প্রতি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে পারে নাই। লোকে যখন দেবুর প্রশংসা করিতেছিল, তখন সে অবগুণ্ঠনের অন্তরালে ঠোঁট বাঁকাইয়াছিল। জীবনে দেবুর প্রতি বিরাগ তাহার সেই প্রথম। পণ্ডিতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রীতি কৃতজ্ঞতা করুণার তার সীমা ছিল না। কিন্তু দেবুর সেদিনকার আচরণে সে তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

কেন সে সকলের কাছে টাকার কথাটা প্রকাশ করিয়া দিল? দুর্গা বলে—জামাই আমাদের পাথর। পাথরই বটে। পণ্ডিতের টাকার প্রয়োজন নাই, কিন্তু পদ্মর তো প্রয়োজন ছিল। তাহার স্বামী তাহাকে ভাসাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, এককণা খাইবার সংস্থান নাই; তাহাকে যদি দয়া করিয়া একজন টাকা দিয়া গেল তো দেবু ধার্মিক বৈরাগী সাজিয়া তাহাকে সে প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া দিল! দেবুর খাইয়া-পরিয়া সে আর কতদিন থাকিবে? কেন থাকিবে? দেবু তাহার কে?

রাঙাদিদি ছিল সেকালে সিধা মানুষ। সে কতদিন পদ্মকে বলিয়াছে—ওলো, দেবাকে একটুকুন্ ভাল করে যত্ন-আত্তি করিস্। ও বড় অভাগা, ওকে একটু আপনার করে নিস্।

পদ্মর সামনেই দেবুকে বলিয়াছে—দেবা, বিয়ে-থাওয়া না করিস্ তো একটা যত্ন-আত্যির লোক তো চাই ভাই। পদ্মকে তুই তো বাঁচিয়ে রেখেছিস—তা ওই তোর সেবা-যত্ন করুক। ওকে বরং তুই ঘরেই নিয়ে যা। মিছে কেনে দুটো জায়-গায় রান্না-বান্না, আর তুই-ই বা হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাস্ কেনে!

দেবু পণ্ডিত, পণ্ডিতের মতই গম্ভীরভাবে বলিয়াছিল—না দিদি! মিতেনী নিজের ঘরেই থাকবে।

বুড়ী তবু হাল ছাড়ে নাই, পদ্মকে বলিয়াছিল—তুই একটুকুন বেশ ভাল করে যত্ন-আত্যি করবি, বুঝলি?

যত্ন-আত্মীয়তা করিবার প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সে তাহা করিতে পায় নাই। দেবুই তাহাকে সে সুযোগ দেয় নাই। সে-ই বা কেন দেবুর দয়ার অন্ন এমন করিয়া খাইবে? বুড়ী রাঙাদিদির টাকাটা পাইলে—সে এখান হইতে কোথাও চলিয়া যাইত। তাই সে বুড়ীর জন্য এমন করিয়া কাঁদিতেছে।

দুর্গা উঠান হইতে ডাকিল—কামার-বউ কোথা হে!

পদ্ম উঠিয়া বসিল; চোখ মুছিয়া সাড়া দিল—এই যে আছি।

দুর্গা কাছে আসিয়া বলিল—কাঁদছিলে বুঝি? তাহলে শুনেছ নাকি?

পদ্ম সবিস্ময়ে বলিল—কি?—হঠাৎ এমন কি ঘটিল যাহা শুনিয়া সে আরও খানিকটা কাঁদিতে পারে? অনিরুদ্ধের কি কোন সংবাদ আসিয়াছে? যতীন-ছেলের কি কোন দুঃসংবাদের চিঠি আসিয়াছে দেবু পণ্ডিতের কাছে? উচ্চিংড়ে কি জংশন শহরে রেলে কাটা পড়িয়াছে?

দুর্গার মুখ উত্তেজনায় থম্ থম্ করিতেছে।

—কি দুর্গা? কি?

—তোমাকে আর দেবু পণ্ডিতকে পতিত করছে ছিরু পাল!—দুর্গা ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিল। উত্তেজনায় রাগে ঘৃণায় সে শ্রীহরিকে সেই পুরানো ছিরু পাল বলিয়াই উল্লেখ করিল।

—পতিত করবে? আমাকে আর পণ্ডিতকে?

—হ্যাঁ। পণ্ডিত আর তোমাকে!—হাসিয়া দুর্গা বলিল—তা তোমার ভাগ্যি

ভাল ভাই। তবে আমিও বাদ যাব না।

একদৃষ্টে দুর্গার মুখের দিকে চাহিয়া পদ্ম প্রশ্ন করিল—কাই বলছে ? কে বলছে !

—ঘোষ মশায়-ছিরে পাল গো, যে এককালে মুচীর মেয়ের এঁটো মদ খেয়েছে, মুচীর মেয়ের ঘরে রাত কাটিয়েছে, মুচীর মেয়ের পায়ে ধরেছে। রাঙা-দিদির ছেরাদ্দ হবে, সেই ছেরাদ্দে পঞ্চগেরামী জাত-জ্ঞাত আসবে, বামুন-পণ্ডিত আসবে, সেইখানে তোমাদের বিচার হবে। পতিত হবে তোমরা।

মৃদু হাসিয়া পদ্ম বলিল—আর তুই ?

—আমি !—দুর্গা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।—আমি !—দুর্গার সে হাসি আর থামে না। দুই দিকে পাড় ভাঙিয়া বর্ষার নদী খল্-খল্ করিয়া অবিরাম যে হাসি হাসে—সেই হাসির উচ্ছ্বাস। তাহার মধ্যে যত তাচ্ছিল্য তত কৌতুক ফেনাইয়া উঠিতেছে। খানিকক্ষণ হাসিয়া সে বলিল—আমি সেদিন সভার মাঝে একখানা ঢাক কাঁধে নিয়ে বাজাব আর নাচব ; আমার যত নষ্ট কীর্তি সব বলব। সতীশ দাদাকে দিয়ে গান বাঁধিয়ে নোব। বামুন, কায়েত, জমিদার, মহাজন—সবারই নাম ধরে বলব। ছিরু পালের গুণের কথা হবে আমার গানের ধুয়ো।

দুর্গা যেন সত্য সত্যই নাচিতেছে। পদ্মরও এমনই করিয়া নাচিতে ইচ্ছা হয়। সে বলিল—আমাকেও সঙ্গে নিস্ ভাই, আমি কাঁসি বাজাব তোর ঢাকের সঙ্গে।

কিছুক্ষণ পর দুর্গা বলিল—যাই ভাই, একবার জামাই পণ্ডিতকে বলে আসি।—বলিয়া সে তেমনি ভাবে প্রায় নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল।

পণ্ডিত শুনিয়া কি বলিবে! পদ্মরও বড় কৌতূহল হইল—সঙ্গে সঙ্গে সে অপরিমেয় কৌতুকও বোধ করিল। যাক্ আজ দেখা হইল না, নাই-বা হইল। দেখিতে তো সে পাইবে পঞ্চগ্রামের সমাজপতিগণের সম্মুখে যেদিন বিচার হইবে, সেদিন সে দেখিবে। কি বলিবে দেবু পণ্ডিত, কি করিবে সে ? তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে প্রতিবাদ করিবে, লম্বা ওই মানুষটি আগুনের শিখার মত জ্বলিতেছে মনে হইবে। কিন্তু পাঁচখানা গাঁয়ের জাত-জ্ঞাতি, নবশাখার মাতব্বরবর্গ তাহাতে কি বাগ মানিবে ? পদ্ম জোর করিয়া বলিতে পারে—মানিবে না। এ চাকলার লোকে শ্রীহরি ঘোষের চেয়ে পণ্ডিতকে বহুগুণে বেশী ভালবাসে, এ কথা খুব সত্য ;

তবু তাহারা দেবুর কথা সত্য বলিয়া মানিবে না ; লোককে চিনিতে তো তাহার বাকি নাই! প্রতিটি মানুষ তাহার দিকে যখন চাহিয়া দেখে, তখন তাহাদের চোখের চাহনি যে কি কথা বলে সে তা জানে। তাহারা এমন একটি অনাত্মীয়া যুবতী মেয়েকে অকারণে ভরণ-পোষণ করিবার মত রসালো কথা শুনিয়া, সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাতে-নাতে পাইয়াও বিশ্বাস করিবে না—এমন কখনও হয়? আকাশ হইতে দেবতারাও যদি ডাকিয়া বলেন—কথাটা মিথ্যা, তবু তাহারা মিথ্যাই বিশ্বাস করিবে। তাহার উপর শ্রীহরি ঘোষ করিবে লুচি-মণ্ডার বন্দোবস্ত! বিশেষ করিয়া পাকামাথা বুড়াগুলি ঘন ঘন ঘাড় নাড়িবে আর বলিবে—"উঁহু! বাপু হে, শাক দিয়া মাছ ঢাকা যায় না!" তখন পণ্ডিত কি করিবে? তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, হয়ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে! কে জানে? পণ্ডিতের সম্বন্ধে ও কথাটা ভাবিতে তাহার কষ্ট হইল।

পণ্ডিত তাহাকে পরিত্যাগ না করুক, সে এইবার পণ্ডিতের সকল সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিবে। তাহার সহিত কোন সংস্রব সে রাখিবে না। ওই পঞ্চায়েতের সামনেই সে-কথা সে মুখের ঘোমটা খুলিয়া—দুর্গার মত ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিবে—পণ্ডিত ভাল মানুষ গো, তোমরা যেমন—সে তেমন নয়। তার চোখের উপর চাউনিতে কেরোসিনের ডিবের শীষের মত কালি পড়ে না! আমাকে নিয়েও তোমরা ঘোঁট পাকিয়ো না। আমি চলে যাব ; যাব নয়, যাচ্ছি—এ গাঁ থেকে চলে যাচ্ছি। কারুর দয়ার-ভাত আমি আর খাব না। তোমাদের পঞ্চায়েতকে আমি মানি না, মানি না, মানি না।

কেন সে মানিবে? কিসের জন্য মানিবে? ঘোষ যখন চুরি করিয়া তাহাদের জমির ধান কাটিয়া লইয়াছিল—তখন পঞ্চায়েৎ তাহার কি করিয়াছে? ঘোষের অত্যাচারে তাহার স্বামী সর্বস্বান্ত হইয়া গেল—তাহার কি করিয়াছে পঞ্চায়েৎ? তাহার স্বামী নিরুদ্দেশ হইয়া গেল—কে তাহার খোঁজ করিয়াছে? সে খাইতে পায় নাই পঞ্চায়েৎ কয় মুঠা অন্ন তাহাকে দিয়াছে? তাহাকে রক্ষা করিবার কি ব্যবস্থা করিয়াছে? তাহারা তাহার স্বামীকে ফিরাইয়া আনুক—তবে বুঝি। তাহাদের যে সব সম্পত্তি শ্রীহরি ঘোষ লইয়াছে সেগুলি ফিরাইয়া দিক—তবেই

পঞ্চায়েতকে মানিবে। নতুবা কেন মানিতে যাইবে?

দেবু পণ্ডিত পাথর। দুর্গা বলে সে পাথর। নহিলে সে আপনাকে তাহার পায়ে বিকাইয়া দিত! তাহাকে দেখিয়া তাহার বুকের ভিতরটা ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠে, এই বর্ষাকালের রাত্রির জোনাকি-পোকা-ভরা গাছের মত জ্বল্‌-জ্বল্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠে; কিন্তু পরক্ষণেই নিভিয়া যায়। আজ সে সব ঝরিয়া যাক, ঝরিয়া যাক। দেবুর ভাত সে আর খাইবে না। সে আবার মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

দুর্গা আসিয়া দেখিল—পণ্ডিত নাই। দরজায় তালা বন্ধ। বাহিরের তক্তা-পোশের উপর একটা কুকুর শুইয়া আছে। রোঁয়া-ওঠা একটা ঘেয়ো কুকুর। পণ্ডিত ফিরিয়া আসিয়া ওইখানেই বসিবে, বেশী শ্রান্ত হইয়া আসিলে—হয়তো ওইখানেই শুইয়া পড়িবে। তাহার বিলু-দিদির সাধের ঘর। একটা ঢেলা লইয়া কুকুরটাকে সে তাড়াইয়া দিল। সেই রাখাল ছোঁড়া খামারের মধ্যে একা মনের উল্লাসে প্রাণ খুলিয়া একেবারে সপ্তম সুরে গান ধরিয়া দিয়াছে—

"কেঁদো নাকো পান-পেয়সী গো,
তোমার লাগি আনব ফাঁদি নৎ।"

মরণ আর কি ছোঁড়ার! কতই বা বয়স হইবে? পনেরো পার হইয়া হয়তো যোলয় পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে প্রাণ-প্রেয়সীর কান্না থামাইবার জন্য ফাঁদি নৎ কিনিবার স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে! দুর্গা ছোঁড়াকে কয়েকটা শক্ত কথা বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। সে খামার বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল। ছোঁড়া তন্ময় হইয়া গান গাহিতেছে আর খস্‌ খস্‌ করিয়া খাঁটিখড় কাটিতেছে। দুর্গার পায়ের শব্দ তাহার কানেই ঢুকিল না। দুর্গা হাসিয়া ডাকিল—ওরে ওই! ও পান পেয়সী!

ছোঁড়া মুখ ফিরাইয়া দুর্গাকে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। গান বন্ধ করিয়া আপন মনেই খুক্‌ খুক্‌ করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

দুর্গা হাসিয়া বলিল—তোর কাছে এলাম ফাঁদি নতের জন্যে। দিবি আমাকে?

ছোঁড়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া বলিল—ধ্যেৎ !

—কেনে রে ? আমাকে সাঙা কর্‌ না কেনে ! শুধু কাঁদি নৎ দিলেই হবে।

ছোঁড়া এবার খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া সারা হইল।

দুর্গা বলিল—মরণ তোমার ! গলা টিপলে দুধ বেরোয়, একবার গানের ছিরি দেখ।

ছোঁড়া এবার ভ্রূ নাচাইয়া বলিল—মরণ লয় ! এইবার সাঙা করব আমি।

—কাকে রে ?

—হু। দেখ্‌বা এই আশ্বিন মাসেই দেখ্‌বা।

—ভোজ দিবি তো ?

—মুনিবকে টাকার লেগে বলেছি।

—মুনিব গেল কোথা তোর ?

ছোঁড়া এবার সাহসী হইয়া ন্যাকামির সুরে জিজ্ঞাসা করিল—একবার দেখে পরানটো জুড়োতে অ'ইছিলি বুঝি ?

দেবুর প্রতি দুর্গার অনুরাগের কথা গোপন কিছু নয় ; সে মুখে বলে না, কিন্তু কাজে-কর্মে-ব্যবহারে তাহার অনুরাগের এতটুকু সঙ্কোচ নাই—দ্বিধা নাই ; সেটা সকলের চোখেই পড়ে। তাহার উপর দুর্গার-মা কন্যার এই অনুরাগের কথা লইয়া আক্ষেপের সহিত পাড়াময় প্রচার করিয়া ফেরে। এই অযথা অনুরাগের জন্যই তাহার হতভাগী মেয়ে যে হাতের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলিতেছে—এ দুঃখ সে রাখিবে কোথায় ? কঙ্কণার বাবুদের বাগানের মালীগুলো এতদিন আসা-যাওয়া করিয়া এইবার হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, আর আসে না। কন্যার উপার্জনে তাহার অবশ্য কিছু স্বার্থ নাই, তাহার একমুঠা করিয়া ভাত হইলেই দিন যায়—তবু তাহার দেখিয়া সুখ হইত। তাই তাহার এত আক্ষেপ ! দুর্গার মায়ের সেই আক্ষেপ-পীড়িত কাহিনী ছোঁড়াটাও শুনিয়াছে। দুর্গার রসিকতার উত্তরে সে এইবার কথাটা বলিয়া শোধ লইল।

দুর্গা কিন্তু রাগ করিল না—উপভোগ করিল। হাসিয়া বলিল—ওরে মুখ-পোড়া ! দাঁড়া, পণ্ডিত আসুক ফিরে, এলেই আমি বলে দোব—তুই এই কথা

বলেছিস।

এবার ছোঁড়ার মুখ শুকাইয়া গেল। বলিল—মুনিব নাই। মুনিব গিয়েছে কুসুমপুর, সেঁথা থেকে যাবে কঙ্কণা।

—ফিরবে তো?

ছোঁড়া বলিল—কঙ্কণা থেকে হয়ত জংশন যাবে। হয়ত সদরে যাবে। আজ-কাল হয়ত ফিরবে না। পরশুও ফিরবে কিনা কে জানে।

দুর্গা সবিস্ময়ে বলিল—জংশনে যাবে, সদরে যাবে, পরশুও হয়ত ফিরবে না। কেন রে? কি হয়েছে?

দুর্গাকে চিন্তিত দেখিয়া ছোঁড়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। এইবার দুর্গা সে কথাটা ছাড়িয়াছে। সে খুব গম্ভীর হইয়া বলিল—মুনিবের কথা মুনিবকেই ভাল। কে জানে বাপু! হেঁথা ঝগড়া হল লোকে লোকে, ছুটল মুনিব। হোঁথা দাঙ্গা হল রামায় শামায় মুনিব আমার ছুটল! কুসুমপুরে শ্যাখেদের সাথে কঙ্কণার বাবুদের দাঙ্গা হয়েছে না কি হয়েছে—মুনিব গেল ছুটতে ছুটতে।

—কঙ্কণার বাবুদের সঙ্গে কুসুমপুরের শেখদের দাঙ্গা হয়েছে? কোন্ বাবু? কোন্ শেখদের? কিসের দাঙ্গা রে?

—কঙ্কণার বড়বাবুদের সাঁতে আর রহম শেখ—সেই যি সেই গাঁট্টা-গাঁট্টা চেহারা, এ্যাই চাপ দাড়ী—শ্যাখজী, তারই সাঁতে।

—দাঙ্গা কিসের শুনি?

—কে জানে বাপু! শ্যাখ বাবুদের তালগাছ কেটে নিয়েছে, না কি কেটে নিয়েছে, বাবুরা তাই শ্যাখকে ধরে নিয়ে গিয়েছে, থামার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। শ্যাখেরা সব দল বেঁধে গেইছে কঙ্কণা। দেখুড়ের তিনকড়ি পাল—বানের আগু চাদি সেই আইছিল; মুনিবও চাদরটা ঘাড়ে ফেলে ছুটল।

—জংশন যাবে, সদর যাবে, তোকে কে বললে?

—দেখুড়ের সেই পাল বললে যি! বললে—কঙ্কণার থানায় নেখাতে হবে সব। তারপরে সদরে গিয়ে নালিশ করতে হবে।

বহুক্ষণ দুর্গা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর বাড়ী আসিয়া ডাকিল—বউ!

পাতুর বউ বাহির হইয়া আসিল।

—দাদা কোন্ মাঠে খাটতে গিয়েছে ?

—অমর-কুড়োর মাঠে।

দুর্গা অমর-কুণ্ডার মাঠের দিকে চলিল। মাঠে গিয়া পাতুকে বলিল—তুই একবার দেখে আয় দাদা। ধান পোঁতার কাজ আমি করতে পারব।

পাতু সতীশের মজুর খাটিতেছিল, সে কোন আপত্তি করিল না। দুর্গা আপনার পরনের ফর্সা কাপড়খানা বেশ আঁট করিয়া কোমরে জড়াইয়া—ধান পুঁতিতে লাগিয়া গেল। মেয়েরাও ধান পোঁতে, লঘু ক্ষিপ্র হাতে তাহারা পুরুষদের সঙ্গে সমানেই কাজ করিয়া যায়। দুর্গাও এককালে করিয়াছে, অল্প বয়সে সে তাহার দাদার জমিতে ধান পুঁতিত। এখন অবশ্য অনেকদিনের অনভ্যাস। প্রথম কয়েকটা গুচ্ছ কাদায় পুঁতিতে খানিকটা আড়ষ্টতা বোধ করিলেও অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ভাবটা কাটিয়া গেল। জমিভরা জলে তাহার রেশমী চুড়িপরা হাত ডুবাইয়া জলের ও চুড়ির বেশ একটা মিঠা শব্দ তুলিয়া ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সারবন্দী ধানের গুচ্ছ পুঁতিয়া যাইতে আরম্ভ করিল।

সে একা নয়, মাঠে অনেক মেয়ে ধান-চারা পুঁতিতেছে। কোলের ছেলেগুলিকে মাঠের প্রশস্ত আলের উপর শোয়াইয়া দিয়াছে। মধ্যে মধ্যে মেঘলা আকাশ হইতে ফিনফিনে ধারায় বৃষ্টি ঝরিতেছে। ছেলেগুলির উপর আচ্ছাদন দিয়া তালপাতার ছাতা ভিজা মাটিতে পুঁতিয়া দিয়াছে। অপরিমেয় আনন্দের সহিত এরকম কাজ করিয়া চলিয়াছে কৃষক-দম্পতি। স্বামী করিতেছে হাল, স্ত্রী পুঁতিতেছে ধানের গুচ্ছ; প্রচণ্ড বিক্রমে স্বামী ভারী কোদাল চালাইয়া চলিয়াছে, স্ত্রী পায়ের চাপে টিপিয়া বাঁধিতেছে আল। বৃষ্টির জলে সর্বাঙ্গ ভিজিয়াছে, কাদায় ভরিয়া গিয়াছে সর্ব-দেহ। মধ্যে মধ্যে রোদ উঠিয়া গায়ের জল-কাদা শুকাইয়া দরদর ধারে ঘাম বহাইয়া দিতেছে, শ্রাবণ-শেষের পুবালী বাতাসে মাথার চুলের গুচ্ছ উড়িতেছে; পুরুষদের কণ্ঠে মেঠো দীর্ঘ সুরের গান দূর-দূরান্তে গিয়া মিলাইয়া যাইতেছে।

মেয়েরা ধান পুঁতিতে পুঁতিতে এক পা করিয়া পিছাইয়া আসিতেছে—এক-তালে পা পড়িতেছে, হাতগুলিও উঠিতেছে-নামিতেছে একসঙ্গে, একসঙ্গেই

বাজিতেছে রূপাদস্তার কাঁকন ও চুড়ি। পুরুষেরা ক্লান্ত হইয়া গান বন্ধ করিলে তাহারা ধরিতেছে সেই গানেরই পরের কলি, অথবা ওই গানের উত্তরে কোন গান। পঞ্চগ্রামের সুবিস্তীর্ণ মাঠে শত শত চাষী এবং শ্রমিক চাষীর মেয়ে—বিশেষ ভাবে সাঁওতাল মেয়েরা চাষ করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের মধ্যে মিশিয়া দুর্গা ধান পুঁতিতে পুঁতিতে মধ্যে মধ্যে চাহিতেছিল কঙ্কণার পথের দিকে।

এগার

সমগ্র অঞ্চলটা একদিনে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উত্তেজনায় চাঞ্চল্যে অধীর হইয়া উঠিল। সামান্য চাষী প্রজারও যে মান-মর্যাদার অনেকখানি দাবি আছে, দেশের শাসনতন্ত্রের কাছে জমিদার ধনী মহাজন এবং তাহার মান-মর্যাদার কোন তফাত নাই—এই কথাটি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তাহারা না-বুঝিলেও আভাসে অনুভব করিল। ব্যাপারটা ঘোরালো করিয়া তুলিয়াছে—কুসুমপুরের পাঠশালার মৌলভী ইরসাদ এবং দেবু।

রহম তিনকড়িকে সেদিন একটা তালগাছ বিক্রয়ের কথা বলিয়াছিল। আসন্ন ঈদলফেতর পর্ব এবং শ্রাবণ-ভাদ্রের অনটনে বিব্রত হইয়া যখন সে ধান বা টাকা ঋণের সন্ধানে এদিক-ওদিক ঘুরিতেছিল, তখনই সে শুনিয়াছিল জংশন শহরে কলিকাতার কলওয়ালার কলে নূতন শেড্ তৈয়ারী হওয়ার কথা। শেডের জন্ত ভাল পাকা তালগাছের প্রয়োজন—এ খবর সে তাহাদের গ্রামের করাতীদের কাছে শুনিয়াছিল। করাতী আবু শেখ বলিয়াছিল—বড় ভাই, সোনা-ডাঙালের মাঠে আউশের ক্ষ্যাতের মাথায় গাছটারে দাও না কেনে বেচ্যা। মিলের মালিক দাম দিচ্ছে একারে চরম। কুড়ি টাকা তো মিলবেই ভাই!

গরু-ছাগলের পাইকার ব্যবসায়ীরা যেমন কোথায় কাহার ভাল পশু আছে খোঁজ রাখে, কাঠ-চেরা ব্যবসায়ে নিযুক্ত এই করাতীরাও তেমনি কোথায় কাহার ভাল গাছ আছে খোঁজ রাখে। অভ্যাসও বটে এবং প্রয়োজনও আছে। কাহারও নূতন ঘর-দুয়ার তৈয়ারী হইতেছে সন্ধান পাইলেই সেখানে গিয়া হাজির হয়।

ঘরের কাঠ চিরিবার কাজ ঠিকা করিয়া লয় ; গাছের অভাব পড়িলে তাহারাই সন্ধান বলিয়া দেয় কোথায় তাহার প্রয়োজনমত ঠিক গাছটি পাওয়া যাইবে। কলওয়ালার শেডটা প্রকাণ্ড বড়, তার চালকাঠামোর জন্য তালগাছ চাই—সাধারণ গাছ অপেক্ষা অনেক লম্বা গাছ, শুধু লম্বা হইলেই হইবে না—সোজা গাছ চাই এবং আগাগোড়া পাকা অর্থাৎ সারসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। লোহার 'টি' এবং 'এ্যাঙ্গেলের' কাজ চালাইতে হইবে—এই কাঠগুলিকে। লোহা এবং কাঠের দাম হিসাব করিয়া কলওয়ালা দেখিয়াছে—ওখানে গাছ যে দরে কেনা-বেচা হয়, তাহা অপেক্ষা তিনগুণ দাম দিলেও তাহার খরচ অর্ধেক কমিয়া যাইবে। সে চলতি দর অপেক্ষা দ্বিগুণ দাম ঘোষণা করিয়া দিয়াছে। যে গাছটির দিকে আবুর দৃষ্টি পড়িয়াছিল—এখানকার দরে সে গাছটির দাম পনরো টাকার বেশী হয় না ; তাই সে কুড়ি টাকা বলিয়াছিল।

অন্য সময় কেহ এ প্রস্তাব করিলে রহম তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে হাঁকাইয়া দিত —প্যাটে কি আমার আগুন লেগেছে না লক্ষ্মী ছেড়েছে যে ঐ গাছটা বেচতি যাব ? ভাগ্, ভাগ্ বুঝছি, শয়তান কুথাকার !

গাছটা তাহাদের সংসারের বড় পেয়ারের গাছ। তাহার দাদু গাছটা লাগাইয়া গিয়াছিল। কোথায় কোন্ মেহমান অর্থাৎ কুটুম্ব বাড়ী গিয়া সেখান হইতে একটা প্রকাণ্ড বড় পাকা তাল আনিয়াছিল। তালটার মাড়ি অর্থাৎ ঘন-রস যেমন মিষ্ট তেমনি সুগন্ধ। সাধারণ তালের তিনটা আঁটি, এ তালটার আঁটি ছিল চারিটি। সোনা-ডাঙ্গালের উঁচু ডাঙ্গায় তখন সে সদ্য মাটি কাটিয়া জমি তৈয়ারী করিয়াছে। সেই জমির আলে সে ওই চারিটি আঁটিই পুঁতিয়া দিয়াছিল। গাছ হইয়াছিল একটা। আজ তিনপুরুষ ধরিয়া গাছটা বাড়িয়া বুড়া হইয়াছে। সার তাহার আগাগোড়া। তা ছাড়া খোলা সমতল মাঠের উপর জন্মিবার সুযোগ পাইয়া গাছটা একেবারে সোজা তীরের মত উপর দিকে উঠিয়াছিল। এ গাছ বেচিবার কল্পনাও কোনদিন রহমের ছিল না। কিন্তু এবার সে বড় কঠিন ঠেকায় ঠেকিয়াছিল ; এই সময় পনরো টাকার স্থলে কুড়ি টাকা দামও প্রলুব্ধ করিবার মত ; আবুর কথায় তাই প্রতিবাদ না করিয়া চুপ করিয়াই ছিল। আরও একটা কথা

তাহার মনে হইয়াছিল।—বাবু যখন কুড়ি বলিয়াছে, তখন সে নিশ্চয় কিছু হাতে রাখিয়াছে। তাই সে সেদিন নিজেই গিয়াছিল কলওয়ালার কাছে। কলওয়ালাও পূর্বেই গাছটির সন্ধান করিয়াছিল। সে এক কথাতেই নিজের হিসাবমত বলিয়াছিল—যদি গাছ বেচ, আমি ত্রিশ টাকা দাম দিব।

—তিরিশ টাকা? রহম অবাক হইয়া গিয়াছিল।

—রাজী হও যদি, টাকা নিয়ে যাও। দর-দস্তুর আমি করি না। এর পর আর কোন কথা আমি বলব না।

রহম আর রাজী না হইয়া পারে নাই। চাষের সময় চলিয়া যাইতেছে, ঘরে ধান-চাল ফুরাইয়া আসিয়াছে। মুনিষ-জনকে ধান দিতে হয়, তাহারা খোরাকী ধানের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছে। ধান না পাইলেই বা কি খাইয়া চাষে খাটিবে? তাহার উপর রমজানের মাস, রোজা উদ্‌যাপনের দিন দ্রুত আগাইয়া আসিতেছে, তাহার ছেলেমেয়েরা ও স্ত্রী-দুইটি কত আশা করিয়া রহিয়াছে—কাপড়-জামা পাইবে। এ সময় রাজী না হইয়া তাহার উপায় কি? এক উপায় জমিদারের কাছে মাথা হেঁট করিয়া বৃদ্ধি দেওয়া, কিন্তু সে তাহা কোনমতেই পারিবে না। 'বাং' যখন দিয়াছে তখন জাতের রক্ষ করিয়াছে, সে বাং খেলাপী হইলে—তাহার ইমান্ কোথায় থাকিবে? রমজানের পবিত্র মাস, সে রোজা রক্ষা করিয়া যাইতেছে, আজ ইমান্-ভঙ্গের গুনাহ্ করিতে পারিবে না।

এইখানেই কলওয়ালার সঙ্গে তাহার দাদনের কথাও হইয়াছিল। মিলের গুদাম-ঘরে ও বাহিরের উঠানে রাশি-রাশি ধান দেখিয়া রহম আত্মসংবরণ করিতে পারে নাই, বলিয়াছিল—আমাদের কিছু ধান 'বাড়ি', মানে দাদন দ্যান কেনে? পৌষ মাঘ মাসে দিবেন। সুদ সমেত পাবেন।

কলওয়ালা তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল—ধান না, টাকা দাদন দিতে পারি।

—টাকা নিয়ে কি করব গো বাবু? আমাদের ধান চাই। আমরা বুঝি ধান।

—ধানেই টাকা, টাকাতেই ধান। টাকার দাদন নিয়ে ধান কিনে নেবে।

—তা—আপনার কাছেই কিনব তো—

—না। আমি ধান বেচি না। চাল বেচি। তাও দু' মণ চার মণ দশ মণ না! দুশো-চারশো মণের কম হলে বেচি না। তোমরা টাকা নিয়ে এখানকার গদিওয়ালার কাছে কিনে নাও

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া রহম বলিয়াছিল—সুদ কত নেবেন টাকায়?

—সুদ নেব না; পৌষ-মাঘ মাসে—কিস্তির মুখে টাকার পরিমাণে ধান দিতে হবে। যে দর থাকবে, দরে টাকায় এক আনা কম দরে দিতে হবে। আর একটি শর্ত আছে।

—বলেন। কি শর্ত?

—তোমরা যারা দাদন নেবে, তারা অন্য কাউকে ধান বেচতে পারবে না। এর অবিশ্যি লেখাপড়া নাই, কিন্তু কথা দিতে হবে। তোমরা মুসলমান—ইমানের উপর কথা দিতে হবে।

রহম সেদিন বলিয়াছিল—আচ্ছা আমরা শলা-পরামর্শ কর্যা বলব।

—বেশ।—মিলওয়ালা মনে মনে হাসিয়াছিল।—তালগাছের টাকাটা আজই নিয়ে যেতে পার।

—আজ্ঞা, পরে আসব। সব ঠিক কর্যা যাব।

মজলিশে টাকা দাদন লওয়া স্থির হইয়াছিল, রহম তালগাছ বিক্রি করিতে মনস্থ করিয়াছিল। তাহার দুই স্ত্রীই কিন্তু গাছের শোকে চোখের জল ফেলিয়াছিল—এমন মিঠা তাল! তিন পুরুষের গাছ! কত লোকে তাহাদের বাড়ীতে তাল চাহিতে আসে। ভাদ্র মাসে তাল পাকিয়া আপনি খসিয়া পড়ে, ভোররাত্রি হইতে নিম্নশ্রেণীর ছেলেমেয়েরা তাল কুড়াইয়া লইয়া যায়। খসিয়া পড়া তালে এ অঞ্চলে কাহারও স্বত্ব-স্বামিত্ব নাই। তাই রহম তালগুলিতে পাক ধরিলে—খসিয়া পড়িবার পূর্বেই কাটিয়া ঘরে আনে। দুঃখ তাহারও যথেষ্ট হইতেছিল; কিন্তু তবুও উপায় কি? সেদিন গিয়া সে গাছ বিক্রি করিয়া টাকা লইয়া আসিল; এবং টাকা দাদন লওয়ারও পাকা কথা দিয়া আসিল।

একটা কথা কিন্তু রহমের মনে হয় নাই। সেইটাই আসল কথা। ওই

গাছটার স্বামিত্বের কথা। তিন পুরুষের মধ্যে স্বামিত্বের পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে কথাটা তাহার মনেও হয় নাই। তাহার পিতামহ জমিদারের কাছে তাকা বন্দোবস্ত লইয়া নিজ হাতে জমি কাটিয়াছিল। কিন্তু তাহার বাপ শেষ বয়সে ঋণের দায়ে ওই জমি বেচিয়া গিয়াছে কঙ্কণার মুখুয্যেবাবুকে। মুখুয্যেবাবুরা মস্ত মহাজন—লক্ষপতি লোক। এমনি ধারার ঋণের টাকায় এ অঞ্চলের বহু জমির স্বামিত্ব তাহাদিগকে অর্শিয়াছে। হাজার হাজার বিঘা জমি তাহাদের কবলে। এত জমি কাহারও নিজের তত্ত্বাবধানে চাষ করানো অসম্ভব। আর তাহারা চাষীও নয়; আসলে তাহারা মহাজন জমিদার। তাই সকল জমিই তাহাদের চাষীদের কাছে ভাগে বিলি করা আছে। তাহারা চাষ করে, ফসল উঠিলে বাবুদের লোক আসে। দেখিয়া-শুনিয়া প্রাপ্য বুঝিয়া লইয়া যায়। রহমের বাপ জমি বিক্রি করিবার পর—বাবুর কাছে জমিটা ভাগে চষিবার জন্ত চাহিয়া লইয়াছিল। তাহার বাপ জমি চষিয়া গিয়াছে, রহমও চষিতেছে। কোন দিন একেবারের জন্ত তাহাদের মনে হয় নাই যে জমিটা তাহাদের নয়। খাজনার পরিবর্তে ধানের ভাগ দেয় এই পর্যন্ত। সেই মতই সে জমিগুলির তদ্বির-তদারক করিতেছে। মজুর নিযুক্ত করিয়া, উন্নতিসাধনের প্রয়োজন হইল—সেই করিয়াছে; বাবুদের নিকট হইতে সেই বাবদ টাকা চাহিবার কথা কোন দিন মনে উঠে নাই! মুখে বরাবর দশের কাছে বলিয়া আসিয়াছে—আমার বাপুতি জমি। মনে মনে জানিয়া আসিয়াছে—আমার জমি। ওই জমির ধান কাটিয়াই নবান্ন পর্ব করিয়াছে। তাই তালগাছটা যখন সে বেচিল, তখন তাহার একবারের জন্তও মনে হইল না—সে অন্তের গাছ বেচিতেছে, একটা অন্যায় কাজ করিতেছে।

গাছটা কাটিয়া মিলওয়ালা তুলিয়া লইয়া যাইবার পর, হঠাৎ আজ সকালে রহমের বাড়ীতে ভোরবেলায় একজন চাপরাসী আসিয়া হাজির হইল! বাবুর তলব, এখনি চল তুমি।

রহম বলদ-গরু দুইটিকে খাইতে দিয়া তাহাদের খাওয়া শেষ হওয়ার অপেক্ষা করিতেছিল। সে বলিল—উ বেলায় যাব বলিয়ো, বাবুকে হে।

—উঁহু! এখুনি যেতে হবে।

রহম মাতব্বর চাষী, গোঁয়ার লোক—সে চটিয়া গেল ; বলিল—এখুনি যেতে হবে মানে ? আমি কি তুর বাবুর খরিদ-করা বান্দা গোলাম ?

লোকটা রহমের হাত চাপিয়া ধরিল। সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী দুর্ধর্ষ রহম তাহার গালে কষাইয়া দিল প্রচণ্ড একটা চড়।—আস্পর্ধা বটে, আমার গায়ে হাত দিস্ !

লোকটা জমিদারের চাপরাসী। ইন্দ্রের ঐরাবতের মতই তাহার দম্ভ, তেমনি হেলিয়া-দুলিয়াই চলা-ফেরা করে। তাহাকে এ অঞ্চলে কেহ এমনি করিয়া চড় মারিতে পারে—এ তাহার ধারণার অতীত ছিল। চড় খাইয়া মাথা ঘুরিয়া গেলেও —সামলাইয়া উঠিয়া সে একটা হুকার ছাড়িল। রহম সঙ্গে সঙ্গে কষাইয়া দিল অন্য গালে আর একটা চড় , এবং দাওয়ার উপর হইতে লাঠি লইয়া প্রচণ্ড বিক্রমে ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

এবার চাপরাসীটার হুঁশ হইল। কোন কিছু না বলিয়া সে ফিরিয়া গিয়া জমিদারের পায়ে গড়াইয়া পড়িল। রহমের চপেটাঘাতাঙ্কিত বেচারার স্ফীত ব্যথিত গাল দুইটা চোখের জলে ভাসিয়া গেল—আর আপনার চাকরি করতে পারব না হুজুর ! মাপ করুন আমায়।

ব্যাপার শুনিয়া বাবু ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে গেল পাঁচ-পাঁচজন লাঠিয়াল। রহমকে চাষের ক্ষেত হইতে তাহারা উঠাইয়া লইয়া গেল। সম্রাট্ আলমগীর যেমন আপনার শক্তি ও ঐশ্বর্যের চরম প্র[illegible]নীর মধ্যে বসিয়া 'পার্বত্য মূষিক' শিবাজীর সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন—বাবুও ঠিক তেমনি ভাবে রহমের সঙ্গে দেখা করিলেন। তাঁহার খাস বৈঠকখানার বারান্দায় রহমকে হাজির করা হইল। সেখানে পাইক-চাপরাসী-পেশ্কার-গোমস্তা গিস্‌গিস্ করিতেছিল , বাবু তাকিয়ায় হেলান দিয়া ফরসী টানিতেছিলেন।

রহম সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। বাবু কথাও বলিলেন না।

সে ক্ষুব্ধ হইয়া একটা বসিবার কিছু খুঁজিতেছিল, কিন্তু [illegible] কয়েক চেয়ার ছাড়া আর কোন আসনই ছিল না। শুধু মাটির উপর বসিতেও তাহার মন চাহিতেছিল না। তাহার আত্মাভিমানে আঘাত লাগিল। পশ্চিমবঙ্গের মুসল-

মান চাষী—যাহাদের জমি-জেরাত আছে, তাদের সবারই এ আত্মাভিমানটুকু আছে। কতক্ষণ মানুষ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে? তাহা ছাড়া তাহাকে কেহ একটা সম্ভাষণ পর্যন্ত করিল না। চারিদিকের এ নীরব উপেক্ষা ও বাবুর এই একমনে তাম্রকূট সেবন যে তাহাকে শুধু অপমান করিবার জন্যই— ইহা বুঝিতেও তাহার বিলম্ব হইল না।

সে এবার বেশ দৃঢ়স্বরেই বলিল—সালাম।...নিজের অস্তিত্বটা সে সংক্ষেপে জানাইয়া দিল।

রহমান বলিল – আমাদের চাষের সময়, ইটা আমাদের বস্যা থাকবার সময় লয় বাবু। কি বলছেন বলেন;

বাবু উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—আমার চাপরাসীকে চড় মেরেছ তুমি?

—উ আমার হাতে ধরেছিল কেনে? আমার ইজ্জৎ নাই। চাপরাসী আমার গায়ে হাত দিবার কে?

ঘাড় ফিরাইয়া বক্রহাস্যে বাবু বলিলেন—এইখানে যত চাপরাসী আছে, সবাই যদি তোমাকে দুটো করে চড় মারে, কি করতে পার তুমি?

রহম রাগে কথা বলিতে পারিল না। দুর্বোধ্য ভাষায় শুধু একটা শব্দ করিয়া উঠিল।

একটা চাপরাসী খাঁ করিয়া তাহার মাথায় একটা চড় কষাইয়া দিয়া বলিল—চুপ বেয়াদপ্!

রহম হাত তুলিয়াছিল; কিন্তু তিন-চারজন একসঙ্গে তাহার হাত ধরিয়া বলিল—চুপ! বস্—ওইখানে বস্।

তাহারা পাঁচজনে মিলিয়া চাপ দিয়া তাহাকে মাটির উপর বসাইয়া দিল। সে এবার বুঝিল তাহার শক্তি যতই থাক্, এতজনের কাছে তাহা নিষ্ফল—মূল্যহীন। রুদ্ধ রোষে চাপরাসীর দিকে সে একবার চাহিল। পনরোজন চাপরাসী; তাহার মধ্যে দশজন তাহার স্বধর্মী স্বজাতি, মুসলমান। রমজানের মাসে সে রোজা করিয়া উপবাসী আছে, তবু তাহাকে অপমান করিতে তাহাদের বাধিল না। রমজানের ব্রত উদ্‌যাপনের দিনে ইহাদের সঙ্গে আলিঙ্গন করিতে হইবে! মাটির দিকে

চাহিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

দেবু ঘোষের রাখালটা দুর্গাকে তিনকড়ির প্রসঙ্গে বলিয়াছিল—'বানের আগু হাদি', অর্থাৎ বন্যার অগ্রগামী জলস্রোতের মাথায় নাচিতে নাচিতে ভাসিয়া যাওয়া বস্তুসমূহ। 'হাদি' বলিতে প্রায়ই জঞ্জাল বুঝায়। তিনকড়ি জঞ্জাল কি না জানি না—তবে সর্বত্র সর্বাগ্রে গিয়া হাজির হয়। কিন্তু তাহাকে কেহ ভাসাইয়া লইয়া যায় না, সেই অন্যকে ভাসাইয়া লয়। বন্যার অগ্রগামী জলস্রোত বলিলেই বোধ হয় তিনকড়িকে ঠিক বলা হয়। মুখে মুখে সংবাদটা সর্বত্র ছড়াইয়াছে। কুসুমপুরের আরও কয়েকজন মুসলমান চাষী রহমের জমির কাছাকাছি চাষ করিতেছিল। তাহারা ব্যাপারটা দেখিয়াও কিন্তু হাল ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই। তিনকড়ি ছিল অপেক্ষাকৃত দূরে। সে ব্যাপারটা দূর হইতে দেখিয়া ঠিক ঠাওর করিতে পারে নাই। কয়েকজন লোক আসিল, রহম-ভাই হাল ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু লোকগুলির মাথার লাল পাগড়ি তাহাকে সচেতন করিয়া তুলিল। সে তৎক্ষণাৎ কৃষাণটার হাতে হালখানা দিয়া আগাইয়া আসিল। সমস্ত শুনিয়া সে ছুটিয়া গেল কুসুমপুর। ইরসাদকে সমস্ত জানাইয়া বলিল—দেখ, খোঁজ কর।

ইরসাদ চিন্তিত হইয়া বলিল—তাই তো!

ভাবিয়া চিন্তিয়া ইরসাদ একজন লোক পাঠাইয়া দিল। লোকটা আসিয়া প্রকৃত সংবাদ দিতেই ইরসাদ যেন ক্ষেপিয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ গ্রামের চাষীদের খবর পাঠাইল। তাহারা আসিবামাত্র ইরসাদ বলিল—যাবে তুমরা আমার সাথে। ছিনায়ে নিয়ে আসব রহম-ভাইকে!

পঞ্চাশ-ষাটজন চাষী সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়া উঠিল।

মুসলমানদের সাহস জিনিসটা অনেকাংশে সম্প্রদায়-গত সাধনালব্ধ জিনিস। তাহার উপর অজ্ঞতা-অসামর্থ্য-দারিদ্র্য-নিপীড়িত জীবনের বিক্ষোভ, যাহা শাসনে-পেষণে লুপ্ত হয় না—সুপ্ত হইয়া থাকে অন্তরে অন্তরে, সেই বিক্ষোভ তাহাদিগকে স্বতঃই সম্মিলিত করে একই সমবেদনার ক্ষেত্রে। ইহাদের সত্তজাগ্রত বিক্ষোভ

কিছুদিন হইতে জমিদারের বিরুদ্ধে ধর্মঘটের মুক্তি-পথে উচ্ছ্বসিত হইতেছিল— আগ্নেয়গিরির গহ্বরমুখ-মুক্ত অগ্নিধূমের মত।

তাহারা দল বাঁধিয়া চলিল, রহমকে তাহারা ছিনাইয়া আনিবে। তাহাদের স্বজাতি, স্বধর্মী—তাহাদের পাঁচজনের একজন, তাহাদের মধ্যে গণ্যমান্য ব্যক্তি— তাহাদের রহম ভাই! তাহারা ইরসাদকে অনুসরণ করিল। তিনকড়ি সেই মুহূর্তে ছুটিল শিবকালীপুরের দিকে। এ সময় দেবুকে চাই। সে সত্য সত্যই জোর কদমে ছুটিল।

এইভাবে দল বাঁধিয়া তাহারা ইহার পূর্বেও জমিদার-কাছারিতে কতবার আসিয়াছে। ক্ষেত্রও অনেকটা একই ভাবের। জমিদারের কাছারিতে জমিদার কর্তৃক দণ্ডিত ব্যক্তির মুক্তির জন্য গ্রামসুদ্ধ লোক আসিয়া হাজির হইয়াছে। সবিনয় নিবেদন—অর্থাৎ বহুত সেলাম জানাইয়া দণ্ডিতের কসুর গাফিলতি স্বীকার করিয়া হুজুরের দরবারে মাফ করিবার আরজ পেশ করিয়াছে। আজ কিন্তু তাহারা অন্য মূর্তিতে, ভিন্ন মনোভাব লইয়া হাজির হইয়াছে।

জমিদারের কাছারি-প্রাঙ্গণে দলটি প্রবেশ করিল—তাহাদের সর্বাগ্রে ইরসাদ। বারান্দায় জমিদার চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন—নিঃশব্দে নিজের চেহারাখানা দেখাইয়া দিলেন। তিনি জানেন—তাঁহাকে দেখিলে এ অঞ্চলের লোকেরা ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। চাপরাসীরা বেশ দম্ভ সহকারে যেন সাজিয়া দাঁড়াইল— যাহার পাগড়ি খোলা ছিল, সে পাগড়িটা তাড়াতাড়ি তুলিয়া মাথায় পরিল।

দলটি মুহূর্তে বারান্দার সিঁড়ির গোড়ায় গিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

জমিদার গম্ভীরস্বরে হাঁকিয়া বলিলেন—কে? কোথাকার লোক তোমরা? কি চাই?...প্রত্যাশা করিলেন—মুহূর্তে দলটির মধ্যে সম্মুখে আসিবার জন্য ঠেলাঠেলি বাধিয়া যাইবে, সকলেই আপন-আপন সেলাম তাঁহাকে দেখাইয়া দিতে চাহিবে; একসঙ্গে পঞ্চাশ-ষাট জন লোক নত হইবে—মাটিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া তাহাদের কথা তাঁহার দাওয়ার উপর আসিয়া উঠিবে সসম্ভ্রমে—সালাম হুজুর।

দলটি তখন স্তব্ধ। অল্প খানিকটা স্তিমিত ভাবের চাঞ্চল্যও যেন পরিলক্ষিত হইল।

জমিদার সঙ্গে সঙ্গে আবার হাঁকিলেন—কি চাই সেরেস্তায় গিয়ে বল!

ইরসাদ এবার সোজা উপরে উঠিয়া গেল; নিতান্ত ছোট একটি সেলাম করিয়া বলিল—সালাম! দরকার আপনার কাছেই।

—একসঙ্গে অনেক আর্জি বোধ হয়? এখন আমার সময় নাই। দরকার থাকলে—

এবার কথার মাঝখানেই প্রতিবাদ করিয়া ইরসাদ বলিল—রহম চাচাকে এমন করে চাপরাসী পাঠিয়ে ধরে এনেছেন কেন? তাকে বসিয়ে রেখেছেন কেন?

জমিদার এবং রহম এবার একসঙ্গে ক্রুদ্ধ রোষে গর্জন করিয়া উঠিল!

জমিদার চীৎকার করিয়া ডাকিলেন—চাপরাসী! কিষণ সিং! জোবেদ আলি!

রহম উঠিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—আমার মাথায় চড় মারছে; আমারে ঘাড়ে ধরে বস করিয়ে দিছে! আমার ইজ্জতের মাথার পরে পয়জার মারছে!

চাপরাসী কিষণ সিং হাঁকিয়া উঠিল—এ্যাও রহম আলি, বইঠ্ রহো।

জোবেদ আগাইয়া আসিল খানিকটা, অন্য চাপরাসীরা আপন-আপন লাঠি তুলিয়া লইল।

ইরসাদও সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল—খবরদার!

তাহার পিছনের সমগ্র জনতাও এবার চীৎকার করিয়া উঠিল—নানা কথায়; কোন একটা কথা স্পষ্ট বোঝা গেল না, নানা শব্দ-সমন্বিত বিপুল ধ্বনি শুধু জ্ঞাপন করিল এক সবল প্রতিবাদ।

পরের মুহূর্তটি আশ্চর্য রকমের একটি স্তব্ধ মুহূর্ত। দুই পক্ষই দুই পক্ষের দিকে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রথম কথা বলিলেন জমিদার। তিনি প্রথমটা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। প্রজার দল, দরিদ্র মানুষগুলো এমন হইল কেমন করিয়া? পরমুহূর্তে মনে হইল—কুকুরও কখনও কখনও পাগল হয়। ওটা উহাদের মৃত্যু-ব্যাধি হইলেও ওই ব্যাধি-বিষের সংক্রমণ এখন উহাদের দন্তে সঞ্চারিত হইয়াছে।

তাহাদের দাঁত অঙ্গে বিদ্ধ হইলে মালিককেও মরিতে হইবে। তিনি সাবধান হইবার জন্যই বলিলেন, কিষণ সিং, বন্দুক নিকালো।

তারপর জনতার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—তোমরা দাঙ্গা করতে চাইলে বাধ্য হয়ে আমি বন্দুক চালাবো।

একটা 'মার মার' শব্দ সবে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু ধ্বনিটা উঠিবার প্রারম্ভ-মুহূর্তেই পশ্চাৎ হইতে তীক্ষ্ণ উচ্চ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিল—না ভাই সব, দাঙ্গা করতে আমরা আসি নাই। আমরা আমাদের রহম চাচাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি। এস রহম চাচা, উঠে এস।

সকলে দেখিল—নীচের সমবেত জনতার পাশ দিয়া আসিয়া জনতাকে অতিক্রম করিয়া দেবু ঘোষ প্রথম সিঁড়িতে উঠিতেছে। সমস্ত জনতা সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল—উঠে এস! উঠে এস! চাচা! বড়-ভাই! রহম-ভাই! এস উঠে এস!

সমস্ত চাপরাসীরা জমিদারের মুখের দিকে চাহিল এমন ক্ষেত্রে তাহারা তাঁহার মুখ হইতে প্রচণ্ড একটা ধমক বা তাহাদের প্রতি একটা জোরালো, বেপরোয়া হুকুম জারির প্রত্যাশা করিল। কিন্তু বাবু শুধু বলিলেন—রহম আমার তালগাছ বিক্রি করেছে চুরি করে, আমি তাকে থানায় দোব।

দেবু বলিল—থানায় আপনি খবর দিন, ধরে নিয়ে যেতে হয় দারোগা এসে ধরে নিয়ে যাবে। থানায় খবর না দিয়ে আপনার চাপরাসী দিয়ে গ্রেপ্তার-করবার ক্ষমতা আপনার নাই। আপনার কাছারিটা গভর্নমেন্টের থানাও নয়, হাজতও নয়। উঠে এস চাচা! এস! এস।

রহম দাঁড়াইয়াই ছিল। দেবু তাহার হাত ধরিয়া বারান্দা হইতে নামিতে আরম্ভ করিল। ইরসাদ তাহার সঙ্গ ধরিল। দেবু জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—চল ভাই। বাড়ী চল সব।

বন্য কুকুর ও মৃগ সজ্ঘবদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু গণ্ডার, বাঘ বা সিংহ থাকে না। এটা জীবধর্ম। শক্তি যেখানে অসমান আধিক্যে একস্থানে জমা হয়, সেখানে নির্ভয়ে একক থাকিবার প্রবৃত্তি তাহার স্বাভাবিক। আদিম মানুষের মধ্যে দৈহিক

শক্তিতে শ্রেষ্ঠ জনের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্যই দুর্বল মানুষেরা জোট বাঁধিয়া তাহাকে পরাজিত করিতে চাহিয়াছিল। পরে আবার শক্তিশালীকেই দলপতি করিয়া সম্মানের বিনিময়ে তাহার স্কন্ধে দলের সকলের প্রতি কর্তব্যের বোঝা চাপাইয়া দিবার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিল। কিন্তু তবুও দলের মধ্যে শক্তিশালীদের প্রতি ঈর্ষা চিরকাল প্রচ্ছন্ন ছিল এবং আছে। ধনশক্তি আবিষ্কারের পর—ধনপতিদের কাছে শৌর্যশালী মানুষ হার মানিয়াছে। ধনপতিদের ইঙ্গিতেই আজ এক দেশের শৌর্যশক্তি অপর দেশের শৌর্যশক্তির সহিত লড়াই করে, বন্ধুত্ব করে। কিন্তু একই দেশের ছোট-বড় ধনপতিদের পরস্পরের মধ্যেও সেই ঈর্ষা পুরাতন নিয়মে বিদ্যমান। একের ধ্বংসে তাহাদের অন্যেরা আনন্দ পায়! বর্তমান ক্ষেত্রে সেইরূপ ঈর্ষান্বিত এক ব্যক্তির প্রতিনিধি আসিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

কঙ্কণাতেই একজন মধ্যবিত্ত জমিদারের নায়েব আসিয়া দেবু এবং ইরসাদকে ডাকিল। লোকটা পথে তাহাদের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। সে বলিল—আমাদের বাবু পাঠালেন আমাকে।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দেবু বলিল—কেন—কেন?

—বাবু অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছেন। ছি! ছি! এই কি মানুষের কাজ! পয়সা হলে কি এমনি করে মানুষের মাথায় পা দিয়ে চলে!

ইরসাদ বলিল—বাবুকে আমাদের সালাম দিয়ো।

—বাবু বলে দিলেন, থানায় ডায়রি করতে যেন ভুল না হয়। নইলে এর পর তোমাদেরই ফ্যাসাদে ফেলবে। এই পথে তোমরা থানায় চলে যাও।

ইরসাদ দেবুর মুখের দিকে চাহিল। দেবুর মনে পড়িল যতীনবাবু রাজবন্দীর কথা। আরও একবার গাছ কাটার হাঙ্গামার সময় যতীনবাবু থানায় ডায়রি করিতে বলিয়াছিল; ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে, কমিশনার সাহেবকে দুখানা টেলিগ্রাম করে দাও। এইভাবে ডায়রি করো—চাপরাসীরা গলায় গামছা বেঁধে টেনে নিয়ে এসেছে মাঠ থেকে, কাছারিতে মারপিঠ করেছে, থামে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। তোমরা গেলে বন্দুকের গুলি ছুঁড়েছে, ভাগ্যক্রমে কাউকে লাগে নাই।

দেবু অবাক হইয়া নায়েবটার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এই নায়েবের মনিব স্বদে জমিদারটির সঙ্গেও তাহাদের কর-বৃদ্ধির কিছু কিছু বিরোধ আছে। বৃদ্ধির ব্যাপার লইয়া ইনিও মুখুয্যেবাবুদের সঙ্গে দল পাকাইয়াছেন, আবার সেই লোকই গোপনে গোপনে মুখুয্যেদের শত্রুতা করিতেছে তাহাদিগকে পরামর্শ দিয়া!

ইরসাদ এবং অন্য সকলে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; ইরসাদ বলিল—নায়েব মশায় মন্দ বলেন নাই দেবু-ভাই।

নায়েব বলিল—আমি চললাম। কে কোথায় দেখবে। হাজার হোক, চক্ষুলজ্জা আছে তো! তবে যা বললাম—তাই করো যেন।...সে চলিয়া গেল।

ইরসাদ বলিল—দেবু-ভাই! তুমি কিছু বলছ নাই যে?

দেবু শুধু বলিল—নায়েব যা বললে, তাই কি করতে চাও ইরসাদ-ভাই?

রহম বলিল—হঁ্যা, বাপজান। নায়েব ঠিক বুলেছে।

—ডায়রি করতে আমার অমত নাই। কিন্তু গলায় গামছা দেওয়া, দড়ি দিয়ে থামে বাঁধা; গুলি ছোঁড়া—এই সব লিখাবে নাকি?

—হাঁ, কেসটা জোর হবে তাতে।

—কিন্তু এ যে মিথ্যে কথা রহম-চাচা!

রহম ও ইরসাদ অবাক হইয়া গেল। রহম মামলা-মকদ্দমায় অভ্যস্ত লোক, ইরসাদ নিজে মামলা না করিলেও দৌলত হাজীর সঙ্গে পাড়া-প্রতিবেশীর মকদ্দমায় দলা-পরামর্শ দেয়, তদ্বির-তদারক করে। পুরাপুরি সত্য কথা বলিয়া যে দুনিয়ায় মামলা-মকদ্দমা হয় না—এ তাহাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ নিছক বাস্তব জ্ঞান। রহম বলিল—দেবু-চাচা আমাদের ছেল্যা মানুষই থেকে গেল হে!

দেবু বলল—তাহলে তোমরাই যা হয় করে এস চাচা। ইরসাদ-ভাইও আছে। আমি এই পথে বাড়ী যাই!

—বাড়ী যাবা?

—হঁ্যা! অন্য সময় আমি রইলাম তোমাদের সঙ্গে। এ কাজটা তোমরাই করে এসো।

ইরসাদ-রহম মনে মনে খানিকটা চটিয়া গেল, বলিল—বেশ! তা যাও।

কয়েকদিন পর। টেলিগ্রাম এবং ডায়রি দুই-ই করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে চারিপাশের গ্রামগুলিতে হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে প্রজা-ধর্মঘটের আয়োজনটা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রজা-ধর্মঘটের আয়োজনটা এই আকস্মিক ঘটনার সংঘাতে অভাবনীয় রকমে শক্তিশালী হইয়া উঠিল। ইহাতে খাজনা-বৃদ্ধির হিসাব-নিকাশের আর্থিক ক্ষতিবৃদ্ধি একেবারেই তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে প্রজাদের কাছে। ইহা অকস্মাৎ তাহাদের জীবনের ইহলৌকিক পারলৌকিক সমস্ত চিন্তা ও কর্মকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশের অতিরিক্ত একটা বস্তু আছে—সেটার নাম জেদ। এই জেদটা তাহাদের আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে দলগত স্বার্থ ও নীতির খাতিরে।

এই উত্তেজিত জীবন-প্রবাহের মধ্য হইতে দেবু যেন অকস্মাৎ নিষ্প্রবাহের একপ্রান্তে আসিয়া ঠেকিয়া গেল। সে আপনার দাওয়ায় তক্তপোশখানির উপর বসিয়া সেই কথাই ভাবিতেছিল। দুর্গা তাহাকে পঞ্চায়েতের কথাটা বলিয়া গিয়াছে। সে প্রথমটা উদাসভাবে হাসিয়াছিল। কিন্তু এই কয়েকদিনের মধ্যেই তাহাকে এবং পদ্মকে লইয়া নানা আলোচনা গ্রামের মধ্যে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। নানা জনের নানা কথার আভাস তাহার কানে পৌঁছিতেছে।

আজ আবার তিনকড়ি আসিয়া বসিয়া গেল—লোকে কি বলচে জান, দেবু-বাবা?

লোকে যাহা বলিতেছে দেবু তাহা জানে। সে নীরবে একটু হাসিল।

তিনকড়ি উত্তেজিত হইয়া বলিল—হেসো না বাবা। তোমার সব তাতেই হাসি। ও আমার ভাল লাগে না।

দেবু তবুও হাসিয়া বলিল—লোকে বললে তার প্রতিবিধান আমি কি করব বলুন?

কি প্রতিবিধান করা যাইতে পারে, সে কথা তিনকড়ি জানে না। কিন্তু সে অধীরভাবেই বলিল—লোকের নরকেও ঠাঁই হবে না। সে কথা আমি কুসুমপুর-ওয়ালাদের বলে এলাম।

—কুসুমপুরওয়ালারাও এই কথা আলোচনা করছে নাকি?

—তারাই তো করছে। বলছে—দেবু ঘোষ মুখুয্যেবাবুদের সঙ্গে তলায় তলায় 'ষড়্' করছে। নইলে ডায়রি করতে তার করতে সঙ্গে গেল না কেন?

শুনিয়া দেবুর সর্বাঙ্গ যেন হিম হইয়া গেল।

তিনকড়ি বলিল—আরও বলছে—দেবু ঘোষ যখন কাছারিতে ওঠে, তখুনি বাবু ইশারায় দেবুকে চোখ টিপে দিয়েছিল। তাতেই দেবু—মাঝপথ থেকে ফিরে এসেছে।

দেবু যেন পাথর হইয়া গিয়াছে; কোন উত্তর দিল না, নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল।

বারো

সংবাদটা আরও বিশদভাবে পাওয়া গেল তারাচরণ নাপিতের কাছে। পাঁচখানা গ্রামেই তাহার যজমান আছে। নিয়মিত যায় আসে। সে বিবৃতির শেষে মাথা চুলকাইয়া বলিল—কি আর বলব বলুন, পণ্ডিত!

দেবু চুপ করিয়া ভাবিতেছিল—মানুষের ভ্রান্ত বিশ্বাসের কথা।

তারাচরণ আবার বলিল—কলিকালে কারুর ভাল করতে নাই!...তারাচরণ এ সব বিষয়ে নির্বিকার ব্যক্তি, পরনিন্দা শুনিয়া-শুনিয়া তাহার মনে প্রায় ঘাঁটা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু তবু দেবনাথের প্রসঙ্গে এই ধারার ঘটনায় সে ব্যথা অনুভব না করিয়া পারে নাই।

দেবু বলিল—এর মধ্যে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাড়ী গিয়েছিলে?

—গিয়েছিলাম, ঠাকুর মশাইও শুনেছেন।

—শুনেছেন?

—হ্যাঁ। ঘোষ একদিন ঠাকুর মশায়ের কাছেও গিয়েছিল কিনা।

—কে? শ্রীহরি?

—হ্যাঁ। ঘোষ খুব উঠে পড়ে লেগেছে। কাল দেখবেন একবার কাণ্ডখানা।

—কাণ্ড?

—পাঁচখানা গাঁয়ের মধ্যে কঙ্কণা-কুসুমপুরের কথা বাদ দেন। বাদবাকী গাঁয়ের মাতব্বর মোড়লদের কাণ্ড-কারখানা দেখবেন। ঘোষ কাল ধানের মরাই খুলবে।

—শ্রীহরি ধান দেবে তা হলে ?

—হ্যাঁ। যারা এই পঞ্চগেরামী মজলিশের কথায়, ঘোষের কথায় সায় দিয়েছে, তাদিকে ঘোষ ধান দেবে। অবশ্যি অনেক লোক রাজী হয় নাই, তবে মাতব্বরেরা সবাই ঢলেছে। মোড়লদের মধ্যে কেবল দেখুড়ের তিনকড়ি পাল বলেছে— আমি ও সবের মধ্যে নাই।

দেবু আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। আজ তাহার মাথায় যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। নানা উন্মত্ত ইচ্ছা তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছে। মনে হয় —দেখুড়িয়ার ওই দুর্দান্ত স্থলাদের নেতা হইয়া এ অঞ্চলের মাতব্বরগুলোকে ধ্বংস করিয়া দেয়। সর্বাগ্রে ওই শ্রীহরিকে। তাহার সর্বস্ব লুঠতরাজ করিয়া তাহাকে অন্ধ করিয়া, তাহার ঘরে আগুন জ্বালাইয়া দেয়।

তারাচরণ বলিল—চাষের সময় এই ধানের অভাব না হ'লে কিন্তু ব্যাপারটা এমন হত না, ধর্মঘট ধর্মঘট করে মাতব্বরেরাই ক্ষেপেছিল। আপনাকে ওরাই টেনে নামালে। কিন্তু ধান বন্ধ হতেই মনে মনে সব হায়-হায় করছিল। এখন ঘোষ নিজে থেকে যেই মজলিশ করে আপনাকে পতিত করবার কথা নিয়ে মোড়লদের বাড়ী গেল, মোড়লরা দেখলে—এই ফাঁক ; সব একেবারে ঢলে পড়ল। তা ছাড়া—

—তা ছাড়া—? স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া দেবু প্রশ্ন করিল।

—তা ছাড়া—তারাচরণ আবার একটু থামিয়া বলিল—একালের লোকজনকে তো জানেন গো, স্বভাব-চরিত্র কটা লোকের ভাল বলুন ? কামার-বউয়ের, দুর্গার কথা শুনে লোকে সব রসস্থ হয়ে উঠেছে।

—হুঁ। এ সম্বন্ধে ন্যায়রত্ন মশায় কি বলেছেন জান ? শ্রীহরি গিয়েছিল বললে যে ?

হাত দুইটি যুক্ত করিয়া তারাচরণ প্রণাম জানাইয়া বলিল—ঠাকুর মশায় ? সে হাসিল, হাসিয়া বলিল—ঠাকুর মশায় বলেছেন,—আহা—বেশ কথাটি বলেছেন

গো! পণ্ডিত লোকের কথা তো! আমি মুখস্থ করেছিলাম, দাঁড়ান মনে করি।

একটু ভাবিয়া সে হতাশভাবে বলিল—নাঃ, আর মনে নাই। হ্যাঁ, তবে বলেছেন—আমাকে ছাড়ান দাও; তুমি পাল থেকে ঘোষ হয়েছ, তুমিই তো মস্ত পণ্ডিত হে! যা হয় কঙ্কণার বাবুদের নিয়ে করগে।

ন্যায়রত্ন শ্রীহরিকে বলিয়াছিলেন—আমার কাল গত হয়েছে ঘোষ। আমি তোমাদের বাতিল বিধাতা। আমার বিধি তোমাদের চলবে না। আর বিধি-নিধবৃত্তি আমি দিই না।...তারপরও হাসিয়া বলিয়াছেন—কঙ্কণার বাবুদের কাছে যাও তাঁরাই তোমাদের মহামহোপাধ্যায়; তুমি পাল থেকে ঘোষ হয়েছ—নিজেই তো এক জন উপাধ্যায় হে!

দেবু সান্ত্বনায় যেন জুড়াইয়া গেল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিজের উন্মত্ততাকে সে শাসন করিল।—ছি! ছি! সে এ কি কল্পনা করিতেছে?

তারাচরণ বলিল—কঙ্কণার বাবুদের কথা উঠল তাই বলছি, কুসুমপুরের শেখদের ব্যাপারে আপনাকে নিয়ে কথাটা কে রটিয়েছে জানেন? ওই বাবুরাই।

—বাবুরা? কি রটিয়েছে?

—হ্যাঁ; বাবুদের নায়েব নিজে বলেছে ইরসাদকে। বলেছে—দেবু ঘোষ কাছারিতে উঠেই বাবুকে চোখ টিপে ইশেরা করেছিল যে, হাঙ্গামা বেশী বাড়বে না—আমি ঠিক করে দিচ্ছি।...তা নইলে বাবু রহমকে ছেড়ে দিতেন না। বাবুও বুঝে দেবুকে ইশেরা করে এক হাত দেখিয়ে দিয়েছেন—আচ্ছা, মিটিয়ে দাও; তা হলে পাঁচশো টাকা দোব।

দেবু বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেল। বাবুদের নায়েব এই কথা বলিয়াছে!

দেবু অবাক হইয়া গেলেও কথাটা সত্য। মুখুয্যেবাবুর মত তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি সত্যই বিরল। মুসলমানেরা যখন দল বাঁধিয়া আসিয়াছিল, তখন তিনি বিচলিত হইয়াছিলেন, একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা আশঙ্কা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তিনি ভয় পান নাই। বরং তিনি এমন ক্ষেত্রে তাহাই চাহিয়াছিলেন, তাহা হইলে মরিলে মরিত কয়েকজন দারোয়ান-চাপরাসী এবং জনকয়েক মুসলমান চাষী, তিনি সর্বপশ্চাতে আগ্নেয়াস্ত্রের আড়ালে অক্ষত থাকিতেন। তারপর মামলা-পরে

—তাঁহার বাড়ী চড়াও করিয়া লুঠতরাজ এবং দাঙ্গার অভিযোগে এই চাষীকুলকে তিনি নিষ্পেষিত করিয়া দিতেন। কিন্তু দেবু আসিয়া ব্যাপারটা অন্য রকম করিয়া দিল। দেবুর জীবনের কাহিনীও তিনি শুনিয়াছেন; সে কাহিনী দেবুকে এমন একটা মর্যাদা এবং ব্যক্তিত্ব দিয়াছে, যাহার সম্মুখে তাঁহার মত ব্যক্তিকেও সঙ্কুচিত হইতে হয়। কারণ দেবু জীবনে যাহা পারিয়াছে, তিনি পারেন নাই। দেবু তাঁহাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া জনতাকে শান্ত রাখিয়া নিমেষে রহমকে উঠাইয়া লইয়া গেল। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সমস্ত অপরাধ এখন তাঁহার ঘাড়ে।

ঠিক এই সময় তাঁহার কানে আসিল—কঙ্কণার অপর কোন বাবুর নায়েব যে পরামর্শ দিয়াছে—সেই কথা, আরও শুনিলেন—দেবু মিথ্যা ডায়রি করিতে এবং তার পাঠাইতে চায় না বলিয়া থানায় যায় নাই। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ চমকের মত ইশারায় একটা কথা খেলিয়া গেল। মনুষ্য-প্রকৃতি তিনি ভাল করিয়াই জানেন। দেবুর কথা তিনি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না; কিন্তু পাঁচশো টাকার লোভ ইহাদের অন্য কেহ সংবরণ করিতে পারেন না, ইহা তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস তখন অপবাদটা রটাইয়া তাহার জনপ্রিয়তাকে আঘাত করিবার চেষ্টা করিলে কেমন হয়? তিনি তাঁহার নায়েবকেও তৎক্ষণাৎ পাল্টা একটা ডায়রি করিতে থানায় পাঠাইলেন এবং মিথ্যা কথাটা ইরসাদ-রহমের কানে তুলিতে বলিয়া দিলেন। উত্তেজনায় অধীর জনতা সঙ্গে সঙ্গে কথাটা বিশ্বাস করিয়া লইল। রহম-ইরসাদের প্রথমটা দ্বিধা হইলেও কথাটা তাহারা একেবারে উড়াইয়া দিতে পারিল না!

হাফ-হাতা পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়া দেবু সেই আসন্ন বিগ্রহের মাথায় করিয়াই বাহির হইয়া পড়িল। তারাচরণ অনুমান করিল পণ্ডিত কোথায় যাইবে, তবুও সে জিজ্ঞাসা করিল—এই দুপুরে কোথায় যাবেন গো?

—ঠাকুর মশাইকে একবার প্রণাম করে আসি তারু-ভাই। নইলে মনের আগুন আমার নিভবে না।···দেবু রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

তারাচরণ আপনার ছাতাটা তাহার হাতে দিয়া বলিল—ছাতা নিয়ে যান। বেজায় কড়া রোদ

কথা না বলিয়া দেবু ছাতাটা লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। পঞ্চগ্রামের বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে দিয়া পথ। শ্রাবণ সন্ত শেষ হইয়াছে। ভাদ্রের প্রথম। চাষের ধান পোঁতার কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। বিশেষ করিয়া যাহারা সচ্ছল অবস্থার লোক, তাহাদের রোয়ার কাজ এয়দিন আগেই শেষ হইয়াছে। ধান ধান করিয়া তাহাদের কাজ বন্ধ হয় নাই, তাহার উপর প্রয়োজন অনুযায়ী নগদ মজুর লাগাইয়াছে। যাহাদের জমির ধান ইহারই মধ্যেই জমিয়া উঠিয়াছে, তাহাদের ক্ষেতে চলিতেছে নিড়ানের কাজ। বিস্তীর্ণ মাঠে ধানের সবুজ রঙে গাঢ়তার আমেজ আসিয়াছে। দেবু কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া আজ চলিল।

একটা অতি বিস্ময়কর ঘটনাও আজ তাহার অন্তরকে স্পর্শ করিল না। এত বড় মাঠে—চাষ এখনও অনেক লোকে করিতেছে, পূর্বে মাঠের প্রতিটি জন তাহার সহিত দু-একটা কথা বলিয়া তবে তাহাকে যাইতে দিত। দূরের ক্ষেতের লোক—ডাকিয়া তাহার গতি রুদ্ধ করিয়া—কাছে আসিয়া সম্ভাষণ করিত। আজ কিন্তু অতি অল্প লোকেই তাহাকে ডাকিয়া কথা বলিল। আজ কথা বলিল—সতীশ বাউড়ী, দেখুড়িয়ার জনকয়েক ভল্লা আর দুই-একজন মাত্র। তাহাদের জাতি-গোত্রীয়দের সকলে—দেবুর অন্যমনস্কতার সুযোগ লইয়া নিবিষ্টমনে চাষেই ব্যস্ত হইয়া রহিল। তিনকড়ি আজ এ মাঠে নাই।

দেবুর সেদিকে খেয়ালই হইল না। প্রথমটা দুরন্ত ক্রোধে মনের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি আদিমযুগের ভয়াবহতা লইয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সান্ত্বনা-বাণীর আভাস পাইয়া, তাহার অন্তরের পুঞ্জীভূত অভিযোগ শীতলবায়ু-প্রবাহ স্পৃষ্ট কালবৈশাখীর মেঘের মত ঝর ঝর ধারায় গলিয়া গিয়াছে। সে-মুহূর্তে তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিয়াছিল, তারাচরণের সম্মুখে সে বহুকষ্টে চোখের জল সংবরণ করিয়াছে। পথেও সে আজ চলিয়াছিল একনিবিষ্টচিত্তে—আত্মহারার মত। হাতের ছাতাটাও খুলিয়া মাথায় দিতে ভুলিয়া গিয়াছে।...

ন্যায়রত্ন মহাশয় পূজার্চনা সবে শেষ করিয়া গৃহদেবতার ঘর হইতে বাহির হইতেছিলেন। দেবুকে দেখিয়া, স্মিতমুখে তাহাকে আহ্বান করিলেন—এস, পণ্ডিত এস।

দেবুর ঠোঁট দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। পৃথিবীর হৃদয়হীন অবিচারের সকল বেদনা এই মানুষটিকে দেখিবামাত্র যেন ফেনিল আবেগে উথলিয়া উঠিল—শিশুর অভিমানের মত।

ন্যায়রত্ন সাগ্রহে বলিলেন—বসো—। মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে রৌদ্রে, ঘেমে নেয়ে গেছ যেন।...দেবুর হাতের বন্ধ ছাতাটার দিকে চাহিয়া বলিলেন—ছাতাটা এখনও ভিজে রয়েছে দেখছি! বেশ বৃষ্টি হয়েছিল সকালে। তারপর প্রহরখানেক তো সূর্যদেব তাম্ররূপ ধারণ করেছেন। মনে হচ্ছে তুমি ছাতাটা মাথায় দাও নি পণ্ডিত। একটু ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় এলে পারতে।

দেবু এতক্ষণ আত্মসংবরণ করিয়াছিল, ঠাকুর মহাশয়ের যুক্তি ও মীমাংসা শুনিয়া এবার একটু বিনম্র হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। সে নতজানু হইয়া বলিল—পায়ের ধুলো নেব কি?

—অর্থাৎ আমায় ছোঁবে কিনা জিজ্ঞাসা করছ? সম্মুখে আমাকে দেখছ, আমার পূজার্চনা শেষ হয়ে গিয়েছে। তুমি পণ্ডিত মানুষ, সিদ্ধান্ত তুমি করে নাও।

দেবু কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিল না। সে ঠাকুর মহাশয়ের মুখের দিকেই চাহিয়া রহিল। ন্যায়রত্ন মহাশয় দেবতার নির্মাল্য সমেত হাতখানি দেবুর মাথার উপর রাখিয়া বলিলেন—আমার পায়ের ধুলোর আগে—ভগবানের আশীর্বাদ নাও। পণ্ডিত, তাঁর সেবা করি বলেই সংসারের ছোঁয়া-ছুঁয়ির বিচার করি। যে বস্তু যত নির্মল, তাতে স্পর্শদুষ্টি তত শীঘ্র সংক্রামিত হয় কিনা। তাই সাবধানে থাকি। নইলে—আমি তোমাকে স্পর্শ করব না এমন স্পর্ধা আমার হবে কেন?

দেবু ন্যায়রত্নের পায়ের উপর মাথা রাখিল।

ন্যায়রত্ন সস্নেহে বলিলেন—ওঠ, পণ্ডিত ওঠ।...বলিয়া বাড়ীর ভিতরের দিকে মুখ ফিরাইয়া ডাকিলেন—ভো—ভো—রাজন্! দাদু হে!

দেবু ব্যগ্রভাবে বলিল—বিশু-ভাই এসেছে নাকি?

—হ্যাঁ। ন্যায়রত্ন হাসিলেন।

—কি দাদু?...বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল বিশ্বনাথ। এবং দেবুকে

দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল—এ কি, দেবু-ভাই! এই রৌদ্রে?

ন্যায়রত্ন হাসিয়া বলিলেন—দেখছ পণ্ডিত? রাজ্ঞীর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপমগ্ন রাজচিত্ত অসময়ে আহ্বানের জন্য কেমন বিক্ষুব্ধ হয়েছে—দেখছ?

বিশ্বনাথ লজ্জিত হইল না, বলিল—আপনার ঠাকুর মাতবেন ঝুলনে, রাজ্ঞী সেই নিয়ে ব্যস্ত। এ বেচারার দিকে চাইবার তাঁর অবকাশ নাই মুনিবর!

—আমার দেবতার প্রসাদে এই পূর্ণিমারাত্রে তুমিও হিন্দোলায় দুলবে রাজন্। তুমি ঘরে ঝুলনার দড়ি টাঙিয়েছ—আমি উঁকি মেরে দেখেছি। আমার ঠাকুরের ঝুলনের অজুহাতেই তুমি কলকাতা থেকে আসবার সুযোগ পেয়েছ, সেটা ভুলে যেয়ো না। আমি অবশ্য, তুমি সাতদিন পরে এলেও কিছু বলি না; কিন্তু তুমি তো প্রতিবারেই আমার ঠাকুরের প্রতি ভক্তির ছলনা করে কৈফিয়ৎ দিতে ভোল না রাজন্।

বিশ্বনাথ এবার হাসিতে লাগিল। দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, বিলুকে তাহার মনে পড়িয়া গেল। ঝুলনে তাহারাও একবার দোল খাইয়াছিল।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—জয়া যদি ব্যস্ত থাকে, তবে তুমিই পণ্ডিতের জন্য এক গ্লাস সরবৎ প্রস্তুত করে আন দেখি।

দেবু ব্যস্ত হইয়া বলিল—না—না—না।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—গৃহস্থকে আতিথ্য-ধর্ম পালনে ব্যাঘাত দিতে নাই।... তারপর বিশ্বনাথকে বলিলেন—যাও ভাই পণ্ডিতের বড় তৃষ্ণা পেয়েছে। বড় শ্রান্ত-ক্লান্ত ও।...

কিছুক্ষণ পরে ন্যায়রত্ন বলিলেন—আমি সব শুনেছি পণ্ডিত।

দেবু তাঁহার পায়ে হাত দিয়াই বসিয়াছিল; সে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আমি কি করব বলুন।

ন্যায়রত্ন স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। বিশ্বনাথ পাশেই চুপ করিয়া বসিয়াছিল—জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল।

দেবু আবার প্রশ্ন করিল—বলুন আমি কি করব?

ন্যায়রত্ন বলিলেন—বলবার অধিকার নিজে থেকেই অনেকদিন ত্যাগ করেছি। শশীর মৃত্যুর দিন উপলব্ধি করেছিলাম—কাল পরিবর্তিত হয়েছে, পাত্রেরাও পূর্ব কাল থেকে স্বতন্ত্র হয়েছে; দৈবক্রমে আমি ভূতকালের মন এবং কায়া সত্ত্বেও ছায়ার মত বর্তমানে পড়ে রয়েছি। সেদিন থেকে আমি শুধু দেখে যাই। বিশ্বনাথকে পর্যন্ত কোন কথা বলি না।

তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইলেন। দেবু চুপ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া যেমন বসিয়া ছিল—তেমনি বসিয়া রহিল। ন্যায়রত্ন আবার বলিলেন—দেখ, বলবার অধিকার আমার আর শক্তিই নাই। শশীর কালেও যাদের দেখেছি, এদের মানুষ তাদের চেয়েও স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছে। মানুষের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে।

বিশ্বনাথ এবার বলিল—তাদের যে সর্বাগ্রে দেহের মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে দাদু, নৈতিক মেরুদণ্ড সোজা থাকবে কি করে? অভাব যে অনিয়ম; নিয়ম না থাকলে নীতি থাকবে কোন্ অবলম্বনে বলুন? চুরিতে দুর্ভিক্ষে যার সব যায়, সে বড় জোর নীতি মেনে চুরি না-করতে পারে, কিন্তু ভিক্ষে না করে তার উপায় কি বলুন? ভিক্ষার সঙ্গে হীনতার বড় নিকট সম্বন্ধ, আর হীনতার সঙ্গে নীতির বিরোধকে চিরন্তন বলা চলে।

ন্যায়রত্ন হাসিলেন, বলিলেন—তাই-ই কালক্রমে সত্য হয়ে দাঁড়াল বটে। হয় তো মহাকালের তাই অভিপ্রায়। নইলে দীনতা—সে হোক না কেন নিষ্ঠুরতম দীনতা—তার মধ্যে থেকেও হীনতার স্পর্শ বাঁচিয়ে চলার সাধনাই তো ছিল মহাধর্ম। কৃচ্ছ্রসাধনায়, সর্বত্যাগে—ভগবানকে পাওয়া যাক—না-যাক—পার্থিব দৈন্য এবং অভাবকে মালিন্য-মুক্ত করে মনুষ্যত্ব একদিন জয়যুক্ত হয়েছিল।

বিশ্বনাথ বলিল—যে শিক্ষায় আপনার পূর্বগামীরা এটা সম্ভবপর করেছিলেন—সে শিক্ষা যে তাঁরাই সার্বজনীন হতে দেন নি দাদু। এ তারই প্রতিফল। মণি পেয়ে মণি ফেলে দেওয়া যায়, কিন্তু মণি যে পায় নি—সে মণি ফেলে দেবে কি করে? লোভই বা সংবরণ করবে কি করে

ন্যায়রত্ন পৌত্রের মুখের দিকে চাহিলেন, বলিলেন—কথা তুমি বেশ চিন্তা করে

বলে থাক দাদু। অসংযত বা অর্থহীন ভাবে কথা তো বল না তুমি!

বিশ্বনাথ দেখিল—পিতামহের দৃষ্টিকোণে প্রখরতা অতি ক্ষীণ মাত্রায় চমকিয়া উঠিতেছে। দেবুও লক্ষ্য করিয়াছিল, সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল, কিন্তু বিশ্বনাথের কোন্ কথায় ন্যায়রত্ন এমন হইয়া উঠিয়াছেন—অনুমান করিতে পারিল না।

বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল—আমার পূর্ববর্তী সম্মুখে বর্তমান, আমি এখন রঙ্গমঞ্চে নেপথ্যে অবস্থান করছি। সেইজন্যই বললাম—আপনার পূর্বগামী।

ন্যায়রত্নও হাসিলেন—নিঃশব্দ বাঁকাহাসি, বলিলেন—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণের দিব্যাস্ত্রের সম্মুখে পার্থ-সারথি রথের ঘোড়া দুটোকে নতজানু করে বসিয়ে মান বাঁচিয়েছিলেন। অর্জুনকে পেছন ফিরতেও হয় নি, কর্ণের মহাস্ত্রও ব্যর্থ হয়েছিল। বাগ্‌যুদ্ধে তুমি কৌশলী বিশ্বনাথ।

বিশ্বনাথ এবার খানিকটা শঙ্কিত হইয়া উঠিল, ইহার পর ন্যায়রত্ন যাহা বলিবেন, সে হয়তো বজ্রের মত নিষ্ঠুর, অথবা ইচ্ছামৃত্যুশীল শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের অন্তিম মৃত্যু ইচ্ছার মত সকরুণ মর্মান্তিক কিছু। ন্যায়রত্ন কিন্তু তেমন কোন কিছুই বলিলেন না, ঘাড় নিচু করিয়া শুধু আপনার ইষ্টদেবতাকে ডাকিলেন—নারায়ণ! নারায়ণ!

পরমুহূর্তেই তিনি সোজা হইয়া বসিলেন—যেন আপনার সুপ্ত শক্তিকে টানিয়া সোজা করিয়া জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। তারপর দেবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—বিবেচনা করে দেখ পণ্ডিত। আমার উপদেশ নেবে অথবা তোমাদের এই নবীন ঠাকুর মশায়ের উপদেশ নেবে?

বিশ্বনাথও সোজা হইয়া বসিল, বলিল—আমি যে সমাজের ঠাকুর মশায় হব দাদু, সে সমাজে আপনার দেবু পণ্ডিত হবে আপনাদেরই মত পূর্বগামী। সে সমাজের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই, হয় দেবু কাশীবাস করবে অথবা আপনার মত দ্রষ্টা হয়ে বসে থাকবে।

ন্যায়রত্ন হাসিয়া বলিলেন—তা হলে আমার পাঁজী-পুঁথি এবং শাস্ত্রগ্রন্থ ফেলে দিয়ে ঘর-দোর পরিষ্কার করে ফেলি, বল? আমার ঠাকুরের তা হলে মহাভাগ্য!

পাকা নাটমন্দির হবে! তুমিই সেদিন বলছিলে—যুগটা বণিকের এবং ধনিকের যুগ; কথাটা মহাসত্য। এ অঞ্চলের নব সমাজপতি—মুখুয্যেদের প্রতিষ্ঠা তার জলন্ত প্রমাণ।

বিশ্বনাথ হাসিয়া বাধা দিয়া বলিল—আপনি রেগে গেছেন দাদু। কথাগুলো আপনার যুক্তিহীন হয়ে যাচ্ছে, সেদিন আরও কথা বলেছিলাম—সেগুলো আপনি ভুলে গেছেন।

ন্যায়রত্ন চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—তুমি নাই। তোমার সেই ধর্মহীন—ইহলোক-সর্বস্ব সাম্যবাদ।

—ধর্মহীন নয়। তবে আপনারা যাকে ধর্ম বলে মেনে এসেছেন—সে ধর্ম নয়। সে আচারসর্বস্ব ধর্ম নয়, ন্যায়নিষ্ঠ সত্যময় জীবনধারা। আপনাদের বাহ্যানুষ্ঠান ও ধ্যানযোগের পরিবর্তে বিজ্ঞানযোগে পরম রহস্যের অনুসন্ধান করব আমরা। তাকে শ্রদ্ধা করব—কিন্তু পূজা করব না।

ন্যায়রত্ন গম্ভীরস্বরে ডাকিলেন—বিশ্বনাথ!

—দাদু!

—তা হলে আমার অন্তে তুমি আমার ভগবানকে অর্চনা করবে না?

বিশ্বনাথ বলিল—আগে আপনি দেবু পণ্ডিতের সঙ্গে কথা শেষ করুন।

ন্যায়রত্ন দেবুর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। দেবুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া ন্যায়রত্নের জীবনে আবার একটা আগুন জ্বলিয়া উঠিল? কুড়ি-বাইশ বৎসর পূর্বে নীতির বিতর্কে এক বিরোধবহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল—তাহাতে সংসারটা ঝলসিয়া গিয়াছে; ন্যায়রত্নের একমাত্র পুত্র—বিশ্বনাথের পিতা ক্ষোভে অভিমানে আত্মহত্যা করিয়াছে।

দেবুকে নীরব দেখিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—পণ্ডিত!

দেবু বলিল—আমি আজ যাই ঠাকুর মশায়!

—যাবে? কেন?

—অন্যদিন আসব।

—আমার এবং বিশ্বনাথের কথা শুনে শঙ্কিত হয়েছ?...ন্যায়রত্ন হাসিলেন।

না-না, ওর জন্যে তুমি চিন্তিত হয়ো না। বল, তুমি কি জানতে চাও। বল?

দেবু বলিল—আমি কি করব? শ্রীহরি পঞ্চায়েৎ ডেকে আমাকে পতিত করতে চায়। অন্যায় অপবাদ দিয়ে—

—হ্যাঁ, এইবার মনে হয়েছে। ভাল, পঞ্চায়েৎ তোমাকে ডাকলে—তুমি যাবে, সবিনয়ে বলবে—আমি অন্যায় কিছু করি নি। তবু যদি শাস্তি দেন—নেব; কিন্তু নিরাশ্রয়া বন্ধুপত্নীকে পরিত্যাগ করতে পারব না। তাতে যা পারে পঞ্চায়েৎ করবে। ন্যায়ের জন্য দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে।

বিশ্বনাথ হাসিয়া উঠিল।

ন্যায়রত্ন প্রশ্ন করলেন—হাসলে যে বিশ্বনাথ? তোমাদের ন্যায় অনুসারে কি মেয়েটাকে ত্যাগ করা উচিত?

—আমাদের উপর অবিচার করছেন আপনি। আমাদের ন্যায়কে আপনাদের ন্যায়ের উল্টো অর্থাৎ অন্যায় বলেই ধরে নিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আপনি যা বলছেন—আমাদের ন্যায়ও তাই বলে। তবে আমি হাসলাম—পঞ্চায়েৎ পতিত করবে এবং তাতে দুঃখ-কষ্টের কথা শুনে।

—তার মানে তুমি বলছ—পঞ্চায়েৎ পতিত করবে না, না পতিত করলেও দুঃখ কষ্ট নাই।

—পঞ্চায়েৎ পতিত করবেই। কারণ তার পিছনে রয়েছে ওদের সমাজের ধনী সমাজপতি শ্রীহরি ঘোষ এবং তার প্রচুর ধন-ধান্য। তবে দুঃখ যতখানি অনুমান করেছেন ততখানি নাই।

ন্যায়রত্ন হাসিয়া বলিলেন—তুমি এখনও ছেলেমানুষ বিশ্বনাথ।

—বুদ্ধত্বের দাবি করি না দাদু, তাতে আমার রুচিও নাই। তবে ভেবে দেখুন না পঞ্চায়েৎ কি করতে পারে? আপনি যে যুগের কথা ভেবে বলছেন। সে যুগে সমাজ পতিত করলে—তার পুরোহিত, নাপিত, ধোপা, কামার, কুমোর বন্ধ হত। কর্মজীবন, ধর্মজীবন দুই-ই পঙ্গু হয়ে যেত। সমাজের বিধান লঙ্ঘন করে তাকে কেউ সাহায্য করলে—তারও শাস্তি হত। গ্রামান্তর থেকেও কোন সাহায্য পাওয়া যেত না। এখন ধোপা-নাপিত-কামার-পুরুতই সমাজের নিয়ম

মেনে চলে না। পয়সা দিলেই গুগুলো এখন মিলবে। সে যুগে ধোপা-নাপিত সমাজের হুকুম অমান্য করলে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হত। এখন ঠিক উল্টো। ধোপা-নাপিত ছুতোর-কামারেরা যদি বলে যে তোমাদের কাজ আমি করব না—তাহলে আমরাই জব্দ হয়ে যাব। আর বেশী পেড়াপীড়ি করলে হয় তারা অন্যত্র উঠে যাবে, নতুবা জাত-ব্যবসা ছেড়ে দেবে। ভয় কি দেবু, জংশন থেকে ক্ষুর কিনে নিয়ো একখানা, আর কিছু সাবান। তা যদি না পারো তো জংশন শহরেই বাসা নিও, তোমাকে দাড়িও রাখতে হবে না—ময়লা কাপড়ও পরতে হবে না। জংশন পঞ্চায়েতের এলাকার বাইরে।

দেবু অবাক হইয়া বিশ্বনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ন্যায়রত্নও তাহার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া শেষে হাসিলেন; বলিলেন—তুমি আর রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে নেই দাদু, তুমি আবির্ভূত হয়েছ। আমিই বরং প্রস্থান করতে ভুলে গিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে অযথা মঞ্চে অবস্থান করছি।

বিশ্বনাথ বলিল—অন্তত মহাগ্রামের মহামান্য সমাজপতি হিসেবে আপনার কাছে লোকে এলে তখন কথাটা অতি সত্য বলে মনে হয়। দেশে নতুন পঞ্চায়েৎ সৃষ্টি হল—ইউনিয়ন-বোর্ড, ইউনিয়ন-কোর্ট, বেঞ্চ; তারা ট্যাক্স নিয়ে বিচার করছে, সাজা দিচ্ছে। তবু লোকে যখন সমাজপতির বংশ বলে আমাদের, তখন যাত্রার দলের রাজার কথা মনে পড়ে।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—ওরে বিদূষক! না, যাত্রার দলের রাজা নই! ইতিহাসের রাজ্যভ্রষ্ট রাজা আমি। আমার রাজ্যভ্রষ্টতা সম্বন্ধে আমি সচেতন। এখানে রয়েছি ভ্রষ্ট রাজ্যের মমতায় নয়; সে আর ফিরবে না—সে কথাও জানি। তবু রয়েছি, আমার কাছে যে গচ্ছিত আছে গুপ্তসম্পদ! কুলমন্ত্র, কুলপরিচয়, কুলকীর্তির প্রাচীন ইতিহাস। তোরা যদি নিস্—হাসি মুখে মরব। না নিস্ তাও দুঃখ করব না। সব তাঁকে সমর্পণ করে চলে যাব।

ঠিক এই সময়েই ভিতর-বাড়ীর দরজার মুখে আসিয়া দাঁড়াইল জয়া। সে বলিল—দাদু, একবার এসে দেখেশুনে নিন, তখন যদি কোনটা না পাওয়া যায়, তবে কি হবে বলুন তো? তা ছাড়া, আপনার-আমার না হয় উপোস, কিন্তু অজু

বদলে লোকে সর্বাঙ্গে অপমান-কলঙ্কের কালি লেপিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। তাই আজ বিলু-খোকাই তাহাকে পথ ভুলাইয়া আনিয়াছে। তাহার চোখের উপর বিলু ও খোকার মূর্তি জল-জল করিয়া ভাসিয়া উঠিল।

রাম আবার জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় যাবেন আজ্ঞা?—দিবা দ্বিপ্রহরে পণ্ডিত মানুষ গ্রামের পথ ভুল করিয়াছে, একথা সে ভাবিতেই পারিল না।

দেবু বলিল—একটু শ্মশানের দিকে যাব।

—শ্মশানে?

—হ্যাঁ। দরকার আছে।

রাম অবাক্ হইয়া গেল।

দেবু বলিল—তুমি আমার একটু কাজ করবে?

—বলুন আজ্ঞা?

পকেট হইতে দড়িতে বাঁধা কয়েকটা চাবি বাহির করিয়া বলিল—এই চাবি নিয়ে তুমি—তাই তো, কাকে দেবে এ?…ক্ষণিক চিন্তা করিয়া লইয়া বলিল—চাবিটা তুমি কামার-বউ—অনিরুদ্ধ কামারের বউকে দিয়ে বলবে যে, ভাঁড়ার থেকে আট সের চাল নিয়ে আমার রাখাল ছোঁড়াকে দু'সের আর কৃষাণ দুজনকে—তিন সের করে ছ'সের দিয়ে দেয় যেন। আমার ফিরতে দেরি হবে। এখনি যেতে হবে না, চাষের কাজ শেষ করে যেয়ো।

রাম বলিল—আজকের কাজ হয়ে গিয়েছে। আজ পুঁয়েছে, হাল বন্ধ, আগাম্ পোঁতা-জমিগুলোতে নিড়েন দিচ্ছিলাম। তা যে রোদ, আর পারলাম না। আমি এখুনি না হয় যাচ্ছি। কিন্তু আপনি শ্মশানে গে কি করবেন গো?

—একটু কাজ আছে। দেবু বাঁধের দিকে অগ্রসর হইল।

রাম তবু সন্তুষ্ট হইল না। দেবুর গতিবিধি তাহার কাছে বড় রহস্যময় বলিয়া মনে হইল। দেবুকে লইয়া যে সমস্ত কথা উঠিয়াছে—সে সবই জানে। পদ্ম সংক্রান্ত কথাও জানে, রহম ও কঙ্কণার বাবুদের মধ্যে বিবাদ-প্রসঙ্গে যে কথা উঠিয়াছে—তাহাও জানে। পদ্মের কথা সে অপরাধের মধ্যেই গণ্য করে না। বিপত্নীক জোয়ান লেখাপড়া-জানা ভাল ছেলে, তার যদি এই স্বামী-পরিত্যক্তা

মেয়েটিকে ভালই বাসিয়া থাকে—সে যদি ভালই বাসিয়া থাকে তাহাকে, তাহাতে দোষ কোথায়? কঙ্কণার বাবুদের দেওয়া অপবাদ সে বিশ্বাস করে না। এ সম্বন্ধে তিনকড়ি গল্প করিয়া বলিয়াছে! তিনকড়ি অবশ্য পদ্মের কথাও বিশ্বাস করে না।

তাই সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াও দেবুকে আরও খানিকটা আটকাইয়া কথা-প্রসঙ্গে ভিতরের কথাটা জানিবার জন্যই বলিল—কুসুমপুরের মিটিংয়ে যান নাই আপনি?

—কুসুমপুরের মিটিং! কিসের মিটিং?

—মস্ত মিটিং আজ কুসুমপুরে গো। তিনু-দাদা গিয়েছে। বাবুদের সঙ্গে রহমের হাঙ্গামার কথা—ধর্মঘটের কথা—

মৃদু হাসিয়া দেবু বলিল—আমি আর ওসবের মধ্যে নাই, রাম-ভাই।

রাম চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল—শ্মশানে কি করবেন আপনি? এই দুপুর বেলা, খান্ নাই—দান্ নাই। চলুন, ঘর চলুন।

ঠিক এই সময়েই একটা হাঁক ভাসিয়া আসিল। চাষীর হাঁক, চড়া গলায় লম্বা টানা ডাক। রাম ঘুরিয়া দাঁড়াইল—ডাকটার শেষ—অ-আ ধ্বনিটা স্পষ্ট। রাম কানের পিছনে হাতের আড়াল দিয়া শুনিয়া বলিল—তিনু-দাদা আমাকেই ডাকছে। সঙ্গে সঙ্গে সে মুখের দুই পাশে হাতের তালুর আড়াল দিয়া সাড়া দিল—এ—এঃ!

তিনু হন-হন করিয়া আগাইয়া আসিতেছে। দেবুও যাইতে যাইতে থমকিয়া দাঁড়াইল।···ব্যাপারটা কি।

তিনু অত্যন্ত উত্তেজিত। কাছে আসিয়া এমন জায়গায় রামের সঙ্গে দেবুকে দেখিয়া সে কোন বিস্ময় প্রকাশ করিল না। বিস্ময়-প্রকাশের মত মনের অবস্থাই নয় তাহার। সে বলিল—ভালই হয়েছে, দেবু বাবাও রয়েছে। তোমার বাড়ি হয়েই আসছি আমি। পেলাম না তোমাকে। কুসুমপুরের শেখেরা বড় গোল পাকিয়ে তুললে বাবা। রামা, তোরা সব লাঠি-সড়কি বার কর।

দেবু সবিস্ময়ে বলিল—কেন? আবার কি হল?

—আর বলো না বাবা। আজ মিটিং ডেকেছিল। তোমাকে বাদ দিয়ে ডেকেছিল—আমি যেতাম না। কিন্তু ভাবলাম—যাই, কড়া-কড়া কটা কথা শুনিয়ে দিয়ে আসি। গিয়ে দেখি—সে মহা হাঙ্গামা! শুনলাম কঙ্কণার বাবুরা নাকি বলেছে, কুসুমপুর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেবে; আগে কুসুমপুর ছিল হিঁদুর গাঁ—আবার হিঁদু বসাবে বাবুরা। এইসব শুনে শেখেরা ক্ষেপে উঠেছে, তারা বলছে—আমাদের গাঁ ছারখার করলে আমরাও হিঁদুর গাঁ ছারখার করে দোব।

—বলেন কি! তারপর?

—তারপর সে অনেক কথা। তা আমার বাড়ীতে এস কেনে, সব বলব। তেষ্টায় বুক আমার শুকিয়ে গিয়েছে!

কথাটা বলিতে বলিতে সে অগ্রসর হইল। সঙ্গে সঙ্গে দেবু এবং রামও আগাইয়া চলিল।

তিনকড়ি বলিল—গাঁয়ের জগন-টগন সব ধর্মঘটের মাতব্বরেরা মিটিংয়ে গিয়েছিল। যায় নাই কেবল—পঞ্চায়েতের মোড়লরা। শুনেছ তো—তোমাকে পতিত করা নিয়ে—ছিরে বেটার সঙ্গে খুব এখন পীরিত। ছিরে ধান দেবে কিনা।

—শুনেছি। কিন্তু কুসুমপুরে কি হল?

—আমরা বললাম—বাবুরা তোমাদের ঘর জ্বালিয়ে দেয়, তোমরা বাবুদের সঙ্গে বোঝ। অন্য হিঁদুরা তার কি করবে? তারা বললে—বাবুরা বলেছে—হিঁদু বসাবে, তখন সব হিঁদুই একজোট হবে।—আসবার সময় আবার শুনলাম—।...স্বয় মা রে!

তিনকড়ির বাড়ীর দরজায় তাহারা আসিয়া পড়িয়াছিল।

দেবু প্রশ্ন করিল—আর কি শুনলেন?

—বলি। দাঁড়াও বাবা, আগে জল খাই একঘটি।

দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল স্বর্ণ, তিনকড়ির বিধবা মেয়েটি। সুন্দর স্বাস্থ্যবতী মেয়ে, চমৎকার মুখশ্রী, গৌরবর্ণ দেহ। পনরো-ষোল বছরের মেয়েটিকে দেখিয়া কে বলিবে সে বিধবা! কিশোরী কুমারীর মত স্বপ্নবিভোর দৃষ্টি তাহার

চোখে ; মুখের কোথাও কোন একটি রেখার মধ্যে এতটুকু বেদনা বা উদাসীনতা লুকাইয়া নাই। সে বাহির হইয়া আসিল—তাহার হাতে একখানি বই। দেবুকে দেখিয়া লজ্জিতভাবে চকিতে সে বইখানি পিছনের দিকে লুকাইল।

জটিল চিন্তা এবং উৎকণ্ঠা সত্ত্বেও দেবু হাসিয়া বলিল—বই লুকোচ্ছ কেন? কি বই পড়ছিলে?

তিনকড়ি ঘরের ভিতর যাইতে যাইতে বলিল—মা স্বন্ন, দেবু-বাবাকে একটুকু সরবৎ করে দে তো।

—না—না। আমার আজ পূর্ণিমার উপবাস। একবার সরবৎ আমি খেয়েছি।

—তবে একটুকু হাওয়া কর্। যে গরম। গলগল্ করে ঘামছে।

স্বর্ণ তাড়াতাড়ি একখানা পাখা লইয়া আসিল। দেবু বলিল—পাখাটা আমাকে দাও।

—না, আমি হাওয়া করছি।

—না, না। দাও, আমাকে দাও। তুমি বরং বইখানা নিয়ে এস। কি পড়ছিলে দেখি? যাও নিয়ে এস।

কুণ্ঠিতভাবেই স্বর্ণ বইখানা আনিয়া দেবুর হাতে দিল।

বইখানি একখানি স্কুলপাঠ্য সাহিত্য-সঙ্কলন। বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক-লেখিকাদের ছাত্রোপযোগী লেখা চয়ন করিয়া সাজানো হইয়াছে। প্রবন্ধ, গল্প, জীবনী, কবিতা।

দেবু বলিল—কোন্‌টা পড়ছিলে বল।

স্বর্ণ নতমুখে বলিল—ও একটা পদ্য পড়ছিলাম।

দেবু হাসিয়া বলিল—পদ্য বলে না, কবিতা বলতে হয়। কোন্ কবিতা পড়ছিলে?

স্বর্ণ একটু চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা কবিতা।

দেবু বইখানার কবিতার দিকটা খুলিতেই একটা কবিতা যেন আপনিই বাহির হইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা পাতা খোলা থাকিলে বই খুলিতে গেলে

আপনা-আপনিই সেই পাতাটি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। দেবু দেখিল কবিতাটির শেষে লেখকের নাম লেখা রহিয়াছে—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতাটির নামের দিকে চাহিয়া দেখিল—'স্বামীলাভ'। তাহার নিচে ব্র্যাকেটের ভিতর ছোট অক্ষরে লেখা 'ভক্তমাল'। সে প্রশ্ন করিল—এইটে পড়ছিলে বুঝি!

স্বর্ণ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—হ্যাঁ, ওইটাই সে পড়িতেছিল।

দেবু স্নিগ্ধস্বরে বলিল—পড় তো, আমি শুনি।—বইখানা সে তাহার দিকে আগাইয়া দিল।

রাম ভল্লা বলিল—স্বর্ণ মা যা সুন্দর রামায়ণ পড়ে পণ্ডিত মশায়! আহা-হা, পরান জুড়িয়ে যায়।

দেবু হাসিয়া বলিল—পড় পড়, শুনি।

স্বর্ণ মৃদুস্বরে বলিল—বাবাকে খেতে দিতে হবে, আমি যাই।—বলিয়া সে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। লজ্জিতা মেয়েটির দিকে চাহিয়া দেবু সস্নেহে হাসিল। তারপর সে কবিতাটি পড়িল—

> "একদা তুলসীদাস জাহ্নবীর তীরে নির্জন শ্মশানে
>
> ... ...
>
> হেরিলেন, মৃত পতি-চরণের তলে বসিয়াছে সতী,
> তারি সনে একসাথে এক চিতানলে মরিবারে মতি।
>
> ... ...
>
> তুলসী কহিল, "মাতঃ যাবে কোন্‌খানে এত আয়োজন?"
>
> ... ...
>
> কহে করজোড় করি, "স্বামী যদি পাই স্বর্গ দূরে যাক।"
> তুলসী কহিল হাসি, "ফিরে চল ঘরে কহিতেছি আমি,
> ফিরে পাবে আজ হতে মাসেকের পরে আপনার স্বামী।"
> রমণী আশার বশে গৃহে ফিরে যায় শ্মশান তেয়াগি,
> তুলসী জাহ্নবী-তীরে নিস্তব্ধ নিশায় রহিলেন জাগি।
>
> ... ...

একমাস পরে প্রতিবেশীরা আসিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিল—তুলসীর মন্ত্রে কি ফল হইয়াছে? মেয়েটি হাসিয়া বলিল—পাইয়াছে, সে তাহার স্বামীকে পাইয়াছে!

শুনি' ব্যগ্র কহে তারা, "কহ তবে কহ, আছে কোন্ ঘরে?"
নারী কহে, "রয়েছেন প্রভু অহরহ আমারি অন্তরে।"

কবিতাটি শেষ করিয়া দেবু স্তব্ধ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। স্বর্ণকে দেখিয়া যে কথা তাহার মনে হয় নাই, সেই কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল,—স্বর্ণ বিধবা, সাত বৎসর বয়সে সে বিধবা হইয়াছে। নীরবে নতমুখে সে চলিয়া গেল, তখন তাহার ওই নতমুখের ভঙ্গির মধ্যে—শান্ত পদক্ষেপের মধ্যে যাহা সে উপলব্ধি করিতে পারে নাই, তাহাই সে এখন স্পষ্ট অনুভব করিল তাহার গোপন-পোষিত সুগভীর বিরহ-বেদনা। সে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তুলসীদাসের মন্ত্রের মত কোন মন্ত্র যদি তাহার জানা থাকিত, তবে স্বর্ণকে সেই মন্ত্র সে দিত। তিনকড়ি কাকা আক্ষেপ করিয়া বলে—স্বর্ণ আমার সোনার প্রতিমা—সে কথা মিথ্যা নয়। চোখ তাহার জলে ভরিয়া উঠিল

তিনকড়ি এই মুহূর্তে ঘরে প্রবেশ করিল, বাহির হইতেই সে কথা আরম্ভ করিয়াছিল - এই পাকটি, বুঝলে বাবাজী, বেশী করে লাগালে তোমার সে দৌলত শেখ। দৌলত গিয়েছিল মুখুয্যেবাবুদের বাড়ী, বাবুরা নাকি তাকেই কথাটা বলেছে!...

তের

কঙ্কণার মুখুয্যেবাবু ঠিক এই কথাটা বলেন নাই।

দৌলত শেখকে তিনিই ডাকিয়াছিলেন। শেখজী অর্থশালী লোক; বর্তমানে তাহার চামড়ার ব্যবসায় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বেশ সমৃদ্ধ। স্বজাতি স্বসম্প্রদায়ের লোক না হইলেও বর্তমান সমাজে ধনীতে-ধনীতে একটি লৌকিকতার সম্বন্ধ আছে, সেই সূত্রে মুখুয্যেবাবুদের সঙ্গে, শ্রীহরির সঙ্গে এবং অন্য জমিদার,

মহাজনের সঙ্গে হাজী সাহেবের সৌহার্দ্য আছে। এ ছাড়া শেখজী মুখুজ্যেবাবুদের একজন বিশিষ্ট প্রজা; তাঁহাদের সেরেস্তায় দৌলত শেখের নামে খাজনার অঙ্কটা বেশ মোটা। ধনী দৌলতের সঙ্গে গ্রামের সাধারণ লোকের মনের অমিলের কথাও মুখুজ্যেবাবুরা জানেন। তাই শেখজীকে তাঁরা ডাকিয়াছিলেন।

জংশন শহরে থানার দারোগাবাবু ও জমিদারবাবু ক্রমবর্ধমান পাথরের মত ভারী এবং মূক হইয়া উঠিতেছেন। ডায়রি করিতে গেলে ডায়রি করিয়া লন—কোন কথা বলেন না। মুখুজ্যেবাবুদের বাড়ী হইতে একটা দশ-পনরো সের মাছ পাঠানো হইয়াছিল, তাঁহারা ফেরত দিয়াছেন। নায়েবকে পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছেন—হাওয়া যে রকম গরম, তাতে হজম হবে না মশায়। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে টেলিগ্রাম গিয়েছে, কমিশনারের কাছে টেলিগ্রাম গিয়েছে। বাপ রে! আবার শুনছি নাকি মিনিস্টারের কাছেও যাবে টেলিগ্রাম! এসব আর আনবেন না দয়া করে।

পরশু তারিখে সার্কেল অফিসার সফরে আসিয়াছিলেন—ইউনিয়ন-বোর্ড পরিদর্শনে! তিনি—শুধু তিনি কেন, সরকারই কর্মচারীমাত্রই—এস-ডি-ও, ডি-এস-পি, মধ্যে মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সাহেব পর্যন্ত এ অঞ্চলে আসিলেই কঙ্কণার বাবুদের ইংরাজী-কেতায় সাজানো দেবোত্তরের গেস্ট-হাউসে উঠিয়া আতিথ্য-স্বীকার করিয়া থাকেন। সরকারের ঘরে বাবুদের নামডাক যথেষ্ট, লোকহিতকর কাজও তাঁহাদের যথেষ্ট আছে, স্কুল—হাসপাতাল—বালিকা বিদ্যালয় তাঁহাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। সরকারী কাজে চাঁদার খাতায় তাঁহাদের নাম সর্বদাই উপরের দিকেই থাকে। তাঁহারা যে পথে চলিয়া থাকেন, সে পথটি বাহ্যতঃ-স্পষ্ট আইনের পথ। টাকা ধার দেন, সুদ লন। খাজনা বাকি পড়িলে, অমার্জনীয় কঠোরতার সঙ্গে সুদ আদায় করেন, নালিশ করেন। বৃদ্ধির ব্যাপারেও মুখুজ্যেবাবুরা আদালতের মধ্য দিয়া চলিতেছেন! বে-আইনী আদায় হয়ত কিছু আছে, কিন্তু সেও এমনভাবে আইনের গঙ্গাজল প্রক্ষেপে শুদ্ধ হইয়া যায় যে, সে আদায়ের অসিদ্ধতা অশুদ্ধতার কথা কখনও উঠিতেও পায় না। যেমন—দেবোত্তরের পার্বণী আদায়, খারিজ-ফি বাবদ উদবৃত্ত আদায় ইত্যাদি; এই আদায়ের জন্য

বাবুদের জবরদস্তি নাই। শুধু পার্বণী না দিলে টাকা আদায় লনও না, দেনও না। না-লওয়া বা না-দেওয়াটা ইচ্ছাধীন, বে-আইনী নয়। এবং পরিশেষে বাধ্য হইয়া আদালতে যান এবং অন্যকে যাইতে বাধ্য করেন, তাহাও বে-আইনী নয়। সুতরাং আইনের ক্ষুরধারে যাঁহারা চলিয়া থাকেন—তাঁহাদের নিকট মাথা কামাইতে আসিয়া দুই-এক বিন্দু রক্তপাত সকলে মানিয়া লইয়াছে। ইহার উপর সরকারের প্রতি বাবুদের ভক্তিশ্রদ্ধার কথা লর্ড কর্নওয়ালিসের আমল হইতে আজ পর্যন্ত এ জেলার প্রত্যেক সাহেব বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সেইজন্যই রাজভক্ত বাবুদের অতিথি-নিকেতনে আতিথ্য স্বীকার করাকে তাঁহারা কিছু অন্যায় মনে করেন না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পরশু তারিখে সার্কেল-অফিসার এখানে আসিয়াও বাবুদের অতিথি-নিকেতনে আতিথ্য স্বীকার করেন নাই। মুখুয্যেবাবু দুইটা কারণে সচকিত হইয়া উঠিলেন। দেশ-কালের কোথায় কি যেন পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে তিনি জানিতে পারেন নাই। প্রজাদের টেলিগ্রামের মূল্য যে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। মামলার কূট-কৌশল প্রজাদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির কাছে আজ যেন অত্যন্ত দুর্বল বলিয়া মনে হইতেছে! অথচ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে এখান হইতে ছয় মাইল দূরবর্তী গ্রামের জমিদার প্রজাদের জনতার উপর গুলি চালাইয়া তৎক্ষণাৎ ঘোড়ায় চড়িয়া সদরে গিয়া সাহেবকে সেলাম দিয়া প্রণাম করিলেন—তিনি ঘটনার সময় সদরে ছিলেন। প্রজাদের মামলা ফাঁসিয়া গিয়াছিল। ঘরে বসিয়া তিনি অনুভব করিলেন রাজশক্তি যেন এই সঙ্ঘবদ্ধ প্রজাদের ভার পাইয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে! সঙ্গে সঙ্গে তিনিও চঞ্চল হইয়া পড়িলেন।

দেবুকে ইহাদের সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াও বিশেষ ফল হয় নাই। একেবারে হয় নাই তা নয়, তবে যেটুকু হইয়াছে তাহার মূল্য খুব বেশি নয়, অন্ততঃ তাঁহার তাই মনে হইল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি দৌলত শেখকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন।

শেখজীর বয়স ষাট বৎসর পার হইয়া গেলেও এখন দেহ বেশ সমর্থ আছে। মাঝারি আকারের একটা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হইয়া এখনও যাওয়া-আসা করেন; সেই ঘোড়াটায় চড়িয়া শেখজী বাবুদের কাছারিতে উঠিলেন। বাবু সমাদর

করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন।

দৌলত শেখও রহম এবং ইরসাদকে ভাল চোখে দেখেন না। তিনি বলিলেন—ভুল খানিকটা করেছেন কর্তা। চুরি করে তালগাছটা বেচলে—একটা চুরির চার্জে নালিশ করে দিলেই ঠিক হত।

কর্তা বলিলেন—সে তো করবই—এখন তোমায় ডেকেছি, তুমি কুসুমপুরের মাতব্বর লোক। তুমি ওদের বুঝিয়ে দাও গে, ব্যাপারটা ভাল করছে না। আমার কিছুই হবে না এতে। সাহেব তদন্তে এলেও বিনা মামলায় কিছু করতে পারবে না। মামলা—হাইকোর্ট পর্যন্ত চলে। মিথ্যে নালিশ হাইকোর্টে টিকবে না। তা ছাড়া হাইকোর্টের মামলা ধান বেচে হয় না।

দাড়িতে হাত বুলাইয়া শেখ বলিল—দেখেন কর্তা, আমাকে বলা আপনার মিছা। রহম শেখ হল বদমাস বেতমিজ লোক, ইরসাদ তুকসম লিখাপড়া শিখে নামের আগে লিখে মৌলভী, ফরজ জানে না কলেমা জানে না, নিজেরে বলে মোমেন। আমি হাজী হজ করে আসছি—বয়স হল ষাট, আমারে বলে—বুড়া ঘুষ খায়, লোকেরে ঠকায়—উ হাজী নয় কাফের। আমি বললে উয়ারা শুনবেই না।

কর্তা বলিলেন—ভাল! তুমি গ্রামের মাতব্বর লোক—আমাদের সঙ্গে অনেক দিনের সুবাদ তোমার, তাই তোমাকে বললাম। এর পর আমাকে তুমি দোষ দিয়ো না। রহম-ইরসাদ আর তার দলে যারা আছে, এ অঞ্চল থেকে আমি তাদের বাস তুলে ছাড়ব!—বলিয়াই মুখুয্যে কর্তা উঠিয়া গেলেন। দৌলত শেখের সঙ্গে আর বাক্যালাপও করিলেন না। তাঁহার মনে হইল হাজী ইচ্ছা করিয়াই ব্যাপারটা হইতে সরিয়া থাকিতে চাহিতেছে। কল্পনায় তাঁহার ছোটখাটো সমধর্মীদের মত শেখজীও বোধ হয়, তিনি বিব্রত হওয়ায় আনন্দ উপভোগ করিতেছে।

দৌলত শেখ কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া উঠিল। অবহেলাটা তাহার গায়ে বড় লাগিল। বুড়া ঘোড়ায় চড়িয়া ফিরিবার পথে বার বার তাহার ইচ্ছা হইল সে-ও রহম এবং ইরসাদের সঙ্গে যোগ দেয়। সে জীবনে নিতান্ত সামান্য অবস্থা হইতে

বড় হইয়াছে। বহু পরিশ্রম করিয়াছে, বহু লোকের সহিত কারবার করিয়াছে; বহুজনের মন তাহাকে রাখিতে হইয়াছে। মানুষকে বুঝিবার একটা ক্ষমতা তাহার জন্মিয়া গিয়াছে। সে বেশ বুঝিল—আজ রহম এবং ইরসাদ তাহাকে মানে না—সে তাহাদিগকে মানাইতে পারে না—এই সত্যটা জানিবার পর মুখুয্যেবাবু আর তাহাকে মান্য করিবার প্রয়োজন অনুভব করিলেন না। আজ একটা বিপাকের সৃষ্টি করিয়া সামান্য রহম ও ইরসাদ বাবুর কাছে তাহার চেয়েও বড় হইয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ তাহার মনে হইল—রহম এবং ইরসাদকে সে যদি বাগ মানাইয়া আপনার আয়ত্তে আনিতে পারে, তবে এ অঞ্চলের এই দুর্দ্ধর্ষ কর্তাটিকে 'ছিপে-গাঁথা' হাঙরের মত খেলাইয়া লইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাসি আসিল। মুখুয্যেবাবু শের ছিল হঠাৎ যেন শিয়াল বনিয়া গিয়াছে। যখন তাহাকে বলিল—রহম ইরসাদ আর তার দলে যারা আছে এ অঞ্চল থেকে তাদের বাস তুলে ছাড়ব—বাবুর তখনকার গলার আওয়াজটা পর্যন্ত হাল্কা হইয়া গিয়াছিল! শাসানিটা নিশ্চয়ই মৌখিক। মুখুয্যেবাবুর মুখখানা পর্যন্ত ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে। আরে—হায় রে, হায় রে মুখুয্যেবাবু! তুমি দেখতেছি বাঘের খাল (চামড়া) পরিয়া থাক—আসলে তুমি ভেড়া! রহম আর ইরসাদকে ভয় কর তুমি? ফুঃ ফুঃ!

ঘোড়ার পিঠে বসিয়া আপন মনে হাজী সাহেব বারকয়েক ফুঃ ফুঃ শব্দ করিল। ইরসাদ—রহম? ওদের মুরদ কি? মুখুয্যেবাবুর মত তাহার যদি টাকা থাকিত, তবে সে কোন্ দিন এই অসভ্য বেতমিজ দুইটাকে সাফ করিয়া দিত। মানুষের খাল (চামড়া) দাগাবার (পরিষ্কার) কারবার নাই, নইলে উহাদের খাল ছাড়াইয়া দাগাবার করিয়া তাহার কারবারের চামড়ার সঙ্গে মিশাইয়া দিত! ইরসাদ-রহমের মুরদ কি?

গ্রামে ঢুকিয়া দৌলত শেখ অবাক হইয়া গেল। গ্রামে লোকে-লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। শিবকালীপুর, মহাগ্রাম, দেখুড়িয়ার হিন্দু চাষীরা আসিয়া জমিয়াছে, গ্রামের মুসলমান চাষীরা সকলে হাজির আছে; এখানে—ইরসাদ, রহম, শিবকালীপুরের জগন ডাক্তার, দেখুড়িয়ার তিনকড়ি। সে ঘোড়ার লাগামটা

টানিয়া ধরিল। দেবু ঘোষ নাই। মুখুয্যেবাবু ও-চালটা মন্দ চালে নাই। ওদিকে শ্রীহরি ঘোষও চালিয়াছে ভাল চাল; ছোঁড়াটা বসিয়া গিয়াছে।

জগন ডাক্তার মুখফোঁড় লোক—ধনীর উপর তাহার অত্যন্ত আক্রোশ, সে দৌলতকে দাঁড়াইতে দেখিয়া হাসিয়া রহস্য করিয়াই বলিল—শেখজী কঙ্কণা গিয়েছিলেন নাকি হাওয়া খেতে? মুখুয্যে-বাড়ী? বেশ! বেশ!—

উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটি হাসির কানাকানি পড়িয়া গেল।

শেখের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। এই উদ্ধত ডাক্তারটির কথাবার্তার ধরনই এই রকম। কিন্তু এই সব নগণ্য চাষী—যাহারা সেদিনও ধান-ধান করিয়া কুকুরের মত তাহার দুয়ারে আসিয়া লেজ নাড়িয়াছে—তাহারাও তাহাকে উপেক্ষা করিয়া হাসিতেছে। তাহার ইচ্ছা হইল মুখুয্যেবাবুর সংকল্পের কথাটা একবার হতভাগ্যদের শুনাইয়া দেয়!

রহম এবার হাসিয়া বলিল—কি বড়-ভাই, কথা বলছেন না যি গো?

জগন ডাক্তার বলিল—শেখজী দেখছেন কে কে আছে এখানে। কাল আবার যাবেন তো, গিয়ে নামগুলো বলতে হবে বাবুকে। রিপোর্ট করতে হবে।

দৌলতের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। সে হাজী, হজ্ করিয়া আসিয়াছে, মুসলমান সমাজে তাহার একটা সম্মান প্রাপ্য আছে। রহম ইরসাদই এতদিন তাহাকে অমান্য করিত, বলিত—টাকা থাকলেই জাহাজের টিকিট কেটে মক্কা শরীফ যাওয়া যায়। হজ্ করে এসেও যে সুদ খায়, লোকের সম্পত্তি ঠকিয়ে নেয় —হজের পুণ্য তার বরবাদ হয়ে গিয়েছে। তাকে মানি না। তাহাদের সেই অবজ্ঞা সমস্ত লোকের মধ্যে সঞ্চারিত হইতেছে। সে সকলের তাহাকে কোন্ স্তরে টানিয়া নামাইতে চাহিতেছে, তাহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল সে। চাকলার হিন্দুরা পর্যন্ত তাহাকে উপহাস করে, অশ্রদ্ধা করে!

ইরসাদ বলিল—কি চাচা, গরিবানদের সাথে কথাই বলেন যি গো!

দৌলত বলিল—কি বুলব ইরসাদ, বুলতে শরম লাগছে আমার!

জগন বলিয়া উঠিল—আরে বাপরে! শেখজীর শরম লাগছে যখন—তখন

না জানি সে কি কথা!

দৌলত বলিল—তুমার সাথে আমার কোন বাত নাই ডাক্তার। আমি বলছি রহমকে আর ইরসাদকে—আমার জাতভাইদিগে। আমাদিগের বড়ো সর্বনাশ! এখানে কি সাধে দৌড়াইছি? শুন হে রহম, তুমিও শুন ইরসাদ, আজ মুখুয্যেবাবু আমাকে বুললে—তুমি বলিয়ো দৌলত, তুমাদের জাতভাইদিগে—হাঙ্গাম সহজে মিটিয়ে না নিলে, তামাম কুসুমপুর আমি ছারখার করে দিব।

'গ্রামের লোকে'র পরিবর্তে 'জাতভাই' এবং 'যাহারা হাঙ্গামা করবে' তাহাদের পরিবর্তে 'তামাম কুসুমপুর' বলিয়া দৌলত নিজেও রহম-ইরসাদের আত্মীয় হইবার চেষ্টা করিল।

রহম গোঁয়ার-গোবিন্দ লোক—সে সঙ্গে সঙ্গে বলিল—তামাম কুসুমপুর ছারখার করে দিবে?

ইরসাদ হাসিয়া বলিল—আপনি তো মিয়া মোকাদিম লোক, বাবুদের সঙ্গে মহরম-মহরম—তামাম কুসুমপুর গেলেও আপনি থাকবেন। আপনার ভয় কি?

—না, আমিও থাকব না। আমাকেও বাদ দিবে না রে! আমি বুললাম—আমি বুড়া হলাম কত, আমার আর কয়টা দিন? মুসলমান হয়ে মুসলমানের সর্বনাশ আমি দেখতে পারব না।—বাবু বুললে—তবে তুমিও থাকবা না, দৌলত, কুসুমপুরে আমি হিঁদু পাড়া বসাব। এই জগন ডাক্তারই তখুনই গাঁয়ে এসে ভিটে তুলবে। দেবু ঘোষও আসবে। দেখুড়ার তিনুও আসবে।—ব্যাপার বুঝেছ?

সঙ্গে সঙ্গে ভেল্কি খেলিয়া গেল।

সমবেত জনতা দুইভাগ হইয়া পরস্পরের দিকে প্রথমটা চাহিল বেদনাতুর দৃষ্টিতে, তারপর চাহিল সন্দেহপূর্ণ নেত্রে।

জগন প্রতিবাদ করিয়া একবার কিছু বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু শুধু—'কক্ষণও না'—এই কথাটি ছাড়া আর কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না।

রহম উঠিয়া দাঁড়াইল। দেহে তার প্রচণ্ড শক্তি, উদ্ধত কোপন স্বভাব—তাহার উপর রমজানের রোজার উপবাসে মস্তিষ্ক উগ্র ও স্নায়ুমণ্ডলী অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হইয়া আছে—সে যেন ক্ষেপিয়া গেল। চীৎকার করিয়া সদম্ভে বলিল—তা হলে

চাকলার হিঁদুর গাঁগুলানও আমরা ছারখার করে দিব।

দারুণ হট্টগোলের মধ্যে মিটিং ভাঙিয়া গেল।

রমজানের পবিত্র মাস। 'রমজে'র অর্থ জ্বলিয়া যাওয়া। রমজানের মাসে রোজার উপবাসের কৃচ্ছ্রসাধনের বহ্নিতে মানুষের পাপ পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়। আগুনে পুড়িয়া লোহার যেমন জংমরিচার কলঙ্ক নষ্ট হয়—তেমনি ভাবেই ক্ষুধার আগুনে পুড়িয়া মানুষ খাঁটি হইবে—এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এই সময়টিতে উপবাসক্লিষ্ট মুসলমানদের মনে দৌলতের এই কথাটি বারুদখানায় অগ্নিসংযোগের কাজ করিল।

হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও উত্তেজনা নেহাৎ অল্প হইল না। গ্রামে গ্রামে লোক জটলা পাকাইতে আরম্ভ করিল।

ইহার উপর দিন দিন নূতন নূতন গুজব রটিতে লাগিল—ভীষণ আশঙ্কাজনক গুজব। কোথা হইতে ইহার উদ্ভব—তাহার সন্ধান কেহ করিল না, সম্ভব-অসম্ভব বিচার করিয়া দেখিল না। উত্তেজনার উপর উত্তেজনায়—দুই সম্প্রদায়ই মাতিয়া উঠিল।

থানায় ক্রমাগত ডায়রি হইতেছে। টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম যাইতেছে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে, কমিশনারের কাছে, মুসলিম লীগের অফিসে, হিন্দু মহাসভায়। বাবুদের মোটর গাড়িটা এই বর্ষার দিনেও কাদাজল ঠেলিয়া গ্রামের পর গ্রাম ছুটিয়া বেড়াইতেছে। গাড়ীতে ঘুরিতেছে—বাবুদের নায়েব ও বাবুদের উকীল। সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায় বিপন্ন। প্রকাণ্ড এক মিটিং হইবে বাবুদের নাটমন্দিরে। কুসুমপুরের মসজিদে মুসলমানেরা মজলিশ করিতেছে। আশপাশের গ্রামে যেখানে মুসলমান আছে—খবর পাঠানো হইয়াছে। দৌলত শেখ রহমকে পাশে লইয়া বসিয়াছে।

একা ইরসাদ কেবল ক্রমশ যেন স্তিমিত হইয়া আসিতেছে। সে কথাবার্তা বিশেষ বলে না। নীরবে বসিয়া শুধু দেখে আর শোনে। অবসর সময়ে আপনার বাড়ীতে বসিয়া ভাবে। ইরসাদ সংসারে একা মানুষ। তাহার স্ত্রী স্বামীর ঘরে আসে না। ইরসাদের বিবাহ হইয়াছে কয়েক মাইল দূরবর্তী গ্রামে এক বর্ধিষ্ণু মুসলমান পরিবারে। শালকেরা কেহ উকীল, কেহ মোক্তার। তাহাদের ঘরের

মেয়ে আসিয়া ইরসাদদের দরিদ্র সংসারে থাকিতে পারে না। তাহার এবং তাহার বাপ-ভাইয়ের দাবি ছিল—ইরসাদ আসিয়া তাহাদের কাহারও মুহুরীর কাজ করুক। শহরে তাহাদের বাসাতেই থাকিবে—রোজগারও হইবে। কিন্তু ইরসাদ সে প্রস্তাব গ্রহণ করে নাই। মেয়েটি সেই কারণেই আসে না। ইরসাদও যায় না। তালাক দিলেও তাহার আপত্তি নাই। তবে সে বলে তালাকের দরখাস্ত সে করিবে না, করিতে হয় তাহার স্ত্রী করিতে পারে! আপনার ঘরে একা বসিয়া সে সমস্ত ব্যাপারটা তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করে। রহম চাচা আজও বুঝিতে পারিতেছে না—কি হইতে কি ঘটিয়া গেল। সমস্ত গ্রামটা গিয়া পড়িয়াছে দৌলত শেখের মুঠার মধ্যে।

দৌলত অকস্মাৎ প্রচণ্ড ধার্মিক হইয়া উঠিয়াছে। রমজানের উপবাসের সময় গৃহস্থকে দান করিতে হয়, দরিদ্র মুসলমানকে গম, ময়দা, কিসমিস, বা তাহার মূল্যের পরিমাণ চাল কলাই দান করিয়া—ঈশ্বরের দরবারে 'ফেতরা' আদায় দিতে হয়। সম্পন্নশালী বা ধনীর উপর শাস্ত্রের নির্দেশ—তাহারা সোনারুপা দান করিয়া 'ফেতরা' আদায় দিবে। ধনী দৌলত—'ফেতরা' আদায় দিত—তাহার রাখাল কৃষাণ মাহিন্দারকে সেরখানেক করিয়া চাল দিয়া সে এক ঢিলে দুই পাখী মারিত। এই উপলক্ষে রাখাল কৃষাণদের বকশিশ দেওয়াও হইত, আবার খোদাতালার দরবারে পুণ্যের দাবিও জানানো হইত। এই লইয়া গ্রামে প্রতিজনে দৌলতের সমালোচনা করিয়াছে, তাহাকে ঘৃণা করিয়াছে। সে সবই দৌলতের কানে যাইত, কিন্তু এতকালের মধ্যে সে এসব গ্রাহ্যও করে নাই। এবার সেই দৌলত ঘোষণা করিয়াছে, লোকেরা সেই কথা নির্লজ্জের মত সগৌরবে বলিয়া বেড়াইতেছে—শেখজী এবার খাঁটি আমিরের মত 'ফেতরা' আদায় দিবে। শেখের দরজা হইতে অর্থী-প্রার্থী শূন্যহাতে ফিরিবে না। রমজানের সাতাশ রাত্রিতে "শবে কদর" উপলক্ষে সে সমস্ত রাত্রি জাগিবে, গোটা গাঁয়ের লোককে সমাদর করিয়া খাওয়াইবে। বুদ্ধিহীন লোকগুলি হাঁ করিয়া আছে সেই রাত্রির অপেক্ষায়। রহম চাচা পরম উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে। সে বলিতেছে—শেখের এতদিনে মতি ফিরিয়াছে। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। দৌলত

শেখ রহমকে বলিয়াছে—মামলা হয়—টাকা লাগে—আমি দিব তুয়াদিগে!

ইরসাদের হাসি আসিল। মনে পড়িল—ছেলেবেলায় সে একখানা ছবিওয়ালা ছেলেদের বইয়ে পড়িয়াছিল—কুমীরের বাড়ীর নিমন্ত্রণের গল্প। গল্পের শেষের ছবিটা তাহার চোখের উপর জল্-জল্ করিয়া ভাসিতেছে, নিমন্ত্রিতদের খাইয়া স্ফীতোদর কুমীর বসিয়া গড়গড়ার নল টানিতেছে।

—ইরসাদ! বাপজান? ইরসাদ!...উত্তেজিত কণ্ঠে ডাকিল রহম।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ইরসাদ সাড়া দিল—আসুন, ভিতরে আসুন, চাচা!

—আরে বাপজান—তুমি বাইরিয়া এস। জলদি এস। দেখ! দেখ!

—কি? ইরসাদ ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিল।

—দেখ!

ইরসাদ কিছু দেখিতে পাইল না। শুধু বহুজনের সমবেত পদধ্বনির মত একটা শব্দ কানে আসিল। পরক্ষণেই রাস্তার বাঁক ঘুরিয়া আবির্ভূত হইল—খাকী পোশাক-পরা আর্মড কনস্টেবল। দুই-চারিজন নয়—প্রায় জন পঁচিশ। তাহারা মার্চ করিয়া পথের ধুলা উড়াইয়া চলিয়া গেল; কঙ্কণার জমাদারও তাহাদের সঙ্গে ছিল—সে ইরসাদ এবং রহমকে দেখিয়া আর্মড কনস্টেবলের নেতাকে কি বলিল।

রহম বলিল—আমাদিগে দেখায়ে কি বুললে বল তো?

ইরসাদ ঈষৎ হাসিল, কিছু বলিল না।

রহম বলিল—পঞ্চাশ জনা ফৌজ আসছে বাপজান। সঙ্গে ডিপুটি আসছে একজনা। দেখ কি হয়!

হইল না বিশেষ কিছু।

ডেপুটি-সাহেবের মধ্যস্থতায় বিবাদটা মিটিয়া গেল। কঙ্কণার মুখুয্যেবাবু পঞ্চাশ টাকার মিঠাই পাঠাইয়া দিলেন কুসুমপুরের মসজিদে। রহমকে ডাকিয়া তাহাকে সম্মুখ বেঞ্চিতে বসাইয়া বলিলেন—কিছু মনে করো না রহম।

দৌলত শেখও গিয়াছিল। সে বলিল—দেখেন দেখি, জমিদার আর প্রজা—বাপ আর বেটা। বেটার কসুর হলে বাপ শাসন করে, ঘুণা বেটা হলে—তার

গোসা হয়। বাপ আবার পেয়ার করলি পরেই—সে গোসা ছুটে যায়।

রহমও এ আদরে গলিয়া গেল; সেও বলিল—হুজুরকে অনেক সালাম আমার। আমাদের কসুরও হুজুর মাপ করেন।

ইরসাদকে ডাকা হয় নাই, ইরসাদ যায়ও নাই; রহম অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু ইরসাদ বলিয়াছিল—মুরুব্বি শেখজী যাচ্ছেন—তুমি যাচ্ছ; আমার শরীরটা ভাল নাই চাচা।

দৌলত এবং রহম চলিয়া গেল।

খানিক পরে ইরসাদের ডাক আসিল। একজন কনস্টেবল থানা হইতে জরুরী তলব লইয়া আসিল। ইরসাদ একটু চকিত হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই সে জামাটা গায়ে দিয়া, মাথায় টুপিটি পরিয়া কনস্টেবলের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

থানায় গিয়া দেখিল—আরও একজনকে ডাকা হইয়াছে। দেবু থানার বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে।

—দেবু-ভাই!…থানার বারান্দায় মুখোমুখি দাঁড়াইয়া অসঙ্কোচে সে দেবুকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিল। সে দিনের কথা মনে করিয়াও তাহার কোন সঙ্কোচ হইল না।

দেবু হাসিয়া বলিল—এস ভাই।

ইরসাদ খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—সব লুট হয়ে গেল দেবু-ভাই, সব বরবাদ গেল।

দেবু বলিল—তার আর করবে কি বল? উপায় কি?

ইরসাদ আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—তোমার কাছে আমার কসুর হয়ে আছে, দেবু-ভাই—

দেবু তাহার হাতখানি নিজের হাতে টানিয়া লইয়া বলিল—আমাদের শাস্ত্রে কি আছে জানো ভাই? সুখে, দুঃখে, রাজার দরবারে, শ্মশানে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে যারা পাশাপাশি থাকে তারাই হল প্রকৃত বন্ধু! বন্ধুর কাছে বন্ধুর ভুলচুক হয় বই কি; তার জন্যে মাপ চাইতে নাই!…দেবু তাহার স্বভাব-সুলভ প্রীতির হাসি হাসিল।

ইরসাদও তাহার মুখের দিকে চাহিল। ঠিক এই সময়েই তাহাদের ডাক পড়িল।

ডেপুটি সাহেব দুজনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ এক বিচিত্র স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন—দৌড়াদৌড়ি হচ্ছে বুঝি?

দেবু আপত্তির সুরে কি দুই-এক কথা বলিতে গেল।

ডেপুটি বলিলেন—থাম।

তারপর বলিলেন—এবার খুব বেঁচে গেলে। কিন্তু ভবিষ্যতে সাবধান!

দুজনে একসঙ্গেই থানা হইতে বাহির হইল। থানার ব্যাপারটা দুইজনের অন্তরেই আঘাত দিয়াছিল। কথাবার্তা ওই কঠিন শাসনবাক্য ছাড়া আর কিছুই হয় নাই, কিন্তু যে বিচিত্র দৃষ্টিতে ডেপুটি সাহেব তাহাদের দিকে চাহিয়াছিল—সেই দৃষ্টি দারোগাবাবু, জমাদার কনস্টেবল, এমন কি চৌকিদারদের চোখেও ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

নীরবেই দুইজনে পথে চলিতেছিল। ক্ষুদ্র শহরের জনাকীর্ণ কলরব-মুখর পথ নীরবেই অতিক্রম করিয়া তাহারা আসিয়া উঠিল ময়ূরাক্ষীর রেলওয়ে ব্রীজে। ব্রীজ পার হইয়া তাহারা ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধের পথ ধরিল। নির্জন পথ; বাঁধের দুই পাশে বর্ষার জল পাইয়া শরবন ঘন সবুজ প্রাচীরের মত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। পথে চলিতে চলিতে অকস্মাৎ ইরসাদ উপরের দিকে মুখ তুলিয়া—হাত বাড়াইয়া উচ্ছ্বসিতভাবে বলিয়া উঠিল—খোদা, তুমি তো সব জানছ, সব দেখছ! বিচার করো—তুমি এর বিচার করো। অন্যায় যদি আমার হয়, হে খোদাতালা, তুমি আমাকে সাজা দিয়ো—আমার চোখের দৃষ্টি নিয়ো; আমি যেন পথে-পথে ভিক্ষে করে বেড়াই। লা-ইলাহা ইল্লা-ল্লাহ্! তুমি ছাড়া আমার কেউ নাই। তুমি বিচার করো! রোজা করে তোমার গোলাম—আমি—তোমার কাছে হাত জোড় করে বলছি—তুমি এর বিচার করো! তোমার ইনসাফে দোষী সাব্যস্ত হবে যারা, সেই বেইমানদের মাথায়···

ইরসাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

দেবু পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। ইরসাদ ভাইয়ের মর্মদাহের আঁচ সে অনুভব

করিয়াছিল। মর্মদাহ তাহারও কম নয়। কিন্তু তাহার যেন সব সহিয়া গিয়াছে। কানুনগোর অপমান, জেল, বিলু এবং খোকন-মণির মৃত্যু, সদ্য-সদ্য তাহার দুই-দুইটা জঘন্য অপবাদ, ছিরু ঘোষের চক্রান্ত—তাহাকে ক্রমশঃ যেমন সংবেদনশূন্য তেমনি সহনশীল করিয়া তুলিয়াছে। এই সেদিনও তাহার মনে আগুন উঠিয়াছিল অকস্মাৎ নিষ্ঠুর প্রজ্বলনে; কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই তাহা নিভিয়া গিয়াছিল। সেদিন হইতে সে যেন আরও প্রশান্ত হইয়া গিয়াছে। দেবু বুঝিল—ইরসাদ বিপক্ষদিগকে নিষ্ঠুর অভিসম্পাতে অভিশপ্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার পিঠে হাত দিয়া গাঢ় স্নেহস্পর্শ জানাইয়া স্নিগ্ধস্বরে বাধা দিয়া বলিল—থাক, ইরসাদ-ভাই, থাক্।

ইরসাদ তাহার মুখের দিকে চাহিল।

দেবু বলিল—কাউকে শাপ-শাপান্ত করতে নেই, ইরসাদ-ভাই।

ইরসাদের চোখ দুইটা দপ-দপ করিয়া জ্বলিতেছিল।

দেবু হাসিয়া বলিল—নিজে যদি ভগবানের কাছে অপরাধ করি—সংসারে পাপ করি, তবে ভগবানকে বলতে হয়—আমাকে সাজা দাও! সে সাজা মাথা পেতে নিতে হয়। কিন্তু অন্য কেউ যদি পাপ করে সংসারে, আমার অনিষ্ট করে, তবে ভগবানকে বলতে হয়—ভগবান, ওকে তুমি ক্ষমা কর, মাফ কর!

ইরসাদ স্থিরদৃষ্টিতে দেবুর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। এবার দুইটি তপ্ত অশ্রুর ধারা তাহার প্রদীপ্ত চক্ষু হইতে গড়াইয়া পড়িল।

দেবু বলিল—এস। মাথার ওপর রোদ চড়ছে। রোজার সময়। পা চালিয়ে এস।

চাদরের খুঁটে চোখ মুছিয়া ইরসাদ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

—আমাদের গাঁ হয়ে চল। আমার বাড়ীতে একটু বসবে, জিরিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বাড়ী যাবে, কেমন?

ইরসাদ এবার ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—চল।

গ্রামের মধ্যে তাহারা দুইজনে যখন ঢুকিল, তখন গ্রামের পথ লোকজনে পরিপূর্ণ। পল্লীপথের জনবিরলতাই স্বাভাবিক রূপ। এমন অস্বাভাবিক জনতা

দেখিয়া দেবু ও ইরসাদ দুইজনেই চমকিয়া উঠিল। ইরসাদ বলিল—ব্যাপার কি দেবু-ভাই ?

দেবু ততক্ষণে ব্যাপারটা বুঝিয়াছে। ভিড় শুধু মানুষেরই নয় রাস্তারধারে, গাছতলায় গাড়ীরও ভিড় জমিয়া গিয়াছে। দেবু বলিল—দেখবে চল। বিপদ কিছু নয়।—সে একটু হাসিল।

ইরসাদও চাষী মুসলমানের ঘরের ছেলে। সুস্থ অবস্থা হইলে ব্যাপারটা সে মুহূর্তে বুঝিতে পারিত। কিন্তু আজ তাহার চিত্ত ও মস্তিষ্ক উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া রহিয়াছে।

পথের ভিড় অতিক্রম করিয়া অল্প খানিকটা আসিয়াই শ্রীহরি ঘোষের বাড়ী। তাহার খামারবাড়ীর প্রবেশের দরজাটা সম্প্রতি পাকা ফটকে পরিণত করিয়াছে শ্রীহরি। প্রশস্ত ফটকটা দিয়া গাড়ী পর্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে। ফটকটার মুক্ত পথে আঙুল বাড়াইয়া দেবু বলিল—ওই দেখ!

তকতকে খামারের উঠানে একখানা ঘরের সমান উচ্চ স্তূপ বাঁধিয়া রাশিরাশি ধান ঢালা হইয়াছে। ভাদ্রের নির্মেঘ আকাশে প্রখর সূর্যের আলোতে শরতের শুভ্রতা। সেই শুভ্র উজ্জ্বল রৌদ্রের প্রতিফলনে পরিপুষ্ট সিঁদুরমুখী ধানের রাশি ঠিক যেন পাকা-সোনার বর্ণে ঝলমল করিতেছিল।

শ্রীহরি একখানা চেয়ারে বসিয়া আছে—একটা লোক একটা ছাতা ধরিয়াছে তাহার মাথার উপর। মধ্যস্থলে বাঁশের তে-কাটায় প্রকাণ্ড এক দাঁড়ি-পাল্লায় সেই ধান ওজন হইতেছে।—রাম-রাম রাম-রাম, রামে-রামে দুই-দুই; দুই রামে তিন-তিন!

আশ-পাশ ঘিরিয়া বসিয়া আছে গ্রাম-গ্রামান্তরের মোড়ল-মাতব্বরেরা। বাহিরে পাঁচিলের গায়ে ঘরের দেওয়ালের পাশে সঙ্কীর্ণ চালের ছায়ায় ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে সাধারণ চাষীরা লুব্ধ প্রত্যাশায়। তাহারা সকলেই দেবুকে দেখিয়া মাথা নত করিল।

দেবু কাহাকেও কোন কথা বলিল না। ইরসাদকে লইয়া সে আপনার দাওয়ায় গিয়া উঠিল। সেখান হইতে শুনিল জগন ডাক্তার উচ্চকণ্ঠে লোকগুলিকে গালি-গালাজ করিতেছে।—বড়লোকের পা-চাটা কুত্তার দল! বেইমান বিশ্বাস-

ঘাতক সব। ইতর ছোটলোক সব।

বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল দুর্গা। ইরসাদকে দেখিয়া সে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল—ওই, কুসুমপুরের পণ্ডিত মিয়া যি গো!

ইরসাদ বলিল—হ্যাঁ। ভাল আছ তুমি?

দুর্গা বলিল—হ্যাঁ ভাল আছি।…তারপর সে দেবুর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—পথ দিয়ে এলে, দেখে এলে?

—কি?

—ঘোষের দুয়ারে ভিড়?

—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ নয়! ইয়ার ঠেলা তোমাকে সামলাতে হবে। ই সব হচ্ছে তোমায় লেগে।

দেবু হাসিল।

দুর্গা বলিল—হাসি লয়। রাঙাদিদির ছেরাদ্দ 'নিকটিয়ে' এসেছে। পঞ্চায়েৎ বসবে।

দেবু আরও একটু হাসিল। তারপর ভিতর হইতে একবাপতি জল ও একটি ঘটি আনিয়া ইরসাদের সামনে নামাইয়া দিয়া বলিল—মুখ-হাত-পা ধুয়ে ফেল। রোজার উপোস, জল খাবার তো জো নাই!

ইরসাদ বলিল—কুলি করবার পর্যন্ত হুকুম নাই।

দেবু একখানা পাখা লইয়া নিজের গায়ে—সঙ্গে সঙ্গে ইরসাদের গায়েও বাতাস দিতে আরম্ভ করিল।

দুর্গা বলিল—আমাকে দেন পণ্ডিত, আমি দুজনাকেই বাতাস করি!

চোদ্দ

পঞ্চগ্রামের জীবন-সমুদ্রে একটা প্রচণ্ড তরঙ্গোচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল। সেটা শতধা ভাঙিয়া ছড়াইয়া পড়িল। সমুদ্রের গভীর অন্তরে অন্তরে যে স্রোত-ধারা বহিয়া চলিয়াছে, তরঙ্গবেগটা অস্বাভাবিক শক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া সেই স্রোতের ধারায়

টান দিয়াছিল ; একটা প্রকাণ্ড আবর্তনের আলোড়নের টানে নিচের জলকে উপরে টানিয়া তুলিতে চাহিতেছিল। সমুদ্রের অন্তঃস্রোত-ধারার আকর্ষণেই সে উচ্ছ্বাস ভাঙিয়া পড়িল। নিরুৎসাহ নিস্তেজ জীবনযাত্রায় আবার দিনরাত্রিগুলি কোন রকমে কাটিয়া চলিল। মাঠে রোয়ার কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। ভোরে উঠিয়া চাষীরা মাঠে গিয়া নিড়ানের কাজে লাগে। হাতখানেক উঁচু ধানের চারাগুলির ভিতর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আগাছা তুলিয়া ধান ঠেলিয়া আগাইয়া যায়, এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত, আবার ও-প্রান্ত হইতে এ প্রান্তের দিকে আগাইয়া আসে। মাঠের আলের উপর দাঁড়াইয়া মনে হয় মাঠটা জনশূন্য।

মাথার উপর ভাদ্রের প্রখর রৌদ্র। সর্বাঙ্গে দরদরধারে ঘাম ঝরে, ধানের ধারালো পাতায় গা-হাত চিরিয়া যায়। তবু অন্তর তাহাদের আশায় ভরিয়া থাকে, মাঠের ঐ সতেজ ধানের গাঢ় সবুজের প্রতিচ্ছায়াই যেন অন্তরে প্রতিফলিত হয়। আড়াই প্রহর পর্যন্ত মাঠে হাঁটিয়া বাড়ী ফেরে। স্নানাহার সারিয়া ছোট ছোট আড্ডায় বিভক্ত হইয়া বসিয়া তামাক খায়, গল্পগুজব করে। গল্পগুজবের মধ্যে বিগত হাঙ্গামার ইতিহাস, আর দেবু ঘোষ ও পদ্ম সংবাদ। দুইটাই অত্যন্ত মুখরোচক এবং উত্তেজনাকর আলাপ। কিন্তু আশ্চর্যের কথা—এমন বিষয়বস্তু লইয়া আলাপ-আলোচনা যেন জমে না। কেন জমে না, তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। সীতাকে অযোধ্যার প্রজারা জানিত না—চিনিত না এ কথা নয়, কিন্তু তবু সীতার অশোকবনে বন্দিনী অবস্থার আলোচনার নানা কুৎসিত কল্পনায় তাহারা মাতিয়া উঠিয়াছিল - ওই মাতিয়া উঠার আনন্দেই। কিন্তু লঙ্কায় রাক্ষসেরা মাতে নাই। অবশ্য তাহারা সীতার অগ্নি-পরীক্ষা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। মন্দোদরীর কথা লইয়া রাক্ষসেরা মাতে নাই। কারণ মাতনের আনন্দ অনুভব করিবার মত তাহাদের মানসিকতা লঙ্কার যুদ্ধে মরিয়া গিয়াছিল। তেমনি ভাবেই বোধ হয় এ অঞ্চলের লোকের মনের কাছে কোন আলোচনাই জমিয়া উঠে না। আষাঢ়ের রথযাত্রার দিন হইতে ভাদ্রের কয়েকদিন তাহাদের জীবনে একটা অদ্ভুত কাল। দিন যেন হাওয়ায় চড়িয়া উড়িয়া গিয়াছে। পঞ্চগ্রামের এতবড় মাঠে গোটা চাষটা হইয়া গেল—হাজার দু-হাজার লোক খাটিল, একদিন একটা বচসা হইল না,

মারপিট হইল না। আরও আশ্চর্যের কথা—এবার বীজধানের আঁটি কদাচিৎ চুরি গিয়াছে। চাষের সময় সে কি উৎসাহ! সে কত কল্পনা-রঙীন্ আশা! মাঠে এবার চার-পাঁচখানা গানই শোনা গিয়াছে এই লইয়া। বাউড়ী-কবি সতীশের গানখানাই সব চেয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল—

"কলিকাল ঘুচল অকালে!
দুখের ঘরে সুখ যে বাসা বাঁধলে কপালে॥
কাক ছুঁয়ে কেউ জল না কাটে, মাঠের জল রইচে মাঠে,
(পরে) দেয় পরের কাটে আলের গোড়ালে॥
ভুলল লোকে গালাগালি, ভাই বেরাদার-গলাগলি,
অঘটনের ঘটন খালি— কলিতে কে ঘটালে।
দীন সতীশ বলে—কর-জোড়ে— তেরশো ছত্রিশ সালে॥"

সতীশের কল্পনা ছিল আবার চাষ হইয়া গেলে, তাহাদের দলের মহড়ার সময় সে এই ধরনের আরও গান বাঁধিয়া ফেলিবে। কিন্তু রোয়ার কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে, এখনও বাউড়ী-ডোমপাড়ায় তাহাদের দল জমিয়া উঠে নাই। ছোট ছেলেদের দল বকুলতলায় সন্ধ্যার হ্যারিকেনের আলোটা জ্বালাইয়া ঢোলক লইয়া বসে—কিন্তু বয়স্কেরা বড় আসে না। সমস্ত অঞ্চলটার মানুষগুলির মধ্যে একটা অবসন্ন ছত্রভঙ্গের ভাব।

অন্ধকার পক্ষ চলিয়াছে। দেবু আপনার দাওয়ায় তক্তাপোশের উপর হ্যারিকেন জ্বালাইয়া বসিয়া থাকে; চুপ করিয়া বসিয়া ভাবে। কুসুমপুরের লোকে তাহাকে ঘৃণা ঘুষ লওয়ার অপবাদ দিয়াছিল; ইরসাদ-ভাই সত্য-মিথ্যা বুঝিয়াছে—তাহার কাছে ইহা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে প্রীতি-সম্ভাষণ করিয়া গিয়াছে;—সে অপবাদের গ্লানি তাহার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে, সেজন্য তাহার দুঃখ নাই! শ্রীহরি ঘোষ তাহার সহিত পদ্মকে ও দুর্গাকে জড়াইয়া জঘন্য কলঙ্ক রটনা করিয়াছে, পঞ্চায়েতের বৈঠক বসাইবার উদ্যোগে এখনও লাগিয়া রহিয়াছে—সেজন্যও তাহার কোন দুঃখ নাই, লজ্জা নাই, রাগ নাই। স্বয়ং ঠাকুর মহাশয়

তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছেন। পঞ্চায়েৎ যদি তাহাকে পতিতও করে, তবুও সে দুঃখ করিবে না, কোন ভয়ই সে করে না। কিন্তু তাহার গভীর দুঃখ—ধর্মের নামে শপথ করিয়া যে ঘট এ অঞ্চলের লোকে পাতিয়াছিল; সেই ঘট তাহারাই চুরমার করিয়া ভাঙিয়া দিল! ইরসাদ-রহম কি ভুলটাই করিল! সামান্য ভুলটা যদি তাহারা না করিত! তাহাকে যাহা বলিয়াছিল—তাহাতেও ক্ষতি ছিল না। তাহাকে বাদ দিয়াও কাজ চলিত। কিন্তু এক ভুলেই সব লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল।

লণ্ডভণ্ডই বটে। এই হাঙ্গামা মিটমাটের উপলক্ষে—কঙ্কণার বাবুদের সঙ্গে কুসুমপুরের শেখেদের বৃদ্ধির ব্যাপারটাও চুকিয়া গিয়াছে। দৌলত এবং রহমকে মধ্যস্থ রাখিয়া বৃদ্ধির কাজ চলিতেছে। টাকায় দুই আনা বৃদ্ধি। সেদিকে হয়ত খুব অন্যায় হয় নাই। কিন্তু জমি বৃদ্ধিরও বৃদ্ধি দিতে হইবে স্থির হইয়াছে। কথাটা শুনিতে বা প্রস্তাবটা দেখিতে অন্যায় কিছু নাই। পাঁচ বিঘা জমির দশ টাকা খাজনা দেয় প্রজারা, সেখানে জমি ছয় বিঘা হইলে এক বিঘার বাড়তি খাজনা প্রজার দেয় এবং জমিদারের ন্যায্য প্রাপ্য—ইহা তো আইনসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত, ধর্মসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু অনেক গোলমাল আছে ইহার মধ্যে। জমিদার-সেরেস্তায় বহুক্ষেত্রে জমি-জমার অঙ্ক ঠিক নাই; মাপের গোলমাল তো আছেই। সেকালের মাপের মান একাল হইতে পৃথক ছিল

দৌলতের বৃদ্ধি কি হারে হইয়াছে বা হইবে তাহা কেহ এখনও জানে না। রহম ওই হারেই বৃদ্ধি দিয়াছে; সে গোমস্তার পাশে বসিয়া মধ্যস্থতা করিবার সম্মান পাইয়াই সব ভুলিয়া গিয়াছে।

কুসুমপুরে বৃদ্ধি অস্বীকার করিয়াছে একা ইরসাদ।

শিবকালীপুরে শ্রীহরি ঘোষের সেরেস্তাতেও বৃদ্ধির কথা-বার্তা পাকা হইয়া গিয়াছে। ওই মুখুয্যেবাবুদের আগেই দাগা বুলাইবে সকলে। এ গ্রামে জগন এবং আর দুই-একজন মাথা খাড়া করিয়া রহিয়াছে। বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরী কোন দিন ধর্মঘটে নাই, কিন্তু প্রাচীনকালের আভিজাত্যের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য বৃদ্ধি দিতে রাজী হয় নাই। সে আপনার সংকল্পে অবিচলিত আছে।

দেখুড়িয়ায় আছে কেবল তিনকড়ি। ভল্লারাও আছে, কিন্তু তাহাদের জমি

কতটুকু? কাহারও তুই বিদ্যা—কাহারও বড় জোর পাঁচ, কাহারও-বা মাত্র দশ-পনের কাঠা।

শ্রীহরি ঘোষের বৈঠকখানায় মজলিশ বসে। একজন গোমস্তার স্থলে এখন দুইজন গোমস্তা। সাময়িকভাবে একজন গোমস্তা রাখিতে হইয়াছে। বৃদ্ধির কাগজপত্র তৈয়ারী হইতেছে। ঘোষ বসিয়া তামাক খায়। হরিশ, ভবেশ প্রভৃতি মাতব্বরেরা আসে। মধ্যে মধ্যে এ অঞ্চলের পঞ্চায়েতমণ্ডলীর মণ্ডলেরাও আসে। দু-চারিজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতও পায়ের ধূলা দেন। শাস্ত্র-আলোচনা হয়। শ্রীহরির উৎসাহের অন্ত নাই। সে নিজের গ্রামের উন্নতির পরিকল্পনা দশের সম্মুখে সগর্বে প্রকাশ করিয়া বলে—

দুর্গোৎসব মহাযজ্ঞ—আগামী বৎসর সে চণ্ডীমণ্ডপে দুর্গোৎসব করিবে। সকলে শুনিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠে। গ্রামে দশভুজার আবির্ভাব—সে তো গ্রামেরই মঙ্গল। গ্রামের ছেলেদের লইয়া যাইতে হয় দ্বারকা চৌধুরীর বাড়ী, মহাগ্রামে ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ী, কঙ্কণায় বাবুদের বাড়ী।

—সেই তো! শ্রীহরি উৎসাহভরে বলে—সেইজন্যেই তো। চণ্ডীমণ্ডপে পূজা হবে; আপনারা দশজনে আসবেন, বসবেন, পূজা করাবেন। ছেলেরা আনন্দ করবে, প্রসাদ পাবে। একদিন গ্রামের জাত জাত খাবে। একদিন হবে ব্রাহ্মণ-ভোজন। অষ্টমীর দিন রাত্রে লুচি-ফলার। নবমীর দিন গাঁয়ের যাবতীয় ছোটলোক, খিচুড়ী যে যত খেতে পারে। বিজয়ার বিসর্জনের রাত্রে বারুদের কারখানা করব।

লোকজন আরও খানিকটা উৎসাহিত হইয়া উঠে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কেহ উপস্থিত থাকিলে সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইয়া—ঘোষের পরিকল্পনাকে রাজকীর্তির সহিত তুলনা করিয়া বলে—দুর্গোৎসব কলির অশ্বমেধ, যজ্ঞ করবার ভারই তো রাজার! করবে বই কি। ভগবান যখন তোমাকে এ গ্রামের জমিদারী দিয়েছেন, মা লক্ষ্মী যখন তোমার ঘরে পা দিয়েছেন—তখন এ যে তোমাকেই করতে হবে। তিনিই তোমাকে দিয়ে করাবেন।

শ্রীহরি হঠাৎ গম্ভীর হইয়া যায়, বলে—তিনি করাবেন, আমি করব—সে তো

বটেই। করতে আমাকে হবেই। তবে কি জানেন, মধ্যে মধ্যে মনে হয়—করব না, কিছু করব না আমি গাঁয়ের জন্যে। কেন করব বলুন? কিছুদিন ধরে আমার সঙ্গে সব কি কাণ্ডটা করলে বলুন দেখি? আরে বাপু, রাজার রাজ্য। তাঁর রাজ্যে আমি জমিদারী নিয়েছি। তিনি বৃত্তি নেবার এক্তিয়ার আমাকে দিয়েছেন—তবে আমি চেয়েছি—দোব না—দোব না করে নেচে উঠল সব—গেঁয়ো পণ্ডিত—একটা চ্যাংড়া ছোঁড়ার কথায়। মুসলমানদের নিয়ে জোট বেঁধে—শেষ পর্যন্ত কি কাণ্ডটা করলে বলুন দেখি।

সকলে স্তব্ধ হইয়া থাকে। সব মনে পড়িয়া যায়। সুস্থ জীবনোচ্ছ্বাসের আনন্দ-আস্বাদ, সুস্থ আত্মশক্তির ক্ষণিক নির্ভীক প্রকাশের সমস্ত স্মৃতি মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। কেহ মাথা নামায়, কাহারও দৃষ্টি শ্রীহরির মুখ হইতে নামিয়া মাটির উপর নিবদ্ধ হয়।

শ্রীহরি বলিয়া যায়—যাক্, ভালয় ভালয় সব চুকে গিয়েছে—ভালই হয়েছে! ভগবান মালিক, বুঝলেন, তিনিই বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

—নিশ্চয়ই। ভগবান মালিক বই কি!

—নিশ্চয়। কিন্তু ভগবান তো নিজে কিছু করেন না। মানুষকে দিয়েই করান। এক একজনকে তিনি ভার দেন! সে ভার পেয়ে যে তাঁর কাজ না করে, সে হল আসল স্বার্থপর—অমানুষ, জন্মান্তরে তার দুর্দশার আর অন্ত থাকে না। তাদের অবহেলায় সমাজ ছারখার হয়।

ব্রাহ্মণেরা এ কথায় সায় দেয়, বলে—নিশ্চয়, রাজা, রাজকর্মচারী, সমাজপতি—এরা যদি কর্তব্য না করে—প্রজা দুঃখ পায়, সমাজ অধঃপাতে যায়। কথায় বলে, রাজা বিনে রাজ্য-নাশ।

শ্রীহরি বলে—এ গ্রামে বদমায়েশি করে কেউ আর রেহাই পাবে না, দুষ্ট বদমাশ যারা—তাদের আমি দরকার হলে গাঁ থেকে দূর করে দোব।

সে তাহার বৃহত্তর পরিকল্পনার কথা বলিয়া যায়।—এ অঞ্চলে নবশাখা সমাজের পঞ্চায়েৎ-মণ্ডলীর সে পুনর্গঠন করিবে; কদাচার, ব্যভিচার, ধর্মহীনতাকে দমন করিবে। কোথাও কোন দেবকীর্তি রক্ষা করিবার জন্য করিবে পাকা

আইনসম্মত ব্যবস্থা। দেবতা, ধর্ম এবং সমাজের উদ্ধারের ও রক্ষার একটি পরিকল্পনা সে মুখে মুখে ছকিয়া যায়।

সে বলে—আপনারা শুধু আমার পিছনে দাঁড়ান। কিছু করতে হবে না আপনাদের! শুধু পেছনে থেকে বলুন—হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে আমরা আছি। দেখুন আমি সব শায়েস্তা করে দিচ্ছি। ঝড়-ঝঞ্ঝাট আসে সামনে থেকে মাথা পেতে নোব! টাকা খরচ করতে হয় আমি করব। পাঁচ-সাত কিস্তি উপরি উপরি নালিশ করলে—যত বড়লোক হোক জিভ বেরিয়ে যাবে এক হাত। স্ত্রী-পুত্র যায় আবার হয়। কত দেখবেন?—

সে আঙুল গণিয়া বলিয়া যায়—কাহার কাহার স্ত্রী-পুত্র মরিয়াছে—আবার বিবাহ করিয়া তাহাদের সন্তানাদি হইয়াছে। সত্যই দেখা গেল, এ গ্রামের ত্রিশ জনের স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে, তাহার মধ্যে আঠাশ জনেরই বিবাহ হইয়াছে। স্ত্রী-পুত্র দুই-ই গিয়াছে পাঁচজনের, তাহার মধ্যে চারজনেরই আবার স্ত্রী-পুত্র দুই-ই হইয়াছে—হয় নাই কেবল দেবু ঘোষের। সে বিবাহ করে নাই।

—কিন্তু—শ্রীহরি হাসিয়া বলিল—সম্পত্তি লক্ষ্মী, গেলে আর ফেরেন না! বড় কঠিন দেবতা। যার প্রজা যত বড় হোক—কিস্তি কিস্তি বাকী খাজনার নালিশ হলে—সম্পত্তি তার যাবেই।

বিস্মিত স্তব্ধ লোকগুলি মাটির পুতুলের মত হইয়া যায়। শ্রীহরি তাহাদের সহায়, তাহারা ঘোষেদের সমর্থনকারী। শ্রীহরি বলিতেছে—তাহাদের জোরেই তাহার জোর, তবু তাহাদের মনে হয় তাহাদের মত অসহায় দুঃখী এ সংসারে আর নাই। উপরের দিকে মুখ তুলিয়া অকস্মাৎ গভীর স্বরে ভবেশ ভগবানকে ডাকিয়া উঠে—গোবিন্দ! গোবিন্দ! তুমিই ভরসা!

হরিশ বলে—এই কথাটিই লোকে ভুলে যায়! মনে করে আমিই মালিক! হামসে দিগর নাস্তি। আরে বাপু—তাহলে ভগবান তো তোকে রাজার ঘরেই পাঠাতেন!

সকলে উঠিবার জন্য ব্যস্ত হয়, আপন আপন মনের কথাগুলি যথাসাধ্য সংক্ষেপ করিয়া সবিনয়ে ব্যক্ত করে।

—আমার ওই জোতটার পুরানো খতিয়ান দলিল খুঁজে পেয়েছি শ্রীহরি। জমি যে বাড়ছে তার মানে হল গিয়ে—ওতে আবাদী জমি তোমার বারো বিঘেই ছিল; তা ছাড়া ঘাস-বেড ছিল—পাঁচ বিঘে। এখন বাবা ঘাস-বেড় ভেঙে ওটাকে সুদ্ধ আবাদী জমি করেছে। তাতেই তোমার সতেরোর জায়গায় কুড়ি বিঘে হচ্ছে।

—আচ্ছা সুবিধেমত একদিন দেখাবেন দলিল।

ব্রাহ্মণরা বলেন—আমার দু'বিঘে বেহ্মত্তোর—মাপের জমির মধ্যে ঢুকে গিয়েছে।

—বেশ, নজির আনবেন।

সকলে উঠিয়া যায়। শ্রীহরি সেরেস্তার কাজ খানিকটা দেখে, তারপর খাওয়া-দাওয়া করিয়া কল্পনা করে—এবার সে লোকাল-বোর্ডে দাঁড়াইবে। লোকাল-বোর্ডে না দাঁড়াইলে—এ অঞ্চলের পথঘাটগুলির সংস্কার করা অসম্ভব। শিবকালীপুর এবং কঙ্কনার মধ্যবর্তী সেই খালটার উপর এবার সাঁকোটা করিতেই হইবে। আর এই লোকগুলার উপর রাগ করিয়া কি হইবে? নির্বোধ হতভাগার দল সব। উহাদের উপর রাগ করাও যা—ঘাসের উপর রাগ করাও তাই।

হঠাৎ একটা জানালার দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। নিজেই আকৃষ্ট হয়। জানালা দিয়া দেখা যায়—অনিরুদ্ধের বাড়ী। সে নিজেই জানালা খুলিয়া দিয়া চাহিয়া দেখে। অন্ধকারের মধ্যে কিছু ঠাওর হয় না। তবে এক একদিন দেখা যায়—কেরোসিনের ডিবে হাতে দীর্ঘাঙ্গী কামারণী এ-ঘর হইতে ও-ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

দেখুড়িয়ার তিনকড়ি আপন দাওয়ার উপর বসিয়া গোটা অঞ্চলটার লোককে ব্যঙ্গভরে গাল দেয়। তিনকড়ির গালিগালাজের মধ্যে অভিসম্পাত নাই, আক্রোশ নাই, আছে শুধু অবহেলা আর বিদ্রূপ। সে বৃত্তি দিবে না। ভূপাল তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছিল; বেশ সম্মান করিয়া নমস্কার করিয়া বলিয়াছিল—যাবে একবার মণ্ডল মশায়। বৃত্তির মিটমাটের কথা হচ্ছে, মোড়লরা সব আসবে। আপনি একটু—

হঠাৎ ভূপাল দেখিল তিনকড়ি অত্যন্ত রূঢ়দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে, সে থমকিয়া থামিয়া গেল এবং কয়েক পা পিছাইয়া আসিল। হঠাৎ মণ্ডল মহাশয়ের চিতাবাঘের মত ঘাড়ে লাফাইয়া পড়া মোটেই আশ্চর্য নয়।

তিনকড়ির মুখের পেশীগুলি এবার ধীরে ধীরে নড়িতে লাগিল। নাকের ডগাটা ফুলিয়া উঠিল—দুইপাশে জাগিয়া উঠিল অর্ধ-চন্দ্রাকারে দুইটা বাঁকা রেখা; —উপরের ঠোঁটটা খানিকটা উল্টাইয়া গেল, দুরন্ত ঘৃণাভরে প্রশ্ন করিল—কোথায় যাব?

—আজ্ঞে?

—বলি—কোথায় যেতে হবে?

—আজ্ঞে—ঘোষ মহাশয়ের কাছারিতে।

—ওরে বেটা, বাউড়ির বেজ খসলে ব্যাঙ হয়, হাতি হয় না। ছিলে পাল, ঘোষ হয়েছে—বেশ কথা। তার আবার মশায় কিসের রে ভেমো বাগ্দী? কাছারিই বা কিসের?

ভূপালের আর উত্তর করিতে সাহস হইল না।

তিনকড়ি হাত বাড়াইয়া—আঙুল দিয়া পথ দেখাইয়া বলিল—যা, পালা।

ভূপাল চলিয়াই যাইতেছিল—হঠাৎ দাঁড়াইল, খানিকটা সাহস করিয়া বলিল —আমার কি দোষ বলেন? আমি হুকুমের গোলাম, আমাকে বললেন—আমি এসেছি। আমার উপর ক্যানে—

তিনকড়ি এবার উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—হুকুমের গোলাম। বেটা ছুঁচোর গোলাম চামচিকে কোথাকার, বেরো বলছি, বেরো।

ভূপাল পলাইয়া বাঁচিল। তিনকড়ির কথায় কিন্তু তাহার রাগ হইল না। বিশেষ করিয়া ডোম, বাগ্দী, বাউড়ী, হাড়ি—ইহাদের সঙ্গে তিনকড়ির বেশ একটি হৃদ্যতা আছে। তিনকড়ির বাছ-বিচার নাই; সকলের বাড়ী যায়, বসে, গল্প করে, কল্কে লইয়া হাতেই তামাক খায়। এককালে সে মনসার গানের দলেও ইহাদের সঙ্গে গান গাহিয়া ফিরিত। আজও রসিকতা করে, গালিগালাজও করে, তাহাতে বড় একটা কেহ রাগ করে না। ভূপাল বরং পথে আপন মনেই পরম কৌতুকে

খানিকটা হাসিয়া লইল। গালাগালখানি বড় ভাল দিয়েছে মোড়ল। 'ছুঁচোর গোলাম চামচিকে'—অর্থাৎ ঘোষ মহাশয় ছুঁচো। তাহার নিজের চামচিকে হইতে আপত্তি নাই, কিন্তু ঘোষ মহাশয়কে ছুঁচো বলিয়াছে—এই কৌতুকেই সে হাসিল।

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি! মাঝে মাঝে মেঘ আসে, উতলা ঠাণ্ডা বাতাস দেয়, গাছপালার ঘন পত্রপল্লবে শন্-শন্ শব্দে সাড়া জাগিয়া উঠে; খানাডোবায় ব্যাঙগুলা কলরব করে; অশ্রান্ত ঝিঁঝির ডাক উঠে, মধ্যে মধ্যে ফিন্‌ফিনে ধারায় বৃষ্টি নামে; তিনকড়ি দাওয়ার উপর অন্ধকারে বসিয়া তামাক টানে আর গালিগালাজও করে। বসিয়া শোনে রাম ভল্লা—তারিণী ভল্লা।

—শেয়াল, শেয়াল! বেটারা সব শেয়াল, বুঝলি রাম, শেয়ালের দল সব।

রাম ও তারিণী অন্ধকারের মধ্যেই সমঝদারের মত জোরে জোরে ঘাড় নাড়ে, বলে—তা বৈ কি!

তিনকড়ির কোন গালিগালাজই মনঃপূত হয় না—সে বলিয়া উঠে—বেটারা শেয়ালও নয়! শেয়ালে তো তবু ছাগল-ভেড়াও মারতে পারে। ক্ষেপেও কামড়ায়। বেটারা সব শেঁকশেয়াল।

ঘরের মধ্যে হ্যারিকেনের আলো জ্বালিয়া পড়ে গৌর আর স্বর্ণ। তাহারা বাপের উপমা শুনিয়া হাসে।

—ভল্লুকের বাচ্চা বেটারা সব উল্লুকের দল!

এবার স্বর্ণ আর থাকিতে পারে না—সে খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠে।

তিনকড়ি ধমকাইয়া উঠে—গৌর বুঝি ঢুলছিস?

গৌর হাসিয়া বলে—কৈ না।

—তবে? তবে সব হাসছিস কেন?

গৌর বলে—তোমার কথা শুনে হাসছে সব।

—আমার কথা শুনে?—তিনকড়ি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলে—হাসির কথা নয় মা। অনেক দুঃখে বলছি মা। অনেক ভিতিক্ষেতে। ছেলেমানুষ তোরা, কি বুঝবি!

স্বর্ণ অপ্রস্তুত হইয়া বলে—না বাবা, সেজন্য নয় ;—একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সঙ্কোচভরেই আবার বলে—তুমি বললে না—ভল্লুকের বাচ্ছা উল্লুক—তাই। ভল্লুকের পেটে উল্লুক হয় ?

এবার তিনকড়িও হাসিয়া উঠে। ও, তা বটে। ওটা আমারই ভুল বটে।

রাম আর কামিনীও এবার হাসে। ঘরের মধ্যে গৌর-স্বর্ণও মার একচোট হাসে, তিনকড়ি স্বর্ণের তীক্ষবুদ্ধির কথা ভাবিয়া খুশিও হয় খানিকটা। উৎসাহিত হইয়া বলে—খানিক মানসার পাঁচালী পড় মা! আমরা শুনি। এই প্রসঙ্গেই সে আবৃত্তি করে—

"দিন গেল মিছে কাজে, রাত্রি গেল নিদ্রে,
না ভজিনু রাধা কৃষ্ণ-চরণারবিন্দে।"

দিনরাত যত বেটা ভেড়ার কথা ভেবে কি হবে ? ভেড়া—ভেড়া, সব ভেড়া। বুঝলি রামা—শেয়াল দেখলে ভেড়াগুলো চোখ বুজে দেয়। ভাবে—আমরা যখন শেয়ালটাকে দেখতে পাচ্ছি না, শেয়ালটাও তখন আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। বেটা শেয়ালের তখন পোয়াবারো হয়ে যায়, ক্যাক করে ধরে আর নলীটি ছিঁড়ে দেয়! এ হয়েছে ঠিক তাই। ব্যাটা ছিরে পাল, শুধু ছিরে পাল ক্যানে—কঙ্কণার বাবুরা পর্যন্ত ধূর্ত শেয়াল আর এ বেটারা হল সব ভেড়া। মটামট ঘাড় ভাঙছে।

এবার ক্রমশই উপমা-সম্মত গালাগালি পাইয়া তিনকড়ি খুশি হইয়া উঠে।

স্বর্ণ ঘর হইতে জিজ্ঞাসা করে—কোন্ জায়গাটা পড়ব বাবা ?

মনসার পাঁচালী তিনকড়ির মুখস্থ। এককালে সে ভাসানের গানের মূল গায়েন ছিল। সেই সময়েই কলিকাতা হইতে ছাপা বইখানা সে আনাইয়া ছিল। সেকালে ভাসানের দল ছিল পাঁচালীর দল; তিনকড়িই তাহাকে যাত্রার ঢঙে রূপান্তরিত করিয়াছিল। তখন সে সাজিত 'চাঁদোবেনে', মধ্যে মধ্যে 'গোদা'র ভূমিকাতেও অভিনয় করিত। চন্দ্রধর সাজিয়া বাঁশের একটা এবড়ো-খেবড়ো ডালের লাঠিকে 'হেমতালের লাঠি' হিসাবে আস্ফালন করিয়া বীররসের অভিনয়ে আসর মাত করিয়া দিত। যতবার সে আসরে প্রবেশ করিত, বলিত—

"যে হাতে পূজিনু আমি চণ্ডিকা জননী,
সে হাতে না পূজিব কভু চ্যাঙ্-মুড়ি কানি!"

তারপর সনকার সম্মুখে গম্ভীরভাবে বলিত—চন্দ্রধরের চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবেছে, ছয়-ছয় বেটা আমার বিয়ে কাল হয়ে অকালে কালের মুখে গিয়েছে, ওই—ওই চ্যাঙ্-মুড়ি-কানির জন্য। আমার মহাজ্ঞান হরণ করেছে। বন্ধু ধন্বন্তরিকে বধ করেছে। আর যা আছে তাও যাক্। তবু—তবু আমি তাকে পূজব না। না—না—না!

আজ সে বলিল—পড না এক জায়গা।

রাম বলিল—সন্ন মা, সেই ঠাঁইটে পড়। কলার মান্দাসে করে বেউলো জলে ভেসেছে মরা নখীন্দরকে নিয়ে; বেশ সুর করে পড় মা।

তিনকড়ি বলিয়া দিল—ওইখান থেকে পড সন্ন। ওই যে—যেখানে চন্দ্রধর বলছে—

"যদিরে কানির লাইগ পাই একবার।
কাটিয়া ঘুচিব আমি মরা পুত্রের ধার॥"

স্বর্ণ বই খুলিয়া সুর করিয়া পড়িল—

"যে করিনু কানিরে আমার মনে জাগে।
নাগের উৎসিষ্ট পুত্র ভাসাও নিয়া গাঙ্গে।
শ্বশুরের শুনিয়া বেউলা নিষ্ঠুর বচন।
বিষাদ ভাবিয়া পাছে করয়ে ক্রন্দন॥"

তারপর সুর করিয়া ত্রিপদী ছন্দে আরম্ভ করিল—

"মালি নাগেশ্বর খানিক উপকার করহ বেউলারে!
তুমি বড় গুণমণি তোরে ভাল আমি জানি
হের, আইস বুলি হে তোমারে!
যাও তুমি সাধু পাশ খুঁজিয়া লও রাম-কলার গাছ
বান্ধ ভুরা যেমন প্রকারে,
হাতে কঙ্কণ ধর, খোলের মাঝস গড়
অমূল্য রতন দিমু তোরে॥"

বেহুলা বিলাপ করে আর আপনার বিবাহের বেশ খুলিয়া ফেলে ; হাতের কঙ্কণ খুলিয়া ফেলিল—বাজু-বন্ধ, অমম খুলিল—কানের কুণ্ডল, নাকের বেসর ফেলিয়া দিল, সিঁথের সিন্দুর মুছিল, বাসর-ঘরে সোনার বাটা ভরা ছিল পানের খিলি, বেহুলা সে সব ফেলিয়া লখীন্দরের মৃতদেহ কোলে করিয়া এক অনির্দিষ্টের উদ্দেশ্যে ভাসিয়া চলিল। মৃত লখীন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া খেদ করিতে করিতে ভাসিয়া চলিল—

"জাগরে প্রভু গুঞ্জরি সাগরে।
তোমারে ভাসায়ে মাও চলিয়া যায় ঘরে।
বাপ যোগদ ভাল পাষাণে বাঁধে হিয়া।
ছাড়িল তোমায় দয়া সাগরে ভাসাইয়া।"

বেহুলা ভাসিয়া যায়। কাক কাঁদে, সে বেহুলার সংবাদ লইয়া যায় তাহার মায়ের কাছে, অন্য পাখীরা কাঁদে। পশুরা কাঁদে, শিয়াল আসে লখীন্দরের মৃতদেহের গন্ধে, কিন্তু বেহুলার কান্না দেখিয়া সেও কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া যায়।...

তিনকড়ি, রাম, তারিণী ইহারাও কাঁদে। স্বর্ণের গলাও ভারী হইয়া আসে, সেও মধ্যে মধ্যে চোখের জল মোছে। সেই অধ্যায়টা শেষ হইতেই তিনকড়ি বলিল—আজ আর থাক্ মা সন্ন।

স্বর্ণ বইখানি বন্ধ করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া তুলিয়া রাখিয়া বাড়ীর ভিতর গেল ; গৌর খানিক আগেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তারিণী এবং রামও উঠিল।

—আজ উঠলাম মোড়ল।

—হ্যাঁ।—অন্যমনস্ক তিনকড়ি একটু চকিতভাবেই বলিল—হ্যাঁ।

অন্ধকারের দিকে চাহিয়া সে বসিয়া রহিল। মনটা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। রাত্রে বিছানায় শুইয়াও তাহার ঘুম আসে না। গাঢ় অন্ধকার রাত্রি, ঝিমি-ঝিমি বৃষ্টি। চারিদিক নিস্তব্ধ—গ্রাম-গ্রামান্তরের লোকজন সব অঘোরে ঘুমাইতেছে। তাহারা পেটের দায়ে মান বলি দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে। শ্রীহরি ঘোষের গোলা খুলিয়াছে, কঙ্কণার বাবুদের গোলা খুলিয়াছে, দৌলত শেখের গোলা খুলিয়াছে—তাহাদের জন্য। কিন্তু তাহাকে কেহ দিবে না। সে শহরে

কলওয়ালার কাছে টাকা লইয়া একবার কিনিয়াছিল। সেই ধানের কিছু কিছু সে জমাদের দিয়াছে। আবার ধান চাই। বড়লোকের—ওই জমিদারের সঙ্গে বাদ করিয়াই চৌদ্দ ডিঙা মধুকর ডুবিয়া গেল। পৈতৃক পঁচিশ বিঘা জমির বিশ বিঘা গিয়াছে, অবশিষ্ট আর পাঁচ বিঘা। বেহুলার মত তাঁর স্নেহের স্বর্ণময়ী বাসরে বিধবা হইয়া অথৈ সাগরে ভাসিতেছে। এ কালে লখীন্দর বাঁচে না। উপায় নাই। হঠাৎ তাহার মনে পড়ে, সদর শহরে ভদ্রলোকের ঘরেও আজকাল বিধবা-বিবাহ হইতেছে। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। সেকথা একবার সে তাহার স্ত্রীর কাছে তুলিয়াছিল, কিন্তু স্বর্ণ তাহার মাকে বলিয়াছিল—না—মা! ছি!···আর এক উপায়—স্বর্ণকে লেখাপড়া শেখানো। জংশনে সে মেয়ে-ডাক্তারকে দেখিয়াছে, মেয়ে-ইস্কুলের মাস্টারণীদের দেখিয়াছে। লেখাপড়া শিখিয়া এমনই যদি স্বর্ণ হইতে পারে!···সে বারান্দায় শুইয়া ভাবে।

কৃষ্ণপক্ষের আকাশে চাঁদ উঠিল। মেঘের ছায়ায় জ্যোৎস্না-রাত্রির চেহারা হইয়াছে ঠিক ভোররাত্রির মত। মধ্যে মধ্যে ভুল করিয়া কাক ডাকিয়া উঠিতেছে—বাসা হইতে মুখ বাড়াইয়া পাখার ঝাপট মারিতেছে

তিনকড়ি মনের সংকল্পকে দৃঢ় করিল। বহুদিন হইতেই তাহার এই সংকল্প, কিন্তু কিছুতেই কাজে পরিণত করিতে সে পারিতেছে না. কালই দেবুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করিবে।

—মণ্ডল মশায়! ও মণ্ডল মশায়! মণ্ডল মশায় গো।

তিনকড়ির নাসিকাধ্বনির সাড়া না পাইয়া চৌকিদারটা আজ তাহাকে ডাকিতেছে।

কুসুমপুরের মুসলমানেরা দৌলত শেখের কাছে ধান ঋণ পাইয়াছে। সারাটা দিন রমজানের রোজার উপবাস করিয়া ও সারাটা দিন মাঠে খাটিয়া জমিদারের সেরেস্তায় বৃদ্ধির জটিল হিসাব করিয়াছে। সূর্যাস্তের পর 'এফতার' অর্থাৎ উপবাস ভঙ্গ করিয়া অসাড়ে ঘুমাইতেছে।

ইরসাদ প্রতি সন্ধ্যায় রোজার উপবাস ভঙ্গ করিবার পূর্বে—তাহার একজন

গরীব জাতভাইকে কিছু খাইতে দিয়া তবে নিজে খায়। তাহার মনে শক্তি নাই, অহরহ একটা অব্যক্ত জ্বালায় সে জ্বলিতেছে। দেবু-ভাই তাহাকে যে কথা বলিয়াছিল—সে কথা মনে করিয়াও সে মনকে মানাইতে পারে না।

সে স্পষ্ট চোখের উপর দেখিতে পাইতেছে—কি হইতেছে। শুধু কি হইতেছে নয়, কি হইবে—তাহাও তাহার চোখের উপর ভাসিতেছে। দৌলতের ঋণ সর্বনাশা ঋণ! তাহার কাছে টাকা কর্জ লইয়া কলওয়ালার দেনা শোধ করা হইয়াছে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই ঋণের দায়ে সম্পত্তি সমস্ত গিয়া ঢুকিবে দৌলতের ঘরে। কলওয়ালার ঋণে যাইত ধান; দৌলতের ঋণ সুদে-আসলে যুক্ত হইয়া প্রবালদ্বীপের মত দিন দিন বাড়িবে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই গোটা গ্রামটার জমির মালিক হইবে দৌলত। শিবকালীপুরের শ্রীহরি ঘোষের মত···সে-ই হইবে তামাম জমির মালিক। রহম-চাচাকেও খাজনা দিতে হইবে দৌলতকে।

অন্ধকার রাত্রের মধ্যে আকাশের দিকে চাহিয়া সে ঈশ্বরকে ডাকে। 'আল্লাহ্-নূরাইয়াহ্'—তুমি এর বিচার কর। প্রতিকার কর! গরীবদের বাঁচাও।

এ প্রার্থনা তার নিজের জন্য নয়। সে ঠিক করিয়াছে—এ গ্রাম ছাড়িয়া সে চলিয়া যাইবে। তাহার শ্বশুরবাড়ীর আহ্বানকে সে আর অগ্রাহ্য করিবে না! সে যাইবে। কাজ করিবার সঙ্গে পড়িবে, ম্যাট্রিক পাস করিয়া সে মোক্তারি পড়িবে। মোক্তার হইয়া তবে সে দেশে ফিরিবে। তার আগে নয়। তারপর সে যুদ্ধ করিবে। দৌলত, কঙ্কণার বাবু, শ্রীহরি ঘোষ—প্রতিটি দুশমনের সঙ্গে সে জেহাদ করিবে।

মহাগ্রামে ন্যায়রত্ন বসিয়া ভাবেন।

চণ্ডীমণ্ডপে হারিকেন জ্বলে, কুমোরেরা দুর্গাপ্রতিমায় মাটি দেয়, অজয় বসিয়া থাকে। ওইটুকু ছোট ছেলে—উহার চোখেও ঘুম নাই। গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে প্রতিমা-গঠন দেখে। শশীশেখরও এমনি ভাবে দেখিত; বিশ্বনাথও দেখিত, অজয়ও দেখিতেছে। পাড়ার ছেলেপিলেরা আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চিরকাল থাকে! কিন্তু এ দাঁড়াইয়া থাকা সে দাঁড়াইয়া থাকা নয়—অর্থাৎ তাঁহারা ছেলেবেলায় যে মন লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন—এ তাহা নয়।

জমজমাট মহাগ্রাম—ধন-ধান্যে ভরা সচ্ছল পল্লীগ্রাম—অথচ উৎসব-সমারোহ কিছুই নাই। প্রাণধারা ক্রমশ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। সম্পদ গিয়াছে, মানুষের স্বাস্থ্য গিয়াছে; বর্ণাশ্রম সমাজ-ব্যবস্থা আজ বিনষ্টপ্রায়; জাতিগত কর্মবৃত্তি মানুষের হস্তচ্যুত—কেহ হারাইয়াছে, কেহ ছাড়িয়াছে। আজই সকালে আসিয়াছিল কয়েকটি বিধবা মেয়ে। তাহারা ধান ভানিয়া অন্নের সংস্থান করিত, কিন্তু ধান-কল হইয়াছে জংশনে, তাহাদের কাজ এত কমিয়া গিয়াছে যে তাহাতে আর তাহাদের ভাত-কাপড়ের সংস্থান হইতেছে না। তিনি শুধু শুনিলেন। শুনিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন, কিন্তু উপায় কিছু তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিতে পারিলেন না। এখনও ভাবিয়া পান নাই।

এ বিষয়ে তিনি অনেকদিন হইতেই সচেতন। এককালে কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে সমাজধর্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—বৈদেশিক মনোভাবকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কালের উৎসাহে আপন পুত্রই বিদ্রোহী হইয়াছিল। তারপরও তিনি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন হোক বিশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থা, ধর্ম যদি অক্ষুণ্ণ থাকে—তবে আবার একদিন সব ফিরিবে। আজ স্বয়ং ঈশ্বরই বুঝি হারাইয়া যাইতেছেন।

তাঁহার পৌত্র বিশ্বনাথ কালধর্মে আজ নাস্তিক, জড়বাদী

বিশ্বনাথ চলিয়া গিয়াছে। দেবুর সহিত কথা-প্রসঙ্গে সেদিন যে কথা উঠিয়াছিল—সেই আলোচনার পরিণতিতে সে বলিয়াছিল—আমার জীবনের পথ, আদর্শ, মত—আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ আলাদা। আপনি আমার জন্যে শুধু কষ্ট পাবেন দাদু। তার চেয়ে—জয়া আর অজয়কে নিয়ে—

ন্যায়রত্ন বলিয়াছিলেন—না ভাই! সে যেয়ো না। হোক আমাদের মত ও পথ ভিন্ন। তা বলে কি এক জায়গায় দুজনে বাসও করতে পারব না?

বিশ্বনাথ পায়ের ধুলা লইয়া বলিয়াছিল—বাঁচালেন দাদু! জয়া, অজয় আপনার কাছে থাক, আর আমি--

---আর তুমি? তুমি কি---

—আমি?—বিশ্বনাথ হাসিয়াছিল।—আমার কর্মক্ষেত্র দিন দিন যেমন বিস্তৃত

—তেমনি জটিল হয়ে উঠছে দাদু।

—এইখানে—তোমার দেশে থেকে কাজকর্ম কর তুমি।

—আমার কর্মক্ষেত্র গোটা দেশটাতে দাদু। আমি আপনার মত মহা-মহোপাধ্যায়ের পৌত্র, আমার কর্মক্ষেত্র বিরাট তো হবেই। এখানে কাজ করবে দেবু, দেবুর সঙ্গে আরও লোক আসবে ক্রমশ, দেখবেন আপনি। মানুষ চাপা পড়ে মরে, কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্ব পুরুষানুক্রমে মরে না। তার অন্তরাত্মা উঠতে চাচ্ছে—উঠবেই। আপনাদের সমাজ-ব্যবস্থা কোটি কোটি লোককে মেরেছে—তাই তাদের মাথা-চাড়ায় সে চৌচির হয়ে ফেটেছে। সে একদিন ভাঙবে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা সমাজের কল্যাণ চিন্তাই করতে চেয়েছিলেন, তাতে আমি সন্দেহ করি না। কিন্তু কালক্রমে তার মধ্যে অনেক গলদ, অনেক ভুল ঢুকেছে। সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতেই আমরা এ সমাজকে ভাঙব—ধর্মকে বদলাব।

প্রাচীন কাল হইলে ন্যায়রত্ন আগ্নেয়গিরির মত অগ্নুদ্গার করিতেন। কিন্তু শশীর মৃত্যুর পর হইতে তিনি শুধু নিরাসক্ত দ্রষ্টা ও শ্রোতা। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি শুষ্ক হাসি হাসিয়াছিলেন।

বিশ্বনাথ বলিয়া গিয়াছে—একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী রাজনৈতিক আন্দোলন আসন্ন, দাদু! আমার কলকাতা ছাড়লে চলবে না। জয়াকে কোন কথা বলবেন না। আর আপনার দেব-সেবার একটা পাকা বন্দোবস্ত করুন। কোন টোলের ছেলেকে দেবতা বা সম্পত্তি আপনি লেখাপড়া করে দিন।

ন্যায়রত্ন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন—যদি জয়াকে ভার দি বিশ্বনাথ? তাতে তোমার কোন আপত্তি আছে?

বিশ্বনাথ একটু চিন্তা করিয়া বলিয়াছিল—দিতে পারেন, কারণ জয়া আমার ধর্ম গ্রহণ করতে কোনদিনই পারবে না।

ন্যায়রত্ন অন্ধকার দিগন্তের দিকে চাহিয়া ওই কথাই ভাবিতেছিলেন আর বিদ্যুচ্চমকে আভাস দেখিতেছিলেন। কোন অতি দূর দূরান্তের বায়ুস্তরে মেঘ জমিয়া বর্ষা নামিয়াছে, সেখানে বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইতেছে; তাহারই আভাস

দিগন্তে ক্ষণে ক্ষণে ফুটিয়া উঠিতেছিল। মেঘ-গর্জনের কোন শব্দ শোনা যাইতেছে না। শব্দতরঙ্গ এ দূরত্ব অতিক্রম করিয়া আসিতে ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া শেষে নৈঃশব্দ্যের মধ্যে মিলাইয়া যাইতেছে। ইহার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই। ভাদ্র মাস হইলেও এখনও সময়টা বর্ষা। কয়েকদিন আগে পর্যন্ত এই অঞ্চলে প্রবল বর্ষা নামিয়াছিল; জলঘন মেঘে আচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুচ্চমক এবং মেঘগর্জনের বিরাম ছিল না। আবার আজ মেঘ দেখা দিয়াছে; খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন মেঘপুঞ্জের আনাগোনা চলিয়াছেই, চলিয়াছেই। দিগন্তে এ সময়ে মেঘের রেশ থাকেই এবং চিরদিনই এ সময় দূর-দূরান্তের মেঘভারের বিদ্যুৎ-লীলার প্রতিচ্ছটা রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে দিগন্তসীমায় ক্ষণে ক্ষণে আভাসে ফুটিয়া উঠে। সমস্ত জীবনভোরই ন্যায়রত্ন এ খেলা দেখিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আজ তিনি এই ঋতুরূপের স্বাভাবিক বিকাশের মধ্যে অকস্মাৎ অস্বাভাবিক অসাধারণ কিছু দেখিলেন যেন। তাঁহার নিজের তাই মনে হইল।

গভীর শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন নিষ্ঠাবান হিন্দু তিনি। বাস্তব জগতের বর্তমান এবং অতীত কালকে আঙ্কিক হিসাবে বিচার করিয়া, সেই অঙ্ক-ফলকেই ধ্রুব, ভবিষ্যৎ, অখণ্ড সত্য বলিয়া মনে করিতে পারেন না। তাহারও অধিক কিছু—অতীন্দ্রিক কিছুর অস্তিত্বে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস; মধ্যে মধ্যে তিনি তাহাকে যেন প্রত্যক্ষ করেন, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া, সমস্ত মন দিয়া পর্যন্ত অনুভব করেন। আকস্মিকতার মত অপ্রত্যাশিতভাবে জটিল রহস্যের আবরণের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া সে আসে; বাস্তববাদের যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া অঙ্কফল ওলট-পালট বিপর্যস্ত করিয়া দিয়া যায়।

বিশ্বনাথ বলে—অঙ্ক কষিয়া আমরা সূর্যের আয়তন বলিতে পারি, ওজন বলিতে পারি।

হয় তো বলা যায়। জ্যোতিষীরা অঙ্ক কষিয়া গ্রহ-সংস্থান নির্ণয় করে। পুরাতন কথা। নূতন করিয়া সূর্যের এবং অন্যান্য গ্রহের আয়তন তোমরা বলিয়াছ। কিন্তু ওই অঙ্কটাই কি সূর্যের আয়তন—ওজন? কোটী কোটী মণ—। ন্যায়রত্ন হাসিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন—যে লোক দু-মণ বোঝা বইতে পারে,

চার মণ তার ঘাড়ে চাপালে তার ঘাড় ভেঙে যায়, দাদু। সুতরাং দু-মণের দ্বিগুণ চার মণ অঙ্ক কষে বললেও—সেটা যে কত ভারী সে জ্ঞান তার নেই। অনুভূতি দিয়ে তাকে প্রত্যক্ষ করতে হয়। যার অতীন্দ্রিয় অনুভূতি নেই—নির্ভুল হলেও সর্বতত্ত্বের অঙ্কফল তার কাছে নিষ্ফল। যার আছে, সে বুঝতে পারে আজকের অঙ্কফল কাল পাল্টায়- পূর্ণ কল্পিত হয়, বৃদ্ধি পায়। অতীতকে এই ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি দিয়ে প্রত্যক্ষ করতে হয়।

বিশ্বনাথ উত্তর দেয় নাই।

বিশ্বনাথ বুঝিয়াছিল—নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণের সংস্কার-বশেই ন্যায়রত্ন এ কথা বলিতেছেন। তাঁহার সে সংস্কার ছিন্নভিন্ন করিয়া দিবার মত তর্কযুক্তিও তাহার ছিল, কিন্তু স্নেহময় বৃদ্ধের হৃদয়, বেশী আঘাত দিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই। সে চুপ করিয়াই ছিল, কেবল একটু হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

ন্যায়রত্নও আর আলোচনা বাড়ান নাই। বিশ্বনাথ স্থির, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এখন তিনি শুধু দ্রষ্টা।...অন্ধকার রাত্রে একা বসিয়া ন্যায়রত্ন ওই কথাই ভাবেন! ভাবেন অজয় আবার কেমন হইবে কে জানে!

একটা বিপর্যয় যেন আসন্ন, ন্যায়রত্ন তাহার আভাস মধ্যে মধ্যে স্পষ্ট অনুভব করেন। নূতন কুরুক্ষেত্রের ভূমিকা এ। অভিনব গীতার বাণীর জন্য পৃথিবী যেন উন্মুখ হইয়া আছে।

তবু তিনি বেদনা অনুভব করেন বিশ্বনাথের জন্য। সে এই বিপর্যয়ের আবর্তে ঝাঁপ দিবার জন্য যোদ্ধার আগ্রহ লইয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে।

জয়ার মুখ, অজয়ের মুখ মনে করিয়া তাঁহার চোখের কোণে অতি ক্ষুদ্র জলবিন্দু জমিয়া উঠে। পরমুহূর্তেই তিনি চোখ মুছিয়া হাসেন।

ধন্য সংসারে মায়ার প্রভাব! মহামায়াকে তিনি মনে মনে প্রণাম করেন।

পনের

আরও একজন জাগিয়া থাকে। কামার-বউ, পদ্ম। অন্ধকার রাত্রে ঘরের মধ্যে অন্ধকার স্পর্শসহ, গাঢ়তর হইয়া উঠে। পদ্ম অন্ধকারের মধ্যে চোখ মেলিয়া জাগিয়া থাকে।—এলোমেলো চিন্তা। শুধু এক বেদনার একটানা সুরে সেগুলি গাঁথা।

উঃ—কি অন্ধকার! নিজের হাতখানা চোখের সামনে ধরিলেও দেখা যায় না!

গ্রামখানায় লোক অঘোরে ঘুমাইতেছে। সাড়া-শব্দ নাই, শুধু ব্যাঙের শব্দ, বোধ হয় হাজার ব্যাঙ একসঙ্গে ডাকিতেছে। হুইড়া বড় ব্যাঙ—এখানে বলে হাঁড়া-ব্যাঙ—পালা দিয়া ডাকিতেছে। একটা ডাকিতেছে অন্যটা থামিয়া আছে, এটা থামিলেই ওটা ডাকিবে। যেন কথা বলিতেছে। একটা পুরুষ আর তাহার স্ত্রী।...বেঙা চলিয়াছে জলে, পরমানন্দে জলে সাঁতার কাটিয়া আহারের সন্ধানে, পূর্ণ বেগে—তীরের মতন। বেঙী ছানাগুলি লইয়া পিছনে পড়িয়া যাচ্ছে—কচি কচি পায়ে এত জোরে জল কাটিয়া যাইবার তাহাদের শক্তি নাই, বেঙী তাহাদিগকে ফেলিয়া যাইতে পারে না, সে ডাকিতেছে—

"যেও না যেও না বেঙা—আমাদিগে ছেড়ে,
মুই নারী অভাগিনী ভাসি যে পাথারে—
ও-হায় কচি-বাচ্চা নিয়ে!"

বেঙা গম্ভীর গলায় শাসন করিয়া বলে—

"মর্—মর্—এলি আবা—পিছে ডাকিস্ কেনে?
কেতার্থ করেছ আমায়—ছেলেপিলে এনে—
মরতে কেন করলাম বিয়ে!"

পুরুষগুলা এমনি বটে। প্রথম প্রথম কত ভালবাসা! তারপর ফিরিয়াও চায় না।...অনিরুদ্ধ গেল—বলিয়া গেল না—কাকের মুখে একটা বার্তাও পাঠাইল না। একখানা পোস্টকার্ড, কিই বা তাহার দাম! হঠাৎ মনে হয়, সে কি

বাঁচিয়া আছে? না, মরিয়া গিয়াছে? সে নাই—নিশ্চয়ই মরিয়াছে। বাঁচিয়া থাকিলে একটা খবরও সে কখনও-না-কখনও দিত। বেড়ারা এমনি করিয়াই মরে। শোলমাছের পোনার ঝাঁকের লোভে, কাঁকড়াবাচ্চার ঝাঁকের লোভে বেঘোরে ছুটিয়া যায়—কালকেউটে যম হইয়া পাকিয়া থাকে—সে খপ করিয়া ধরে।—সে দুঃখের মধ্যেও হাসে। তখন বেড়ার কি কাতরানি!

"ও বেড়ী—ও বেড়ী—আমায় যমে ধরেছে।"

এবার সে অন্ধকারের মধ্যে হাসিয়া সারা হয়।

বাহিরে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল, বিদ্যুতের ছটা জানালা দরজার ফাঁক দিয়া—দেওয়ালের ফাটল দিয়া—চালের ফুটা দিয়া ঘরের ভিতর চক্‌চক্‌ করিয়া খেলিয়া গেল।—উঃ। কি ছটা!

ঘরের ভিতরের অন্ধকার পরমুহূর্তেই হইয়া উঠিল দ্বিগুণিত। পদ্ম ঘরের চারিদিক সেই অন্ধকারের মধ্যে চাহিয়া দেখিল। আর কিছুই দেখা যায় না; কিন্তু বিদ্যুতের এক চমকেই সব দেখা গিয়াছে। শিবকালীপুরের কর্মকারের ঘর ফাটিয়া চৌচির হইয়াছে, চালে অজস্র ফুটা—এইবার ধসিয়া গিয়া ঢিপিতে পরিণত হইবে। কর্মকার মরিল—তাহার ঘর ভাঙিল, এখন শুধু টিকিয়া রহিল কামারের বউ। কর্মকার মরিয়াছে, এমন কথাই বা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে?

সকল বেড়াই কি মরে? তাহারা লোকের পোনা খাইয়া আরও খাইয়া চলে—শেষে গাঙে গিয়া পড়ে; সেখানে পায়—রুই কাতলের ডিম, পোনার ঝাঁক। সেই ঝাঁকের সঙ্গে স্রোতে ভাসিয়া চলিয়া যায়। গাঙের ধারের বেড়ীর দেখা হয়, সেইখানে জমিয়া যায়। আবার এমনও হয় যে, বেড়া সারারাত্রি খাইয়া-দাইয়া সকালে ফেরে, ফিরিয়া দেখে—বেড়ী-ই নাই, তাহাকে ধরিয়া খাইয়াছে গ্রামের গোখুরা। ছেলেগুলারও কতক খাইয়াছে কতকগুলা চলিয়া গিয়াছে কোথায় কে জানে। আবার কত বেড় ছেলে ফেলিয়া পলাইয়া যায়। ওই উচ্চিংড়ের মা তারিণীর বউ! ওই উচ্চিংড়ে ছেলেটা। আবার তাহাদের মিতেকে—দেবু পণ্ডিতকে দেখ না কেন! মিতেনী মরিয়াছে, মিতে কাহারও দিকে কি ফিরিয়া চাহিল।

হঠাৎ মনে পড়ে রাঙাদিদিকে। রাঙাদিদি কতই না রসিকতা করিত। কত কথা বলিত। তাহাকে গাল দিয়া বলিত—মরণ তোমার! মর তুমি! ভাল করে যত্ন-আত্যি করতে পারিস না?

পদ্ম একদিন হাসিয়া বলিয়াছিল—আমি পারব না! তুমি বরং চেষ্টা করে দেখ দিদি।

—ওলো—আমার বয়েস থাকলে—রাঙাদিদি তাচ্ছিল্যভরে একটা পিচ্ কাটিয়া বলিয়াছিল—দেখ্‌তিস দেবা আমার পায়ে গড়াগড়ি যেতো। দেখ্ না—এই বুড়ো বয়সে আমার রঙের জৌলুসটা দেখ না!···এই একজন ছিল তাহার দরদী জন। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া যায় দুর্গাকে! এই এক দরদী আছে তার! দুর্গা বলে—জামাই পণ্ডিত পাথর! পাথর হাসে না, পাথর কাঁদে না, পাথর কথা বলে না, পাথর গলে না। পাথর সে অনেক দেখিল। বকুলতলার নুড়ি-পাথরকে দেখিয়াছে, শিবকে দেখিয়াছে, কালীকে দেখিয়াছে,—অনেক মাথা কুটিয়াছে। তাহার গলায় হাতে এখনও একবোঝা মাদুলি।

পণ্ডিতও পাথর। বেশ হইয়াছে—লোকে পাথরের গায়ে কলঙ্কের কালি লেপিয়া দিয়াছে—বেশ হইয়াছে! খুশি হইয়াছে সে!···

বাহিরে পাখার ঝপটের শব্দ উঠিল, কাক ডাকিতেছে। সকাল হইয়া গেল কি? আঃ—তাহা হইলে বাঁচে! পদ্ম বিছানার পাশের জানালাটা খুলিয়া অবাক হইয়া গেল। আহা, এ কি রাত্রি! আকাশে কখন চাঁদ উঠিয়াছে। পাতলা মেঘে ঢাকা চাঁদের আলো ফুট ফুট করিতেছে—ফিনফিনে নীলাম্বরী শাড়ী-পরা ফর্সা বউয়ের মত।

সে দরজা খুলিয়া মাঠ-কোঠার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

চারিদিক নিঝুম। উপরের বারান্দা হইতে দেখিয়া অদ্ভুত মনে হইতেছে। বাড়ীটা যেন হাঁ করিয়া গিলিতে চাহিতেছে। মাটির উঠান জলে ভিজিয়া নরম হইয়া আছে, কিন্তু তবু রূপালী জ্যোৎস্নায় তক্ তক্ করিতেছে, কোথাও একমুঠা জঞ্জাল, কোথাও একটা পায়ের দাগ নাই! দক্ষিণ-দুয়ারী বারান্দাটা

পড়িয়া আছে—কোথাও একটা জিনিস নাই। বারান্দাটা মনে হইতেছে কত বড়! পোড়ো বাড়ী জঞ্জালে ময়লায় ভরিয়া পড়িয়া থাকে—মরা মানুষের মত। চালে খড় থাকে না, দেওয়াল ভাঙিয়া যায়, দুয়ার জানালা খসিয়া যায়—মড়ার মাথায় যেমন চুল থাকে না, মাংস থাকে না, চোখের গর্ত মুখের গহ্বর হাঁ হইয়া থাকে, তেমনি ভাবে। আর এ বাড়ীটা ঝক্-ঝক্ তক্-তক্ করিতেছে, চাল আজও খড়ে ঢাকা, দরজা জানালা জীর্ণ হইলেও ঠিক আছে; শুধু নাই কোথাও মানুষের কোন চিহ্ন। না আছে পায়ের ছাপ, না আছে জিনিসপত্র, জামা—জুতো—ছড়ি—হুঁকো—কল্কে—কল্কে-ঝাড়া গুল, সব থাকিত দক্ষিণ-দুয়ারী ঘরটার দাওয়ায়! লোকের বাড়ীর উঠানে থাকে—ছেলের খেলাঘর, যতীন-ছেলে থাকিতে উচ্চিংড়ে, গোবরা ছিল—তখন উঠানটায় ছড়াইয়া থাকিত কত জিনিস, কত উদ্ভট সামগ্রী! এখন কিছুই নাই আর, কিছুই নাই। মনে হইতেছে—বাড়ীটা নিঃসাড়ে মরিতেছে ক্ষুধার জ্বালায়—যেন হাঁ করিয়া আছে খাদ্যের জন্য, মানুষের কর্ম-কোলাহলে—মানুষের জিনিসপত্রে পেটটা তাহার ভরিয়া দাও। একা পদ্মকে নিত্য চিবাইয়া চুষিয়া তাহার তৃপ্তি হওয়া দূরে থাক—সে বাঁচিয়া থাকিলেও পারিতেছে না। উঠানের একপাশে কাহার পায়ের দাগ পড়িয়াছে যেন! দুর্গার পায়ের দাগ। সন্ধ্যাতেও সে আসিয়াছিল। অনুদিন সে এইখানে শোয়। আজ আসে নাই।

হয়তো—! ঘৃণায় পদ্মের মনটা রি-রি করিয়া উঠিল। হয়তো কঙ্কণা গিয়াছে। অথবা জংশনে! কাল জিজ্ঞাসা করিলেই অবশ্য বলিবে। লজ্জা বা কুণ্ঠা তাহার নাই, দিব্য হাসিতে হাসিতে সবিস্তারে সব বলিবে। বড় করিয়াই সে বলে—পেটের ভাত—পরনের কাপড়ের জন্য দাসীবিত্তিও করতে নারব ভাই, ভিক্ষেও করতে নারব।

ভিক্ষা কথাটা তাহার গায়ে বাজিয়াছিল। মনে করিলেই বাজে। ছিঃ, সে ভিক্ষার অন্ন খায়! হ্যাঁ! ভিক্ষার ভাত ছাড়া কি? পণ্ডিতের কাছে এ সাহায্য লইবার তাহার অধিকার কি? নিজের ভাগ্যের উপর একটা ক্রুদ্ধ আক্রোশ তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সে আক্রোশ আকাশ-ছাওয়া মেঘের মত গিয়া পড়িল প্রথমটা অনিরুদ্ধের উপর, পরে শ্রীহরির উপর, তারপর সে আক্রোশ

গিয়া পড়িল দেবুর উপর। সেই বা কেন এমন-ভাবে করে তাকে? কেন?

দুর্গা বলে মিথ্যা নয়; বলে—পণ্ডিতকে দেখে আমার মায়া হয়। আহা বিলু-দিদির বর! নইলে ওর ওপর আবার টান! ও কি মরদ, কামার-বউ ওর কি আছে বল?...তারপর তাচ্ছিল্যভাবে পিচ্ কাটিয়া বলে—ও আক্ষেপ আমার নাই ভাই। বামুন, কায়েত, সদ্গোপ—জমিদার, পেসিডেন, হাকিম দারোগা—কত—কামার-বউ—।...সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ভাঙিয়া পড়ে; বলে—লোকে, আমি মুচীর মেয়ে; আমাদের লোককে পা ছুঁয়ে পেন্নাম করতে দেয় না, ঘরে ঢুকতে দেয় না;—আর আমারই পায়ে গড়াগড়ি সব। পাশে বসিয়ে আদর করে—যেন স্বগ্গে তুলে দেয় বলব কি ভাই —সে আর না বলেই পারে না, হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে

দুর্গা আজও হয়তো অভিসারে গিয়াছে। হয়তো তাহার পায়ে গড়াইয়া পড়িতেছে—কোন মান্যগণ্য ধনী প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। কঙ্কণায় গিয়াছে হয়তো। বাবুদের বাগানের কত অভিজ্ঞতা দুর্গা বলিয়াছে। বাগানে জোৎস্না ও আলোয় বাবুদের শখ হয় দুর্গার হাত ধরিয়া বেড়াইতে! গ্রীষ্মের সময় ময়ূরাক্ষীর জলে স্নান করিতে যায়! আজও হয়তো—তেমনি কোন নূতন অভিজ্ঞতা লইয়া ফিরিবে। কালই তার পরনে দেখা যাইবে নূতন কলঘরের শাড়ী, হাতে নূতন কাচের চুড়ি। অবশ্য এ সন্দেহ সত্য না হইতেও পারে। কারণ আজকাল দুর্গা আর সে দুর্গা নাই। আজকাল দুর্গা আর বড় একটা অভিসারে যায় না। বলে—ওতে আমার অরুচি ধরেছে ভাই। তবে কি করি, পেটের দায় বড় দায়! আর যাব না বললেই কি ছাড়ে সব? কামার-বউ, বলব কি—ভদ্রলোকের ছেলে—সন্ধে বেলায় বাড়ীর পেছনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে জানলায় ঢেলা মেরে সাড়া জানায়। জানলা খুলে দেখি—গাছের তলায় অন্ধকারের মধ্যে ফটফটে জামাকাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে। আবার রাত দুপুরে—ভাই কি বলব—কোঠার জানলায় উঠে—শিক ভেঙে—ডাকাতের মতও ঘরে ঢোকে।

—বাপ রে! পদ্ম শিহরিয়া উঠে! সর্বাঙ্গ তাহার থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল [illegible] লজ্জায়। উঃ, পশুর জাত সব! পশু! পরমুহূর্তেই তাহার মুখে

হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাহার শিয়রে আছে বগি-দা, সে নির্ভয়ে রেলিংয়ের উপর ভর দিয়া মেঘচ্ছায়া-মলিন জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া রহিল। ভাদ্রের গুমোট গরমে—ওই ঘরে জানালা-দরজা বন্ধ করিয়া কি শোয়া যায়? মিঠে মৃদু হাওয়া বেশ লাগিতেছে। শরীর জুড়াইয়া যাইতেছে। চাঁদের উপর দিয়া সাদা-কালো—খানা-খানা মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে! কখনও আলো, কখনও আঁধার!

হঠাৎ সে চমকাইয়া উঠিল। ও কে! ওই যে দক্ষিণ-দুয়ারী দাওয়ার উপর এক কোণে সাদা ফটফটে কে দাঁড়াইয়া আছে চোরের মত। কে ও?—পদ্মের বুকের ভিতরটা দুরু-দুরু করিয়া উঠিল। সন্তর্পণে ঘরে ঢুকিয়া—দাখানা হাতে লইয়া দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। লোকটা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ছিরু পাল? সে হইলে কি এমন স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত? লম্বা মানুষটি। কে? পণ্ডিত—হ্যাঁ, পণ্ডিত বলিয়াই মনে হইতেছে। তাহার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন-গতি পরিবর্তিত হইয়া গেল। স্পন্দন হ্রাস হইল না, কিন্তু ভয়-বিহ্বলতা তাহার চলিয়া গেল। পাথর গলিয়াছে। হাজার হউক হুলো বেড়ালের জাত। আহা! বেচারা আসিয়াও কিন্তু সঙ্কোচভরে দাঁড়াইয়া আছে।

পদ্ম ধীরে ধীরে নামিয়া গেল। পণ্ডিত স্থির হইয়া তেমনি ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে। পদ্ম অগ্রসর হইল। চাপা গলায় ডাকিল—মিতে?—

না। মিতে নয়। পণ্ডিত নয়। মানুষই নয়। দাওয়াটার ওই কোণটার মাথার উপরে চালে একটা বড় ছিদ্র হইয়াছে। সেই ছিদ্রপথে চাঁদের আলো পড়িয়াছে দীর্ঘ রেখায়, ঠিক যেন কোণে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছে একটি লম্বা মানুষ!

দরজায় ধাক্কা দেয় কে? দরজা ঠেলিতেছে। হ্যাঁ! বেশ ইঙ্গিত রহিয়াছে এই আঘাতের মধ্যে। কামার-বউ আসিয়া দরজার ফাঁক দিয়া দেখিল। তারপর ডাকিল—কে?...

কে?—কে?

দেবু বিছানায় শুইয়া জাগিয়া ছিল। সে ভাবিতেছিল। হঠাৎ সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া নজরে পড়িল—তাহার বাড়ির কোণের রাস্তাটার ওপারে শিউলি

গাছটার তলায় ফটফটে সাদা কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া কে দাঁড়াইয়া আছে। কে ? দেবু উঠিয়া বসিল। সে চমকিয়া উঠিল, এ যে স্ত্রীলোক ! আকাশের একস্থানে মেঘ ঘন হইয়া আসিয়াছে, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতে শুরু হইয়াছে। গাছের পাতায় টুপ-টাপ শব্দ শোনা যায়। এই গভীর রাত্রে মেঘজল মাথায় করিয়া কে দাঁড়াইয়া আছে এখানে ?

দুর্গা ? এক তাহাকেই বিশ্বাস নাই। সে সব পারে। কিন্তু সত্যই কি সে ? সে সব পারে, তবু দেবু এ কথা বিশ্বাস করিতে পারে না যে—সে তাহার জানালার সম্মুখে আসিয়া এমনভাবে বিনা প্রয়োজনে দাঁড়াইয়া থাকিবে। সে ডাকিল—দুর্গা ?

মূর্তিটি উত্তর দিল না, নড়িল না পর্যন্ত।

কে ? দুর্গা হইলে কি উত্তর দিত না ? তবে ? তবে কে ?

অকস্মাৎ তাহার মনে হইল—এ কি তাহলে তাহার পরলোকবাসিনী বিলু ? শিউলি-তলায় ঝরা ফুলের মধ্যে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহাকে গোপনে দেখিতে আসিয়াছে ! হয়তো নিত্যই দেখিয়া যায়। নানা পার্থিব চিন্তায় অন্য-মনস্ক দেবু তাহাকে লক্ষ্য করে না। সে কাঁদে ; কাঁদিয়া চলিয়া যায়। দেবুর আর সন্দেহ রহিল না। সে ডাকিল—বিলু ! বিলু !

মূর্তিটি যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল—ঈষৎ, মুহূর্তের জন্য।

দেবুর সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, বুকের ভিতরটা ভরিয়া উঠিল এক অনির্বচনীয় আবেগে। পার্থিব অপার্থিব দুই স্তরের কামনার আনন্দে অধীর হইয়া, সে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া দাওয়া হইতে পথে নামিল—পথ অতিক্রম করিয়া, শিউলি-তলায় আসিয়া মূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইল—ব্যগ্রভাবে হাত বাড়াইয়া মূর্তির হাত ধরিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভ্রম ভাঙিয়া গেল। রক্ত-মাংসের স্থূল দেহ, স্নিগ্ধ উষ্ণতাময় স্পর্শ—স্পর্শের মধ্যে সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক প্রবাহ, হাতখানার মধ্যে নাড়ীর গতি দ্রুত স্পন্দিত হইতেছে,—এ কে !—সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—কে তুমি ?

আকাশ একখানা ঘন কালো মেঘে ঢাকিয়া গিয়াছে ; জ্যোৎস্না প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে—চারিদিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন। দেবু আবার প্রশ্ন করিল—কে ? আভাসে ইঙ্গিতে মনের চেতনায় তাহাকে চিনিয়াও তবু প্রশ্ন করিল—কে ?

পদ্ম আপনার অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া দিল। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেবুর দিকে চাহিয়া বলিল—আমি।

—কামার-বউ?

—হ্যাঁ, তোমার মিতেনী—পদ্ম হাসিল।

দেবুর শরীরের ভিতর একটা কম্পন বহিয়া গেল, কোন কথা সে বলিতে পারিল না।

চাপা গলায় ফিস-ফিস করিয়া পদ্ম বলিল—আমি এসেছি মিতে।

দেবু স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

পদ্মের কণ্ঠস্বর সঙ্কোচলেশশূন্য—তাহার বুকের মধ্যে প্রচণ্ড কামনার আবেগ—স্নায়ু-মণ্ডলীতে অধীর উত্তেজনা—শিরায় শিরায় প্রবহমাণ রক্তধারায় ক্রম বর্ধমান অধীর উষ্ণতা। সে বলিল—আমি এসেছি মিতে। ও-ঘরে আর আমি থাকতে পারলাম না। তোমার ঘরে থাকব আমি। দু-জনায় নতুন ঘর বাঁধব। তোমার খোকন আবার ফিরে আসবে আমার কোলে। যে যা বলে বলুক। না-হয় আমরা চলে যাব দু-জনায়—দেশান্তরে!

এই কয়টা কথা বলিয়াই সে হাঁপাইয়া উঠিল।

দেবু তেমনি মূঢ়-স্তব্ধ হইয়াই দাঁড়াইয়া রহিল।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া দেবুকে জিজ্ঞাসুভাবে ডাকিল—মিতে!

দেবু একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল—সে সচেতন হইবার চেষ্টা করিল; তারপর সহজভাবে বলিল—চেপে জল আসছে, বাড়ী যাও কামার-বউ।

সে আর দাঁড়াইল না, সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিল। ঘরে ঢুকিয়া, দরজাটা বন্ধ করিয়া, খিলটা আঁটিয়া দিবার জন্য উঠাইল—

সেই অবস্থায় হঠাৎ সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। কতক্ষণ সে খিলে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—তাহার নিজেরই খেয়াল ছিল না। খেয়াল হইল—বিদ্যুতের একটা তীব্র তীক্ষ্ণ চমকে নীলাভ দীপ্তিতে যখন চোখ ধাঁধিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেই বজ্রগর্জনে চারিদিক থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বাহিরের বর্ষণের প্রবল ধারাপাতে গাছের পত্র-পল্লবে ঝর্ ঝর্ শব্দে চারিদিক ভরিয়া উঠিয়াছে।

সত্যই বৃষ্টি নামিয়াছে প্রবল বেগে। দেবু সচকিত হইয়া দরজা খুলিয়া আবার বাহির হইল। দাওয়ায় দাঁড়াইয়া রাস্তার ওপারের শিউলিগাছটার দিকে চাহিয়া দেখিল—কিন্তু কিছুই দেখা গেল না, গাছটাকেও পর্যন্ত দেখা যায় না। ঘন প্রবল বৃষ্টিধারায়, গাঢ় কালো মেঘের ছায়ায় সব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মিতেনীর অবশ্য চলিয়া যাওয়ারই কথা, আর কি সে দাঁড়াইয়া থাকে, না থাকিতে পারে? তবুও সে দাওয়া হইতে নামিয়া ছুটিয়া গেল শিউলি-তলার দিকে। শিউলি-তলা শূন্য। কিছুক্ষণ সে সেই বৃষ্টির মধ্যেই দাঁড়াইয়া রহিল। একবার কয়েক পা অগ্রসরও হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিল। ঘরে আসিয়া একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভিজা কাপড় বদলাইয়া সে চুপ করিয়া বসিল। হতভাগিনী মেয়ে! ইহার প্রতিবিধান করার প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু কি প্রতিবিধান? তাহার মনে পড়িল—স্বর্ণ সেদিন যে কবিতাটি পড়িতেছিল—সেই কবিতাটির কথা—'স্বামীলাভ'। যে মন্ত্র তুলসীদাস সেই বিধবাকে দিয়াছিলেন—সে মন্ত্র সে কোথায় পাইবে?

বাহিরে মুষলধারে বর্ষণ চলিয়াছে।

সকালে ঘুম ভাঙিল অনেকটা বেলায়। অনেকটা রাত্রি পর্যন্ত তাহার ঘুম আসে নাই। বোধ হয় শেষরাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া ছিল সে। এখনও বর্ষণ থামে নাই। আকাশে ঘোর ঘনঘটা। উতলা এলোমেলো বাতাসও আরম্ভ হইয়াছে। একটা বাদল নামিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে! দেবু ওই শিউলিগাছটার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাত্রির কথাগুলি তাহার মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। হতভাগিনী মেয়ে। সংসারে এমনি ভাগ্যহতা কতকগুলি মেয়ে থাকে যাহাদের দুঃখ-দুর্দশার কোন প্রতিবিধান নাই। যে প্রতিবিধান করিতে যায়, সে পর্যন্ত দুর্ভাগিনীর অনিবার্য দুঃখে আগুনের আঁচে ঝলসিয়া যায়। অনিরুদ্ধ দেশত্যাগী হইয়াছে, তাহার জমিজেরাত সব গিয়াছে—সে বোধ হয় ওই মেয়েটির ভাগ্যফলের তাড়নায়। সে তাহাকে আশ্রয় দিল—তাহার দিকেও আগুনের আঁচ আগাইয়া আসিতেছে। শ্রীহরি তাহার চারিদিকে পঞ্চায়েতমণ্ডলীর শাসনের বেড়া-আগুন

জালিবার উদ্যোগ করিতেছে! পরশু পঞ্চায়েত বসিবে, চারিদিকে খবর গিয়াছে। উদ্যোগ-আয়োজন বোধ প্রচুর করিয়াছে। রাঙাদিদির এক উত্তরাধিকারী খাড়া করিয়াছে—সে-ই শ্রাদ্ধ করিবে। সেই উপলক্ষে পঞ্চায়েত বসিবে। পরশু রাঙাদিদির শ্রাদ্ধ। মেয়েটা নিজে তাহাকে জ্বালাইয়া ছাই করিয়া দিবার জন্য পাপের আগুন জ্বালাইয়াছে বারুদের রঙীন বাতির মত। আপনার আদর্শ অনুযায়ী—সংস্কার অনুযায়ী—দেবু আপনাকে কঠিন শুচিতা সংযমে অনুপ্রাণিত করিবার সংকল্প করিল। সে কোনমতেই আর কামার-বউয়ের বাড়ী যাইবে না! ছাতা মাথায় দিয়া সে মাঠের দিকে বাহির হইয়া পড়িল।

রাত্রে প্রবল বর্ষণ হইয়া গিয়াছে। গ্রামের নালায় হড়্ হড়্ করিয়া জল চলিতেছে। কয়েকটা স্থানে নালার জল রাস্তা ছাপাইয়া বহিয়া চলিয়াছে। পুকুর-গড়েগুলি পূর্ব হইতেই ভরিয়া ছিল, তাহার উপর কাল রাত্রে জলে এমন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে যে, জল-প্রবেশের নালা দিয়া এখন পুকুরের জল বাহির হইয়া আসিতেছে। জগন ডাক্তারের বাড়ীর খিড়কি-গড়েটার ধারে জগন দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পুকুর হইতে জল বাহির হইতেছে; ডাক্তার নিজে দাঁড়াইয়া মাহিন্দারটাকে দিয়া নালার মুখে বাঁশের টেঁটী বার পোঁতাইতেছে। জগনও আজকাল তাহার সঙ্গে বড় একটা কথাবার্তা বলে না। সে পঞ্চায়েতের মধ্যে নাই, থাকিবার কথাও নয়, ডাক্তার কায়স্থ—নবশাখ্য সমাজের পঞ্চায়েতের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কি? তবুও গ্রাম্য সমাজে—গ্রামবাসী হিসাবে তাহার মতামত—সহযোগিতা—এ সবের একটা মূল্য আছে, বিশেষ যখন সে ডাক্তার, প্রাচীন প্রতিপত্তিশালী ঘরের ছেলে—তখন বিশেষ মূল্য আছে। কিন্তু ডাক্তার শ্রীহরির নিমন্ত্রিত পঞ্চায়েতের মধ্যে নাই। আবার দেবুর সঙ্গেও সম্বন্ধ সে প্রায় ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ডাক্তারও কামার-বউয়ের কথাটা বিশ্বাস করিয়াছে। নেহাৎ চোখাচোখি হইতে ডাক্তার শুষ্কভাবে বলিল—মাঠে চলেছ?

হাসিয়া দেবু বলিল—হ্যাঁ। বার পোঁতাচ্ছ বুঝি?

—হ্যাঁ। পোনা আছে, বড় মাছও ক'টা আছে, এবারও পোনা ফেলেছি। তারপর আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল—আকাশ যা হয়েছে, যে রকম 'আওলি-

বাউলি' (এলোমেলো বাতাস) বইছে—তাতেও তো মনে হচ্ছে—বাদলা আবার নামল। এর ওপরে জল হলে—বার পুঁতেও কিছু হবে না।

দেবুও একবার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিল—হুঁ।

প্রায় সকল গৃহস্থই, যাহাদের পুকুর-গড়ে আছে—তাহারা সকলেই জগনের মত নালার মুখে বেড়ার আটক দিতে ব্যস্ত। পল্লী-জীবনে,—মাঠে—ধান, কলাই, গম, আলু, আখ, বাড়ীতে—শাক-পাতা লাউ, কুমড়া; গোয়ালে—গাইয়ের দুধের মত পুকুরের মাছও অত্যাবশ্যকীয় সম্পদ। বারো মাস তো খায়ই, তাহা ছাড়া কাজ-কর্মে, অতিথি-অভ্যাগত-সমাগমে ঐ মাছই তাহাদের মানরক্ষা করিয়া থাকে। "পেটের বাছা, ঘরের গাছা, পুকুরের মাছা"—পল্লী-গৃহস্থের সৌভাগ্যের লক্ষণ।

সদ্গোপ-পাড়া পার হইয়া বাউড়ী ডোম ও মুচী-পাড়া। ইহাদের পাড়াটা গ্রামের প্রান্তে এবং অপেক্ষাকৃত নিচু স্থানে। গ্রামের সমস্ত জলই এই পাড়ার ভিতর দিয়া নিকাশ হয়। পল্লীটার ঠিক মাঝখান দিয়া চলিয়া গিয়াছে একটা বালুময় প্রস্তর পথ বা নালা;—সেই পথ বাহিয়া জল গিয়া পড়ে পঞ্চগ্রামের মাঠে। পাড়াটা প্রায় জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। কোথাও একহাঁটু, কোথাও গোড়ালি-ডোবা জল। পাড়ার পুরুষেরা কেহ নাই, সব মাঠে গিয়া পড়িয়াছে। এই প্রবল বর্ষণে ধানের ক্ষতি তো হইবেই, তাহার উপর জলের তোড়ে আল ভাঙিবে, জমিতে বালি পড়িবে; সেই সব ভাঙনে মাটি দিতে গিয়াছে। মেয়েরা এবং ছোট ছেলেরা হাত-জালি—ঘুনি লইয়া মাছ ধরিতে ব্যস্ত। ছোট ছেলেগুলার উৎসব লাগিয়া গিয়াছে। কেহ সাঁতার কাটিতেছে—কেহ লাফাইতেছে, অপেক্ষাকৃত বয়স্ক কয়টা ছেলে কাহার একটা কাটা তালগাছের অসার ডগার অংশ জলে ভাসাইয়া নৌকা-বিহারে মত্ত। ইহারই মধ্যে কয়েক জনের ঘরের দেওয়ালও ধসিয়াছে।

দেবুর মন তাহাকে এ পথে টানিয়া আনিয়াছিল—দুর্গার উদ্দেশ্যে। দুর্গাকে দিয়া কামার-বউয়ের সন্ধান লইবার কল্পনা ছিল তাহার। দুর্গাকে কিছু প্রকাশ করিয়া বলিবার অভিপ্রায় ছিল না। ইঙ্গিতে কতকগুলা কথা জানাইবার এবং জানিবার আছে তাহার। সে সমস্ত রাত্রি ভাবিয়া স্থির করিয়াছিল—রাত্রির

ঘটনাটার ঘুণাক্ষরে উল্লেখ না করিয়া সে শুধু কামার-বউয়ের মন্ত্রদীক্ষা লওয়ার প্রস্তাব করিবে। বলিবে—দেখ, মানুষের ভাগ্যের উপর তো মানুষের হাত নাই। ভাগ্যফলকে মানিয়া লইতে হয়। ভগবানের বিধান। মানুষের স্ত্রী-পুত্র যায়, স্ত্রীলোকের স্বামী-পুত্র যায়, থাকে শুধু ধর্ম। তাহাকে মানুষ না ছাড়িলে সে মানুষকে ছাড়ে না। যে মানুষ তাহাকে ধরিয়া থাকে—সে দুঃখের মধ্যেও সুখ না-হোক শান্তি পায়, পরকালের গতি হয়, পরজন্মে ভাগ্য হয় প্রসন্ন। তুমি এবার মন্ত্রদীক্ষা লও। তোমাদের গুরুকে সংবাদ দিই, তুমি মন্ত্র লও, সেই মন্ত্র জপ কর, বার কর, ব্রত কর। মনে শান্তি পাইবে।

দুর্গার বাড়ীতে আসিয়া সে ডাকিল—দুর্গা!

দুর্গার মা একখানা [illegible] কাপড় পরিয়া ছিল—তাহাতে মাথায় ঘোমটা দেওয়া যায় না, সে তাড়াতাড়ি একখানা ছেঁড়া গামছা মাথার উপর চাপাইয়া বলিল—সি তো সেই ভোরে উঠেই চলে গেয়েছে বাবা। কাল রেতে মাথা ধরেছিল; কাল আর কামার মাগীর ঘরে শুতে যায় নি। উঠেই সেই ভাবী-সাবির লোকের বাড়ীই গেয়েছে।

পাতুর বিড়ালীর মত বউটা ঘরের মেঝে হইতে খোলায় করিয়া জল সেচিয়া ফেলিতেছে। চালের ফুটা দিয়া জল পড়িয়া মাটির মেঝের গর্ত হইয়া গিয়াছে।

ফিরিবার পথে সে অনিরুদ্ধের বাড়ীর দিকটা দিয়া গ্রামে ঢুকিল। গ্রামের এই দিকটা অপেক্ষাকৃত উঁচু। এদিকটায় কখনও জল জমে না, কিন্তু আজ এই দিকটাতেই জল জমিয়া গিয়াছে—পায়ের গোড়ালি ডুবিয়া যায়। ওদিকে রাঙাদিদির ঘরের দেওয়ালের গোড়াটা বেশ ভিজিয়া উঠিয়াছে। কারণটা সে ঠিক বুঝিল না। সে কামার-বাড়ীর দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া ডাকিল—দুর্গা—দুর্গা রয়েছিস?

কেহ সাড়া দিল না। সে আবার ডাকিল। এবারও কোন সাড়া না পাইয়া সে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। বাড়ীর মধ্যেও কাহারও কোন সাড়া নাই; উপরের ঘরের দরজাটা খোলা হাঁ-হাঁ করিতেছে। দক্ষিণ-দুয়ারী ঘরে একটা কোণে চালের ছিদ্র দিয়া অজস্র ধারায় জল পড়ায় দেওয়ালের একটা কোণ ধসিয়া পড়িয়াছে,

কাদায় মাটিতে দাওয়াটা একাকার হইয়া গিয়াছে ! সে আরও একবার ডাকিল ; এবার ডাকিল—মিতেনী রয়েছ ? মিতেনী !

মিতেনী বলিয়াই ডাকিল। হতভাগিনী মেয়েটির দুর্ভাগ্যের কথাও যে সে না ভাবিয়া পারে না। এ-দেশের বালবিধবাদের মত কামার-বউ হতভাগিনী। সংযম যে শ্রেষ্ঠ পন্থা তাহাতে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাদের বঞ্চনার দিকটাও যে বড় সকরুণ। যে যুগে দেবু জন্মিয়াছে এবং তাহার জীবনে যে সংস্কার ও শিক্ষা সে আয়ত্ত করিয়াছে, তাহাতে তাহার কাছে দুইটা দিকই গুরুত্বে প্রায় সমান মনে হয় ! বিশেষ করিয়া কিছুদিন আগে সে শরৎচন্দ্রের বইগুলি পড়িয়া শেষ করিয়াছে, তাহার ফলে এই ভাগ্যহতা মেয়েগুলির প্রতি তাহার দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা পাল্টাইয়া গিয়াছে। কাল রাত্রে সংযমের দিকটাই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, তখন সে তাহাকে বিচার করিতে চাহিয়াছিল কঠিন বিচারকের মত প্রাচীন বিধান অনুসারে। আজ এই মুহূর্তে করুণার দিকটা যেমন ঝুঁকিয়া পড়িল। সে ডাকিল—মিতেনী রয়েছ ? মিতেনী !

এ ডাকেও কোন সাড়া মিলিল না। বোধ হয় দুর্গার সঙ্গে মিলিয়া মিতেনী ঘাটের দিকে গিয়াছে গা ধুইতে। সে ফিরিল। পথের জল ক্রমশঃ বাড়িতেছে। পথের দু পাশে যাহাদের ঘর—তাহাদের মধ্যে জনকয়েক আপন আপন দাওয়ায় বসিয়া আছে নিতান্ত বিমর্ষভাবে। অদূরে হরেন ঘোষাল শুধু ইংরেজীতে চিৎকার করিতেছে। প্রথমেই দেখা হইল—চণ্ডী ও ভবেশখুড়োর সঙ্গে। দেবু প্রশ্ন করিল—আপনাদের পাড়ায় এত জল খুড়ো ?

তাহারা কোন কিছু বলিবার পূর্বেই হরেন ঘোষাল তাহাকে ডাকিল—কাম্ হিয়ার, সি, সি—সি উইথ ইয়োর ওন আইজ। দি জমিদার—শ্রীহরি ঘোষ এস্কোয়ার—মেম্বার অব দি ইউনিয়ন বোর্ড—ড্যাম্ ড্যান—ইট।

দেবু আগাইয়া গেল। দেখিল—নালা দিয়া জল শ্রীহরির পুকুরে ঢুকিবার আশঙ্কায় শ্রীহরি নালায় একটা বাঁধ দিয়াছে। জলের স্রোতকে ঘুরাইয়া দিয়াছে উঁচু পথে। সে পথে জল সরিতেছে না, জমিয়া জমিয়া গোটা পাড়াটাকেই ডুবাইয়া দিয়াছে।

দেবু কয়েক মুহূর্তে দাঁড়াইয়া ভাবিল। তারপর বলিল—ঘরে কোদাল আছে ঘোষাল ?

—কোদাল ?—ব্যাপারটা অনুমান করিয়া কিন্তু ঘোষালের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

—হ্যাঁ, কোদাল—কি টামনা। যাও নিয়ে এস।

বিবর্ণমুখে ঘোষাল বলিল—বাঁধ কাটলে ফৌজদারি হবে না তো ?

—না। যাও নিয়ে এস।

—বাট, দেয়ার ইজ কানুশেখ—হি ইজ এ ডেঞ্জারাস্ ম্যান।

—নিয়ে এস ঘোষাল, নিয়ে এস। না হয় বল—আমি আমার বাড়ী থেকে নিয়ে আসি।—দেবু সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার দীর্ঘ দেহখানি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। ঘোষাল এবার ঘর হইতে একটা টামনা আনিয়া দেবুর হাতে আগাইয়া দিল। দেবু মাথার ছাতাটা বন্ধ করিয়া ঘোষালের দাওয়ার উপর ফেলিয়া দিয়া কাপড় সাঁটিয়া টামনা হাতে বাঁধের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। চিৎকার করিয়া বলিল—আমাদের বাড়ী-ঘর ডুবে যাচ্ছে। এ বে-আইনী বাঁধ কে দিয়েছে বল—আমি কেটে দিচ্ছি।

শ্রীহরির ফটক হইতে কানুশেখ বাহির হইয়া আসিল। কানুর পিছনে নিজে শ্রীহরি। দেবু টামনা উঠাইয়া বাঁধের উপর কোপ বসাইল—কোপের পর কোপ।

শ্রীহরি হাঁকিয়া বলিল—দিচ্ছে, দিচ্ছে—আমারই লোক কেটে দিচ্ছে। দেবু-খুড়ো, নামো তুমি। আমার পুকুরের মুখে একটা বড় বাঁধ দিয়ে নিলাম—তাই জলটা বন্ধ করেছি। হয়ে গেছে বাঁধ। ওরে যা—যা—কেটে দে, বাঁধ। যা—যা, জল্‌দি যা।

পাঁচ-সাতজন মজুর ছুটিয়া আসিল। এই গ্রামেরই মজুর, দেবুকে আর সকলে পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু তাহারা করে নাই। একজন শ্রদ্ধাভরে বলিল—নেমে দাঁড়ান পণ্ডিত মশায়, আমরা কেটে দি।

ঘোষালের দাওয়ায় টামনাটা রাখিয়া দিয়া দেবু আপনার ছাতাটা তুলিয়া লইয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। শ্রীহরির পাশ দিয়াই যাইবার পথ। শ্রীহরি

হাসিমুখে বলিল—খুড়ো।

দেবু দাঁড়াইয়া ফিরিয়া চাহিল।

শ্রীহরি তাহার কাছে অগ্রসর হইয়া আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—অনিরুদ্ধের বউটার সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়েছে নাকি ?

দেবুর মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ভ্রূকুটি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল—চোখ দুটিতে যেন ছুরির ধার খেলিয়া গেল। তবুও সে আত্ম-সংবরণ করিয়া বলিল—মানে ?

—মানে, কাল রাত্রি তখন প্রায় দেড়টা কি দুটো। বৃষ্টিটা মুষলধারে এসেছে। ঘুম ভেঙে গেল, জানালা দিয়ে ছাট আসছিল, গেলাম জানালা বন্ধ করতে। দেখি রাস্তার উপরেই কে দাঁড়িয়ে। ডাকলাম—কে ? মেয়ে-গলায় উত্তর এল—আমি। কারও কিছু হয়েছে মনে করে তাড়াতাড়ি নেমে গেলাম। দেখি কামার-বউ দাঁড়িয়ে। আমাকে বললে—আপনার ঘরে তো দাসী বাঁদী আছে পাঁচটা—আমাকে একটু ঠাঁই দেবেন আপনার ঘরে ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কেন বল দেখি ? দেবু খুড়োর কাছে ছিলে, সে তো তোমাকে আদর-যত্ন না করে এমন নয়। সে কথার উত্তর দিলে না, বললে—যদি ঠাঁই না দেন, আমি চলে যাব—যে দিকে দুই চোখ যায়।—কি করবো বাবা ? বললাম—না—এস।

শ্রীহরি সগর্বে হাসিতে লাগিল। দেবু স্তম্ভিত হইয়া গেল।

শ্রীহরি আবার বলিল—ভালই হয়েছে বাবা। পেত্নী নেমেছে তোমার ঘাড় থেকে। এখন ঐ মুচী ছুঁড়ীটাকে বলে দিয়ো—যেন বাড়ী-গাড়ী না আসে; পঞ্চায়েতকে আমি একরকম করে বুঝিয়ে দোব। একটা প্রায়শ্চিত্ত করে ফেল। বিয়ে-থাওয়া কর, ভাল কনে আমি দেখে দিচ্ছি!

দেবু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শ্রীহরির সব কথা শুনিতেছিল না, বিস্ময় এবং ক্রোধের উত্তেজনা সংবরণের প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল। এতক্ষণে আত্মসংবরণ করিয়া সে হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, আমি চললাম।

পদ্মর জীবনের নিরুদ্ধ কামনা—যাহা এতদিন শুধু তাহার মনের মধ্যেই আলোড়িত হইত, সেই কামনা অকস্মাৎ তাহারই মনের ছলনায় গোপন দ্বার-পথে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। সে কামনা আদিম সহস্রমুখী হইয়া। মানুষ যাহা চায়, নারী যাহা চায়, যে পাওনার দাবিদার নারীর প্রতি দেহকোষে—প্রতি লোমকূপে—চেতনার প্রতি পদে স্পন্দিত হয়—সেই দাবি তাহার। দেহের তৃপ্তি—উদরের তৃপ্তি; স্বামী-সন্তান—অন্ন-বস্ত্র-সম্পদ, ঘর-সংসারের দাবি। একাধিপত্যের প্রতিষ্ঠার মধ্যে শুধু তাহার নিজস্ব করিয়া এইগুলি সে পাইতে চায়। ঐ কামনাগুলিকে কৃচ্ছ্রসাধনের নিগ্রহে নিগৃহীত সে অনেক করিয়াছে। বারব্রত করিয়াছে, উপবাস করিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রাণশক্তির প্রবল উচ্ছ্বাস কিছুতেই ধর্ষিত হয় নাই। গোপন মনে অনেক কল্পনা—অনেক সংকল্প মৃত্তিকাচ্ছন্ন বীজাঙ্কুরের মত উদগত হইতেছিল, অকস্মাৎ তাহারা সেদিন—জীবনের স্বাধীন চিন্তা ও কর্মক্ষেত্রের উপর চাপানো সামাজিক সংস্কারের পাথরখানার একটা ফাটল দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। আলোর রেখাকে মানুষ ভাবিয়া সে নিচে নামিয়া আসিয়াছিল। তারপর বাতাসে দরজা নড়িয়া উঠিতে সে তাহার মধ্যে শুনিয়াছিল—কাহার আহ্বানের ইঙ্গিত। দাখানা হাতে করিয়াই সে দরজা খুলিয়াছিল। দরজার সামনে কেহ ছিল না, কিন্তু তাহার মনে হইয়াছিল—কে যেন সট্ করিয়া সরিয়া গেল। তাহার অনুসন্ধানে সে পথে নামিয়াছিল। সে যত আগাইয়াছিল—মরুভূমির মরীচিকার মত তাহার কল্পনার আগন্তুকও তত সরিয়া সরিয়া শেষ পর্যন্ত তাহাকে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছিল—ওই শিউলি-তলায়। অদূরে দেবুর ঘরখানা নজরে পড়িবামাত্র তাহার অজ্ঞাতসারেই দাখানা হাত হইতে খসিয়া পড়িয়া গিয়াছিল।

দেবুর ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইতেই তাহার চেতনা ফিরিয়াছিল। কিন্তু তখন তাহার জীবনের সযত্ন-পোষিত নিরুদ্ধ কামনা গুহানির্মুক্ত নির্ঝরের মত শতধারায়

মাটির বুকে নামিবার উপক্রম করিয়াছে। উচ্ছলিত বাসনায় ভয় নাই—সঙ্কোচ নাই; তাহার সর্বাঙ্গে লক্ষ লক্ষ জৈব-দেহকোষে খল খল হাসি উঠিয়াছে, শিরায় শিরায় উঠিয়াছে কলস্বরা গান; অজস্র অপার সুখে সাধে আনন্দে প্রাণ উচ্ছ্বসিত; ঘর-সংসার-সন্তানের মুকুলিত কল্পনায় সে বিভোর হইয়া উঠিয়াছে। সে দেবুকে বলিল তাহার কথা—যে কথা এতদিন তাহার গোপন মনের আগল্ খুলিয়া ঘুণাক্ষরে কাহাকেও বলে নাই—আভাসে-ইঙ্গিতেও জানায় নাই।

দেবুর নিরাসক্ত নির্মম উপদেশে তাহার চমক ভাঙিল—'মেঘে জল আসছে—বাড়ী যাও কামার-বউ!'

নিরুচ্ছ্বসিত নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানের অপমানে সে যেন অধীর হইয়া গেল। বাধার আক্রোশে আবর্তময়ী স্রোতধারার মত কূল ভাঙিয়া দেবুকে ছাড়িয়া লাফ দিয়া শ্রীহরির অবজ্ঞাত জীবন তটের দিকে ছুটিয়া চলিল। বিচার করিল না—শ্রীহরির মরুভূমির মত বিশাল বালুস্তর, সেখানে জলস্রোত কল-কলনাদে ছুটিতে পায় না—বালুস্তরের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়। একবার ভবিষ্যৎ ভাবিল না, ভালমন্দ বিচার করিল না—পদ্ম সরাসরি শ্রীহরির ঘরে গিয়া উঠিল।

সে গিয়া দাঁড়াইল শ্রীহরির কোঠাঘরের পিছনে। শ্রীহরির কথা সত্য—সে জাগিয়াই ছিল। কিন্তু তখন হইতেই পদ্ম ঘুমাইতেছিল। অঘোরে অচেতনের মত ঘুমাইতেছিল। দেবুর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর সহসা তাহার নিদ্রাতুর চেতনার মধ্যে জাগরণের স্পন্দন তুলিল। জাগিয়া উঠিয়া জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল—দেবু ও শ্রীহরি মুখোমুখি দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে। সে চারিদিক চাহিয়া দেখিল, এতক্ষণে উপলব্ধি করিল—সে কোথায়। রাত্রের কথাটা একটা দুঃস্বপ্নের মত ধীরে ধীরে তাহার মনে জাগিয়া উঠিল।—কিন্তু আর উপায় কি?

দুর্গা দেবুর ঘরেই বসিয়া ছিল। সে সংবাদ দিতেই আসিয়াছিল যে, কামার-বউ বাড়ীতে নাই।

দেবু শুনিয়া সংক্ষেপে বলিল—জানি।

দেবুর মুখ দেখিয়া দুর্গা আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। চুপ

করিয়া বসিয়া রহিল।

দেবু বলিল—তুই এখন বাড়ী যা দুর্গা, পরে সব বলব।

দুর্গা উঠিল।

দেবু আবার বলিল—না। বস, শোন্। তোর যদি অসুবিধে না হয় দুর্গা, তবে তুই আমার বাড়ীতেই থাক্ না!

দুর্গা অবাক হইয়া দেবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।—জামাই-পণ্ডিত এ কি বলিতেছে!

দেবু বলিল—ঘর-দোরগুলোয় ঝাঁট পড়ে না, নিকোনো হয় না; রাখাল ছোঁড়াটা যা পাজী হয়েছে! তুই এসব কাজকর্মগুলো কর। এইখানেই খাবি। মাইনে যদি নিস, তাও দোব!

অকস্মাৎ চাবুক-খাওয়া ঘোড়ার মত দুর্গা সচকিত হইয়া উঠিল। বলিল—ঝিয়ের কাজ তো আমি করতে পারি না, জামাই-পণ্ডিত। আমার বাড়ীঘর ঝাঁটপাটের জন্যে দাদার বউকে দিন একসের করে চাল দি।

দেবু তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—ঝি, কেন? তুই তো বিলুকে দিদি বলতিস্। আমার শালীর মত থাকবি, মাইনে বলাটা আমার ভুল হয়েছে। হাত-খরচও তো মানুষের দরকার হয়!

দুর্গা তাহার মুখের দিকে মূঢ়ের মত স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

দেবু বলিল—পরশু পঞ্চায়েত বসবে দুর্গা, অন্তত এ কদিন তুই আমার এখানে থাক্।

দুর্গা এবার ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া হাসিয়া ফেলিল। পরম কৌতুক অনুভব করিল সে। পঞ্চায়েতের মজলিশে জামাই-পণ্ডিতের সঙ্গে তাহাকে জড়াইয়া মজার আলোচনা হইবে।

দেবু গম্ভীরভাবেই বলিল—কি বলছিস বল্?

—চাবিটা দাও, ঘর-দোর ঝাঁট দি।—দুর্গা চাবির জন্য হাত বাড়াইল।

দেবু চাবিটা তাহার হাতে তুলিয়া দিল। বলিল—দেখ্, কলসীতে জল আছে কিনা?

—জল! দুর্গা বলিল—সে আমি দেখব কি গো? তুমি দেখ!

দেবু বলিল—তুই-ই দেখ। না থাকে নিয়ে আসবি। যতীনবাবু তোকে বলেছিল—মনে আছে? তা ছাড়া তুই আমাকে যে মায়া-ছেদ্দা করিস, সে তো কারুর মা-বোনের চেয়ে কম নয়। তোর হাতে আমি জল খাব। জাত আমি মানি না। পঞ্চায়েতের কাছে আমি সে কথা খুলেই বলব।

—না। সে আমি পারব না জামাই-পণ্ডিত। আমার হাতের জল—কঙ্কণার বামুন-কায়েত বাবুরা লুকিয়ে খায়, মদের সঙ্গে জল মিশিয়ে দিই, মুখে গ্লাস তুলে ধরি—তারা দিব্যি খায়। সে আমি দি—কিন্তু তোমাকে দিতে পারব না। —দুর্গার চোখে জল আসিয়াছিল—গোপন করিবার জন্যই অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতার সহিত সে ঘুরিয়া দরজার চাবি খুলিতে আরম্ভ করিল।

দেবু একটু ম্লান হাসি হাসিয়া নীরব হইয়া বসিয়া রহিল।

সম্মুখেই রাস্তার ওপারে সেই শিউলিগাছটা। বসিয়া বসিয়া কেবলই মনে হইতেছে গতরাত্রির কথা! ছি—ছি—ছি! পদ্ম এ কি করিল? কোনমতেই আর সে পদ্মের প্রতি এককণা করুণা করিতে পারিতেছে না।

আকাশের মেঘটা এতক্ষণে কাটিতেছে। এক ঝলক রোদ উঠিল। আবার মেঘে ঢাকিল। আবার মেঘ কাটিয়া রোদ উঠিল। বৃষ্টি ধরিয়াছে।

—পেন্নাম গো পণ্ডিত মশায়।—প্রণাম করিল সতীশ বাউড়ী, সঙ্গে আছে আরও কয়েকজন বাউড়ী মুচি চাষী মজুর। সবাই ভিজিয়া গিয়াছে, ভিজিয়া ভিজিয়া কালো রঙও ফ্যাকাসে হইয়া উঠিয়াছে, পায়ের পাতায় পাঁকুই—আঙুলের ফাঁক—হাতের তেলো—মড়ার হাতের মত সাদা এবং আঙুলের ডগাগুলি চুপসিয়া গিয়াছে।

প্রতিনমস্কার করিয়া দেবু কেবলমাত্র কথা বলিয়া আপ্যায়িত করিবার জন্যই জিজ্ঞাসা করিল—জল কেমন?

—ভাসান বইছে মাঠে। ধান-পান সব ডুবে গিয়েছে। গুঁড়ি-টুঁড়ি খুলে নিয়ে যাবে। বড়ো কেঁচে করে দিলে পণ্ডিত মশায়!

পণ্ডিতকে এই দুঃখের কথা কয়টি বলিবার জন্য সতীশের ব্যগ্রতা ছিল।

শাওলের কাতলা মেরেছে।

আর একজন বলিল—কঙ্কণার বাবুদের নারান (নারায়ণ) দীঘি ভেসেছে।

দেবু উঠিয়া পড়িল।

পদ্মের এই অতি শোচনীয় পরিণতিতে সে একটা নিষ্ঠুর আঘাত পাইয়াছে। তাহার নিজের শিক্ষা-সংস্কার-জ্ঞান-বুদ্ধি-মত অপরাধ যোল আনা পদ্মেরই, সে নিজে নির্দোষ। সে তাহাকে স্নেহ করিয়াছে—আপনার বিধবা ভ্রাতৃবধূর মত সসম্মানে তাহার অন্নবস্ত্রের ভার সাধ্যমত বহন করিয়াছে। গভীর রাত্রে সে যেভাবে আপনাকে সংযত রাখিয়া অতি মিষ্ট কথা বলিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে—তাহাতে অন্যায় কোথায়? মিথ্যা অপবাদ দিয়া শ্রীহরি পদ্মের জন্যই সমাজকে ঘুষ দিয়া তাহাকে পতিত করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাও সে গ্রাহ্য করে নাই; নির্ভয়ে পঞ্চায়েতের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। সুতরাং তাহার দোষটা কোনখানে?

তবুও কিন্তু মন মানিতেছে না! মানুষের ভুলে বা কর্মে এমন পরিণামের জন্য গভীর বেদনা-দুঃখ-লজ্জার সঙ্গে থাকে যে নিরুপায় অক্ষমতার অপরাধ-বোধ, পদ্মের জন্য দুঃখ-বেদনা-লজ্জার সঙ্গে সেই অক্ষমতার অপরাধ-বোধও অনাবিষ্কৃত ব্যাধির পীড়নের মত তাহাকে পীড়িত করিতেছিল। দুঃখ-বেদনা-লজ্জা—সবই ওই অক্ষমতার অপরাধ-বোধের বিভিন্ন রূপান্তর। তাহার মন—শত যুক্তিতর্কসম্মত নির্দোষিতা সত্ত্বেও সেই পীড়নে পীড়িত হইতেছিল। দুর্গাকে বাড়ীতে থাকিতে বলিয়া—তাহার হাতে জল খাইতে চাহিয়া বিদ্রোহের উত্তেজনায় মনকে উত্তেজিত করিয়াও সে ওই দুঃখ বেদনা হইতে মুক্তি পাইল না। উপস্থিত বন্যারোধী বাঁধের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া দেবু বাঁধ দেখিতে বাহির হইয়া পড়িল—সে কেবল ওই আত্মপীড়া হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য। দুর্গাকে ডাকিয়া বলিল—দুর্গা, আমি এসে রান্না চড়াব। তুই বাড়ী-টাড়ী যাস্ তো একবার ঘুরে আয় ততক্ষণ।

বিস্মিত হইয়া দুর্গা বলিল—কোথা যাবে এখন? শিশিমীতে আবার কার কোথা দুঃখু ঘটল?

গম্ভীরভাবে দেবু বলিল—ময়ূরাক্ষীতে বান বাড়ছে। বাঁধটা একবার দেখে

আসি।

দুর্গা অবাক হইয়া গালে হাত দিল।

দেবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—কি?

—কি? "কাঁদি-কাঁদি মন করছে, কেঁদে না আঁখি মিটছে, রাজাদের হাতী মরেছে, একবার তার গলা ধরে কেঁদে আসি"—সেই বিত্তান্ত। আচ্ছা, বাঁধ ভেঙে বান কোন্ কালে ঢুকেছে শুনি?

—বকিস্ নে। আমি আসি—দেবু ছাতাটা হাতে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

দুর্গা মিথ্যা কথা বলে নাই। প্রকাণ্ড চওড়া বাঁধের দুই পাশে ঘন শরবনের শিকড়ের জালের জটিল বাঁধনে বাঁধের মাটি একেবারে জমিয়া এক অখণ্ড বস্তুতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দশ-বিশ বৎসর অন্তর হড়পা বান আসে—যা খুব প্রবল বান হয়, তখন অবশ্য একটু-আধটু বাঁধ ভাঙে, পরে সেখানে মাটি ফেলিয়া মেরামত করা হয়। কিন্তু বর্ষার আগে হইতে কোথাও বাঁধ দুর্বল হইয়া আছে—এ ভাবনা কেহ ভাবে না।

আগে কিন্তু ভাবিত। এই বাঁধ-রক্ষার রীতিমত ব্যবস্থা ছিল।

দেবু মনে মনে সেই কথাগুলিকেই খুব বড় করিয়া তুলিল। ওই বাঁধের ভাবনাকেই একমাত্র ভাবনার কথা করিয়া তুলিয়া সে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

অর্ধচন্দ্রাকারে অবস্থিত এই পঞ্চগ্রামের বিস্তীর্ণ মাঠখানার প্রান্ত ধনুকের ছিলার মত বহিয়া গিয়াছে পাহাড়িয়া নদী ময়ূরাক্ষী। পাহাড়িয়া মেয়ের মতই প্রকৃতি, সাধারণতঃ বেশ থাকে। জল বাড়ে কমে। কিন্তু বন্য প্রকৃতির উচ্ছ্বাসের মত বন্যা আসে অকস্মাৎ হু হু করিয়া—আবার তেমনি দ্রুতবেগেই কমিয়া যায়। তাহাতে বড় ক্ষতি হয় না। পঞ্চগ্রামের মাঠের প্রান্তে বন্যারোধী বাঁধ আছে—তাহাতেই বন্যাবেগ প্রতিহত হয়। বাঁধটি মাত্র পঞ্চগ্রামের সীমাতেই আবদ্ধ নয়। নদী-কূলের বহুদূর পঞ্চগ্রামের প্রান্তসীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কবে কে এই বাঁধ বাঁধিয়াছে কেহ বলিতে পারে না। লোকে বলে 'পাঁচের জাঙাল' বা পঞ্চজনের জাঙাল। লোকে ব্যাখ্যা করিয়া বলে—পঞ্চজন মানে পঞ্চপাণ্ডব। মা কুন্তীকে লইয়া যখন তাহারা আত্মগোপন করিয়া ফিরিতেছিল—

তখন এ অঞ্চলে ময়ূরাক্ষীর বন্যা আসিয়াছে, দেশঘাট ভাসিয়া গিয়াছে, ধান ডুবিয়াছে, ঘর ভাঙিয়াছে, দেশের লোকের দুঃখ-দুর্দশার আর সীমা নাই। রাজার মেয়ে, রাজার রানী, পঞ্চপাণ্ডব-জননীর চোখে জল আসিল লোকের এই দুর্দশা দেখিয়া। ছেলেরা বলিল—কাঁদ কেন মা? মা আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন লোকের দুর্দশা। যুধিষ্ঠির বলিল—এর জন্য কাঁদ কেন? তোমার চোখে যেখানে জল আসিয়াছে, সেখানে কি লোকের দুর্দশা থাকে, না থাকিতে পারে? এমন প্রতিকার আমরা করিতেছি, যাহাতে আর কখনও বন্যায় এ অঞ্চলের লোকের ক্ষতি না হয়। বলিয়াই পাঁচ ভাই বাঁধ বাঁধিতে লাগিয়া গেলেন। বাঁধ বাঁধা হইল। পঞ্চপাণ্ডব চাষীদের ডাকিয়া বলিয়া গেলেন—দেখ বাপু, বাঁধ বাঁধিয়া দিলাম। রক্ষণাবেক্ষণের ভার তোমাদের রহিল। প্রতি বৎসর—বর্ষার প্রারম্ভে রথযাত্রা, অম্বুবাচী, নাগপঞ্চমী প্রভৃতি হল-কর্ষণের নিষিদ্ধ দিনগুলিতে প্রত্যেকে কোদাল ঝুড়ি লইয়া আসিবে—আপন আপন গ্রামের সীমানার বাঁধে প্রত্যেকে পাঁচ ঝুড়ি করিয়া মাটি দিয়া যাইবে, তিন দিনে, তিন-পাঁচ পনের ঝুড়ি মাটি দিবে।

সেই প্রথাই প্রচলিত ছিল আবহমানকাল। যখন হইতে জমিদার হইল গ্রামের সর্বময় কর্তা—জমিন-পতিত-খাল-বিল-খানা-খন্দ, খাসকর, বনকর, জলকর, ফলকর, পাতামহল, লতামহল, এমন কি ঊর্ধ্ব-অধঃ-মধ্যস্থ হক-হকুকের মালিক—তখন হইতেই বাঁধ হইয়াছে জমিদারের খাস সম্পত্তি। জমিদারের বিনা হুকুমে কাহারও বাঁধের গায়ে মাটি দিবার বা কাটিবার অধিকার রহিল না। যখন এ প্রথা উঠিয়া গেল, তখন জমিদার বেগার ধরিয়া বাঁধ মেরামত করাইতেন। হাল আমলে বাঁধ ভাঙিলে সেই রেওয়াজ অনুযায়ী বাঁধ বাঁধিবার খরচের কতক দেয় জমিদার, কতক দেয় প্রজা; বৎসরে বাঁধে মাটি দেওয়ার দায়িত্ববোধ লোকের চলিয়া গিয়াছে! বাঁধ ভাঙিলে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত যাইবে, তদন্ত হইবে, এস্টিমেট হইবে—জমিদার-প্রজাকে নোটিস হইবে, তারপর শীতে-গ্রীষ্মে বাঁধ মেরামত হইতে থাকিবে।

বিস্তীর্ণ পঞ্চগ্রামের মাঠ জলে প্রায় ডুবিয়া গিয়াছে। দেবু চীৎকার করিয়া আস-

পথ ধরিয়া চলিয়াছিল। রাত্রে আকাশে যে ঘনঘটা জমিয়াছিল—সে ঘনঘটা এখন অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। প্রখর রৌদ্র উঠিয়াছে। রৌদ্রের ছটা জলে পড়িয়া বিস্তীর্ণ মাঠখানা আয়নার মত ঝকমক্ করিতেছে। ধানের চারাগুলি বড় দেখা যায় না।

জল কোথাও এক-হাঁটু—কোথাও এক-কোমর। বর্ষার জল-নিকাশের যে দুইটা নালা আছে সেখানে জল এক-বুক, স্রোতও প্রচণ্ড। বাকি মাঠের মধ্যে জলস্রোত মন্থর, প্রায় স্থির হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; মধ্যে মধ্যে সেই মন্থর জলস্রোত চিরিয়া একটি রেখা অতি দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। সেই রেখার পিছনে পিছনে লোক ছুটিয়াছে—হাতে পলুই অথবা কোঁচ। ওগুলি মাছ, বড় মাছ। মাঠে মৎস্য সন্ধানী লোক অনেক। নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ।

দেবু সমস্ত মাঠটা অতিক্রম করিয়া বাঁধের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিল; মনে পড়িয়া গেল, যেখানটায় সে উঠিবে, ওপাশে তাহারই নিচে ময়ূরাক্ষীর চরভূমির উপর শ্মশান, তাহার বিলু ও খোকার চিতা। বিলু আজ থাকিলে ঠিক এমনটা হইত না। পদ্মের এ পরিণাম হইতে পারিত না। যে মন্ত্র সে জানে না—সে মন্ত্র তাহার বিলু জানিত। বিলু থাকিলে, কামার-বউকে দেবু নিজের বাড়ীতেই রাখিতে পারিত। বিলু হাসিমুখে তাহার কোলে খোকাকে তুলিয়া দিত। সকাল-সন্ধ্যায় তাহার কানে মন্ত্র দিত। সকালে দুর্গানাম স্মরণ করিতে শিখাইত—"সকালে উঠিয়া যেবা দুর্গানাম স্মরে, দুর্গে দুর্গে তার সব পাপ-তাপ হরে।" শিখাইত মঙ্গলের কামনায়। শিখাইত পুণ্যশ্লোক নাম স্মরণ করিতে, পুণ্যশ্লোক নলরাজা, পুণ্যশ্লোক ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, পুণ্যশ্লোক জনার্দন নারায়ণ সর্বপুণ্যের আধার। সন্ধ্যায় গল্প বলিত, পরে সতীর গল্প, সীতার গল্প, সাবিত্রীর গল্প। কামার-বউয়ের সব ক্ষুধা, সব ক্ষোভ, সব লোলুপতার নিবৃত্তি হইত।

সে বাঁধের উপরে উঠিল। শরবনে—উতলা বাতাসে সর্-সর্-সন্ সন্ শব্দ উঠিয়াছে। তাহারই সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে একটা একটানা ক্ষীণ গোঙানির শব্দ। নদীর ডাক। নদীর বুকে বান উঠিয়াছে। এ ডাক তো ভাল নয়! ওপাশের ঘন শরবনের আড়াল ঠেলিয়া দেবু নদীর বুকের দিকে চাহিয়া সচকিত

হইয়া উঠিল। এ যে ময়ূরাক্ষী ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, ভয়ঙ্কর-বেশে সাজিয়াছে! এপারে বাঁধের কোল হইতে ওপারে জংশনের কিনারা পর্যন্ত ভাসিয়া উঠিয়াছে। জলের রঙ গাঢ় গিরিমাটির মত। দুই তটভূমির মধ্যে ময়ূরাক্ষী কুটিল আবর্তে পাক খাইয়া—তীরের মত ছুটিয়া চলিয়াছে। গেরুয়া রঙের জলস্রোতের বুক ভরিয়া ভাসিতেছে পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা ফেনা। পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে যতদূর দেখা যায়—ততদূর শুধু ফেনা। তাহার উপর ময়ূরাক্ষীর বুকে জাগিয়াছে ডাক, ওই অস্ফুট গোঙানি। দেবু বন্যার কিনারা পর্যন্ত নামিয়া গেল। সেখানে দাঁড়াইয়া বাঁধের বুকের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। এদিক-ওদিক চাহিয়া হঠাৎ দেখিতে পাইল—শরবনের গায়ে জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে পিঁপড়ে এবং পোকার পুঞ্জ; বড় বড় গাছগুলির কাণ্ড বাহিয়া লক্ষ লক্ষ পতঙ্গ উপরে উঠিয়া চলিয়াছে। পায়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিল—মাত্র পায়ের পাতাটা ডুবিয়া ছিল—ইহারই মধ্যে জল প্রায় গোড়ালির কাছ পর্যন্ত উঠিয়াছে। দেবু আবার বাঁধের উপর উঠিল। বাঁধটার অবস্থা দেখিতে সে অগ্রসর হইয়া চলিল।

ময়ূরাক্ষীতে এখন যে বন্যা, সে বন্যার বেশী আশঙ্কার কারণ নাই। বর্ষায় নদীর বন্যা স্বাভাবিক। তবে এটা ভাদ্র মাস; ভাদ্রে বন্যা হইলে মড়ক হয়। ডাক-পুরুষের কথায় আছে—"চৈত্রে কুয়া ভাদরে বান, নরমুণ্ড গড়াগড়ি যান।" ভাদ্রের বন্যায় ফসল পচিয়া অজন্মা হয়, গরীব গুণায় না-খাইয়া মরে; আর হয় বন্যার পরেই সংক্রামক ব্যাধি—যত জ্বর-জ্বালা—কাল ম্যালেরিয়া। ছোটখাটো বন্যার ফলও কম অনিষ্টকর নহে। কিন্তু দেবু আজ যে বন্যার কথা ভাবিতেছে—সে বন্যা ভীষণ ভয়ঙ্কর। হড়পা-বান, কেহ কেহ বলে ঘোড়া বান। হড়্ হড়্ শব্দে, উন্মত্ত হ্রেষাধ্বনি তুলিয়া প্রচণ্ড গতিতে ধাবমান একপাল বন্য ঘোড়ার মতই এ বান ছুটিয়া আসে। কয়েক ফিট উঁচু হইয়া এক বিপুল উন্মত্ত জলরাশি আবর্তিত হইতে হইতে দুই কূল আকস্মিকভাবে ভাসাইয়া, ভাঙিয়া, দুই পাশের প্রান্তর, গ্রাম, ক্ষেত, খামার, বাগান, পুকুর তচনচ করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। সেই হড়পা বান বা ঘোড়া-বান আসিবে বলিয়া মনে হইতেছে।

ময়ূরাক্ষীতে অবশ্য এ বন্যা একেবারে নূতন নয়। পাহাড়িয়া নদীতে কচিৎ

কখনও এ ধারায় বন্যা আসে। যে পাহাড়ে নদীর উদ্ভব, সেখানে আকস্মিক প্রবল প্রচণ্ড বর্ষণ হইলে সেই জল পাহাড়ের ঢালুপথে বিপুল বেগ সঞ্চয় করিয়া এমনি ভাবে নিম্নভূমিতে ছুটিয়া আসে। ময়ূরাক্ষীতেই ইহার পূর্বে আসিয়াছে।

একবার বোধ হয় পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্বে হইয়াছিল। সে বন্যার স্মৃতি আজও লোকে ভুলিয়া যায় নাই। নবীনেরা, যাহারা দেখে নাই, তাহারা সে বন্যার বিরাট বিক্রমচিহ্ন দেখিয়া শিহরিয়া উঠে। দেখুড়িয়ার নিচেই মাইলখানেক পূর্বে ময়ূরাক্ষী একটা বাঁক ঘুরিয়াছে। সেই বাঁকের উপর বিপুল-বিস্তার বালুস্তূপ এখনও ধূ ধূ করিতেছে। একটা প্রকাণ্ড আমবাগান দেখা যায়—ওই বন্যার পর হইতে এখন বাগানটার নাম হইয়াছে গলা-পোঁতার বাগান, বাগানটার প্রাচীন আমগাছগুলির শাখা-প্রশাখার বিশাল মাথার দিকটাই শুধু জাগিয়া আছে বালুস্তূপের উপর। সেই বন্যায় ময়ূরাক্ষী বালি আনিয়া গাছগুলার কাণ্ড ঢাকিয়া আকণ্ঠ পুঁতিয়া দিয়া গিয়াছে। বাগানটার পরেই 'মহিষডহরে'র বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি; এখনও বালিয়াড়ির উপর ঘাস জন্মে নাই। 'মহিষডহর' ছিল তৃণশ্যামল চরভূমির উপর একখানি ছোট গোয়ালার গ্রাম। ময়ূরাক্ষীর উর্বর চরভূমির সতেজ সরস ঘাসের কল্যাণে গোয়ালাদের প্রত্যেকেরই পুষিত মহিষের পাল। 'মহিষডহর' গ্রামখানা সেই বন্যায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। ময়ূরাক্ষীর কূলভরা বন্যায় গোয়ালার ছেলেদের পিঠে লইয়া যে মহিষগুলা এপার ওপার করিত, সেবারের সেই হড়পা বানে মহিষগুলা পর্যন্ত নিতান্ত অসহায়ভাবে কোনরূপে নাক জাগাইয়া থাকিয়া ভাসিয়া গিয়াছিল।

এবার কি আবার সেই বন্যা আসিতেছে? শিবকালীপুরের সম্মুখে বাঁধের গায়ে বান বাঁধের বুক ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। পিঁপড়েগুলা চাপ বাঁধিয়া গাছের উপরে উঠিয়া আশ্রয় লইয়াছে। মুখে তাহাদের লক্ষ লক্ষ ডিম। শুধু পিঁপড়েই নয়, লাখে-লাখে কত বিচিত্র পোকা। বাঁধের গায়ে ছিল উহাদের বাসা। বন্যা আসিবার আগেই উহারা কেমন বুঝিতে পারে। বৃষ্টি আসন্ন হইলে উহারা যেমন নিম্নভূমের বাসা ছাড়িয়া উঁচু জায়গায় উঠিয়া আসে, বন্যা আসিবার পূর্বেও তেমনি করিয়া উহারা বুঝিতে পারে এবং উপরে উঠিয়া আসে। সাধারণতঃ বাঁধের মাথায় গিয়া আশ্রয় লয়। এবার উহারা গাছের উপরে আশ্রয় লইতেছে। আরও আশ্চর্য

—পিঁপড়েরা ডিম লইয়া উপরে উঠিলেই অন্য পিঁপড়ের দল তাহাদের আক্রমণ করে; ডিম কাড়িয়া লয়; এবার সে রকম যুদ্ধ পর্যন্ত নাই, এতটা পথ আসিতে সে মাত্র দুইটা স্থানে এ যুদ্ধ দেখিয়াছে। এখানে যাহারা আক্রমণ করিয়াছে—তাহারা গাছেই থাকে, বিষাক্ত হিংস্র কাঠ-পিঁপড়ের দল। যাহারা নিচে হইতে উপরে উঠিয়াছে—তাহারা যেন অর্ধমৃতপ্রায় বিপন্ন। বন্যার জলে ভাসমান চালায় মানুষ ও সাপ যেমন নির্জীবের মত পড়িয়া থাকে, উহাদের তেমনি নির্জীব অবস্থা।

বাঁধের অবস্থাও ভাল নয়। দীর্ঘকাল কেহ লক্ষ্য করে নাই। বাঁধের গায়ে অজস্র ছোট গর্ত দিয়া জল ঢুকিতেছে। ইঁদুরে গর্ত করিয়াছে; এ গর্ত রোধ করিবার উপায় নাই। সর্বনাশা জাত। শস্যের আপদ—ঘরের আপদ, পৃথিবীর কোন উপকারই করে না। বাঁধের ভিতরটা বোধ হয় সুড়ঙ্গ কাটিয়া ফোঁপরা করিয়া দিয়াছে; বাঁধটা প্রকাণ্ড চওড়া এবং এই শরবনের শিকড়ের জালের বাঁধনে বাঁধা বলিয়া সাধারণ বন্যায় কিছু হয় না। কিন্তু প্রথম স্রোতের মুখে যে জল জাগিয়াছে—সে যদি তাহার মনের ভ্রম না হয়—তবে ময়ূরাক্ষীর বুকের মধ্যে হইতে ঘুমন্ত রাক্ষসী জাগিয়া উঠিবে। এবার ঘোড়া-বানই আসিবে। সে বন্যার মুখে এই সংস্কার-বর্জিত প্রাচীন বাঁধ কিছুতেই টিকিয়া থাকিতে পারিবে না।

আবার আকাশে মেঘ করিয়া আসিল।

বাতাস বাড়িতেছে, ঝিন্-ঝিন্ ধারায় বৃষ্টি নামিল। বাতাসের বেগে ঝিন্-ঝিনে বৃষ্টি কুয়াশার পুঞ্জের মত ভাসিয়া যাইতেছে; এ বাদল সহজে ছাড়িবে বলিয়া মনে হয় না! দুর্ভাগ্য—এ শুধু তাহাদেরই দুর্ভাগ্য। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া তৈয়ারী-করা বুকের রক্ত-সেচা—মাঠ-ভরা ধান পচিয়া যাইবে, গ্রাম ভাসিয়া যাইবে, ঘর-দুয়ার ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইবে, সমগ্র দেশটায় হাহাকার উঠিবে। মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত—। সহসা তাহার একটা কথা মনে হইল, —লোকে বলে সেকালের লোক পুণ্যাত্মা ছিল কিন্তু সেকালেও তো এমনি ভাবে এই চণ্ডপা বান আসিত। এমনি ভাবেই শস্য পচিত, ঘর ভাঙিত! লোকে হাহাকার করিত!...ভাবিতে ভাবিতে মহাগ্রামের সীমানা পার হইয়া সে দেখুড়িয়ার প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বাঁধের উপর দুটি লোক দাঁড়াইয়া আছে, মাথায় ছাতা নাই, সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে। একজনের হাতে একটা লাঠির মত একটা-কিছু, অন্য জনের হাতে একটা কি—বেশ ঠাওর করা গেল না। কুয়াশা-পুঞ্জের মত বৃষ্টিধারার মধ্যে তাহাদের স্পষ্ট পরিচিতিকে আপনা করিয়া রাখিয়াছে। আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া দেবু চিনিল—একজন তিনকড়ি, অন্যজন রাম ভল্লা, তিনকড়ির হাতে কোঁচ, রামের হাতে পলুই। তাহারা বাহির হইয়াছে মাছের সন্ধানে।

দেবু আসিয়া বলিল—মাছ ধরতে বেরিয়েছেন?

নদীর দিকে অখণ্ড মনোযোগের সহিত চাহিয়া তিনকড়ি দাঁড়াইয়া ছিল, দৃষ্টি না ফিরাইয়াই সে বলিল—বেরিয়েছিলাম। নদীর কাছ বরাবর এসেই যেন কানে গেল গোঁ গোঁ শব্দ। নদী ডাকছে।

রাম বলিল—পর পর তিনটে লাঠি পুঁতে দিলাম, দুটো ডুবেছে, এই দেখেন—শেষটার গোড়াতে উঠেছে বান। গতিক ভাল নয় পণ্ডিত মশায়।

দেবু বলিল—আমিও সেই কথা ভাবছি। ডাক আমিও শুনেছি। ভাবছিলাম আমার মনের ভুল।

—উঁহু। ভুল নয়? ঠিক শুনেছ তুমি!

—বাঁধের অবস্থা দেখেছেন? ইঁদুরে ফোঁপরা করে দিয়েছে!—

রাম বলিল—ওতে কিছু হবে না। ভয় আপনার কুসুমপুরের মাথায়—কঙ্কণার গায়ে বাঁধ ফেটে আছে।

—ফেটে আছে?

—একেবারে ইমাথা-উমাথা ফাটল। সেই যে শিমুলগাছটা ছিল—বাবুরা কেটে নিয়েছে, তখুনি ফেটেছে। পাহাড়ের মতন গাছটা বাঁধের ওপরেই পড়েছিল তো, তার ওপর এইবার শেকড়গুলা পচেছে। লোকে কাঠ করতে শেকড় বার করে নিয়েছে। ভয় সেই জায়গায়, সেখানটা মেরামত না করলে, ও মাটি ময়ূরাক্ষী তো ভুয়োর মতন চেটে মেরে দেবে।

দেবু বলিল—যাবেন তিনু-কাকা?

তিন্থু তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত, সে যেন এতক্ষণ বল পাইতেছিল না। লোকে তাহাকে বলে 'হোপো'। হই-হই করা নাকি তাহার অভ্যাস। রামাও সেই কথা বলিয়াছে। কথাটা তাহাদের মধ্যে আগেই হইয়াছে। তিনকড়ি তখনই যাইতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু রামা বলিয়াছিল—যাবা তো! যেতে বলছ—যাচ্ছি—চল। কিন্তুক—যেয়ে করবা কি শুনি? কেউ আসবে বাঁধ বাঁধতে?

—আসবে না?

—তুমিও যেমন, আসবে। তার চেয়ে লোকে খবর পেলে ঘর-দুয়ার সামলাবে, ঘরে মাচান বাঁধবে। চুপ করে বসে থাক। চল বরং নিজেদের ঘর সামলাই গিয়ে, মাচান বেঁধে রাখি। হরি করে—রাতারাতি বান আসে—সব শালাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়!

তিনকড়ি তাহাতে গররাজি নয়! উৎফুল্ল হইয়া বলল—মন্দ বলিস নাই রামা, ঠিকই বলেছিস! সেই হলেই শুয়োরের বাচ্চাদের ভাল হয়। শুয়োরের বাচ্চা, সব শুয়োরের বাচ্চা। ঘুরে-ফিরে পেট ভরণের জন্যে হুড়মুড় করে সব শালা সেই ছিরে পালের আঁস্তাকুড়ে গিয়ে পড়ল!

দেবু তাগিদ দিল—চলুন কাকা, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

দেখুড়িয়ার সীমানার পর মহাগ্রাম তারপর শিবকালীপুর, তারপর কুসুমপুর। গোটা কুসুমপুরের সীমানাটা পার হইয়া কঙ্কণার সীমানার সঙ্গে সংযোগস্থলে বাঁধের গায়ে বেশ একটি ফাটল দেখা দিয়াছে। পূর্বে এখানে ছিল প্রকাণ্ড একটা শিমুলগাছ। সে-কালে দেবু যখন ইস্কুলে পড়িত তখন গাছটাকে দেখিলেই মনে পড়িত—"অস্তি গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলী তরু:"...গাছটায় অসংখ্য বনটিয়ার বাস ছিল। দেবুর বয়স তো অল্প, এমন কি তিনকড়ি এবং রামও বাল্য-কালে এই গাছে উঠিয়া বনটিয়ার বাচ্চা পাড়িয়াছে।

শিমুলের তক্তা ওজনে খুব হাল্কা এবং তক্তাগুলিকে যথেষ্ট পাতলা করিয়া চিরিলেও ফাটে না; সেই হিসাবে পালকি তৈয়ারীর পক্ষে শিমুল-তক্তাই প্রশস্ত। কঙ্কণার বাবুদের জমিদারী অনেক—দুর্গম পল্লীগ্রাম অঞ্চলেও বিস্তৃত। এই বিংশ-শতাব্দীর উনত্রিশ বৎসর চলিয়া গেল, এখন সব গ্রামে গরুর গাড়ী যাইবারও পথ

নাই। পূর্বকালে বরং পথ ছিল, কাঁচা মেঠো পথ ; মাঠের মধ্য দিয়া একখানা গাড়ী যাইবার মত রাস্তা। বর্ষায় কাদা হইত, শীতে কাদা শুকাইয়া গাড়ীর চাকায় গরুর খুরে গুঁড়া হইয়া ধুলা উড়িত—নামক ছিল গো-পথ। ওই পথে মাঠ হইতে ধান আসিত, গ্রামান্তরে যাওয়া চলিত। পঞ্চায়েৎ রক্ষণাবেক্ষণ করিত। কিন্তু জমিদার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই—গো-চরের পতিতভূমির সঙ্গে গো-পথও প্রজাবিলি করিয়াছে। ভূমিলোভী চাষীরাও অনেক ক্ষেত্রে আপন জমির পাশে যেখানে গো-পথ পাইয়াছে সেখানে আত্মসাৎ করিয়াছে। আজকাল ইউনিয়ন-বোর্ড পাকা রাস্তা লইয়া ব্যস্ত, এদিকে দৃষ্টি দিবার অবকাশও নাই। কাজেই এই মোটর-ঘোড়া-গাড়ীর যুগেও জমিদারদের পালকির প্রয়োজন আছে ; সেই পালকির জন্যই শিমুলগাছটা কাটা।

দীর্ঘকালের সম্বন্ধ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া বনস্পতি যখন মাটিতে পড়িল, তখন তাহারই বত্রিশ নাড়ীর টানে—মাটির বাঁধটার উপরের খানিকটা ফাটিয়া বসিয়া গেল। সেই তখন হইতেই বাঁধটার এইখানটায় ফাট ধরিয়া আছে। উপরের অধাংশে ফাটল, নিচেটা ঠিকই আছে বন্যা সচরাচর বাঁধের উপরের দিকে উঠে না। তাই ও-দিকে কাহারো দৃষ্টি পড়ে নাই। এবার বন্যা হু-হু করিয়া উপরের দিকে উঠিতেছে। দেবু, তিনকড়ি ও রাম তিনজনে ফাটল-জীর্ণ বাঁধটাকে দেখিয়া একবার পরস্পরের দিকে চাহিল। তিনজনের দৃষ্টিতেই নীরব শঙ্কিত প্রশ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তিনকড়ি বলিল—এ তো দু-চারজনের কাজ নয় বাবা!

রাম হাসিয়া বলিল—বান যে রকম বাড়ছে, তাতে লোক ডাকতে ডাকতেই বাঁধ বেনজনের মা কালীর মত 'কেতিয়ে' পড়বে।

তিনকড়ি গাল দিয়া উঠিল—হারামজাদা, হাসতে তোর লজ্জা লাগে না?

রাম প্রবলতর কৌতুক অনুভব করিল, সে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার ঘর বলিতে একখানা কুড়ে ; সম্পদ বলিতে খানকয়েক থালা-কাঁসা, একটা টিনের পেঁটরা, কয়েকখানা কাঁথা, একটা হুঁকো আর কয়েকখানা লাঠি ও সড়কী। নিজে সে এই প্রৌঢ় বয়সেও ভীমের মত শক্তিশালী, সাঁতারে সে কুমীর ; তাহার শঙ্কাও কিছু নাই—গ্রাম্য গৃহস্থদের উপরেও মমতা কিছু নাই। উহারা তাহাকে ভয় করে, ঘৃণা করে, নির্যাতনে সাহায্য করে—বি-এল কেসে সাক্ষ্য দেয় ; তাই

তাহাদের চরমতম দুর্দশা হইলেও সে ফিরিয়া চায় না। তাহাদের দুর্দশায় রামের মহা-আনন্দ। সে হাসিয়া সারা হইল।

দেবু ফাটল-ভরা বাঁধটার দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল।

দুরন্ত প্লাবনে পঞ্চগ্রাম ভাসিয়া যাইবে। মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল দুর্দশা-গ্রস্ত অঞ্চলটার ছবি। রাক্ষসী ময়ূরাক্ষী যুগে যুগে এমনি করিয়া পঞ্চগ্রামের শস্য-সম্পদ, ঘর-দুয়ার ভাঙিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু সেকালে মানুষের অবস্থা ছিল আলাদা। মানুষের দেহে ছিল অসুরের মত শক্তি। সেকালের চাষীর হাতে থাকিত সাত আট সের ওজনের কোদালি, গ্রামের মধ্যে ছিল একতা। ময়ূরাক্ষী বাঁধ ভাঙিয়া সব ভাসাইয়া দিয়া যাইত, শক্তিশালী চাষীরা আবার বাঁধ বাঁধিত; জমির বালি ঠেলিয়া ফেলিত। সেকালের বলদগুলাও ছিল ওই চাষীদের মত সবল—সেই বলদে হাল জুড়িয়া আবার জমি চষিত, পর বৎসরেই পাইত অফুরন্ত ফসল। আবার ঘর-দুয়ার হইত, নূতন সুন্দরতর ঘর গড়িত মানুষ। গ্রামগুলি নূতন সাজে সাজিয়া গড়িয়া উঠিত, সংসারে বৃদ্ধা গিন্নীর অন্তর্ধানের পর নূতন গিন্নীর হাতে-সাজানো সংসারের মত চেহারা হইত গ্রামের। কিন্তু এ কাল আলাদা। অনাহারে চাষীর দেহে শক্তি নাই, গরুগুলাও না খাইয়া শীর্ণ দুর্বল। এখন জমিতে বালি পড়িলে মাঠের বালি মাঠেই থাকিবে, ক্ষেত হইবে বালিয়াড়ি; ভাঙা ঘর মেরামত করিয়া জুড়ে হইবে, মানুষ মরিবার দিনের দিকে চাহিয়া কোন-রূপে মাথা গুঁজিয়া থাকিবে, এই পর্যন্ত। এই বিপদের মুখে ডাক দিলে তবু মানুষ আসিবে, কিন্তু বিপদ ঘটিয়া গেলে—তারপর বাঁধ বাঁধিতে আর কেহ আসিবে না। মানুষের একতার বোঁটা কোথায় কে কাটিয়া দিয়াছে—আর বাঁধা যায় না। তবু এই সময়—এই সময় ডাক দিলে, মানুষ আসিলেও আসিতে পারে।

সে বলিল—তিনু-কাকা, লোক যোগাড় করতেই হবে। আপনি দেখুড়ে আর মহাগ্রাম যান। আমি কুসুমপুর আর শিবকালীপুরে যাই।

তিনু বলিল—রামা, তোর নাগরা নিয়ে এসে পেট্।

রাম বলিল—মিছে—নাগরা পিটিয়ে আমার হাত ব্যথা করাবে মোড়ল। কেউ আসবে না।

তিনু বলিল—তুই সব জানিস্‌! ভল্লারাও আসবে না?

রাম বলিল—দেখো। আমাদের গাঁয়ের ভল্লাদের কথা ছাড়, তারা আসবে। কিন্তুক আর এক মানুও আসবে না—তুমি দেখো।

সতের

রামের কথাই সত্য হইল। অবস্থাপন্ন চাষী কেহ আসিল না, আসিল শুধু দরিদ্রের দল। আর মাত্র দু-এক জন। তাহাদের মধ্যে প্রধান ইরসাদ।

দেবু কুসুমপুরে ছুটিয়া গিয়াছিল। ইরসাদ বাড়ী হইতে বাহির হইতেছিল। কাল অমাবস্যা, রমজান মাসের শেষদিন, পরশু হইতে শওয়াল মাসের আরম্ভ। শওয়ালের চাঁদ দেখিয়া ঈদ মোবারক ঈদল্‌-ফেতর পর্ব। রোজার উপবাস-ব্রতের উদ্‌যাপন। এ পর্বে নূতন পোশাক চাই, সুগন্ধি চাই, মিষ্টান্ন চাই। জংশনের বাজারে যাইবার জন্য সে বাহির হইতেছিল। দেবু ছুটিয়া গিয়া পড়িল। বাজার করা স্থগিত রাখিয়া ইরসাদ দেবুর সঙ্গে বাহির হইল। গ্রামের অবস্থাপন্ন চাষী মুসলমানেরা কেহই প্রায় বাড়ীতে নাই। সকলেই গিয়াছে জংশনের বাজারে। এই বাঁধের উপর দিয়াই গিয়াছে, বন্যার অবস্থা দেখিয়া চিন্তাও তাহাদের হইয়াছে, কিন্তু আসন্ন উৎসবের কল্পনায় আচ্ছন্ন চিন্তাটাকে এড়াইয়া গিয়াছে। ইরসাদ দুয়ারে দুয়ারে ফিরিল। গরীবেরা বাড়ীতে ছিল, টাকা পয়সার অভাবে তাহাদের বাজারে যাওয়া হয় নাই, তাহারা সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল।

ওদিকে বাঁধের উপর বসিয়া রাম নাগরা পিটিতেছে—দুম্‌—দুম্‌—দুম্‌—

শিবকালীপুর হইতে বাহির হইয়া আসিল—সতীশ, পাতু ও তাহাদের দলবল। চাষীরা কেহ আসে নাই। চণ্ডীমণ্ডপে শ্রীহরির ওখানে নাকি মজলিশ বসিয়াছে।

দেখুড়িয়ার ভল্লারা পূর্বেই আসিয়া জুটিয়াছে। মহাগ্রামের জন কয়েক আসিয়াছে। মোটমাট প্রায় পঞ্চাশ জন লোক। এদিকে বন্যার জল ইতিমধ্যেই প্রায় হাত খানেকের উপর বাড়িয়া গিয়াছে। বাঁধের গায়ে ফাটলটার নিচেই একটা গর্তের ভিতর দিয়া বন্যার জল সরীসৃপের মত মাঠের ভিতর ঢুকিতে আরম্ভ

করিয়াছে। বাঁধের উপর পঞ্চাশ জন লোক বুক দিয়া পড়িল।

এই ধারার সুড়ঙ্গের মত গর্তের গতি অত্যন্ত কুটিল। বাঁধের ওপারে কোথায় তাহার মুখ, সেই মুখ খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারিলে কোনমতেই বন্ধ হইবে না। পঞ্চাশ জোড়া চোখ ময়ূরাক্ষীর বন্যার জলের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল —বাঁধের গায়ে কোথায় জল ঘূরপাক খাইতেছে—ঘূর্ণির মত।

ঘূর্ণি একটা নয়—দশ-বারোটা। অর্থাৎ গর্তের মুখ দশ-বারোটা। এ পাশের দেখা গেল জল একটা গর্ত দিয়াই বাহির হইতেছে না—অন্তত দশ জায়গা দিয়া জল বাহির হইতেছে। বাঁধের ফাটলের মাটি গলিয়া ঝুপ-ঝুপ করিয়া খসিয়া পড়িতেছে; ফাটলটা বাড়িতেছে; বাঁধের মাটি নিচের দিকে নামিয়া যাইতেছে।

তিনকড়ি বলিল—দাঁড়িয়ে থাকলে কিছু হবে না।

জগন—লেগে যাও কাজে।

হরেন উত্তেজনায় আজ চিন্মী বলিতেছিল—জলদি! জলদি! জলদি!

দেবু নিজে গিয়া ফাটলের গায়ে দাঁড়াইয়া বলিল—ইরসাদ ভাই, গোটা কয়েক খুঁটো চাই। গাছের ডাল কেটে ফেল! সতীশ, মাটি আন।

মাঠের সাদা জলের উপর দিয়া পাটল রঙের একটা অজগর যেন অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে বিসর্পিল গতিতে ক্ষুধার্ত উন্মত্ত গ্রাসে।

বাঁধের গায়ে গর্তটার মুখ কাটিয়া, গাছের ডালের খুঁটা পুঁতিয়া, আশপাশ দিয়া তাহারই মধ্যে ঝপাঝপ মাটি পড়িতেছিল—ঝুড়ির পর ঝুড়ি পঞ্চাশ জন লোকের মধ্যে জগন ও হরেন মাত্র দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু আটচল্লিশ জনের পরিশ্রমের মধ্যে একটুকু ফাঁকি ছিল না। কতক লোক মাটি কাটিয়া ঝুড়ি বোঝাই করিতেছিল—কতক লোক বহিতেছিল, দেবু, ইরসাদ, তিনকড়ি এবং আরও জন কয়েক—বন্যার ঠেলায় বাঁকিয়া যাওয়া খুঁটিগুলিকে ঠেলিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

—মাটি—মাটি—মাটি!

বন্যার বেগের মুখে তালপাতার আড় দেওয়া বেড়ার খুঁটাগুলিকে ঠেলিয়া ধরিয়া রাখিতে হাতের শিরা ও মাংসপেশীসমূহ কঠিন হইয়া যেন জমাট বাঁধিয়া যাইতেছে; এইবারে বোধ হয় তাহারা ফাটিয়া যাইবে। দাঁতে দাঁত চাপিয়া

দেবু চীৎকার করিয়া উঠিল—মাটি, মাটি, মাটি!

রাম ভল্লার মূর্তি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে, নিশীথ অন্ধকারের মধ্যে মারাত্মক অস্ত্র হাতে তাহার যে মূর্তি হয়—সেই মূর্তি। সে তিনকড়িকে বলিল—একবার ধর। সে চট্ করিয়া পিছন ফিরিয়া মাটিতে পায়ের খুঁট দিয়া—পিঠ দিয়া বেড়া-কাটে ঠেলিয়া ধরিল। তারপর বলিল ফেল মাটি!

ইরসাদ হাঁপাইতেছিল। রমজানের মাসে সে একমাস যাবৎ উপবাস করিয়া আসিতেছে। আজও উপবাস করিয়া আছে। দেবু বলিল—ইরসাদ-ভাই, তুমি ছেড়ে দাও। উপরে গিয়ে একটু বরং বস।

ইরসাদ হাসিল, কিন্তু বেড়া ছাড়িল না। ঝপ্ ঝপ্ মাটি পড়িতেছে। আকাশে মেঘ একবার ঘোর করিয়া আসিয়াছে, আবার সূর্য উঠিতেছে।

একবার সূর্য উঠিতেই ইরসাদ সূর্যের দিকে চাহিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল, বলিল—একবার ধর, আমি এখুনি আসছি। নামাজের ওয়াক্ত চলে যাচ্ছে ভাই।

বেলা ঢলিয়া পড়িয়াছে। মানুষের আকারের চেয়ে প্রায় দেড়গুণ দীর্ঘ হইয়া ছায়া পড়িয়াছে। জোহরের নামাজের সময় চলিয়া যাইতেছে। দেবু রাম ভল্লার মত পিছন ফিরিয়া পিঠ দিয়া বেড়াটায় ঠেলা দিয়া বলিল—যাও তুমি।

শ্রমিকের দল কাদা ও জলের মধ্যে প্রাণপণে দ্রুতগতিতে আসিয়া ঝুড়ির পর ঝুড়ি মাটি ফেলিতেছিল। মাটি নয় কাদা। ঝুড়ির ফাঁক দিয়া কাদা তাহাদের মাথা হইতে কোমর পর্যন্ত লিপ্ত করিয়া গলিয়া পড়িতেছে। শুধু কাদার মত মাটিতে বিশেষ কাজ হইতেছে না। বানের জলের তোড়ে কাদার মত মাটি মুহূর্তে গলিয়া যাইতেছে। ওদিকে ময়ূরাক্ষী ফুলিয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতেছে। বান বাড়িতেছে, উতলা বাতাসে প্রবহমান বন্যার বুকে শিহরণের মত চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিতেছে।

নদীর বুকের ডাক এখন স্পষ্ট। খরস্রোতের কল্লোল-ধ্বনি ছাপাইয়া একটা গর্জন ধ্বনি উঠিতেছে।

জলস্রোত যেন ঘোলাবের মত আবর্তিত হইয়া চলিতেছে। নদীর বুক রাশি রাশি ফেনায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

ফেনার সঙ্গে আবর্জনার স্তূপ—শুধু আবর্জনাই নয়—খড়, ছোটখাটো শুকনা ডালও ভাসিয়া চলিয়াছে।

সহসা হরেন আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিয়া উঠিল—Doctor, look, one চালা!—একটা ছোট ঘরের চাল ভাসিয়া চলিয়াছে।

—There—There—ওই একটা—ওই একটা। ওই আর একটা। By God—a big গাছের গুঁড়ি।

ঘরের চাল, কাটা গাছের গুঁড়ি, বাঁশ, খড়, ভাসিয়া চলিয়াছে;—নদীর উপরের দিকে গ্রাম ভাসিয়াছে।

জগন ডাক্তার আতঙ্কিত হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—গেল! গেল!

তিনকড়ি এতক্ষণ পর্যন্ত পাথরের মানুষের মত নির্বাক হইয়া সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া বেড়াটা ঠেলিয়া ধরিয়াছিল। এবার সে দেবুর হাত ধরিয়া বলিল—পাশ দিয়ে সরে যাও। থাকবে না, ছেড়ে দাও। রামা, ছাড়্! মিছে চেষ্টা। দেবু, পাশ দিয়ে সর। নইলে জলের তোড়ে মাটির মধ্যে হয়তো গুঁজে যাবে! গেল—গেল—গেল!

গিয়াছে! দ্রুত প্রবর্ধমান বন্যার প্রচণ্ডতম চাপে বাঁধের ফাটলটা গলিয়া সশব্দে এপাশের মাঠের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল। রাম পাশ কাটিয়া সরিয়া দাঁড়াইল; তিনকড়ি সুকৌশলে ওই জলস্রোতের মধ্যে ডুব দিয়া সাঁতার কাটিয়া ভাসিয়া চলিল। দেবু জলস্রোতের মধ্যে মিশিয়া গেল।

জগন চিৎকার করিয়া উঠিল—দেবু! দেবু!

রাম তল্লা মুহূর্তে ঝাঁপ দিয়া পড়িল জলস্রোতের মধ্যে।

ইরসাদের নামাজ সবে শেষ হইয়াছিল; সে কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—দেবু-ভাই!

মজুরদের দল হায় হায় করিয়া উঠিল। সতীশ বাউড়ী, পাতু বায়েনও জলস্রোতের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

পিছনে বন্যারোধী বাঁধের ভাঙন ক্রমশ বিস্তৃততর হইতেছে, গৈরিক বর্ণের জলস্রোত ক্রমবর্ধিত কলেবরে হুড়-হুড় শব্দে মাঠের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে; মাঠের

সাদা জলের উপর এবার গৈরিক বর্ণের জল—কালবৈশাখীর মেঘের মত ফুলিয়া ফুলিয়া চারপাশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই হাঁটুজল বাড়িয়া প্রায় এক-কোমর হইয়া উঠিল। ইরসাদও এবার জলের স্রোতের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল।

বন্যার মূল স্রোতটি ছুটিয়া চলিয়াছে—পূর্ব মুখে। ময়ূরাক্ষীর স্রোতের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে। পাশ দিয়া ঠেলিয়া চলিয়াছে গ্রামগুলির দিকে। মূল স্রোত মাঠের সাদা জল চিরিয়া প্রবল বেগে ছুটিয়াছে কুসুমপুরের সীমানা পার হইয়া শিবকালীপুর, শিবকালীপুরের পর মহাগ্রাম, মহাগ্রামের পর দেখুড়িয়া, দেখুড়িয়ার সীমা পার হইয়া, পঞ্চগ্রামের মাঠ পার হইয়া, বালুময় মহিষডহর—গলাপোতা বাগানের পাশ দিয়া ময়ূরাক্ষীর বাঁধের মুখে ময়ূরাক্ষীর নদীস্রোতে গিয়া পড়িবে।

রাম এই জলস্রোতের সঙ্গেই চলিয়াছে, এক-একবার মাথা তুলিয়া উঠিতেছে—আবার ডুব দিতেছে। তিনকড়িও চলিয়াছে। সে যখন মাথা তুলিয়া উঠিতেছে তখন চিৎকার করিয়া উঠিতেছে—হায় ভগবান্!

বন্যার জলে মাটির নিচের কীট-পতঙ্গ ভাসিয়া চলিয়াছে। একটা কালকেউটে জলস্রোতের উপর সাঁতার কাটিয়া তিনকড়ির পাশ দিয়া চলিয়া গেল। তিনকড়ি মুহূর্তে জলের মধ্যে ডুব দিল। জল-প্লাবনে মাঠের গর্ত ভরিয়া গিয়াছে, সাপটা খুঁজিতেছে একটা আশ্রয়স্থল, কোন গাছ অথবা এক টুকরা উচ্চভূমি। এ সময়ে মানুষকে পাইলেও মানুষকে জড়াইয়া ধরিয়া বাঁচিতে চাহিবে। কীট-পতঙ্গের তো অবধি নাই। খড়-কুটা-ডাল-পাতার উপর লক্ষ কোটি পিঁপড়া চাপ বাঁধিয়া আশ্রয় লইয়াছে। মুখে তাহাদের সাদা ডিম, ডিমের মমতা এখনও ছাড়িতে পারে নাই।

কুসুমপুরে কোলাহল উঠিতেছে—বান গ্রামের প্রান্তে গিয়া উঠিয়াছে। শিব-কালীপুরেও বান ঢুকিয়াছে। বাউড়ী-পাড়া মুচি-পাড়ায় জল জমিয়াই ছিল, বন্যার জল ঢুকিয়া এখন প্রায় এক-কোমর জল হইয়াছে। সতীশ ও পাতু ছাড়া সকলেই পাড়ায় ফিরিল। প্রতি ঘরে মেয়েরা ছেলেরা কলরব করিতেছে; ইহারই মধ্যে অনেকের ঘরে জল ঢুকিয়াছে। তৈজসপত্র হাঁড়িকুড়ি মাথায় করিয়া, গরু-ছাগল-গুলাকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া তাহারা পুরুষদেরই অপেক্ষা করিতেছিল, উহারা

ফিরিতেই সকলে হৈ হৈ করিয়া উঠিল—চল—চল—চল।

গ্রামও আছে—নদীও আছে চিরকাল। বানও আসে, গ্রামও ভাসে কিন্তু সর্বাগ্রে ভাসে এই হরিজন-পল্লী। ঘর ডুবিয়া যায়, অধিবাসীরা এমনিভাবেই পলায়, কোথায় পলাইয়া গিয়া আশ্রয় লইবে—সেও তাহাদের ঠিক হইয়া আছে। তাহাদের পিতৃপিতামহ এইখানেই আশ্রয় লইত। গ্রামের উত্তর দিকের মাঠটা উঁচু—ওই মাঠের মধ্যে আছে পুরোনো কালের মজা দীঘি। এই উত্তর-পশ্চিম কোণটায় প্রকাণ্ড সুবিস্তৃত একটা অর্জুন গাছ আছে, সেই গাছের তলায় গিয়া আশ্রয় লইত; আজও তাহারা সেইখানেই চলিল।

দুর্গার মা অনেকক্ষণ হইতেই চিৎকার করিতেছিল। দুর্গা সন্ধ্যা হইতে দেবুর বাড়ীতে ছিল। দেবু বাহির হইয়া গিয়া আর ফিরিল না। বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সে বাড়ী ফিরিয়া উপরে উঠিয়াছে, আর নামে নাই। রুক্মী বুকে বালিশ দিয়া উপুড় হইয়া জানালা দিয়া বান দেখিতেছে। শুধু বান দেখা নয়, গানও গাহিতেছে।—

"কলঙ্কিনী রাইয়ের তরে কানাই আজ লুটায় ধুলাতে
চিত্রকূটে আনিবে বারি—কলঙ্কিনীর কলঙ্ক ভুলাতে।"

দুর্গার মা বারবার ডাকিতেছে—দুগ্‌গা বান আসছে। ঘর-দুয়োর সামলিয়ে নে। চল্ বরং দীঘির পাড়ে যাই।

দুর্গা বারকয়েক সাড়াই দেয় নাই। তারপর একবার বলিয়াছে—দাদা ফিরে আসুক। তারপর সে আবার আপন মনে গানের পর গান গাহিয়া চলিয়াছে। এখন সে গাহিতেছিল—

"এ পারেতে রইলাম আমি, ও পারেতে আর একজনা—
মাঝেতে পাথার নদী পার করে কে সেই ভাবনা,
কোথায় তুমি কেলে সোনা?"

হঠাৎ তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল—মাঠ হইতে প্রত্যাগত লোকগুলির কোলাহল। সে বুঝিল পণ্ডিতের ব্যর্থ উত্তেজনায় লোকগুলি অনর্থক বানের সঙ্গে লড়াই করিয়া হার মানিয়া বাড়ী ফিরিল। সে একটু হাসিল। পণ্ডিতের যেন

খাইয়া-দাইয়া কাজ নাই, এই বান আটক দিতে গিয়াছিল!...দুর্গার মা নিচে হইতে চেঁচাইয়া উঠিল—দুগ্‌গা, দুগ্‌গা! অ—দুগ্‌গা!

—যা-না তু দাখির পাড়ে। মরণের ভয়েই গেলি হারামজাদী?

—ওগো, না!

—তবে এমন করে চেঁচাইছিস কেনে?

দুর্গার মা এবার কাঁদিয়া বলিল—ওলো, জামাই-পণ্ডিত ভেসে যেয়েছে লো!

দুর্গা এবার ছুটিয়া নামিয়া আসিল—কি? কে ভেসে যেয়েছে?

—জামাই পণ্ডিত। বানের তোড়ের মুখে পড়ে—।

দুর্গা বাহির হইয়া গেল। কিন্তু পথে জল থৈ থৈ করিতেছে, এই জল ভাঙিয়া সে কোথায় যাইবে? যাইয়াই বা কি করিবে? মনকে সান্ত্বনা দিল—দেবু শক্তিহীন পুরুষ নয়, সে সাঁতার জানে। কিন্তু বাঁধভাঙা বানের জলের তোড়—সে যে ভীষণ। বড় গাছ সম্মুখে পড়িলে শিকড়সুদ্ধ টানিয়া ছিঁড়িয়া পাড়িয়া ফেলে—জমির বুক খাল করিয়া চিরিয়া ফাঁড়িয়া দিয়া যায়। ভাবিতে ভাবিতেই সে পথের জলে নামিয়া পড়িল। এক কোমরের বেশী জল। ইহারই মধ্যে পাড়াটা জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। কেবল মুরগীগুলা ঘরের চালায় বসিয়া আছে। হাঁসগুলা বন্যার জলে ভাসিতেছে। গোটাকয়েক ছাগল দাঁড়াইয়া আছে একটা ভাঙা পাঁচিলের মাথায়। হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল—একটা লোক জল ঠেলিয়া এক বাড়ী হইতে বাহির হইয়া অন্য একটা একটা বাড়ীতে গিয়া ঢুকিল। দুঃখের মধ্যে সে হাসিল। হরেন বাউড়ী। লোকটা ছিঁচকে চোর। কে কোথায় কি ফেলিয়া গিয়াছে সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। সে অগ্রসর হইল। তাই তো পণ্ডিত—জামাই-পণ্ডিত ভাসিয়া গেল!

বাহিরে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সে মাকে ডাকিয়া বলিল—দাওয়ায় না-কেনে পাথর ওপরে উঠে বস্ মা। বউ, তুইও ওপরে যা। জিনিসপত্তরগুলা ওপরে তোল্।

মা বলিল—ঘর পড়ে মরব না কি?

—নতুন ঘর! এত শীগ্‌গির পড়বে না।

—দুর্গা কোথা চললি ?

—আসি আমি।

সে আর দাঁড়াইল না। অগ্রসর হইল।

দিনের আলো পড়িয়া আসিতেছে। দুর্গা পথের জল ভাঙিয়া অগ্রসর হইল। নিজেদের পাড়া ছাড়াইয়া ভদ্র-পল্লীতে আসিয়া উঠিল। ভদ্র-পল্লীর পথে জল অনেক কম, কোমর পর্যন্ত জল কমিয়া হাঁটুতে নামিয়া আসিল। কিন্তু কম থাকিবে না। বান বাড়িতেছে। ভদ্র-পল্লীর ভিটাগুলি আবার পথ অপেক্ষাও উঁচু জমির উপর অবস্থিত, পথ হইতে মাটির সিঁড়ি ভাঙিয়া উঠিতে হয়। আবার ঘরগুলির মেঝে-দাওয়া আরও খানিকটা উঁচু। সিঁড়িগুলা ডুবিয়াছে—এইবার উঠানে জল ঢুকিবে। গ্রামের মধ্যে প্রচণ্ড কলরব উঠিয়াছে। স্ত্রী-পুত্র, গরু-বাছুর, জিনিস-পত্র লইয়া ভদ্র গৃহস্থেরা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। ওই বাউড়ী-হাড়ি ডোম-মুচীদের মত সংসারটিকে বস্তা-ঝুড়ির মধ্যে পুরিয়া বাহির হইবার উপায় নাই। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপটা ইহারই মধ্যে মেয়েছেলেতে ভরিয়া গিয়াছে। তাহারা চিরকাল বন্যার সময় এই চণ্ডীমণ্ডপেই আসিয়া আশ্রয় লয়। এবারও লইয়াছে।

পূর্বকালে চণ্ডীমণ্ডপ ছিল মাটির, ঘর-দুয়ারগুলিও তেমন ভাল ছিল না। এবার বিপদের মধ্যেও সুখ—চণ্ডীমণ্ডপ পাকা হইয়াছে, ঝকঝকে পাকা মেঝে ; ঘর-দুয়ারগুলিও ভাল হইয়াছে। কিন্তু তবুও লোকে ভরসা করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে ঢুকিতে পারে নাই। ঘোষ কি বলিবেন—এই ভাবিয়া ইতস্তত করিয়াছিল, কিন্তু শ্রীহরি নিজে সকলকে আহ্বান করিয়াছে, গায়ে চাদর দিয়া সকল পরিবারগুলির সুখ-সুবিধার তদ্বির করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মিষ্টভাষায় সকলকে আহ্বান করিয়া, অভয় দিয়া বলিতেছে—ভয় কি, চণ্ডীমণ্ডপ রয়েছে, আমার বাড়ী রয়েছে, সমস্ত আমি খুলে দিচ্ছি।

শ্রীহরি ঘোষের এই আহ্বানের মধ্যে একবিন্দু কৃত্রিমতা নাই, কপটতা নাই। গ্রামের এতগুলি লোক যখন আকস্মিক বিপর্যয়ে ধন-প্রাণ লইয়া বিপন্ন—তখন সে অকপট দয়াতে আর্দ্র হইয়া উঠিল। শুধু চণ্ডীমণ্ডপই নয় ; সে তাহার নিজের

বাড়ী-ঘর-দুয়ারও খুলিয়া দিতে সংকল্প করিল। শ্রীহরির বাপের আমলেই ঘর-দুয়ার তৈয়ারি করিবার সময় বন্যার বিপদ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিয়াই ঘর তৈয়ারি করা হইয়াছিল। প্রচুর মাটি ফেলিয়া উঁচু ভিটাকে আরও উঁচু করিয়া তাহার উপরে আরও একবুক দাওয়া-উঁচু শ্রীহরির ঘর। ইদানীং শ্রীহরি আবার ঘরগুলির ভিতরের গায়ে পাকা দেয়াল গাঁথাইয়া মজবুত করিয়াছে; দাওয়া, মেঝে, এমন কি উঠান পর্যন্ত সিমেণ্ট দিয়া বাঁধাইয়াছে! নূতন বৈঠকখানা-ঘরের দাওয়া তো প্রায় একতলার সমান উঁচু। সম্প্রতি শ্রীহরি একটা প্রকাণ্ড গোয়াল-ঘর তৈয়ারি করাইয়াছে, তাহার উপরেও কোঠা করিয়া দোতলা করিয়াছে। সেখানেও বহু লোকের স্থান হইবে, সে ঘরখানার ভিতরও বাঁধানো। তাহার এত স্থান থাকিতে গ্রামের লোকগুলি বিপন্ন হইবে?

শ্রীহরির মা—ইদানীং শ্রীহরির গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য দেখিয়া পূর্বের মত গালিগালাজ বা চিৎকার করিতে সাহস পায় না, এবং সে নিজেও যেন অনেকটা পাল্টাইয়া গিয়াছে, মান-মর্যাদা-বোধে সে-ও যেন অনেকটা সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। তবুও এক্ষেত্রে শ্রীহরির সংকল্প শুনিয়া সে প্রতিবাদ করিয়াছিল—না বাবা হরি, সে হবে না—তোমাদের আমি ও করতে দোব না। তা হলে আমি মাথা খুঁড়ে মরব।

শ্রীহরির তখন বাদ-প্রতিবাদ করিবার সময় ছিল না। এতগুলি লোকের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে, তা ছাড়া গোপন মনে সে আরও ভাবিতেছিল—ইহাদের আহারের ব্যবস্থার কথা। যাহাদের আশ্রয় দিবে—তাহাদের আহারের ব্যবস্থা না করাটা কি তাহার মত লোকের পক্ষে শোভন হইবে? মায়ের কথার উত্তরে সংক্ষেপে সে বলিল—ছি: মা!

—ছি: কেনে বাবা, কিসের ছি:? তোমাকে ধ্বংস করতে যারা ধর্মঘট করেছে—তাদিগে বাঁচাতে তোমার কিসের দয়া, কিসের গরজ?

শ্রীহরি হাসিল, কোন উত্তর দিল না। শ্রীহরির মা ছেলের সেই হাসি দেখিয়াই চুপ করিল—সন্তুষ্ট হইয়াই চুপ করিল, পুত্র-গৌরবে সে নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করিল। জমিদারের মা হইয়া তাহারও অনেক পরিবর্তন হইয়াছে।

এতগুলি লোকের দণ্ড-মুণ্ডের মালিক তাহারা, এ কি কম গৌরব? লোকে তাহাকে বলে রাজার মা। সে মনে মনে স্পষ্ট অনুভব করিল—যেন ভগবানের দয়া-আশীর্বাদ তাহার পুত্র-পৌত্র, তাহার পরিপূর্ণ সম্পদ-সংসারের উপর নামিয়া আসিয়া আরও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছে। শ্রীহরিও ঠিক তাই ভাবিতেছিল!

ময়ূরাক্ষী চিরকাল আছে, চিরকাল থাকিবে; তাহাতে বন্যাও আসিবে। লোকেরা বিব্রত হইবে—তাহার পুত্র-পৌত্রেরাও এমনিভাবেই সকলকে আশ্রয় দিবে। সকলে আসিয়া বলিবে—শ্রীহরি ঘোষ মশায় ভাগ্যে চণ্ডীমণ্ডপ করে গিয়েছিলেন! সেদিনও তাহার নাম হইবে।

তাই শ্রীহরি নিজে আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে দাঁড়াইয়া সকলকে মিষ্টভাষায় আহ্বান জানাইল, অভয় দিল—ভয় কি চণ্ডীমণ্ডপ রয়েছে, আমার বাড়ী-ঘর রয়েছে, সমস্ত খুলে দিচ্ছি আমি।

চাষী গৃহস্থেরা সপরিবারে আসিয়া আশ্রয় লইতেছে। শ্রীহরির গুণগান করিতেছে। একজন বলিতেছিল—ভাগ্যমান পুরুষ যে গাঁয়ে জন্মায়—সে গাঁয়েরও মহাভাগ্যি। সেই ধুলোয়-ধুলোকীর্ণ হয়ে থাকত; আর এ হয়েছে দেখ দেখি! যেন রাজপুরী!

শ্রীহরি হাসিয়া বলিল—তোমরা তো আমার পর নও গো। সবই জ্ঞাত জ্ঞাত; আপনার জন। এ তো সব তোমাদেরই।

দুর্গা পথের জলের উপরেই দাঁড়াইয়া ছিল। এ পাড়া পার হইয়াই আবার মাঠ। জল ইহারই মধ্যে হাঁটু ছাড়াইয়া উঠিয়া পড়িল। মাঠে সাঁতার-জল। এদিকে বেলা নামিয়া পড়িতেছে। জামাই-পণ্ডিতের খবর লইয়া এখনও কেহ ফিরিল না। জামাই-পণ্ডিত তবে কি ভাসিয়া গেল? চোখ ফাটিয়া তাহার জল আসিল। তাহার জামাই-পণ্ডিত, পাঁচখানা গ্রাম যাহার নাম লইয়া ধন্য-ধন্য করিয়াছিল, পরের জন্য যে নিজের সোনার সংসার ছারখার হইতে দিল, গরীব দুঃখীর আপনার জন, অনাথের আশ্রয়, ন্যায্য ছাড়া অন্যায্য কাজ যে কখনও করে না, সেই মানুষটা ভাসিয়া গেল—আর এই লোকগুলা একবার তাহার নামও করে না!

সে জল ভাঙিয়া অগ্রসর হইল। গ্রামের ও-মাথায় পথের উপরে সে দাঁড়াইয়া থাকিবে। প্রকাণ্ড বড় মাঠ। তবুও তো দেখা যাইবে—কেহ ফিরিতেছে কি না। জামাই-পণ্ডিত ভাসিয়া গেলে—এই পূর্বদিকেই গিয়াছে। মানুষগুলা তো ফিরিবে! দূর হইতে তাকিয়াও তো খানিকটা আগে খবর পাইবে! দুর্গা গ্রামের পূর্ব মাথায় আসিয়া দাঁড়াইল। নির্জনে সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া সারা হইয়া গেল, বার বার মনে মনে গাল দিতে লাগিল কামার-বউকে। সর্বনাশী রাক্ষসী যদি এমন করিয়া পণ্ডিতের মুখে কালি মাখাইয়া—মাথাটা হেঁট করিয়া দিয়া চলিয়া না যাইত, তবে জামাই-পণ্ডিত এমনভাবে এখন মাঠের দিকে যাইত না। সে তো জামাই-পণ্ডিতের অাবগতিক জানে। সে যে তাহার প্রতি পদক্ষেপের অর্থ বুঝিতে পারে।

কে একটা লোক দ্রুতবেগে জল ঠেলিয়া গ্রামের ভিতর হইতে আসিতেছে। দুর্গা মুখ ফিরাইয়া দেখিল। কুসুমপুরের রহম শেখ আসিতেছে। রহমই প্রশ্ন করিল—কে, দুগ্গা নাকি?

—হ্যাঁ।

—আরে, দেবু-বাপের খবর কিছু পালি?—শেখের কণ্ঠস্বরে গভীর উদ্বেগ। দেবুর সঙ্গে ঘটনাচক্রে তাহার বিচ্ছেদ ঘটিয়া গিয়াছে। রহম আজ জমিদারের লোক। এখনও সে জমিদারের পক্ষে থাকিয়াই কাজকর্ম করিতেছে; দৌলতের সঙ্গেও তাহার যথেষ্ট খাতির। দেবুর প্রসঙ্গ উঠিলে সে তাহার বিরুদ্ধ-সমালোচনাই করিয়া থাকে। কিন্তু দেবুর এই বিপদের সংবাদ পাইয়া কিছুতেই সে স্থির থাকিতে পারে নাই, ছুটিয়া আসিয়াছে। সে বাড়ীতে ছিল না; থাকিলে হয়তো বাঁধ-ভাঙার খবর পাইবামাত্র দেবুদের সঙ্গেই আসিত। সেই গাছ-বেচা টাকা লইয়া সে সকালে উঠিয়াই গিয়াছিল জংশনের বাজারে। রেলের পুল পার হইবার সময়েই বান দেখিয়া সে খানিকটা ভয় পাইয়াছিল। বাজারে বসিয়াই সে বাঁধ-ভাঙার সংবাদ পায়। দৌড়াইতে দৌড়াইতে সে যখন গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল—তখন তাহাদের গ্রামেও জল ঢুকিয়াছে। তাহার বাড়ীর ছেলেমেয়েরা দৌলতের দলিজায় আশ্রয় লইয়াছে। গ্রামের মাতব্বরদের পরিবারবর্গ প্রায় সকলেই সেখানে। সাধারণ চাষীরা ছেলেমেয়ে লইয়া মসজিদের প্রাঙ্গণে আশ্রয় লইয়াছে।

মজুর খাটিয়া, চাকরি করিয়া যাহারা খায়—তাহারা গিয়াছে গ্রামের পশ্চিম দিকে উঁচু ডাঙায়, এ গ্রামের প্রাচীনকালের মহাপুরুষ গুল্ মহম্মদ সাহেবের কবরের ওখানে। কবরটির উপর প্রকাণ্ড একটা বকুল-গাছের ছায়াছত্র-তলে আশ্রয় লইয়াছে। রহম তাহাদের খবর করিতে গিয়াই দেবুর বিপদের সংবাদ পাইয়াছে। সংবাদটা পাইবামাত্র সে যেন কেমন হইয়া গেল।

মুহূর্তে তাহার মনে হইল—সে যেন কত অপরাধ করিয়াছে দেবুর কাছে। উত্তেজনার মুখে—লোকাপবাদের আকারে প্রচারিত দেবুর ঘুষ লওয়াটা বিশ্বাস করিলেও—রহমের মনের কোণে একটা সন্দেহ ছিল দেবুকে সে যে ছোট হইতে দেখিয়া আসিয়াছে—তাহাকে সে ভালবাসিয়াছে। ওই জানা এবং ভালবাসাই ছিল সেই সন্দেহের ভিত্তি। কিন্তু সে সন্দেহও এতদিন মাথা তুলিবার অবকাশ পায় নাই। দাঙ্গার মিটমাটের ফলে—জমিদার তরফ হইতে তাহাকে সম্মান দিল —সেই সম্মানটাই পাথরের মত এতদিন সে সন্দেহকে চাপিয়া রাখিয়াছিল। আজ এই সংবাদ অকস্মাৎ যেন পাথরটাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল, মুহূর্তে সন্দেহটা প্রবল হইয়া জাগিয়া উঠিল। দেবু—যে এমন করিয়া জীবন দিতে পারে, সে কখনও এমন শয়তান নয়। দেবু-বাপ কখনও বাবুদের টাকা লয় নাই। তেমন প্রকৃতির লোক নয়। ওটা বাবুদের ধাপ্পাবাজি। সে যদি বাবুদের লোক হইত, তবে এই এত বড় বৃষ্টির ব্যাপারে একদিনের জন্যও কি তাহাকে বাবুদের কাছারিতে দেখা যাইত না? সে যদি তেমন স্বার্থপর লোকই হইবে—তবে কেন অসম-সাহসিকতার সহিত বাঁধের ভাঙনের মুখে গিয়া দাঁড়াইল? রহম সেইখান হইতেই ছুটিয়া আসিতেছে!

রহমের প্রশ্নে দুর্গার চোখ দিয়া ঝরঝরধারে জল বহিয়া গেল। এতক্ষণে একটা লোক তাহার জামাই-পণ্ডিতের খবর করিল!

রহম অধিকতর ব্যগ্রতার সঙ্গে প্রশ্ন করিল—দুগ্‌গা?

দুর্গা কথা বলিতে পারিল না, সে ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল—না, কোন সংবাদই পাওয়া যায় নাই।

রহম সঙ্গে সঙ্গে মাঠের জলে নামিয়া পড়িল। দুর্গা বলিল—দাঁড়ান্ শেখজী,

আমিও যাব।

রহম বলিল—আয়। পানি সাঁতার! এতটা সাঁতার দিতে পারবি তো?

দুর্গা কাপড় সাঁটিয়া অগ্রসর হইল।

রহম বলিল—দাঁড়া। ওই দেখ্ কতকগুলা লোক বেরিয়েছে—মহাগ্রাম থেকে।

বানে-ডোবা নিচু মাঠকে বাঁয়ে রাখিয়া মহাগ্রামের পাশে-পাশে কতকগুলি লোক আসিতেছে। গ্রামের ধারে মাঠের অপেক্ষা জল অনেক কম। মাঝ-মাঠে সাঁতার-জল স্রোতের বেগে বহিয়া চলিয়াছে।

রহম সেইখান হইতেই হাঁক দিতে শুরু করিল। চাষীর হাঁক। হাঁক কিন্তু জোর হইল না। সারাটা দিন রোজার উপবাস করিয়া গলা শুকাইয়া গিয়াছে নিজের কণ্ঠস্বরের দুর্বলতা বুঝিয়া রহম বলিল—দুগ্গা, তু সমেত হাঁক পাড়্।

দুর্গাও প্রাণপণে রহমের সঙ্গে হাঁক দিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরও বার বার রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। যদি তাহারা অর্থাৎ পাতু, সতীশ, জগন ডাক্তার, হরেন ঘোষালই হয়! যদি তাহারা আসিয়া বলে—না, পাওয়া গেল না!

তাহারাই বটে! হাঁকের উত্তর আসিল, শুনিয়াই রহম বলিল—হাঁ! উয়ারাই বটে। ইরসাদের কথা মালুম হচ্ছে।

সে এবার নাম ধরিয়া ডাক দিল—ই-র-সা-দ!

উত্তর আসিল—হাঁ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লোক কয়টি আসিয়া উপস্থিত হইল—ইরসাদ, সতীশ, পাতু, হরেন ও দেখুড়িয়ার একজন ভল্লা।

রহম প্রশ্ন করিল—ইরসাদ,—পণ্ডিত? দেবু-বাপকে পেয়েছো?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ইরসাদ বলিল—পাওয়া গিয়েছে। জলের তোড়ের মুখে পড়ে মাথায় কিছু ঘা লেগেছে। জ্ঞান নাই।

দুর্গা প্রশ্ন করিল—কোথায়? ইরসাদ মিয়ে—কোথা জামাই-পণ্ডিত?

—দেখুড়েতে। দেখুড়ের ধারে গিয়ে রাম ভল্লা টেনে তুলেছে।

—বাঁচবে তো?

—জগন ডাক্তার রয়েছে। দুজন ভল্লা গিয়েছে কঙ্কণা—যদি হাসপাতালের

ডাক্তার আসে। ছিরেম ডক্তর এসেছে—জগন ডাক্তারের বাক্স নিয়ে যাবে।

দুর্গা বলিল—আমিও যাব।

চণ্ডীমণ্ডপ লোকজনে ভরিয়া গিয়াছে। তাহারা কলরব করিতেছিল। আপন আপন জিনিসপত্র গুছাইয়া—রাত্রির মত জায়গা করিয়া লইবার জন্য ছোটখাটো কলহও বাধিয়া উঠিয়াছে। ছেলেগুলা চ্যা-ভ্যা লাগাইয়া দিয়াছে। কাহারও অন্যের দিকে দৃক্‌পাত করিবার অবসর নাই। আগন্তুক দলটি চণ্ডীমণ্ডপের কাছে উপস্থিত হইতেই কিন্তু কয়েকজন ছুটিয়া আসিল। কয়েকজনের পিছনে পুরুষেরা প্রায় সকলেই আসিয়া দাঁড়াইল।

—ঘোষাল, পণ্ডিতের খবর কি? পণ্ডিত? আমাদের পণ্ডিত?

—সতীশ—অ সতীশ?

—পাতু? বল্ কেনে রে?

চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে মেয়েরা উদ্‌গ্রীব হইয়া কাজকর্ম বন্ধ করিয়া স্তব্ধভাবে প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

হরেন উত্তেজিতভাবে বলিল—হোয়াট ইজ্ দ্যাট্ টু ইউ? সে খবরে তোমাদের কি দরকার! সেল্‌ফিশ পিপ্‌ল সব!

ইরসাদ বলিল—পণ্ডিতকে বহুকষ্টে পাওয়া গিয়েছে। তবে অবস্থা খুব খারাপ।

চণ্ডীমণ্ডপের মানুষগুলি যেন সব পাথর হইয়া গেল। সহসা স্তব্ধ করিয়া একটি নারীকণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। এক প্রৌঢ়া মা কালীর মন্দিরের বারান্দায় প্রায় মাথা ঠুকিয়া ঐকান্তিক আর্তস্বরে বলিল—বাঁচিয়ে দাও মা, তুমি বাঁচিয়ে দাও। দেবুকে তুমি বাঁচিয়ে দাও। দেবু আমাদের সোনার দেবু। মা-কালী। তুমি মালিক, বাঁচাও তুমি।

স্তব্ধ মানুষগুলির মধ্য হইতে আত্ম-প্রার্থনার গুঞ্জন উঠিল—মা! মা! বাঁচাও! মা-কালী!

মেয়েরা বার বার চোখ মুছিতেছিল।

সন্ধ্যা হইয়া গেল। জগন ডাক্তারের ওষুধের বাক্স লইয়া ভল্লা জোয়ানটি চলিয়াছিল, পিছনে পিছনে দুর্গা। সে-ও অহরহ মনে মনে বলিতেছিল—বাঁচাও মা, বাঁচিয়ে দাও। মা-কালী, তুমিই মালিক। জামাই-পণ্ডিতকে বাঁচিয়ে দাও। এবার পুজোয় আমি ডাইনে-বাঁয়ে জোড়া পাঁঠা দোব মা!

বার বার তাহার চোখে জল আসিতেছিল—মনকে সে প্রবোধ দিতেছিল—আশায় সে বুক বাঁধিতে চাহিতেছিল—জামাই-পণ্ডিত নিশ্চয় বাঁচিবে! এতগুলি লোক, গোটা গ্রাম-সুদ্ধ লোক যাহার জন্য দেবতার পায়ে মাথা কুটিতেছে, তাহার কি অনিষ্ট হয়? কিছুক্ষণ আগে যখন তাহারা ঘোষের তোষামোদ করিতেছিল—কই, তখন তো তাহাদের বুক চিরিয়া এমন দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হয় নাই, চোখ দিয়া জল আসে নাই। সে শুধু দায়ে পড়িয়া বড়লোকের আশ্রয়ে মাথা গুঁজিয়া—লজ্জার মাথা খাইয়া মিথ্যা তোষামোদ করিয়াছে। সে তাহাদের প্রাণের কথা নয়—কখনও নয়। এইটাই তাহাদের প্রাণের কথা! দরদর করিয়া চোখ দিয়া জল কি শুধুই পড়ে? মানুষের কদর্যতার সঙ্গেই দুর্গার জীবনের পরিচয় ঘনিষ্ঠ। মানুষকে সে ভাল বলিয়া কখনও মনে করে নাই। আজ তাহার মনে হইল—মানুষ ভাল—মানুষ ভাল। বড় বিপদে, বড় অভাবে পড়িয়া তাহারা খারাপ হয়। তবুও তাহাদের বুকের ভিতর থাকে ভালত্ব। মানুষের সঙ্গে স্বার্থের জন্য ঝগড়া করিয়াও তাহার মন খারাপ হয়। পাপ করিয়া তাহারা লজ্জা হয় ;

মানুষ ভাল। জামাই-পণ্ডিতকে তাহারা ভুলিয়া যায় নাই! জামাই-পণ্ডিত তাহার বাঁচিবে!

—কে যায় গো? কে যায়?—পিছন হইতে ভারী গলায় কে ডাকিল।

ভল্লা জোয়ানটি মুখ না ফিরাইয়া বলিল—আমরা।

—কে তোমরা?

এবার ছোকরা চটিয়া উঠিল। সে বলিল—তুমি কে?

শাসন-দৃপ্ত কণ্ঠে পিছন হইতে হাঁক আসিল—দাঁড়া ওইখানে।

—না।

—এ্যাই।

ছোকরা হাসিয়া উঠিল, কিন্তু চলিতে বিরত হইল না। দুর্গা শঙ্কিত হইয়া উঠিল। পিছনের লোকটি হাঁকিয়া বলিল—এই শালা!

ছোকরা এবার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—এগিয়ে এস দুম্বই, দেখি তোমাকে একবার।

—কে তুই?

—তুই কে?

—আমি কালু শেখ, ঘোষ মহাশয়ের চাপরাশী। দাঁড়া ওইখানে।

—আমি জীবন ভল্লা! তোমার ঘোষ মহাশয়ের কোন ধার ধারি না আমি।

—তোমার সঙ্গে কে? মেয়ে লোক—? কে বটে?

—দুর্গা তীক্ষ্ণকণ্ঠে উত্তর দিল—আমি দুগ্গা দাসী!

—দুগ্গা?

—হ্যাঁ।

কালু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—অচ্ছা যাও।

কালু বাহির হইয়াছে পদ্মর সন্ধানে। পদ্ম শ্রীহরির বাড়ীতে নাই। বানের গোলমালের মধ্যে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে—কেহ লক্ষ্য করে নাই। সন্ধ্যার মুখে শ্রীহরি তথ্যটা আবিষ্কার করিয়া রাগে ক্ষোভে একেবারে পাগল হইয়া উঠিয়াছে। কালুকে পাঠাইয়াছে, ভূপালকে পাঠাইয়াছে পদ্মর সন্ধানে।

পদ্ম পলাইয়াছে। গতরাত্রে এক অদ্ভুত মুহূর্তে তৃষ্ণার্ত পাগলে যেমন করিয়া পঙ্কপল্বলের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তেমনি ভাবেই শ্রীহরির দরজার সম্মুখে আসিয়া তাহার বাড়ীতেই ঢুকিয়াছিল। আজ সকাল হইতে তাহার অনুশোচনার সীমা ছিল না। তাহার জীবনের কামনা শুধুমাত্র রক্তমাংসের দেহের কামনাই নয়, পেটের ভাতের কামনাই নয়, তাহার মনের পুষ্পিত কামনা—সে ফলের পরিণতির সফলতায় সার্থক হইতে চায়। অন্ন সে শুধু নিজের পেট পুরিয়া চায় না—অন্নপূর্ণা হইয়া পরিবেশন করিতে চায়—পুরুষের পাতে, সন্তানের পাতে, তাহার কামনা অনেক। শ্রীহরির ঘরে থাকার অর্থ উপলব্ধি করিয়া সকাল হইতে সে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতে এবং বন্যার বিপদে এই জন-সমাগমের

সুযোগে কখন তাহাদের মধ্য দিয়াই বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছে গ্রামের দক্ষিণে বন্যা, পূর্বে বন্যা, পশ্চিমেও তাই, সে উত্তর দিকের মাঠ ধরিয়া অন্ধকারের আবরণে চলিয়াছে অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে—যেখানে হোক্।

ভল্লাটির পিছনে দুর্গা চলিয়াছিল।

মাঠের বন্যা বাড়িয়া উঠিয়াছে—যেখানে বৈকালে এক-কোমর জল ছিল, সেখানে জল এখন বুক ছাড়াইয়াছে! শিবকালীপুরে চাষীপাড়াতেও এবার ঘরে জল ঢুকিতেছে। তাহারা মহাগ্রামের ভিতর দিয়া চলিল। মহাগ্রামের পথেও হাঁটুর উপর জল। বন্যার যে রকম বৃদ্ধি, তাহাতে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই চাষীদের ঘরেও বান ঢুকিবে। মহাগ্রাম এককালের সমৃদ্ধিসম্পন্ন গ্রাম—অনেক পড়ো ভিটায় ভাঙা ঘরের মাটির স্তূপ জমিয়া আছে—সেকালের গৃহস্থের পোঁতা গাছগুলির ছায়াকে আশ্রয় করিয়া সেই মাটির স্তূপের উপর সব গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে ও বাড়ীতে যত লোক ধরিয়াছে, তিনি আশ্রয় দিয়াছেন।

দেখুড়িয়ায় একমাত্র ভরসা তিনকড়ির বাড়ী. তিনকড়ির বাড়ীটা খুব উঁচু। সেখানেই অধিকাংশ লোক আশ্রয় লইয়াছে। অনেকে গ্রামান্তরে পলাইয়াছে। ভল্লাদের অনেকে এখনও বাঁধের উপরে বসিয়া আছে। কাঠ ভাসিয়া গেলে ধরিবে। গরু ভাসিয়া গেলে ধরিবে। রাম ভল্লা প্রভৃতি কয়েকজন রাত্রেও থাকিবে স্থির করিয়াছে। কত বড়লোকের ঘর ভাঙিবে, কাঠের সিন্দুক আসিতে পারে। অলঙ্কার-পরা বড়লোকের মেয়ের মৃতদেহও ভাসিয়া আসিতে পারে। বড়লোক বাবু ভাসিয়া আসিতে পারে—যাহার জামায় থাকিবে সোনার বোতাম, আঙুলে হীরার আংটি, পকেটে থাকিবে নোটের তাড়া—কোমরে গেঁজলে-ভরা মোহর। কেবল এক-একজন পালা করিয়া তিনকড়ির বাড়িতে থাকিবে. পণ্ডিতের অসুখ—কখন্ দরকার লাগে কে জানে!

জগন ডাক্তার তিনকড়ির দাওয়ায় বসিয়া ছিল।

জীবন বাক্সটা নামাইয়া দিল।

দুর্গা ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিল—ডাক্তারবাবু, জামাই-পণ্ডিত কেমন আছে?

ডাক্তার ওষুধের বাক্স খুলিয়া ইন্‌জেকশনের সরঞ্জাম বাহির করিতে করিতে বলিল—গোলমাল করিস্‌ নে, বোন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘরের মধ্যে দেবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—কে?—কে?

দুইজনেই ছুটিয়া গেল ঘরের মধ্যে; দেবু চোখ মেলিয়া চাহিয়াছে, তাহার শিয়রে বসিয়া সেবা করিতেছিল তিনকড়ির মেয়ে স্বর্ণ। রাঙা চোখে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া—অকস্মাৎ সে দুই হাতে স্বর্ণের চুলের মুঠি ধরিয়া তাহার মুখখানা আপনার চোখের সম্মুখে টানিয়া আনিয়া বলিতেছে—কে?—কে?

স্বর্ণের চুলগুলি যেন ছিঁড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু অপরিসীম ধৈর্য তাহার। সে নীরবে দেবুর হাত দুইখানা ছাড়াইতে চেষ্টা করিতেছে।

দেবু আবার প্রশ্ন করিল—বিলু? বিলু? এখন এলে তুমি? বিলু!

জগন দেবুর দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া স্বর্ণকে মুক্ত করিয়া দিল।

দুর্গা ডাকিল—জামাই-পণ্ডিত!

জগন মৃদুস্বরে বলিল—ডাকিস না। বিকারে বকছে।

আঠার

ময়ূরাক্ষীর সর্বনাশা বন্যার প্রচণ্ড প্লাবনে অঞ্চলটা বিপর্যস্ত হইয়া গেল। গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এই কালবন্যা—এমন বান আসে নাই। পঞ্চগ্রামের সুবিস্তীর্ণ মাঠখানায় শস্যের প্রায় চিহ্ন নাই। জলস্রোত কতক উপড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। বাকী যাহা ছিল, তাহা হাজিয়া পচিয়া গিয়াছে, একটা দুর্গন্ধ উঠিতেছে। মাঠের জল পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে সবুজ। বাঁধের ভাঙন দিক দিয়া জলস্রোতের প্রবাহ বহিয়া গিয়াছিল—সেখানকার জমিগুলির উপরের মাটিটুকু চাঁছিয়া চাঁছিয়া খুঁড়িয়া, সার ঢালিয়া, চষণের শত সোহাগে এবং সন্তানবতী জননীর বুকের মত শস্য-সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল—তাহার আর কিছুই নাই, স্রোতের টানে খুঁড়িয়া গলিয়া ধুইয়া মুছিয়া চলিয়া গিয়াছে। জমিগুলার বুকে জাগিয়া উঠিয়াছে কঠিন অনুর্বর এঁটেল মাটি; কতক কতক জমির উপর জমিয়া গিয়াছে রাশীকৃত বালি।

গ্রামের কোণে কোণে—যেখানে জলস্রোত ছিল না—সে জমিগুলি শেষে ডুবিয়াছিল এবং আগেই বন্যা হইতে মুক্ত হইয়াছে—সেখানে কিছু কিছু শস্য আছে। কিন্তু সে শস্যের অবস্থাও শোচনীয়; দুর্ভিক্ষ মহামারীর শেষে যে মানুষগুলি কোনমতে বাঁচিয়া থাকে—ঠিক তাদেরই মত অবস্থা। এখন আবার পল্লীগুলির ঘর ধসিয়া ভাঙিয়া পড়িবার পালা পড়িয়াছে। কতক ঘর অবশ্য বন্যার সময়েই ভাঙিয়াছে, কিন্তু বন্যার পর ধসিতেছে বেশী। মাটির ঘর এইভাবেই বেশী ভাঙে। জলে যখন ডুবিয়া থাকে তখন দেওয়ালের ভিত ভিজিয়া নরম হয়, তারপর জল কমিলে—রৌদ্রের উত্তাপ লাগিলেই ফুলিয়া গিয়া ধসিয়া পড়ে। প্রায় শতকরা পঞ্চাশখানা ঘর ভাঙিয়াছে। খড়বিচালি ভাসিয়া গিয়াছে, বন্যায় ডুবিয়া গোচর জমির ঘাস পচিয়া গিয়াছে—গাই-বলদ-ছাগল-ভেড়াগুলার অনাহার শুরু হইয়াছে। তাহারা সুযোগ পাইবামাত্র ছুটিয়া চলিয়াছে উত্তর দিকে। পূর্ব পশ্চিমে বহমান ময়ূরাক্ষীর তীরবর্তী গ্রামগুলির উত্তর দিকে সব মাঠ উঁচু, চিরকাল অবহেলায় মরে, সেই মাঠ জলে ডোবে নাই। এবার অতি-বৃষ্টিতেও মাঠের ফসল বেশ ভাল—গরু ছাগল-ভেড়া ওই মাঠেই ছুটিয়া যাইতে চায়। এবার ওই উত্তরের মাঠেই মানুষের ভরসা, কিন্তু ও-দিকে জমির পরিমাণ অতি সামান্য।

শ্রীহরি ঘোষ আপনার বৈঠকখানায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল। তাহার কর্মচারী দাসজীর সঙ্গে এই সব কথাই সে বলিতেছিল। দাস আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিল—বৃদ্ধির ব্যাপারটা আপোসে মিটমাট করা ভারি অন্যায় হয়েছে—ভারি অন্যায়।

তাহার বক্তব্য—আপোসে মিটমাট না করিয়া মামলার সংকল্পে অবিচলিত থাকিলে আজ মামলাগুলি অনায়াসে একতরফা ডিক্রি—অর্থাৎ প্রজাদের পক্ষ হইতে কোনরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা না হইয়া ডিক্রি হইয়া যাইত। এই অবস্থায় আদালতের মারফতে আপোস করিলেও অনেক ভাল হইত। আদালতকে ছাড়িয়া আপোসে বৃদ্ধি—টাকায় দুই আনার বেশী হয় না, আদালত তাহা গ্রাহ্য করে না। কিন্তু মামলায় অথবা মামলা করিয়া আদালতের মারফতে আপোস করিলে বৃদ্ধি অনেক বেশী হইতে পারে। এমন কি টাকায় আট আনা পর্যন্ত বৃদ্ধির নজির আছে।

শ্রীহরির কথাটা মনে হইয়াছে। কিন্তু কঙ্কণার বড়বাবু যে ব্যাপারটা মাটি করিয়া দিলেন। কি কুক্ষণেই রহমের সঙ্গে হাঙ্গামাটা বাধাইলেন!

দাস বলিল—ধর্মঘটের ঘট বানের জলে ভেসে যেত। পেটের জন্তেই তখন এসে গড়িয়ে পড়ত আপনাদের দরজায়। কলের মালিক তখন টাকা দাদন দিতে চেয়েছিল মাঠের ধান দেখে। কিন্তু এই বানের পরে যে একটি আধলাও কাউকে দিত না।

শ্রীহরি একটু হাসিল—পরিতৃপ্তির হাসি। সে কথা সে জানে। তাহার শান-বাঁধানো উঁচু বাড়ীতে বন্যার জলে ক্ষতি করিতে পারে নাই। ধানের মরাইগুলি অক্ষত পরিপূর্ণ অবস্থায় তাহার আঙিনা আলো করিয়া রহিয়াছে, সে কল্পনা করিল—পাঁচখানা-সাতখানা গ্রামের লোক তাহার খামারে ওই ফটকের সম্মুখ ভিক্ষুকের মত করজোড়ে দাঁড়াইয়া আছে। ধান চাই। তাহাদের স্ত্রী, পুত্র, পরিবারবর্গ অনাহারে রহিয়াছে, মাঠে একটি বীজধানের চারা নাই।

ভাদ্র মাসের এখনও পনের দিন আছে, এখনও দিবারাত্রি পরিশ্রম করিলে আমন জমি চাষ হইতে পারিবে। 'আছাড়ো' করিয়া বীজ পড়িলে কয়েক দিনের মধ্যেই বীজের চারা উঠিয়া পড়িবে। সেই বীজ লইয়া যে যতখানি পারে চাষ করিতে পারিলে তবুও কিছুটা পাওয়া যাইবে। অন্ততঃ প্রতি চারাটিতে একটি করিয়াও ধানের শীষ হইবে। শ্রীহরির নিজের জমি অনেক—অমরকুণ্ডার মাঠের সর্বোৎকৃষ্ট জমিগুলি প্রায় সবই তাহার। সে-সব জমিতে যতখানি সম্ভব চাষ করিবার আয়োজন সে ইতিমধ্যেই করিয়া ফেলিয়াছে। যতটুকু হয়—সেটুকুই লাভ। "আষাঢ়ে রোপণ নামকে"—অর্থাৎ আষাঢ় মাসে চাষের উপযুক্ত জল খুব কমই হয় এবং রোয়ার কাজও খুব কম হয়—আষাঢ়ের চাষ নামেই আছে, কাজে হয় না; হইলেও শস্য অপেক্ষা পাতাই হয় বেশী। "শাঙনে রোপণ ধানকে"—শ্রাবণের চাষে শস্য হয় জান এবং সাধারণতঃ শ্রাবণেই উপযুক্ত বৃষ্টি এদেশে হয়। শ্রাবণের চাষই বাস্তব এবং ফলপ্রদ। "ভাদুরে রোপণ শীষকে"—অর্থাৎ শ্রাবণ পর্যন্ত বৃষ্টি না হইয়া ভাদ্রে বৃষ্টি নামিলে, সে বৃষ্টি অনাবৃষ্টির, ফসল হইবার তেমন কথাও নয়, এবং ভাদ্রে রোয়া ধানগাছগুলি ঝাড়ে-গোছে বাড়িবার সময় পায় না।

ফলে—যে কয়েকটা চারা পোঁতা হয়, সেই চারাগুলিতেই একটি করিয়া শীষ হয়।—আর "আশ্বিনে রোপন কিসকে" ? অর্থাৎ—আশ্বিনে চাষ কিসের জন্ম ?...এটা ভাদ্র মাস—এখনও ভাদ্রের পনেরটা দিন অবশিষ্ট ; এখনও ধানের চারা কইতে পারিলে, এক শীষ করিয়া ধান মিলিবে। চাষীদের বীজের ধান চাই, খাইবার ধান চাই।

শ্রীহরি নিষ্ঠুর হইবে না। সে তাহাদের ধান দিবে। সমস্ত মরাই উজাড় করিয়া ধান দিবে। কল্পনা-নেত্রে সে দেখিল—লোকে অবনত মুখে ধান-ঋণের খতে সই করিয়া দিল। মুক্তকণ্ঠে তাহার জয়ধ্বনি ঘোষণা করিয়া তাহারা আরও একখানি অদৃশ্য খত লিখিয়া দিল,—তাহার নিকট আনুগত্যের খত। অকস্মাৎ সে এই বন্যার মধ্যে অমোঘ বিচারের বিধান দেখিতে পাইল। গভীর-ভাবে সে বলিয়া উঠিল—হরি-হরি-হরি। তুমিই সত্য।

ভগবানের প্রতিভূ রাজা, সকল দেবতার অংশে রাজার জন্ম। ভগবানের পৃথিবী, ভগবানের প্রতিভূ রাজা পৃথিবী শাসন করেন। পৃথিবীর ভূমি তাঁহার, সকল সম্পদ তাঁহার। রাজার প্রতিভূ জমিদার। রাজাই জমিদারকে রাজার বিধানই দিয়াছেন—তুমি কর আদায় করিবে, তাহাদের শাসন করিবে। তাঁহারই নিয়মে প্রজা ভূমির জন্ম কর দেয়, রাজার মতই রাজার প্রতিভূকে মান্য করে। সে বিধানকে ইহারা অমান্য করিয়াছিল বলিয়াই এতবড় বন্যার শাস্তি তিনি বিধান করিয়াছেন। এখন তাহার পরীক্ষা। প্রজার বিপদে রাজার কর্তব্য তাহাদিগকে রক্ষা করা। রাজার প্রতিভূ হিসাবে সে কর্তব্য তাহার উপর আসিয়া বর্তিয়াছে। সে যদি সে-কর্তব্য পালন না করে, তবে তিনি তাহাকেও রেহাই দিবেন না। সে তাহাদিগকে ধান দিবে। তাহার কর্তব্য সে অবহেলা করিবে না।

দুই হাত জোড় করিয়া সে ভগবানকে প্রণাম করিল। তিনি তাহার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াছেন। দিতে বাকী রাখিয়াছেন কি ?—জমি, বাগান, পুকুর, বাড়ী ;—শেষ পর্যন্ত তাহার কল্পনাতীত বস্তু জমিদারি—সেই জমিদারিও তিনি তাহাকে দিয়াছেন। গোয়াল-ভরা গরু, খামার-ভরা মরাই, লোহার সিন্দুক-ভরা টাকা, সোনা, নোট—তাহাকে দুহাতে ঢালিয়া দিয়াছেন। তাহার জীবনের সকল

কামনাই তিনি পরিপূর্ণ করিয়াছেন; পাপকামনা পূর্ণ করিয়াও অত্যাশ্চর্যভাবে সেই পাপ-প্রভাব হইতে তিনি তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন। অনিরুদ্ধের সঙ্গে যখন তাহার প্রথম বিরোধ বাধে, তখন হইতেই তাহার কামনা ছিল—অনিরুদ্ধের জমি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে দেশান্তরী করিবে এবং তাহার স্ত্রীকে সে দাসী করিয়া রাখিবে। অনিরুদ্ধের জমি সে পাইয়াছে—অনিরুদ্ধ দেশত্যাগী। অনিরুদ্ধের স্ত্রীও তাহার ঘরে স্বেচ্ছায় আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল! যাক্, সে যে পলাইয়া গিয়াছে—ভালই হইয়াছে, ভগবান তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন।

এইবার দেবু ঘোষকে শায়েস্তা করিতে হইবে। আরও কয়েকজন আছে,—জগন ডাক্তার, হরেন ঘোষাল, তিনকড়ি পাল, সতীশ বাউড়ী, পাতু বায়েন, দুর্গা মুচিনী। তিনকড়ির ব্যবস্থা হইয়াছে। সতীশ, পাতু—ওগুলা পিঁপড়ে, তবে দুর্গাকে ভালমত সাজা দিতে হইবে। জগন, হরেনকে সে বিশেষ গ্রাহ্য করে না। কোন মূল্যই নাই ও দুটার। আর দেবুকে শায়েস্তা করিবার আয়োজনও আগে হইতেই হইয়া আছে। কেবল বন্যার জন্যই হয় নাই, পঞ্চগ্রামের সমাজের পঞ্চায়েত-মণ্ডলীকে এইবার একদিন আহ্বান করিতে হইবে। দেবু অনেকটা খাট হইয়াছে, আরও একটু খাট হউক। দেবু ভিক্ষা হইতে বাড়ীতে আসুক। চণ্ডীমণ্ডপে তাহাকে ডাকিয়া, পঞ্চগ্রামের লোকের সামনে তাহার বিচার হইবে।

কালু শেখ আসিয়া সেলাম করিয়া একখানা চিঠি, গোটাছয়েক প্যাকেট ও একখানা খবরের কাগজ আনিয়া নামাইয়া দিল। কঙ্কণার পোস্টাপিসে এখন শ্রীহরির লোক নিত্য যায় ডাক আনিতে। এটা সে কঙ্কণার বাবুদের দেখিয়া শিখিয়াছে। খবরের কাগজ দেখিয়া, সে চিঠি লিখিয়া ক্যাটালগ আনায়; চিঠি-পত্রের কারবার সামান্যই—উকিল মোক্তারদের নিকট হইতে মামলার খবর আসে। আর আসে একখানা দৈনিক সংবাদপত্র। চিঠিখানায় একটা মামলার দিনের খবর ছিল, সেখানা নামাইয়া দিয়া শ্রীহরি খবরের কাগজটা খুলিয়া বসিল। কাগজটার মোটা মোটা অক্ষরের মাথায় খবরের দিকে চোখ বুলাইতে গিয়া হঠাৎ সে একটা খবর দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। মোটা মোটা অক্ষরে লেখা—"ময়ূরাক্ষী নদীতে প্রবল বন্যা।"...রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সে সংবাদটা পড়িয়া গেল।...

দেবুও অবাক হইয়া গেল।

সে অনেকটা সুস্থ হইয়াছে, তবে শরীর এখনও দুর্বল। এবার হাসপাতালের ডাক্তারের চিকিৎসায়, জগন ডাক্তারের তদ্বিরে এবং স্বর্ণের শুশ্রূষায়—সে সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। গতকল্য সে অন্নপথ্য করিয়াছে। আজ সে বিছানার উপর ঠেস দিয়া বসিয়া ছিল। সে ভাবিতেছিল নিজের কথা। একেবারে গেলেই ভাল হইত। আর সে পারিতেছে না। রোগশয্যায় দুর্বল ক্লান্ত শরীরে শুইয়া তাহার মনে হইতেছিল—পৃথিবীর আনন্দ-স্বর্ণ সব ফুরাইয়া গিয়াছে। কেন? কিসের জন্য তাহার বাঁচিয়া থাকা? ইহার কথা মনে হইলেই তাহার মনে পড়িতেছে তাহার নিজের ঘর। রিক্ত, জনহীন ধূলায় আচ্ছন্ন ঘর!...তিনকড়ির ছেলে গৌর হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঘরে প্রবেশ করিল—পণ্ডিত-দাদা!

—গৌর? দেবু বিস্মিত হইল—কি গৌর? ইস্কুল থেকে ফিরে এলে?

গৌর জংশনের ইস্কুলে পড়ে, এখন ইস্কুলের ছুটির সময় নয়। গৌর একখানা খবরের কাগজ তাহার সামনে ধরিয়া বলিল—এই দেখুন!

—কি?...বলিয়াই সে সংবাদটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। "ময়ূরাক্ষী নদীতে ভীষণ বন্যা"। সংবাদপত্রের নিজস্ব সংবাদদাতা কেহ লিখিয়াছে। বন্যার ভীষণতা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছে, "শিবকালীপুরের দেশপ্রাণ তরুণ কর্মী দেবনাথ ঘোষ বন্যার গতিরোধের জন্য বিপুল চেষ্টা করিয়াছিলেন—কিন্তু কোন ফল হয় নাই। উপরন্তু তিনি বন্যাস্রোতে ভাসিয়া যান। বহু কষ্টে তাঁহার প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে।" ইহার পরেই স্থানীয় ক্ষতির উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছে—"এখানকার অধিবাসীরা আজ সম্পূর্ণ রিক্ত ও গৃহহীন। শতকরা আটখানি বাড়ী ধসিয়া পড়িয়াছে, সমস্ত খাদ্য শস্য বন্যার প্লাবনে ভাসিয়া গিয়াছে, সাংসারিক সকল সম্বল নিশ্চিহ্ন, ভবিষ্যতের আশা কৃষিক্ষেত্রের খাদ্যসম্পদ বন্যায় পচিয়া গিয়াছে; অনেকের গরুবাছুরও ভাসিয়া গিয়াছে। এই শেষ নয়, সঙ্গে সঙ্গে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের চিরসঙ্গী মহামারীরও আশঙ্কা করা যাইতেছে। ইহাদের জন্য বর্তমানে খাদ্য চাই, ভবিষ্যতে বাঁচিবার জন্য বীজ-ধান চাই, মহামারী হইতে রক্ষার জন্য প্রতি-

সেবক ব্যবস্থা চাই ; নতুবা দেশের এই অংশ শ্মশানে পরিণত হইবে। এই বিপন্ন নরনারীগণকে রক্ষার দায়িত্ব দেশবাসীর উপর ন্যস্ত ; সেই দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে সকলকে আহ্বান জানাইতেছি। এই স্থানে অধিবাসীগণের সাহায্য-কল্পে একটি স্থানীয় সাহায্য সমিতি গঠিত হইয়াছে। ঐ অঞ্চলের একনিষ্ঠ সেবক—উপরোক্ত শ্রীদেবনাথ ঘোষ সম্পাদক হিসাবে সমিতির ভার গ্রহণ করিয়াছেন। দেশবাসীর যথাসাধ্য সাহায্য—বিধাতার আশীর্বাদের মতই গৃহীত হইবে।"

দেবু অবাক হইয়া গেল! এ কি ব্যাপার? খবরের কাগজে এ সব কে লিখিল? দেশপ্রাণ—দেশের একনিষ্ঠ সেবক! দেশময় লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে এ বার্তা কে ঘোষণা করিয়া দিল?—খবরের কাগজটা একপাশে সরাইয়া, সে খোলা জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া চিন্তামগ্ন হইয়া রহিল।

গৌর কাগজখানা লইয়া সকলকে পড়িয়া শুনাইল। যে শুনিল সেই অবাক হইল। দেশের গেজেট দেবু পণ্ডিতের নামে জয়জয়কার করিয়াছে—ইহাতে তাহারা খুশী হইল। শ্রীহরি দেবুকে পতিত করিবার আয়োজন করিতেছে, দায়ে পড়িয়া শ্রীহরির মতেই তাহাদিগকে মত দিতে হইবে, তবুও তাহারা খুশী হইল। বার বার নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিল—হ্যাঁ, তা বটে। ঠিক কথাই লিখেছে। এর মধ্যে মিথ্যা কিছু নাই। দশের দুঃখে দুঃখী, দশের সুখে সুখী—দেবু তো আমাদের স্বদেশী।

তিনকড়ি আস্ফালন করিয়া নির্মম রূঢ় ভাবে তাহাদিগকে গালাগালি দিল—থাম্ থাম্ দুমুখো সাপের দল, থাম্ তোরা। নেড়ী কুত্তার যখন যার কাছে যখন খাবে—তারই পা চাটবে আর ল্যাজ নাড়বে। দেবুর প্রশংসা করবার তোরা কে? যা ছিরে পালের কাছে যা, দল পাকিয়ে পতিত করগে দেবুকে। যা বেটারা, বল গিয়ে তোদের ছিরেকে—গেজেটে কি লিখেছে দেবুর নামে।

তিনকড়ির গালিগালাজ লোকে চুপ করিয়া শুনিল—মাথা পাতিয়া লইল। একজন শুধু বলিল—মোড়ল, পেট হয়েছে দুশমন—কি করব বল? তুমি যা বলছ তা ঠিক বটে!

—পেট আমার নাই? আমার ইস্তিরি-পুত্তুর-কন্যে নাই?

এ কথার উত্তর তাহারা দিতে পারিল না। তিনকড়ি পেট-দুশমনকে জয় করে

না, তাহাকে সে জয় করিয়াছে—এ কথা তাহারা স্বীকার করে ; এজন্য তাহাকে তাহারা প্রশংসা করে। আবার সময়বিশেষে—নিজেদের অক্ষমতার লজ্জা ঢাকিতে তিনকড়ির এই যুদ্ধকে বাস্তববোধহীনতা বলিয়া নিন্দা করিয়া আত্মগ্লানি হইতে বাঁচিতে চায়। কতবার মনে করে—তাহারাও তিনকড়ির মত পেটের কাছে মাথা নিচু করিবে না। অনেক চেষ্টাও করে ; কিন্তু পেট-দুশমনের নাগপাশের এমনি বন্ধন যে, অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার পেষণে এবং বিষ-নিঃশ্বাসে জর্জরিত হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িতে হয়। তাই আর সাহস হয় না।

বাপ, পিতামহ, তাহাদেরও পূর্বপুরুষ এই তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে সন্তান-সন্ততিকে বার বার সাবধান করিয়া দিয়া গিয়াছে—"—পাথরের চেয়ে মাথা শক্ত নয়, মাথা ঠুকিয়ো না।" পেটের চেয়ে বড় কিছু নাই, অনাহারের যাতনার চেয়ে অধিকতর যাতনা কিছু নাই, উদরের অন্নকে বিপন্ন করিয়ো না—তাহাদের শিরায় শিরায় প্রবহমান। শ্রীহরির ঘরেই যে তাহাদের পেটের অন্ন,—কেমন করিয়া তাহারা শ্রীহরিকে অমান্য করিবে? তবুও মধ্যে মধ্যে তাহারা লড়াই করিতে চায়! বুকের ভিতর কোথায় আছে আর একটা গোপন ইচ্ছা—অন্তরতম বাসনা, সে মধ্যে মধ্যে মাথা ঠেলিয়া উঠিয়া বলে—না আর নয়, এর চেয়ে মৃত্যুই ভাল!

এবার ধর্মঘটের সময়—সেই ইচ্ছা একবার জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই তাহারা ভাঙিয়া পড়িয়াছে। যেটুকু সময় দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিত, পারিবার কথা—তাহার চেয়েও অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা ভাঙিয়া পড়িয়াছে। কেমন করিয়া কোথা দিয়া শেখেদের সঙ্গে দাঙ্গা বাধিবার উপক্রম হইল, সদর হইতে আসিল সরকারী ফৌজ। পুরুষানুক্রমে সঞ্চয়-করা ভয়ে তাহারা বিহ্বল হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীহরি দেখাইল দানার লোভ। আর তাহারা থাকিতে পারিল না। থাকিয়াই বা কি হইত? কি করিত? এই বন্যার পর যে শ্রীহরি ভিন্ন তাহাদের বাঁচিবার উপায় নাই। কি করিবে তাহারা? শ্রীহরির কথায় সাদাকে কালো—কালোকে সাদা না বলিয়া তাহাদের উপায় কি? পেট-দুশমনের ভার কেহ নাও, পেট পুরিয়া খাইতে পাইবার ব্যবস্থা কর,—দেখ তাহারা কি না পারে!

তিনকড়ির গালিগালাজের আর শেষ হয় না।—ভীতু শেয়াল, গোঁতা গরু, বোকা ভেড়া, পেটে ছোরা মার্ গিয়ে। মরে যা তোরা! মরে যা! ঢোঁড়া সাপ—এক ফোঁটা বিষ নেই! মরে যা তোরা, মরে যা!

দেখুড়িয়ার অধিবাসী তিনকড়ির এক জ্ঞাতি-ভাই হাসিয়া বলিল—মরে গেলে তো ভালই হয় ভাই তিনু। কিন্তু মরণ হোক বললেই তো হয় না—আর নিজেও মরতে পারি না! তেজের কথা—বিষের কথা বলছিস? তেজ, বিষ কি শুধুই থাকে রে ভাই! বিষয় না থাকলে বিষও থাকে না, তেজও থাকে না!

তিনকড়ি মুখ খিঁচিয়া উঠিল—বিষয়! আমার বিষয় কী আছে? কত আছে? বিষয়—টাকা—!

সে বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ, তিনুদাদা বিষয়—টাকা। তেজ-বিষ আমাদেরও একদিন ছিল। মনে আছে—তুমি আর আমি কঙ্কণার নিতাইবাবুকে ঠেঙিয়েছিলাম? রাত্রে আসত—ঐ তো গোবিন্দের বোনের বাড়ী! তাকে আমিই তোমাকে ডেকে-ছিলাম। আগে ছিলাম আমি। নিতাইবাবু মার খেয়ে ছ'মাস ভুগে শেষটা মরেই গেল—মনে আছে? সে করেছিলাম গাঁয়ের ইজ্জতের লেগে। তখন তেজ ছিল—বিষ ছিল। তখন আমাদের জমজমাট সংসার। বাবার পঞ্চাশ বিঘে জমির চাষ, তিনখানা হাল। বাড়ীতে আমরা পাঁচ ভাই—পাঁচটা মুনিষ, তখন তেজ ছিল—বিষ ছিল। তারপর পাঁচ ভাইয়ে ভিন্ন হলাম, জমি পেলাম দশ বিঘে, পাঁচটা ছেলে মেয়ে, নিজেই বা কি খাই—ছেলেমেয়েদিগের মুখেই বা কি দিই? শ্রীহরি ঘোষের দোরে হাত না পেতে করি কি বল? আর তেজ, বিষ থাকে?

আবার একটু হাসিয়া বলিল—তুমি বলবে—তোমারই বা কি ছিল? ছিল কিনা—তুমিই বল? আর জমিও তোমার আমাদের চেয়ে অনেক ভাল ছিল। তোমার তেজ-বিষ মরে নাই, আছে? তাও তো তেজের দণ্ড অনেক দিলে গো। সবই তো গেল। রাগ করো না, সত্যি কথা বলছি। ঠিক আগেকার তেজ কি তোমারই আছে?

তিনকড়ি এবার শান্ত হইল। কথাটা নেহাত মিথ্যা বলে নাই। আগেকার তেজ কি তাহারই আছে? আজকাল সে চিৎকার করিলে লোকে হাসে। আর

ওই ছিরে—ছিরের আগে চিৎকার করিলে লোকে—সকলেই তো তাহার উত্তর করিত—সামনা সামনি দাঁড়াইত। কিন্তু আজ ছিরে শ্রীহরি হইয়াছে। তাহার তেজের সম্মুখে মানুষ—আগুনের সামনে কুটার মত কাঁপে; কুটা কাঁচা হইলে শুকাইয়া যায়, শুকনা হইলে জ্বলিয়া উঠে।

লোকটি এবার বলিল—তিনু-দাদা, শুনলাম নাকি গেজেটে লিখেছে—দেবুর কাছে টাকা আসবে—সেইসব টাকা-কাপড় বিলি হবে?

তিনকড়ি এটা বুঝিয়া দেখে নাই। সে এতক্ষণ আস্ফালন করিতেছিল—গেজেটে শ্রীহরিকে বাদ দিয়া কেবল দেবুর নাম প্রকাশিত হইয়াছে—এই গৌরবে। সে যে-কথাটা শ্রীহরিকে বার বার বলে—সেই কথাটা গেজেটেও বলিয়াছে—সেই জন্য। সে বলে—তুই সদ্‌গোপ আছিস্ আপনার ঘরে আছিস, তার জন্যে তোকে খাতির করব কেন? খাতির করব তাকেই যে খাতিরের লোক। স্বর্ণ পাঠ্য-পুস্তক হইতে কয়েকটা লাইন পর্যন্ত সে মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে—

"আপনারে বড় বলে বড় সেই নয়,
লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।
বড় হওয়া সংসারেতে কঠিন ব্যাপার,
সংসারে সে বড় হয় বড় গুণ যার।"

ধনী শ্রীহরিকে বাদ দিয়া গেজেট শুধু দেবুর জয়-জয়কার ঘোষণা করিয়াছে—সেই আনন্দেই সে আস্ফালন করিতেছিল। হঠাৎ এই কথাটা শুনিয়া তাহারও মনে হইল, হাঁ, গেজেট তো লিখিয়াছে। যে যাহা সাহায্য করিবেন, বিধাতার আশীর্বাদের মতই তাহা সফল হইবে।

তিনকড়ি বলিল—আসবে না? নিশ্চয় আসবে। নইলে গেজেটে লিখবে কেন?...তিনকড়ির সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। সে ওই কথাটা প্রচার করিবার জন্য তখনই অন্য পাড়ায় চলিয়া গেল। রামা, ও রামা! জেনো! গোবিন্দে! ছিদেম! কোথা রে সব?

দেবু তখনও ভাবিতেছিল। এ কে করিল? বিশু-ভাই নয় তো? কিন্তু বিশু বিদেশে থাকিয়া এ সব জানিবে কেমন করিয়া? ঠাকুর-মহাশয় লিখিয়া

জানাইলেন? হয়তো তাই! তাই সম্ভব। কিন্তু এ কী করিল বিশু-ভাই? এ বোঝা আর সহিতে পারিবে না! সে মুক্তি চায়। জীবন তাহার হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। ক্লান্তি, অরুচি, তিক্ততায় তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছে। আর দুই-তিনটা দিন গেলেই সে তিনকড়ি-কাকার বাড়ী হইতে চলিয়া যাইবে! তিনকড়ির ঋণ তাহার জীবনে শোধ হইবার কথা নয়। রাম ভল্লা তাহাকে বন্যার স্রোত হইতে টানিয়া তুলিয়াছে। কুসুমপুরের ও-মাথা হইতে তিনখানা গ্রাম পার হইয়া দেখুড়িয়ার ধার পর্যন্ত সে ভাসিয়া আসিয়াছিল। তাহার পর হইতে তিনকড়ি তাহাকে নিজের ঘরে আনিয়া গোষ্ঠীসুদ্ধ মিলিয়া যে সেবাটা করিয়াছে তাহার তুলনা হয় না। তিনকড়ির স্ত্রী ও স্বর্ণ, নিজের মা বোনের মত সেবা করিয়াছে; গৌরও সেবা করিয়াছে সহোদর ভাইয়ের মত। তিনকড়ি তাহাকে আপনার খুড়ার মত যত্ন করিয়াছে। কিন্তু এও তাহার সহ্য হইতেছে না, কোন রকমে আপনার পা-দুইটার উপর সোজা হইয়া দাঁড়াইবার বল পাইলেই সে চলিয়া যাইবে। এই অকৃত্রিম স্নেহের সেবাযত্ন তাহাকে অবরুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। এও তাহার ভাল লাগিতেছে না। খোলা জানালা দিয়া দেখা যাইতেছে লোকের ভাঙা ঘর, বন্যার জলে পচিয়া-যাওয়া শাক-পাতার ক্ষেত, পথের দু'ধারে পলি-লিপ্ত ঝোপ-ঝাড়, গাছপালা, গ্রাম্য পথখানি যেখানে গ্রাম হইতে বাহির হইয়া মাঠে পড়িয়াছে সেইখান দিয়া পঞ্চগ্রামের মাঠের লম্বা একটা ফালি অংশ কাদায় জলে ভরা—শস্যহীন মাঠ। কিন্তু এসবের কোন প্রতিকম্পন তাহার চিত্তের মধ্যে চাঞ্চল্য তুলিতেছে না। সে আর পারিতেছে না। সে আর পারিবে না।

—দেবু-দা! গৌর আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহার হাতে সেই কাগজখানা। দেবু তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—বল!

—এটা কেন লিখেছে দেবু-দা? এই যে—?

—কি?

—এই যে, এইখানটা। খবরের কাগজটা দেবুর বিছানার উপর রাখিয়া গৌর বলিল—এই যে।

দেবু হাসিয়া বলিল—কি কঠিন যে বুঝতে পারলে না? কই দেখি।

গৌর অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—আমি না। আমিও তো বললাম—ও আবার কঠিন কি ? স্বর্ণ বলছে।

—কোন্ জায়গাটা ?

—এই যে "এই সমস্ত বিপন্ন নরনারীকে রক্ষার দায়িত্ব দেশবাসীর উপর ন্যস্ত। সে দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে সকলকে আহ্বান জানাইতেছি।" তা স্বর্ণ বলছে,—ওই যে স্বর্ণ দাঁড়িয়ে আছে। আয় না স্বর্ণ, আয় না এখানে !

দেবুও সস্নেহে আহ্বান করিল—এস স্বর্ণ, এস !

স্বর্ণ আসিয়া কাছে দাঁড়াইল।

দেবু বলিল—এর মানে তো কিছু কঠিন নয়।

স্বর্ণ মৃদুস্বরে বলিল—দায়িত্ব লিখেছে কেন তাই শুধোলাম দাদাকে। এ তো লোকের কাছে ভিক্ষা চাওয়া। যার দয়া হবে দেবে—না হয় দেবে না। সে তো দায়িত্ব নয়।

কথাগুলি দেবুর বুকের ভিতরে গিয়া অদ্ভুতভাবে আঘাত করিল।...তাই তো !

স্বর্ণ বলিল—আর আমাদের এখানে বান হয়েছে, তাতে অন্য জায়গার লোকের দায়িত্ব হতে যাবে কেন ?

দেবু অবাক হইয়া গেল। সে বুদ্ধিমতী মেয়েটির অর্থ-বোধের সূক্ষ্ম তারতম্য-জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দেবুর সে দৃষ্টি দেখিয়া স্বর্ণ কিন্তু একটু অপ্রতিভ হইল। বলিল—আমি বুঝতে পারি নাই...সে লজ্জিত হইয়াই চলিয়া গেল।...দেবু তখনও অবাক হইয়া ভাবিতেছিল, এ কথাটা তো সে ভাবিয়া দেখে নাই। সত্যই তো—নাম-না-জানা এই গ্রাম কয়খানির দুঃখ-দুর্দশার জন্য দেশ-দেশান্তরের মানুষের দয়া হইতে পারে, কিন্তু দায়িত্ব তাহাদের কিসের ? দায়িত্ব ! ওই কথাটা গুরুত্বে ও ব্যাপ্তিতে তাহার অনুভূতির চেতনায় ক্রমশ বিপুল হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার এই পঞ্চগ্রামও পরিধিতে বাড়িয়া বিরাট হইয়া উঠিল।

সে ডাকিল—স্বর্ণ !

গৌর বসিয়া তখনও ওই লাইন কয়টি পড়িতেছিল। তাহার মনেও কথাটা

আসিয়াছে। সে বলিল—ঘর চলে গিয়েছে তো!

—ও। আচ্ছা, ডাক তো তাকে একবার।

ডাকিতে হইল না, স্বর্ণ নিজেই আসিল। গরম দুধের বাটি ও জলের গেলাস হাতে করিয়া আসিয়া, বাটিটা নামাইয়া দিয়া বলিল—খান্!

দেবু বলিল—তুমি ঠিক ধরেছ স্বর্ণ। তোমার ভুল হয় নাই। তোমার বুদ্ধি দেখে আমি খুশী হয়েছি।

স্বর্ণ লজ্জিত হইয়া এবার মুখ নামাইল।

দেবু বলিল—তুমি রবীন্দ্রনাথের 'নগরলক্ষ্মী' কবিতাটি পড়েছ?

"দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তিপুরে যবে
জাগিয়া উঠিল হাহারবে,—
বুদ্ধ নিজ ভক্তগণে শুধালেন জনে জনে
'ক্ষুধিতেরে অন্নদান-সেবা
তোমরা লইবে বলো কেবা'?"

—পড়েছ?

স্বর্ণ বলিল—না।

—গৌর, তুমি পড়নি?

—না।

—শোন তবে।

স্বর্ণ বাধা দিয়া বলিল—আগে আপনি দুধটা খেয়ে নিন। জুড়িয়ে যাবে।

দুধ খাইয়া, মুখে জল দিয়া দেবু গোটা কবিতাটা আবৃত্তি করিয়া গেল।

স্বর্ণ বলিল—আমাকে লিখে দেবেন কবিতাটি?

দেবু বলিল—তোমাকে এই বই একখানা প্রাইজ দেব আমি!

স্বর্ণের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

—পণ্ডিত মশায় আছেন? কে বাহির হইতে ডাকিল।

গৌর মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া বলিল—ডাক-পিওন।

দেবু বলিল—এস। চিঠি আছে বুঝি?

—চিঠি—মনি-অর্ডার।

— মনি-অর্ডার!

—পঞ্চাশ টাকা পাঠাচ্ছেন বিশ্বনাথবাবু।

বিশ্বনাথ চিঠিও লিখিয়াছে। তাহা হইলে এ সমস্ত বিশ্বনাথই করিয়াছে। লিখিয়াছে—দাদুর পত্রে সব জানিয়াছি, পঞ্চাশ টাকা পাঠাইলাম, আরও টাকা সংগ্রহ করিতেছি। তোমার কাছে অনেক মনি-অর্ডার যাইবে, আমরাও কয়েক-জন শীঘ্র যাইব। কাজ আরম্ভ করিয়া দাও।

টাকাটা লইয়া দেবু চিন্তিত হইয়া পড়িল। বিশ্বনাথ লিখিয়াছে—"কাজ আরম্ভ করিয়া দাও।" পঞ্চাশ টাকায় সে কী কাজ করিবে? গৌরকে প্রশ্ন করিল—কাক কোথায় গেলেন দেখ তো গৌর!

"দশে মিলি করি কাজ—হারি জিতি নাহি লাজ।"

দেবু অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া দশজনের পরামর্শ লইয়াই কাজ করিল। এই কাজে আজ সে একটি পুরানো মানুষের মধ্যে এক নূতন মানুষকে আবিষ্কার করিল। খুব বেশী না হইলেও, তবু সে খানিকটা আশ্চর্য হইল। তিনু-কাকার ছেলে গৌর। গৌর সুস্থ সবল ছেলে, কিন্তু শান্ত ও বোকা। বুদ্ধি সত্যই তাহার কম। সেই গৌরের মধ্যে এক অপূর্ব গুণ সে আবিষ্কার করিল। সে স্কুলে পড়ে, স্কুলের ছাত্রদের দেবু ভাল করিয়াই জানে। নিজেও সে উৎসাহী ছাত্র ছিল, এবং পাঠশালার পণ্ডিতি করিয়া, গৌরের অপেক্ষা কমবয়সী হইলেও—অনেক ছেলে লইয়া কারবার করিয়াছে। এক ধারার ছেলে আছে যাহারা পড়ায় ভাল কাজ-কর্মেও উৎসাহী; আর একধারার ছেলে আছে যাহারা পড়ায় ভাল নয় অথচ দুর্দান্ত, কাজ-কর্মে প্রচণ্ড উৎসাহ। এ দুয়ের মাঝামাঝি ছেলেও আছে যাহাদের একটা আছে আর একটা নাই। আবার দুইটাতেই পিছনে পড়িয়া থাকে, কচ্ছপের মত যাহাদের জীবনের গতি এমন ছেলেও আছে। গৌর ওই শেষের ধরনের ছেলে বলিয়াই তাহার ধারণা ছিল। কিন্তু আজ সে নিজের অদ্ভুত পরিচয় দিল! এ পরিচয় অবশ্য তাহার পক্ষে স্বাভাবিক; সে তিনকড়ির ছেলে। দশে

মিলিয়া কাজ করার আয়োজনটায় সে একা যেন দশজনের শক্তি লইয়া আত্মপ্রকাশ করিল।

তিনকড়ি বলিয়াছিল আমাদের গাঁয়ের লোক যারা, তা'দিগেই দু-চার টাকা ক'রে দিয়ে আরম্ভ কর।

দেবু বলিল—দেখুন, পাঁচজনাকে ডেকে যা হয় করা যাক। নইলে শেষে কে কি বলবে।

তিনকড়ি বলিল—বলবে কচু। বলবে আবার কে কি? কোন্ বেটার ধার ধারি আমরা? কারো বাবার টাকা? আর ডাকবেই বা কাকে?

দেবু হাসিল; তিনু-কাকার কথাবার্তা সে ভাল করিয়াই জানে। হাসিয়া বলিল—আমি বলছি জগন ডাক্তার, হরেন, ইরসাদ, রহম, এই জনকয়েককে।

—রহম? না রহমকে ডাকতে পাবে না। যে লোক দল ভেঙে জমিদারের সঙ্গে গিয়ে জুটেছে তাকে ডাকতে হবে না।

—না তিনু-কাকা, আপনি ভেবে দেখুন। মানুষের ভুল-চুক হয়। আর তা ছাড়া মানুষকে টেনে আপনার করে নিলেই মানুষ আপনার হয়, আবার ঠেলে ফেলে দিলেই পর হয়ে যায়।

তিনকড়ি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। কথাটা তাহার মনঃপূত হইল না।

দেবু বলিল—কাকে তা হলে পাঠাই বলুন দেখি? রামকে একবার পাওয়া যাবে না?

গৌর বসিয়া ছিল, সে উঠিয়া কাছে আসিয়া বলিল—আমি যাব দেবুদা।

—তুমি যাবে?

—হ্যাঁ। বাবা তো আছে ওজা। রহমকে ডাকতে গেলে কেউ যদি কিছু মনে করে?

তিনকড়ি গর্জিয়া উঠিল—মনে করবে? কে কি মনে করবে? কোন শালাকে খাবার নেমন্তন্ন করছি যে মনে করবে?...তাহার মনের চাপা-দেওয়া অসন্তোষটা একটা ছুতা পাইয়া ফাটিয়া পড়িল।

গৌর অপ্রস্তুত হইয়া গেল। দেবু বলিল—না—না। গৌর ঠিকই বলেছে তিনু-কাকা।

—ঠিক বলেছে—যাক, মরুক।...বলিয়াই সে উঠিয়া চলিয়া গেল।

দেবু চুপ করিয়া রহিল। বাপের অমতে ছেলেকে যাইতে বলিতে দ্বিধা হইল তাহার।

গৌর বলিল—দেবু-দা! আমি যাই?

—যাবে? কিন্তু তিনু-কাকা—

—বাবা তো যেতে বললে।

—না, যেতে বললেন কই? রাগ করে উঠে গেলেন তো।

স্বর্ণ ঘরে ঢুকিল, সে হাসিয়া বলিল—না, বাবা ওই ভাবেই কথা বলেন। মরগে যা, খাগে যা—এসব বাবার কথার কথা।

গৌর হাসিয়া বলিল—বলে না কেবল স্বর্ণকে।...

গৌর ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল—সকলকেই খবর দেওয়া হইয়াছে। বুদ্ধি খরচ করিয়া সে বৃদ্ধ দ্বারিকা চৌধুরীকেও খবর দিয়া আসিয়াছে। দেবু খুশি হইয়া বলিল—বেশ করেছ। বৃদ্ধ চৌধুরী পাকা লোক, অথচ তাহার কথাটাই দেবুর মনে হয় নাই। গৌর বলিল—মহাগ্রামের ঠাকুরমশায়কেও খবর দিয়ে এসেছি দেবু-দা।

দেবু সবিস্ময়ে বলিল—সে কি! তাঁকে কি আসতে বলতে আছে? এ তুমি করলে কি? কি বললে তুমি তাঁকে?

গৌর বলিল—তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নাই। ওঁদের বাড়িতে বললাম—আমাদের বাড়িতে মিটিং হবে আজ। বানের মিটিং। তাই বলতে এসেছি।

স্বর্ণ হাসিয়া সারা হইয়া গেল—বানের আবার মিটিং হল?

অপরাহ্নে সকলেই আসিয়া হাজির হইল। জগন, হরেন, ইরসাদ, রহম এবং তাহাদের সঙ্গে আরও অনেক। সতীশ ও পাতু আসিয়াছে; দুর্গাও আসিয়াছে। সে নিত্যই আসে। তাহারই হাতে দেবুর বাড়ীর চাবি। সে-ই ঘর দুয়ার পরিষ্কার করে, দেখে শুনে। বৃদ্ধ দ্বারিকা চৌধুরীও আসিয়াছেন। বৃদ্ধ হাঁটিয়া আসিতে পারে নাই, গরুর গাড়ী জুড়িয়া আসিয়াছে; মুশকিল হইয়াছে—তিনকড়ি নাই।

সে যে সেই বাহির হইয়াছে, এখনও ফেরে নাই।

বৃদ্ধ বলিল—বাবা-দেবু, খোঁজ তো দু'বেলাই নি। নিজে আসতে পারি নাই।...কথার মাঝখানে হাসিয়া বলিল—অন্য দিকে টানছে কিনা; এদিকে তাই পা বাড়াতে পারি না। তা তোমার তলব পেয়ে এ-দিক্‌কার টানটা বাড়ল, হাঁটতে পারলাম না—গরুর গাড়ী করেই এলাম।

দেবু বলিল—আমার শরীর দেখছেন, নইলে—

—হ্যাঁ, সে আমি জানি বাবা! তবে কাজটা একটু তাড়াতাড়ি সেরে নাও।

—এই যে কাজ সামান্যই। তিনকড়ি-কাকার জন্যে—; তা হোক আমরা বরং আরম্ভ করি ততক্ষণ।

সমস্ত জানাইয়া—কাগজ ও মনি-অর্ডারের কুপন দেখাইয়া টাকাটা সকলের সামনে রাখিয়া দেবু বলিল—বলুন, এখন কি করব?

জগন বলিল—গরীবদের খেতে দাও। যাদের কিছু নাই তাদের দাও।

হরেন বলিল—আই সাপোর্ট ইট।

দেবু বলিল—চৌধুরী মশায়?

চৌধুরী বলিল—কথা তো ডাক্তার ভালই বলেছেন। তবে আমি বলছিলাম—চাষের এখন পনের-বিশ দিন সময় আছে। টাকাটায় বীজধান কিনে দিতে পারলে—

রহম ও ইরসাদ একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—এ খুব ভাল বুদ্ধি।

জগন বলিল—গরীবগুলো শুকিয়ে মরবে যে?

দেবু বলিল—পঞ্চাশ টাকাতে তাদের ক'দিন বাঁচাবে?

—এর পরেও টাকা আসবে!

—সেই টাকা থেকে দেবে তখন!

গৌর দেবুর কানের কাছে আসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল—দেবুদা, আমরা সব ছেলেরা মিলে—যে-সব গাঁয়ে বান হয় নাই—সেই সব গাঁ থেকে যদি ভিক্ষে করে আনি!

গৌরের বুদ্ধিতে দেবু বিস্মিত হইয়া গেল।

ঠিক এই সময়েই প্রশান্ত কণ্ঠস্বরে বাহির হইতে ডাক আসিল—পণ্ডিত রয়েছেন?

ন্যায়রত্ন মহাশয়। সকলে ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। ন্যায়রত্ন ভিতরে আসিয়া, একটু কুণ্ঠার হাসি হাসিয়া বলিলেন—আমার আসতে একটু বিলম্ব হয়ে গেল।

দেবু তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—আমাকে মার্জনা করতে হবে! আমি আপনাকে খবর দিতে বলিনি। তিনকড়ি-কাকার ছেলে গৌর নিজে একটু বুদ্ধি খরচ করতে গিয়ে এই কাণ্ড করে বসেছে।

—তিনকড়ির ছেলেকে আমি আশীর্বাদ করছি। তোমরা দশের সেবার পুণ্যার্জনের যজ্ঞ আরম্ভ করেছ; সে-যজ্ঞভাগ দিতে তোমার আহ্বান জানিয়ে এসে সে ভালই করেছে।

গৌর ঢিপ করিয়া তাঁহার পায়ে প্রণত হইল।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—কই, তিনকড়ির কন্যাটি কই? বড় ভাল মেয়ে। আমার একটু জল চাই। পা ধুতে হবে।

স্বর্ণ তাড়াতাড়ি জলের বালতি ও ঘটি হাতে বাহির হইয়া আসিয়া প্রণাম করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—আমি ধুয়ে দিচ্ছি চরণ।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—আমি কিছু সাহায্য এনেছি পণ্ডিত। চাদরের খুঁট খুলিয়া তিনি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন।

সমস্ত কথাবার্তা শুনিয়া তিনিও বলিলেন—প্রথমে বীজ-ধান দেওয়াই উচিত। বীজের জন্য ধানও আমি কিছু সাহায্য করব পণ্ডিত।

সকলে উঠিলে দুর্গা বলিল—কবে বাড়ী যাবে জামাই-পণ্ডিত? আমি আর পারছি না। তোমার বাড়ীর চাবি তুমি নাও।

দেবু বলিল—কাল কিংবা পরশুই যাব দুর্গা। দু'দিন রাখ চাবিটা!

দুর্গা কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছিল। বলিল—বিলু-দিদির ঘর, বিলু-দিদি নাই, খোকন নাই—যেতে আমার মন হয় না। তার ওপর তুমি নাই। বাড়ী যেন হাঁ হাঁ করে গিলতে আসছে।

এমনই সময়ে তিনকড়ি ফিরিল; পিঠে ঝুলাইয়া আনিয়াছে প্রকাণ্ড এক কাতলা মাছ। প্রায় আধমণ ওজন হবে। আঠারো সেরের কম তো কোনমতেই নয়।

দাওয়ায় করিয়া মাছটা ফেলিয়া বলিল—বাপরে, মাছটার পেছু পেছু প্রায় এক কোশ হেঁটেছি। যেয়ো না হে, যেয়ো না, দাঁড়াও; মাছটা কাটি, খানকতক করে সব নিয়ে যাবে। ডাক্তার, ইরসাদ, রহম! দাঁড়াও ভাই; দাঁড়াও একটুকুন!

উনিশ

পনের দিনের মধ্যেই এ অঞ্চলে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গেল! দুইটা ঘটনা ঘটিয়া গেল। শ্রীহরি ঘোষ পঞ্চায়েত ডাকিয়া দেবুকে পতিত করিল। অন্যদিকে বন্যা-সাহায্য সমিতি বেশ একটি চেহারা লইয়া গড়িয়া উঠিল। সাহায্য-সমিতির জন্যই অঞ্চলটায় বেশী সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ঠাকুর মহাশয়ের নাতি বিশ্বনাথবাবু নাকি গেজেটে বানের খবর ছাপাইয়া দিয়াছেন। কলিকাতা, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি বড় বড় শহর হইতে টাকা তুলিতেছেন; শুধু শহর নয়, অনেক পল্লী-গ্রাম হইতেও লোক টাকা পাঠাইতেছে। প্রায় নিত্যই দেবু পণ্ডিতের নামে কত নাম-না-জানা গ্রাম হইতে পাঁচ টাকা দশ টাকার মনি-অর্ডার আসিতেছে। পনের-কুড়ি দিনের মধ্যেই প্রায় পাঁচশো টাকা দেবুর হাতে আসিয়াছে। যাহাদের ঘর ভাঙিয়াছে, তাহাদের ঘরের জন্য সাহায্য দেওয়া হইবে। বীজধান ইতিমধ্যেই দেওয়া হইয়া গিয়াছে। মাঠে 'আছাড়ো'র বীজ চারা হইতে যে যেমন পারিয়াছে—সে তেমন জমি আবাদ করিতেছে।

ভাদ্রের সংক্রান্তি চলিয়া গেল; আজ আশ্বিনের পয়লা। "আশ্বিনের রোপণ কিসকে?" অর্থাৎ কিসের জন্য। তবু লোকে এখনও রোয়ার কাজ চালাইতেছে। মাসের প্রথম পাঁচটা দিন পূর্বমাসের সামিল বলিয়াই ধরা হয়। তাহার উপর এবার ভাদ্র মাসের একটা দিন কমিয়া গিয়াছে—উনত্রিশ দিনে মাস ছিল। তবে বিপদ হইয়াছে—লোকের ঘরে খাবার নাই, তাহার উপর আরম্ভ হইয়াছে কম্প দিয়া জ্বর—ম্যালেরিয়া। ভাগ্য তবু ভাল বলিতে হইবে যে কলেরা হয় নাই। ঘরে ঘরে শিউলি পাতার রস খাওয়ার এক নূতন কাজ বাড়িয়াছে। ভাদ্রের শেষে শিউলি গাছগুলা নূতন পাতায় ভরিয়া উঠে, ফুল দেখা দেয়; এবার গাছের পাতা নিঃশেষ হইয়া গেল—এ বৎসর গাছগুলায় ফুল হইবে না। জ্বর

আরম্ভ না হইলে আরও কিছু বেশী জমি আবাদ করা যাইত। কাল ম্যালেরিয়া! ম্যালেরিয়া প্রতি বৎসরেই এই সময়টায় কিছু কিছু হয়, এবার এই বানের পর ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে ভীষণভাবে। ওষুধ বিনা পয়সায় পাওয়া যায় কঙ্কণার ডাক্তারখানায় আর জংশন শহরের হাসপাতালে; কিন্তু চাষ কামাই করিয়া এতটা পথ রোগী লইয়া যাওয়া সহজ কথা নয়। জগন ডাক্তার বিনা পয়সায় দেখে, কিন্তু ওষুধের দাম নেয়। না লইলেই বা তাহার চলে কি করিয়া? তবে দেবু পণ্ডিত কাল বলিয়াছে—কলিকাতা হইতে কুইনাইন এবং অন্যান্য ওষুধ আসিতেছে। জেলাতেও নাকি দরখাস্ত দেওয়া হইয়াছে—একজন ডাক্তার এবং ওষুধের জন্য।

লোকের বিস্ময়ের আর অবধি নাই। বুড়া হরিশ সেদিন ভবেশকে বলিল—যা দেখি নাই বাবার কালে, তাই দেখালে ছেলের পালে।

ভবেশ বলিল—তা বটে হরিশ-খুড়ো। দেখলাম অনেক। বান তো আগেও হয়েছে গো।…

নদীমাতৃক বাংলাদেশ; বর্ষা এখানে প্রবল ঋতু। জল-প্লাবন অল্পবিস্তর প্রতি-বৎসরই হইয়া থাকে। পাহাড়িয়া নদী ময়ূরাক্ষীর বুকেও বিশ-ত্রিশ বৎসর অন্তর প্রবল বর্ষায় এই ভাবেই সর্বনাশা রাক্ষসী বন্যার ঢল নামে; গ্রাম ভাসিয়া যায়, শস্যক্ষেত্র ডুবিয়া যায়—এ তাহারা বরাবরই দেখিয়া আসিতেছে। তখনকার আমলে এমন বন্যার পর দেশে একটা দুঃসময় আসিত। সে দুঃসময়ে স্থানীয় ধনী এবং জমিদারেরা সাহায্য করিতেন। ধনীরা, অবস্থাপন্ন গৃহস্থেরা গরীবদের ধান ঋণ দিত; মহাজনেরা বিনা-সুদে বা অল্প সুদে ধান ঋণ দিত চাষীদের। জমিদারের সে সময় আশ্বিন-কিস্তির খাজনা আদায় বন্ধ রাখিত, সে বৎসরের খাজনা বাকি পড়িলে সুদ লইত না। দয়ালু জমিদার আংশিকভাবে খাজনা মাফ দিত, আবার দুই-একজন গোটা বৎসরটারই খাজনা রেয়াত করিত। চাষীদের অবস্থা তখন অবশ্য এখনকার চেয়ে অনেক ভাল ছিল, এমন করিয়া সম্পত্তিগুলা টুকরা টুকরা হইয়া গৃহস্থেরা গরীব হইয়া যায় নাই। তাহারা কয়টা মাস কষ্ট করিত, তাহার পর আবার ধীরে ধীরে সামলাইয়া উঠিত।

গরীব-দুঃখী অর্থাৎ বাউড়ী ডোম-মুচীদের দুর্দশা তখনও যেমন, এখনও তেমনই।

এই ধরনের বিপর্যয়ের পর—তাহাদের মধ্যেই মড়ক হয় বেশী। ভিক্ষা ছাড়া গতি থাকে না, দলে দলে গ্রাম ছাড়িয়া গ্রামান্তরে চলিয়া যায়। আবার দেশের অবস্থা ফিরিলে পিতৃপুরুষের ভিটার মমতায় অনেকেই ফেরে। এমন দুর্দশায় সম্পন্ন গৃহস্থেরা গভর্নমেণ্টের কাছে দরখাস্ত করিয়া তাকাবী ঋণ লইত, পুকুর কাটাইত, জমি কাটাইত, গরীবরা তাহাতে খাটিয়া খাইত।

হরিশ বলিল—ওদের কাল তো এখন ভাল হে। নদীর পুল পার হলেই ওপারে জংশন। বিশটা কলে ধোঁয়া উঠছে। গেলেই খাটুনি—সঙ্গে সঙ্গে পয়সা। তা তো বেটারা যাবে না!

ভবেশ বলিল—যায় নাই তাই রক্ষে খুড়ো! গেলে আর মুনিষ-মাগাল মিলত না!

হরিশ বলিল—তা বটে। তবে এবারে আর থাকবে না বাবা। এবার যাবে সব। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা।

ভবেশ বলিল—হেঃ, দেশে লেগেছে খুব। ইস্কুলের ছোঁড়ারা সব গাঁয়ে-গাঁয়ে গান গেয়ে ভিক্ষে করছে। চাল, কাপড়, পয়সা।

গৌর দেবুকে যে কথাটা কানে-কানে বলিয়াছিল, সে কথাটা কাজে পরিণত হইয়াছে। এক একজন বয়স্ক লোকের নিয়ন্ত্রণে ছেলের দল যে-সব গ্রামে বন্যা হয় নাই সেই সব গ্রাম ঘুরিয়া, গান গাহিয়া, চাল, কাপড় ভিক্ষা করিয়া আনিতেছে। পনের-কুড়ি মণ চাউল ইহার মধ্যে জমা হইয়াছে। কোন এক ভদ্রলোকের গ্রামে—মেয়েরা নাকি গহনা খুলিয়া দিয়াছে। খুব দামী গহনা নয়, আংটি, দুল, নাকছাবি ইত্যাদি। এ-সবই এই অঞ্চলের লোকের কাছে অদ্ভুত ঠেকিতেছে। লোকের বাড়ীতে গরীবেরা নিজে যখন ভিক্ষা চাহিতে যায়, তখন লোকে দেয় না, কটু কথা বলে। কত কাতরভাবে কাকুতি করিয়া তাহাদের ভিক্ষা চাহিতে হয়। অথচ এই ভিক্ষার মধ্যে—এই ভিক্ষার দীনতা নাই। আবার দেবুর বাড়ীতে সাহায্য যাহারা লইতেছে, তাহাদের গায়েও ভিক্ষার দীনতার দাগ লাগিতেছে না। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা অপূর্ব আত্মতৃপ্তির ভাব যেন লুকানো আছে। আগে নিঃস্ব রিক্ত মানুষগুলি দারিদ্র্যের জন্য ভিক্ষা করিতে গিয়া একটা মর্মান্তিক

তুমি আমার ঘরে ছিলে, টাকা বাকী আছে, টাকা দাও। নইলে…।—এই নিয়ে সে এক মহাকেলেঙ্কারি। গোসাঁই রেগে-মেগে চলে গেলেন, বলে গেলেন—কল্কি-মহারাজ না এলে—দুষ্টের দমন হবে না।…ব্যস, তারপর আবার যে-কে সেই—সেই পায়ের তলায়। এও দেখো তাই হবে।

সেকালে রামদাস গোসাঁইয়ের কাছে ওই রূপ-দশাবিনী আসিলেই লোকে গোসাঁইকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। পর পর তিন-চারি দিন তৈয়ারী ভাত-তরকারী নষ্ট হইয়া গেল, কেহ আসিল না। যাহাদের হইয়া গোসাঁই জমিদারের সঙ্গে বিবাদ করিয়াছিলেন—তাহারাও আসে নাই, রামদাস গোসাঁই রাগে-ক্ষোভে স্থান ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। একালে কিন্তু একটা পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। দেবুর সঙ্গে কামারবউ এবং দুর্গাকে জড়াইয়া অপবাদটা লইয়া আলোচনা লোকে যথেষ্ট করিয়াছে, পঞ্চায়েত দেবুকে পতিত করিয়াছে, তবু লোকে তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই।

দেবুর প্রতি ন্যায়রত্নের বিশ্বাস অগাধ, কিন্তু জনসাধারণকে তিনি সে বিশ্বাস করেন না; এই বিষয়টা লইয়া তিনিও ভাবিয়াছেন। তাঁহার এক সময় মনে হয় —সমাজ-শৃঙ্খলা ভাঙিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে, সমাজ ভাঙিবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধর্মবিশ্বাসও লোপ পাইতে বসিয়াছে। সেইজন্য নবশাক সম্প্রদায়ের পঞ্চায়েত শ্রীহরি ঘোষের নেতৃত্বে থাকিয়া দেবুকে পতিত করিবার সংকল্প করিলেও সেটা ঠিক কাজে পরিণত হইল না। হয়তো মাত্র একদিন শিবকালীপুরের চণ্ডীমণ্ডপে—বর্তমানে শ্রীহরি ঘোষের ঠাকুরবাড়িতে—ঘোষের আহ্বানে নবশাক সম্প্রদায়ের পঞ্চায়েত সমবেত হইয়াছিল। স্থানীয় অবস্থাপন্ন সদ্গৃহস্থ যাহারা, তাহাদের অনেকেই আসিয়াছিল। [illegible] এক-মত হয় নাই; দেবুকে ডাকা হইয়াছিল—কিন্তু সে আসে নাই। বলিয়া দিয়াছিল—কামার-বউ শ্রীহরি ঘোষের বাড়িতে আছে, পূর্বে সে তাঁহাকে সাহায্য করিত নিরাশ্রয় বন্ধুপত্নী হিসাবে, কিন্তু এখন তাহার সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। দুর্গা তাহাকে [illegible] করে। দুর্গার মামার বাড়ী তাহার শ্বশুরের গ্রামে, সেই হিসাবে দুর্গা

তাহার স্ত্রীকে দিদি বলিত, তাহাকে জামাই-পণ্ডিত বলে। সে দুর্গাকে স্নেহ করে। দুর্গা তাহার বাড়ীতে কাজকর্ম করে এবং বরাবরই করিবে; সেও তাহাকে চিরদিন স্নেহ এবং সাহায্য করিবে, কোন দিন তাড়াইয়া দিবে না। এই তাহার উত্তর। এই শুনিয়া পঞ্চায়েত [illegible] খুশি হয় করিবেন।

পঞ্চায়েত তাহাকে পতিত করিয়াছে।

পতিত করিলেও জনসাধারণ দেবুর সংস্রব ত্যাগ করে নাই। লোকে আসে যায়, দেবুর ওখানে বসে, পান-তামাক খায়। বিশেষ করিয়া সাহায্য-সমিতি লইয়া দেবুর সঙ্গে তাহাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা। আবার সাধারণ অবস্থার লোকেদের মধ্যে কতকগুলি লোক তো পঞ্চায়েতের নোটিশকে প্রকাশ্যেই 'মানি না' বলিয়া দিয়াছে। তিনকড়ি তাহাদের নেতা।

ন্যায়রত্ন যেদিন দেবুকে উপদেশ দিয়াছিলেন— সেদিন কল্পনা করিয়াছিলেন অন্যরূপ। কল্পনা করিয়াছিলেন—মানুষের সঙ্গে কঠিন বিরোধিতার মধ্যে পণ্ডিতের ধর্মজীবন উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। ধ্যান-ধারণা পূজার্চনার মধ্য দিয়া দেবুর এক নূতন রূপ তিনি কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে। দেবু ঘোষ সাহায্য-সমিতি লইয়া কর্মের পথে চলিয়াছে। কর্মের পথেও ধর্ম-জীবনে যাওয়া যায়। কিন্তু দেবুর সম্বন্ধে একটা কথা শুনিয়া বড় আঘাত পাইয়াছেন— দেবু নাকি দুর্গা মুচিনীর হাতে জল খাইতেও প্রস্তুত। দুর্গাকে সে অনুরোধও করিয়াছিল, কিন্তু দুর্গা রাজী হয় না।

কর্মকেই তিনি সামাজিক জীবনের সঞ্জীবনী-শক্তি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সে কর্ম ধর্ম-বিবর্জিত কর্ম নয়। ধর্ম-বিবর্জিত কর্ম সঞ্জীবনী-সুধা নয়—উত্তেজক সুধা, অন্ন নয়—পচনশীল তণ্ডুলের মাদক রস।

ন্যায়রত্ন দেবুর জন্য চিন্তিত হইয়াছেন। পণ্ডিতকে তিনি ভালবাসেন। পণ্ডিত মাদক রসের উত্তেজনায় উগ্র উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এটা তিনি আগে কল্পনা করেন নাই। সমাজে এমনি ভাবেই জোয়ার-ভাঁটা খেলিতেছে। এমনি ভাবেই মানুষগুলি এক-একবার জোয়ারের উচ্ছ্বাস লইয়া উঠিতেছে আবার সে উচ্ছ্বাস ভাঙিয়া পড়িয়া ভাঁটার টানের মত শান্ত স্তিমিত হইয়া যাইতেছে।

ন্যায়রত্নের খড়মের শব্দ কঠোর হইয়া উঠিল। আপনার উত্তেজনা তিনি বুঝিতে পারিয়া গম্ভীরস্বরে ডাকিয়া উঠিলেন—নারায়ণ! নারায়ণ!

বিশ্বনাথ কালকে পর্যন্ত স্বীকার করে না। সে বলে—কালের সঙ্গেই আমাদের লড়াই। এ কালকে শেষ করে আগামী কালকে নিয়ে আসারই সাধনা আমাদের।

মূর্খ! তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন—তা হলে কালের সঙ্গে যুদ্ধ বলছ কেন? কাল অনন্ত। তার এক খণ্ডাংশের সঙ্গে যুদ্ধ! আজকের কালকে চাও না, আগামী কালকে চাও। এ শাক্ত বৈষ্ণবের লড়াই। কালীরূপ দেখতে চাও না, কৃষ্ণরূপের পিয়াসী! কিংবা ব্রজদুলালের পরিবর্তে দ্বারকানাথকে চাও।

বিশ্বনাথ বলিয়াছিল—কোন নাথকেই আমি চাই না দাদু। একের মধ্যে উপমার খাতিরে কাউকে চাই—একথা বললে আপনার লাভ কি হবে? নাথ আর সহ্য হচ্ছে না মানুষের, নাথের দল এই সুদীর্ঘকাল মানুষ যতবার উঠতে চেয়েছে—তাকে নাথত্বের চাপে নিষ্পেষিত করেছে। তাই আগামী কালের রূপ আমাদের অ-নাথের রূপ। নাথের উচ্ছেদেই হবে আজকের কালের অবসান।

কথাটা সত্য। একগ্রামেও যতবার মানুষগুলি হৈ হৈ করিয়া উঠিয়াছে, ততবার জমিদার-ধনী সমাজ-নেতারা তাহাদের দমন করিয়াছে। এ দেখিয়াও কি তোমার চেতন হয় না বিশ্বনাথ যে, মানুষের জীবনোচ্ছ্বাস এমন ভাবে আদিকাল হইতে ঐ অনাথত্বের কালকে আনিতে চায়—কিন্তু সে কাল আজও আসে নাই। কতকাল আজ অতীত হইয়া গেল—কত আগামী কাল আসিল, কিন্তু যে আগামী কালের কল্পনা তোমাদের—সে কাল আসিল না! কেন আসিল না জান? কালের সেই রূপে আসিবার কাল এখনও আসে নাই।

বিশ্বনাথ এইখানে যাহা বলে—তিনি তাহা কিছুতেই মানিতে পারেন না। তাহার সঙ্গে বিরোধ এইখানেই। গভীর বেদনায় নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণের মন আবার টন্-টন্ করিয়া উঠিল। আবার তিনি ডাকিলেন—নারায়ণ! নারায়ণ!

পোস্টাপিসের পিওন আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।—চিঠি!

চিঠিখানি হাতে লইয়া ন্যায়রত্ন নাটমন্দির হইতে নামিয়া মুক্ত আলোকে ধরিলেন। বিশ্বনাথের চিঠি। ন্যায়রত্নের আজও চশমা লাগে না। তবে

বৎসরখানেক হইতে আলোর একটু বেশী দরকার হয় এবং চোখ দুটি একটু সঙ্কুচিত করিয়া পড়িতে হয়। পোস্টকার্ডের চিঠি! ন্যায়রত্ন পড়িয়া একটু আশ্চর্য হইয়া হইয়া গেলেন—কল্যাণীয়াসু!—কাহাকে লিখিয়াছে বিশু-ভাই? চিঠিখানা উল্টাইয়া ঠিকানা দেখিয়া দেখিলেন—জয়ার চিঠি। ন্যায়রত্ন অবাক হইয়া গেলেন। জয়াকে বিশ্বনাথ পোস্টকার্ডে চিঠি লিখিয়াছে! মাত্র কয়েক লাইন। ...আমি ভাল আছি। আশা করি তোমরাও ভাল আছ। কয়েক দিনের মধ্যেই একবার ওখানে যাইব। ঠিক বাড়ি যাইব না। বন্যার সাহায্য-সমিতির কাজে যাইব, সঙ্গে আরও কয়েকজন যাইবেন। দাদুকে আমার অসংখ্য প্রণাম দিয়ো। তোমরা আশীর্বাদ জানিয়ো। ইতি—

বিশ্বনাথ।

ন্যায়রত্ন চিন্তিতভাবেই বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। পোস্টকার্ডের চিঠিখানা তাঁহাকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। সেদিন যখন বিশ্বনাথ তাঁহাকে বলিয়াছিল—জয়ার সঙ্গেও তাহার মতের মিল হইবে না, সেদিন তিনি এত বিচলিত হন নাই। মতের মিল তো নাই। জয়া তাঁহার হাতে-গড়া মহাগ্রামের মহামহোপাধ্যায় বংশের গৃহিণী; সমাজ ভাঙিয়াছে,—ধর্ম বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে—সারা পৃথিবীর লোভ, অনাচার, অত্যাচার—এ দেশের মানুষ জর্জরিত হইয়া ভয়াবহ পরধর্ম বা ধর্মহীন বৈদেশিক জীবন-নীতি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছে,—কিন্তু তাঁহার অন্তঃপুরে আজও তাঁহার ধর্ম বাঁচিয়া আছে। জয়া অবিচলিত নিষ্ঠা এবং অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁহার দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার পৌত্র ভয়াবহ পরধর্ম গ্রহণ করিয়াছে—এই চিন্তায় যখন তিনি অধীর হন, তখন জয়ার দিকে চাহিয়া সান্ত্বনা পান। বিশ্বনাথ যখন তাঁহার সঙ্গে তর্ক করে—কূটযুক্তিতে তাঁহাকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করে, তখন তিনি গভীর তিতিক্ষায় নিজেকে সংযত করিয়া মহাকালের লীলার কথা ভাবিয়া নীরব হইয়া থাকেন—সেই নীরবতার মধ্যে মনে পড়ে জয়াকে। জয়ার জন্য দারুণ দুশ্চিন্তা হয়। আবার যখন বিশ্বনাথ নানা অজুহাতে পনের দিন, কুড়ি দিন অন্তর বাড়ী আসে, তখন ওই দুশ্চিন্তাই তাঁহার ভরসা হইয়া উঠে। বিশ্বনাথ গোবিন্দজীর যুগল

মানে না ; কিন্তু সেই যুগলের অজুহাতে জয়ার সঙ্গে যুগল খেলা খেলিতে আসে। তাই জয়ার সঙ্গে মতে মিলিবে না বলিলেও ন্যায়রত্নের গোপন অন্তরে ভরসা ছিল। বহ্নির সঙ্গে পতঙ্গের মিল আছে কি না কে জানে—প্রাণশক্তির সঙ্গে দাহিকাশক্তির সম্বন্ধটাই বিরোধী সম্বন্ধ—তবু পতঙ্গ আসে পুড়িয়া ছাই হইতে। জয়ার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি আশ্বস্ত হন। কিন্তু আজ তিনি চিন্তিত হইলেন। বিশ্বনাথ জয়াকে পোস্টকার্ডে চিঠি লিখিয়াছে।

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ন্যায়রত্ন ডাকিলেন—হলা রাজ্ঞী শকুন্তলে!

কেহ উত্তর দিল না। বাড়ীর চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন—ঠাকুর-ঘরে তালা ঝুলিতেছে, অন্য ঘরগুলির দরজাও বন্ধ, শিকল বন্ধ! ন্যায়রত্ন বিস্মিত হইলেন। জয়া তো এ সময়ে কোথাও যায় না!

তিনি আবার ডাকিলেন—অজয়---অজু বাপি!

অজয় সাড়া দিল না—সাড়া দিল বাড়ীর রাখালটা।—যাই আজ্ঞেন, ঠাকুর মশাই ;···ওদিকের চালা হইতে ছোঁড়াটা ঘুমন্ত অজয়কে কোলে করিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল।—খোকন ঘুমুচ্ছে ঠাকুর মশাই!

—অজয়ের মা কোথায় গেল?

—আজ্ঞেন, বউ ঠাকরুণ গেয়েছেন আমাদের পাড়া।

—তোদের পাড়ায়?—ন্যায়রত্ন বিস্মিত হইয়া গেলেন। জয়া বাউড়ী পাড়ায় গিয়াছে?—তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

ছোঁড়াটা বলিল—আজ্ঞেন,—নোটন বাউড়ীর ছেলেটা হাত-পা খিঁচছে—নোটনের বউ আইছিল—ঠাকুরের চরণামেত্তর লেগে। তাই গেলেন সেথা বউ-ঠাকরুণ!

—হাত-পা খিঁচছে? কি হয়েছে?

—তা জেনে না। বা-বাওড় লেগেছে হয়তো।

বা বাওড় অর্থে ভৌতিক স্পর্শ। দুঃখের মধ্যেও ন্যায়রত্ন একটু হাসিলেন। এ বিশ্বাস ইহাদের কিছুতেই গেল না!

ঠিক এই সময়েই জয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে

ফিরিয়াছে। ন্যায়রত্ন চকিত হইয়া উঠিলেন—তুমি এই অবেলায় স্নান করলে?

জয়া ক্লান্ত উদাস স্বরে উত্তর দিল—ছেলেটি মারা গেল দাদু!

—মারা গেল?

—হ্যাঁ।

—কি হয়েছিল?

—জ্বর। কিন্তু এ রকম জ্বর তো দেখি নি দাদু!

ন্যায়রত্ন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—আগে তুমি কাপড় ছাড় ভাই। তারপর শুনব।

জয়া তবু গেল না; বলিল—কাল বিকেল বেলা থেকে সামান্য জ্বর হয়েছিল। সকালে উঠেও ছেলেটা খেলা করেছে। বললে—জলখাবার-বেলা থেকে জ্বরটা চেপে এল। তারপরই ছেলে জ্বরে বেহুঁশ। ঘণ্টাখানেক আগে তড়কার মত হয়। তাতেই শেষ হয়ে গেল। শুনলাম দেখুড়েতেও নাকি পরশু একটি, কাল একটি ছেলে এমনিভাবেই মারা গিয়েছে। এদের পাড়াতে আরও তিন-চারটি ছেলের এমনি জ্বর হয়েছে। এ কি জ্বর দাদু?

কুড়ি

ম্যালেরিয়া এবার আসিয়াছে যেন মড়কের চেহারা লইয়া। চারিদিকে ঘরে ঘরে লোকে জ্বরে পড়িয়াছে। কে কাহার মুখে জল দেয়—এমনি অবস্থা। বয়স্ক মানুষের বিপদ কম—তাহারা ভুগিয়া কঙ্কাল-সার চেহারা লইয়া সারিয়া উঠিতেছে—পাঁচ দিন, সাত দিন, চৌদ্দ দিন পর্যন্ত জ্বরের ভোগ। মড়কটা ছেলেদের মধ্যে। পাঁচ-সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেদের জ্বর হইলে—মা-বাপের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িতেছে। তিন দিন কি পাঁচ দিনের মধ্যেই একটা বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয়। হঠাৎ জ্বরটা ময়ূরাক্ষীর এই বোড়াবানের মতই হু হু করিয়া বাড়িয়া উঠে—ছেলেটা ক্রমাগত মাথা ঘুরায়—তারপর ঐ তড়কার মত! ব্যস্, ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে সব শেষ হইয়া যায়। দশটার মধ্যে বাঁচে দুইটা কি তিনটা, সাত-

আটচাই মরে।

পরশু রাত্রে পাতু মুচীর ছেলেটা মরিয়াছে। পাতুর স্ত্রীর অনেক বয়স পর্যন্ত সন্তান-সন্ততি হয় নাই—দুই বৎসর আগে ওই সন্তানটিকে সে কোলে পাইয়াছিল। পাড়াপ্রতিবাসীরা বলে—ওটি এ-গ্রামের বাসিন্দা হরেন্দ্র ঘোষালের সন্তান। শুধু পাড়াপ্রতিবাসীরাই নয়—পাতুর মা, দুর্গা, ইহারাও বলে। ঘোষালের সঙ্গে স্ত্রীর গোপন প্রণয়ের কথা পাতুও জানে। আগে যখন পাতুর চাকরান জমি ছিল—ঢাকের বাজনা বাজাইয়া সে দু পয়সা রোজগার করিত, তখন পাতু ছিল বেশ মাতব্বর মানুষ, তখন ইজ্জত-সম্ভ্রমের দিকে কঠিন দৃষ্টি ছিল। দুর্গার মন্দ স্বভাবের জন্য তখন সে গভীর লজ্জা-বোধ করিত—দুর্গাকে সে কত তিরস্কার করিয়াছে; কখনো কখনো প্রহারও করিয়াছে। তখন তাহার স্ত্রীও ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। পাতুর প্রতি ছিল তাহার গভীর ভয়, আসক্তিও ছিল; দিবারাত্রি ছুঁচপুঁটকি বিড়ালীর মত বউটা ঘরের কাজ করিয়া ঘুর-ঘুর করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। সে সময় তাহার শাশুড়ী—পাতুর-মা পুত্রবধূর যৌবন ভাঙাইয়া গোপনে রোজকার করিবার প্রত্যাশায় বউটিকে অনেক প্রলোভন দেখাইয়াছিল, কিন্তু তখন বউটি কিছুতেই রাজী হয় নাই। তাহার পর পাতুর জীবনে শ্রীহরি ঘোষের আক্রোশে আসিল একটা বিপর্যয়। জমি গেল, পাতু বাজনার ব্যবসা ত্যাগ করিল, শেষে দিন-মজুরী অবলম্বন করিল। এই অবস্থার মধ্যে কেমন করিয়া যে পাতু বদলাইয়া গেল—সে পাতুও জানে না।

এখন ঘরে চাল না থাকিলে দুর্গার কাছে চাল লইয়া, পয়সা লইয়া—দুর্গাকে সে শাসন করা ছাড়িল। তারপর একদিন তাহার মা বলিল—দুগ্‌গা কঙ্কণায় যায় এতে (রাতে) তু যদি সাথে যাস পাতু—তবে বখ্‌শিশ্‌টা বাবুদের কাছে তুই-ই তো পাস্। আর মেয়েটা যায়, কোনদিন আত (রাত) বিরেতে—যদি বেপদই ঘটে তবে কি হবে? মায়ের প্যাটের বুন তো বটে।

দুর্গাকে সঙ্গে করিয়া বাবুদের অভিসারের আসরে পৌঁছাইয়া দিতে গিয়া—পাতুর ওটাও বেশ অভ্যাস হইয়া গেল। এই অবসরে একদিন প্রকাশ পাইল, তাহার স্ত্রীও ওই ব্যবসায়ে রত হইয়াছে। ঘোষাল ঠাকুরকে সন্ধ্যার পর পাড়ার

প্রান্তে নির্জন স্থানে ঘুরিতে দেখা যায় এবং পাড়া হইতে পাতুর বউকেও সেইদিকে যাইতে দেখা যায়। একদিন পাতুর মা ব্যাপারটা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া হঠাৎ একটা কলরব তুলিয়া ফেলিল। দুর্গা বলিল—চুপ কর মা, চুপ কর, ঘরের বউ, ছিঃ!

পাতু মাকেও চুপ করিতে বলিল না—বউটাকেও তিরস্কার করিল না—নিজেই নীরবে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। বউটা ভয়ে সেদিন বাপের বাড়ী পলাইয়া গিয়াছিল; কয়েক দিন পরে পাতুই নিজে গিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছিল। কিছুদিন পর পাতুর স্ত্রী এই সন্তানটি প্রসব করিল।

পাড়ার লোকে বলাবলি করিল—ছেলেটা ঘোষাল ঠাকুরের মত হইছে বটে। রংটা এতটুকু কালো দেখাইছে।...

পাতুও ছেলেটার দুষ্টবুদ্ধি দেখিয়া কতদিন বলিয়াছে—বামুনে বুদ্ধির তেজাল আছে কিনা, বেটার ফিচ্লেমি দেখ ক্যানে!—বলিয়া সে সস্নেহে হাসিত।

ছেলেটাকে ভালবাসিত সে। হঠাৎ তিনদিনের জ্বরে ছেলেটা শেষ হইয়া গেল। দুর্গাও ছেলেটাকে বড় স্নেহ করিত; সে ডাক্তার দেখাইয়াছিল। জগনকে যতবার ডাকিয়াছে—নগদ টাকা দিয়াছে, নিয়মিত ঔষধ খাওয়াইয়াছে তবু ছেলেটা বাঁচিল না।

আশ্চর্যের কথা—পাতুর স্ত্রী ততটা কাতর হইল না, যতটা কাতর হইল পাতু। পাতু তাহার মোটা গলায় হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া পাড়াটাকে যেন অধীর করিয়া তুলিল।

বিপদের রাত্রে সতীশ আসিয়া তাহাকে ধরিয়া বসাইল—সান্ত্বনা দিল। বাউড়ী ও মুচী-পাড়ার মধ্যে সতীশ মোড়ল মানুষ, ঘরে তাহার হাল আছে—দুই মুঠা খাইবার সংস্থান আছে। সে-ই মনসার ভাসানের দলের মাতব্বর, ঘেঁটুর দলের মূল গায়েন—রকমারি গান বাঁধে; এজন্য হরিজনপল্লীর লোক তাহাকে মান্যও করে। সে-ই ছেলেটার সৎকারের ব্যবস্থা করিল। পরদিন সকালে সে পাতুকে ডাকিয়া নিজের ঘরে লইয়া গেল, তারপর দেবু পণ্ডিতের আসরে লইয়া গেল।

দেবুর আসর এখন সর্বদাই জমজমাট হইয়া আছে। নিজ গ্রামের এবং আশপাশ গ্রামের বারো-তের হইতে আঠারো-উনিশ বছরের ছেলের দল সর্বদা আসিতেছে-যাইতেছে, কলরব করিতেছে। তিনকড়ির ছেলে গৌর তাহাদের সর্দার। পাতুও কয়েকদিন এখানকার কাজে খাটিতেছে। ছেলেদের সঙ্গে সে বস্তা ঘাড়ে করিয়া ফিরিত। গ্রাম-গ্রামান্তরে মুষ্টি-ভিক্ষার চাল সংগ্রহ করিয়া বহিয়া আনিত। এই বিপদের দিনে সাহায্য-সমিতি হইতে পাতুর পরিবারের জন্ম চালের বরাদ্দও হইয়া গেল। কথাটা তুলিল সতীশ।

দেবু কোন গম্ভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া ছিল। সতীশ কথাটা তুলিতেই সে সচেতন হইয়া উঠিল, বলিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় পাতুর ব্যবস্থা করতে হবে বৈকি! নিশ্চয়

সাহায্য-সমিতি হইতে পাতুর খোরাকের চালের ব্যবস্থা দেবু করিয়া দিয়াছে। চালটা লইয়া আসে দুর্গা। সকালে উঠিয়াই জামাই-পণ্ডিতের বাড়ী যায়। বাহির হইতে ঘরকন্নার যতখানি মার্জনা এবং কাজকর্ম করা সম্ভব দেবুর বাড়ীতে সে সেইগুলি করে; সাহায্য-সমিতির চাল মাপে। সকালে গিয়া দুপুরে খাওয়ার সময় ফেরে, খাওয়া-দাওয়া সারিয়া আবার যায়—ফেরে সন্ধ্যার পর। সে এখন সদাই ব্যস্ত। বেশভূষার পারিপাট্যের দিকে দৃষ্টি দিবার অবকাশ পর্যন্ত নাই।

সকালে উঠিয়াই সে দেবুর বাড়ী গিয়াছে। পাতুর মা দাওয়ায় বসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া নাতির জন্ম কাঁদিতেছে। পাতুর মায়ের অভিযোগ সকলের বিরুদ্ধেই। সে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছে,—দুর্গার পাপে তাহার এই সর্বনাশ ঘটিয়া গেল। ওই পাপিনী বউটা—ব্রাহ্মণের ছেলে পাপ সঞ্চার করিয়া যে মহাপাপ সঞ্চয় করিয়াছে, সেই পাপে এত বড় আঘাত তাহার বুকে বাজিল। গৌরাঙ্গ-গোবিন্দ পাসও পাতু দেবস্থলে বাজনা বাজানো ছাড়িয়াছে, সেই দেব রোষে তাহার নাতিটি মরিয়া গেল। সমস্ত গ্রামখানা পাপে ভরিয়া উঠিয়াছে—তাই ময়ূরাক্ষীর বাঁধ ভাঙিয়া আসিল কালবন্যা—তাই দেশ জুড়িয়া মড়কের মত আসিয়াছে—এই সর্বনাশা জ্বর;—গ্রামের পাপে সেই জ্বরে তাহার বংশধর গেল

—তাহার স্বামী-কুল, পুত্র-কুল আজ নির্বংশ হইতে বসিল।

পাড়ায় এখানে-ওখানে আরও কয়েকটা ঘরে কান্না উঠিতেছে। পানু বাড়ীর পিছনে একা বসিয়া কাঁদিতেছিল। আজ সতীশ আসে নাই, অন্য কেহও ডাকে নাই, সে-ও কোথাও যায় নাই।

পানুর মা হঠাৎ কান্না বন্ধ করিয়া আসিল। পানুর মুখের সামনে বসিয়া হাত নাড়িয়া বলিল—আর সব্বনাশ করিস না বাবা, আর কাঁদিস না। পরের ছেলের লেগে আর আদিখ্যেতা করিস না। উঠ্! উঠে খানকয়েক তালপাতা কেটে আন্—এনে দেওয়ালের ভাঙনে বেড়া দে। কাজকম্মো কর্।

বন্যায় পানুর ঘরের একখানা দেওয়াল ধসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। পানু এখন বাস করিতেছে [illegible] কোঠা-ঘরখানার নিচেরতলার ঘরে। ওই ঘরখানা এতদিন নির্দিষ্টভাবে ব্যবহার করিত পানুর মা।

পানু কোন কথা বলিল না।

পানুর মা বলিল—ওগে (রোগে)-শোকে আমার বুকের পাঁজরাগুলা একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেল। এতে (তাতে) শোব—আর তোরা দুজনায় কোঁস্-কোঁস্ করে কাঁদবি—আমার সুখ হয় না বাবু। তোরা আপনার ঘর করে নে। কত লোকের ঘর পড়েছে—সবাই যার যেমন তার তেমন মেরামত করলে—তোর আর হল না।

পানুর মা মিথ্যা বলে নাই, ময়ূরাক্ষীর বানের ফলে এ-পাড়ায় একখানা ঘরও গোটা থাকে নাই, কাহারও বেশী—কাহারও কম ক্ষতি হইয়াছে। কাহারও আধখানা—কাহারও একখানা—কাহারও বা দুইখানা দেওয়াল পড়িয়াছে, দুই-চারজনের গোটা ঘরই পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু এই বিশ-পঁচিশ দিনের মধ্যেই সকলে যে যেমন আপনার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। কেহ বা তালপাতার বেড়া দিয়াছে। যাহাদের গোটা ঘর পড়িয়া গিয়াছে, তাহারা চাল তৈয়ার করিয়া তালপাতার চাটাই ঘিরিয়া মাথা গুঁজিবার ব্যবস্থা করিয়াছে, ঘোষ মহাশয়—শ্রীহরি ঘোষ অকাতরে লোককে সাহায্য করিয়াছে। বলিয়া দিয়াছে—তালপাতা যাহার যত প্রয়োজন কাটিয়া লইতে পারে। দুইটা ও একটা হিসাবে বাঁশও সে

অনেককে দিয়াছে। কিন্তু পাতু শ্রীহরি ঘোষের কাছে যায় নাই। গেলেও ঘোষ তাহাকে দিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে; কারণ সতীশ বাউড়ীকেও ঘোষ কোন সাহায্য করে নাই। বলিয়াছে—তুমি তো বাবা গরীব নও।

সতীশ অবাক হইয়া গেল। সে বড়লোক হইল কেমন করিয়া?

শ্রীহরি বলিয়াছিল—তুমি আগে ছিলে পাড়ার মাতব্বর, এখন হয়েছ গাঁয়ের মাতব্বর। শুধু এ গাঁয়ের কেন—পঞ্চগ্রামের তুমি একজন মাতব্বর। সাহায্য-সমিতি তোমার হাতে। লোককে তুমি সাহায্য করছ, তোমাকে সাহায্য কি আমি করতে পারি?

সতীশ ব্যাপারটা বুঝিয়া উঠিয়া আসিয়াছিল।

ব্যাপারটা শুনিয়া পাতু কিন্তু হাসিয়াছিল, বলিয়াছিল—সতীশ-ভাই, উ বেটার আমি মুখ পর্যন্ত দেখি না। বেটার মুখ দেখলে পাপ হয়। মরে গেলেও আমি কখনও যাব না উয়ার দোরে!

পাতু যায় নাই, এদিকে দুর্গার ঘরে শুকনো মেঝেয় রান্নাবান্নার জায়গা পাইয়া, নিজের ঘর মেরামতের জন্য এতদিন সে কোন চেষ্টাও করে নাই। রাত্রিতে শুইবার স্থান তাহাদের নির্দিষ্ট হইয়া আছে, দেবুর স্ত্রীর মৃত্যুর পর হইতেই দুর্গা পাতুর জন্য এই চাকরিটা স্থির করিয়া দিয়াছিল। সন্ধ্যার পর খাওয়া-দাওয়া সারিয়া ছেলেটা ও স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া গিয়া দেবুর বাড়ী শুইত। ছেলেটার মৃত্যুর পর কয়দিন তাহারা দুর্গার নিজের ঘরেই শুইতেছে। সুতরাং নিজের ঘর-মেরামতের বাস্তব প্রয়োজনের কোন তাগাদাই আপাতত তাহার ছিল না। তাহার মনের যে তাগিদ—সে তাগিদও পাতুর ফুরাইয়া গিয়াছে বহুদিন। রান্নাবান্নার স্থান ও শুইবার আশ্রয় ছাড়া মানুষের যে কারণে ঘরের প্রয়োজন হয়—তা পাতুর নাই। কি রাখিবে সে ঘরে? রাখিবার মত বস্তুই যে তাহার কিছু নাই। চাকরান জমি লইয়া ঘোষের সঙ্গে মামলায় তাহার সমস্ত পিতল-কাঁসা গিয়াছে। সে বাজকর—আগে তাহার ঢাক ছিল দুইখানা, ঢোলও একখানা ছিল; তাহাও গিয়াছে বাজকরের লাভহীন বৃত্তি পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে। পূর্বে চামড়াও একটা সম্পদ ছিল—সেও আর নাই। জমিদার টাকা লইয়া ভাগাড়

বন্দোবস্ত করিবার ফলে চামড়ার কারবারও গিয়াছে। কারবার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টাকাপয়সা আনা বন্ধ হইয়াছে। সুতরাং ঘরে সে রাখিবেই বা কি—আর ঘরখানাকে সাজাইবেই বা কি দিয়া? পৈতৃক থাল-ঘোশালা বিক্রয় করিবার পর পুরনো সিন্দুক-তোরঙ্গের মতই ঘরখানা সেই হইতে যেন অকারণে তাহার জীবনের সবখানি জায়গা জুড়িয়া পড়িয়া ছিল। বানে ঘরখানার একদিকের দেওয়াল ভাঙিয়াছে,—যেন শূন্য তোরঙ্গের একটা দিক উইপোকায় খাইয়া শেষ করিয়াছে। পাতু সেটাকে আর নাড়িতে বা ঝাড়িতে চায় না—বাকী কয়টা দিকও কোন রকমে উইয়ে শেষ করিয়া দিলে সে বোধ হয় বাঁচিয়া যায়। মধ্যে মধ্যে ভাবিয়াছে—ঘরখানা পড়িয়া গেলে, ওই বাস্তুভিটার উপর এবার লাউ-কুমড়া ভাঁটাশাক লাগাইবে—তাহাতে প্রচুর ফসল পাওয়া যাইবে; কিছু খাইবে, কিছু বিক্রয় করিবে।...

মায়ের কথা শুনিয়া পাতুর শোকাতুর মন—দুঃখে-রাগে যেন বিষাইয়া উঠিল! কাটা ঘা যেমন তেল লাগিয়া বিষাইয়া ওঠে, তেমনি যন্ত্রণাদায়ক ভাবে বিষাইয়া উঠিল। মাকে সে কোন কথা বলিল না, সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

যাইবেই বা কোথায়? এক সতীশের বাড়ী। কিন্তু সতীশ আজ আসে নাই বলিয়া অভিমান করিয়া সে সেখানে গেল না, আর এক দেবু পণ্ডিতের মজলিস। কিন্তু সেও পাতুর ভাল লাগিল না। দেশের কথা ছাড়া সেখানে অন্য কথা নাই। আজ সে একান্তভাবে তাহার নিজের কথা বলিতে, অপরের কাছে শুনিতে চায় তাহার দুঃখটা কত বড় মর্মান্তিক সেই কথা, তাহারা পাতুর দুঃখে কতখানি দুঃখ পাইয়াছে সেই কথা সে জানিতে চায়। দশজনের কথা—বিশখানা গাঁয়ের কথা শুনিতে তাহার এখন ভাল লাগে না।

পাতু মাঠের পথ ধরিল।

মাঠেই বা কি আছে? গোটা মাঠখানাকে বানে ছারখার করিয়া দিয়া গিয়াছে। এখানে বালি ধূ ধূ করিতেছে—ওখানে খানায় জল জমিয়া আছে; যে জমিগুলার ওসব ক্ষতি হয় নাই, সেইসব জমিগুলা শুকাইয়া ফাটিয়া যেন হাড়-

পাঁজরা বাহির করিয়া পড়িয়া আছে। চারিপাশ অসমান উঁচু-নিচু, কতক জমিতে অবশ্য আবার ধান পোঁতা হইয়াছে। বন্যানীত পলির উর্বরতায় সদ্যপোঁতা ধানের চারাগুলি আশ্চর্য রকমের জোরালো হইয়া উঠিয়াছে। আরও অনেক জমি চাষ হইতে পারিত, কিন্তু লোকের বীজ নাই। বীজও হয়তো মিলিত—পণ্ডিত বীজের যোগাড় করিয়াছিল, ঘোষও দিতে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু ম্যালেরিয়া আসিয়া চাষীর হাড়গুলা যেন ভাঙিয়া দিল।

হঠাৎ কাহার উচ্চ কণ্ঠের গান তাহার কানে আসিল। স্বরটা পরিচিত। সতীশের গলা বলিয়া মনে হইতেছে।...হাঁ, সতীশই বটে। ময়ূরাক্ষীর বাঁধের উপর দিয়া আসিতেছে। কোথায় গিয়াছিল সতীশ? পরক্ষণেই সে হাসিল। সতীশের অবস্থা মোটামুটি ভাল—জমি হাল আছে, কত কাজ তাহার! কোন কাজে গিয়াছিল, কাজ উদ্ধার করিয়া মনের আনন্দে গান ধরিয়া ফিরিতেছে। তাহার তো পাতুর অবস্থা নয়। জমিও যায় নাই—গরু-মহিষও হয় নাই—ছেলেপ মরে নাই। সে গান-করিবে বৈকি! পাতু একটা দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিয়া পারিল না।

—"গরুর সেবা কর রে মন গরু পরম ধন"

ও:, সতীশ গোধন-মাহাত্ম্য গান করিতেছে!—

"হরিকের লক্ষ্মী মাগো শিবের বাহন।
তুমি মাগো হলে রুষ্ট, জগতেরো অশেষ কষ্ট,
তুষ্ট হও মা ভগবতী বাঁচাও জীবন।
গরু পরম ধন—মন রে—গোমাতা গোধন।"

পাতুকে দেখিয়া সতীশ গান বন্ধ করিল—গভীর বেদনার্ত স্বরে বলিল—রহম আখের জোড়া-বলদ—আহা, জোড়াকে জোড়াই মরে গেল রে!

পাতু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সতীশ বলিল—ভোর বেলা আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। কিছু করতে পারলাম না। আখ বুক চাপড়িয়ে কাঁদছে। আঃ কি বাহারের বলদ-জোড়া!—বলিতে বলিতে সতীশের চোখেও জল আসিল। সে চোখ মুছিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

এতক্ষণে পান্নু প্রশ্ন করিল—কি হয়েছিল?

ঘাড় নাড়িয়া সতীশ শঙ্কিতভাবে বলিল—বুঝতে পারলাম না। তবে মহামারণ কাণ্ড বটে। জরে যেমন ছেলের বংশ মেরে দিছে—এ রোগে গরুও বোধ হয় তেমনি ঝেড়ে-পুছে দিয়ে যাবে। কাণ্ড খুব খারাপ!

সতীশ বাউড়ী এ অঞ্চলের মধ্যে বিচক্ষণ গো-চিকিৎসকও বটে। রহমের গরুর ব্যারাম হইতে সে তাহাকেই ডাকিয়াছিল।

রহম সত্যই বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতেছিল।

চাষী রহমের অনেক শখের গরু। তাহার অবস্থার অতিরিক্ত দাম দিয়া গরু জোড়াটিকে সে প্রায় শৈশব অবস্থায় কিনিয়াছিল। যত্নে লালন-পালন করিয়া, তাহাদিগকে 'আবড়' অর্থাৎ হাল বহনে অনভ্যস্ত হইতে—'দোয়াইয়া' অর্থাৎ অভ্যস্ত করিয়াছিল! শক্ত-সমর্থ সুগঠিত গরু জোড়াটি—এ অঞ্চলের চাষীদের ঈর্ষার বস্তু ছিল। রহম গরু দুইটার নাম দিয়াছিল—একটার নাম 'পেল্লাদ' অপরটার নাম—'আকাই'। প্রহ্লাদ এবং আকাই এ অঞ্চলের একালের বিখ্যাত শক্তিশালী জোয়ান ছিল। গরু দুইটির গৌরবে রহমের অহঙ্কার ছিল কত! ভাল সড়কের উপর দিয়া সে যখন গাড়ী লইয়া যাইত, তখন লোকজন দেখিলেই গরু দুইটার তলপেটে পায়ের বুড়া আঙুলের ঠোকর এবং পিঠে হাতের আঙুলের টিপ দিয়া নাকে একটা অদ্ভুত শব্দ তুলিয়া গরু দুইটাকে ছুটাইয়া দিত বলিত—শেরকে বাচ্চা রে বেটা—আরবী ঘোড়া!

কখনও পথিকদের হুঁশিয়ার করিয়া হাঁকিত—এ-ই সরে যাও ভাই, এই সরে যাও!

বর্ষার সময় কাদায় কাহারও গাড়ী পড়িলে—নদীতে কাহারও ধান বোঝাই গাড়ী খানা-খন্দকে পড়িলে, রহম তাহার প্রহ্লাদ ও আকাইকে লইয়া গিয়া হাজির হইত। তাহাদের গরু খুলিয়া দিয়া সে জুড়িয়া দিত প্রহ্লাদ ও আকাইকে। প্রহ্লাদ-আকাই অবলীলাক্রমে গাড়ী টানিয়া তুলিয়া ফেলিত। পরমগৌরবে নিঃশব্দে রহমের বড় বড় দাঁতগুলি আপনা হইতেই বাহির হইয়া

পড়িত। এ অঞ্চলে শ্রীহরি ঘোষ ছাড়া এমন ভাল হেলে বলদ আর কাহারও ছিল না। শ্রীহরি নিজের বলদ জোড়াটার দাম দিয়াছে—সাড়ে তিনশো টাকা।

রহম বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতেছে।

কাঁদিবে না? গরু যে রহমের কাছে উপযুক্ত ছেলের চেয়েও বেশী! বড় আদরের—বড় যত্নের ধন; তাহার কর্ম-জীবনের দুইখানা হাত। কাঁধে করিয়া লাঙ্গল বয়, বুক দিয়া ঠেলিয়া মাটি চষে, বুড়া বাপ মাকে উপযুক্ত ছেলে যেমন ভাবে কোলে-কাঁধে করিয়া পাথর-চাপড়ির পীরতলা ঘুরাইয়া আনে, তেমনি ভাবে সপরিবার রহমকে গ্রাম-গ্রামান্তরে গাড়ীতে বহিয়া লইয়া যাইত, ক্ষেতের ফসল বোঝাই করিয়া ঘরে আনিয়া তুলিয়া দিত, যোগ্য শক্তিশালী বেটার মত। এই সর্বনাশা বানে জমির ফসল পচিয়া গেল, তবু রহম গরু ও আকাইয়ের সাহায্যে অর্ধেকের উপর জমিতে হাল দিয়া বীজ পুঁতিয়া ফেলিয়াছে। বাকী জমিটায় আশ্বিনের শেষেই রবিখন্দের চাষ করিবে ঠিক করিয়াছে। এখন সে চাষ তাহার কি করিয়া হইবে? যে জমিটায় ধান পোঁতা হইয়াছে—তাহার ফসলই বা কেমন করিয়া ঘরে আনিবে?

একবার ইদুজ্জোহার সময় সে ইমামের কাছে একটা গল্প শুনিয়াছিল।—তাহাদের এক মহাধার্মিক মুসলমান চাষী কোরবানি করিবার জন্য দুনিয়ার মধ্যে তাহার প্রিয়তম বস্তু কি ভাবিয়া দেখিয়া—তাহার চাষের সবচেয়ে ভাল বলদটিকে কোরবানি করিয়াছিল! গল্পটি শুনিয়া তাহার বুক টন্‌-টন্‌ করিয়া উঠিয়াছিল। বার বার মনে পড়িয়াছিল তাহার গরু ও আকাইকে। দুই-তিন দিন সে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারে নাই।

রহম গোঁয়ার লোক, বুদ্ধি তাহার তীক্ষ্ণ নয়, কিন্তু হৃদয়াবেগ তাহার অত্যন্ত প্রবল; একেবারে ছেলেমানুষের মত সে কাঁদিতেছিল। অন্যান্য মুসলমান চাষীরাও আসিয়াছিল। তাহারাও সত্য সত্যই দুঃখিত হইয়াছিল, আহা-হা—এমন চমৎকার জানোয়ার দুইটা মরিয়া গেল! তাহারাও যে অন্যগ্রামের চাষীদের কাছে তাহাদের গ্রামের গরু বলিয়া অহঙ্কার করিত।

হিন্দুদের দুর্গাপূজার পর দশমীর দিন—গরু লইয়া একটা প্রতিযোগিতা হয়।

ঘোড়-দৌড়ের মত গরুর দৌড়। ময়ূরাক্ষীর চরভূমিতে আপন আপন গরু লইয়া গিয়া একটা জায়গা হইতে ছাড়িয়া দেয়, পিছনে প্রচণ্ড শব্দে ঢাক বাজে—চকিত হইয়া গরুগুলি ছুটিতে আরম্ভ করে। একটা নির্দিষ্ট সীমানা যে গরু সর্বাগ্রে পার হয়, সেই গরুই এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হয়, শ্রীহরির নূতন গরু-জোড়াটা সেবার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছিল। পরবৎসর তিনকড়ি আসিয়া রহমের প্রহ্লাদ ও আকাইকে লইয়া গিয়াছিল, বলিয়াছিল —দে ভাই, আমাকে ধার দে। বেটা ছিরের দেমাকটা আমি একবার ভেঙে দি?

রহম আপত্তি করে নাই; সে মুসলমান, কিন্তু তাহার গরু দুইটা তো গরুই; হিন্দুও নয়—মুসলমানও নয়। তা ছাড়া শ্রীহরির দেমাক ভাঙিলে তাহার আনন্দ তিনকড়ির চেয়ে কম হইবে না। সেবার রহমের প্রহ্লাদ সকলকে হারাইয়া দিয়াছিল। প্রহ্লাদের পর শ্রীহরির জোড়াটা পৌঁছিয়াছিল। তাহার ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই রহমের আকাই।

ইরসাদ আসিয়া হাতে ধরিয়া রহমকে বলিল—উঠ! চাচা উঠ? কি করবে বল? মানুষের তো হাত নাই! নাও, এইবার আবার দেখে-শুনে কিনবে একজোড়া ভাল বলদ-বাছুর! আবার হবে! এ জোড়ার চেয়ে ভাল হবে—তুমি দেখিয়ো!

রহম বলিল—না, না, বাপ! তা হবে না। আমার পেল্লাদ-আকাইয়ের মতনটি আর হবে না রে বাপ! যেটি যায় তেমনটি আর হয় না। ইরসাদ বাপ, আর আমার হবে না! আর বাপ ইরসাদ—! ··জলভরা উগ্র চোখ দুটি তুলিয়া রহম বলিল—ই হাতে আর আমার সে হবে না বাপ, আমার আর কি আছে, কিসে হবে?

ইরসাদ বলিল—আমি তুমার টাকার যোগাড় করে দিব চাচা। তুমাকে আমি বাত দিছি। উঠ, তুমি উঠ!

ঠিক এই সময়েই আসিয়া হাজির হইল তিনকড়ি। প্রহ্লাদ ও আকাইয়ের মৃত্যুর খবর পাইয়া সে ছুটিয়া আসিয়াছে। রহম তাহাকে দেখিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—তিনু-ভাই! দেখ ভাই দেখ, আমার কি সব্বনাশ হইছে দেখ।

তিনকড়ি নীরব বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিল মরা বলদ দুইটাকে। নীরবেই প্রহ্লাদের দেহটার পাশে আসিয়া বসিল—কয়েকবার দেহটার উপর হাত বুলাইল; তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল—ওঃ, ছুটো ঐরাবত রে! আঃ, ইন্দ্রপাত হয়ে গেল! সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখ দিয়া টপ্‌ টপ্‌ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল।

চোখ মুছিয়া সে বলিল—মহাগ্রামেও ক'টা গরুর ব্যামো হয়েছে শুনলাম।

চাষীরা সকলে চকিত হইয়া উঠিল—মহাগ্রাম?

—হ্যাঁ—তিনকড়ি চিন্তিতভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—ছেলে-মড়কের মত গো-মড়কও লাগল দেখছি। সতীশ বাউড়ী আমাকে বললে—কি ব্যামো বুঝতেই পারে নাই!

ইরসাদ এবং অন্য চাষীরা মহাচিন্তিত হইয়া উঠিল।

তিনকড়ি বলিল—দেবু তার করেছে জেলাতে গরুর ডাক্তারের জন্যে।—হ্যাঁ—হ্যাঁ, ইরসাদ চাচা, তোমাকে দেবু যেতে বলেছে বিশেষ করে। কাল রেতে কলকাতা থেকে বিশুবাবু আরও সব কে কে এসেছে। বার বার করে তোমাকে যেতে বলে দিয়েছে।

হঠাৎ খানিকটা বিচিত্র হাসি হাসিয়া আবার বলিল—মহাগ্রামে দেখলাম, রমেন চাটুয্যে আর দৌলতের লোক ঘুরছে মুচি-পাড়ায়। গিয়েছে বুঝলাম—পেল্লাদ-আকাইদের খাল (চামড়া) ছাড়াবার লোভে তাগিদ দিতে! একেই বলে—কারু সর্বনাশ, আর কারু পৌষমাস!

রহম একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল—আমি তাগাড়ে দিব না। গেড়ে দিব—আমি মাটিতে গেড়ে দিব।—তারপর হঠাৎ ইরসাদের হাত ধরিয়া বলিল—ইরসাদ, ই তা হলি উয়েরই কাম!

—কি? ইরসাদ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

—মুচীদিকে দিয়া উয়ারাই বিষ দিছে।

তিনকড়ি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—না ভাই, বিষ-কাণ্ড নয়, এ ব্যামোই বটে। মড়ক—গো-মড়ক। তবে ওরা তাগাড় জমা নিয়েছে—লাভ তো

ওদের হবেই।

ইরসাদ বলিল—তা হলে আমি এখন একবার যাই চাচা। ঘরে ভাত চাপিয়ে এসেছি পুড়ে যাবে হয়তো। উ বেলা একবার দেবু-ভাইয়ের কাছে থেকে ঘুরে আসতে হবে। বিশুবাবু এসেছে বললে তিনু-কাকা। দেখে আসি একবার কি বলে।…

ছমির শেখ নিতান্ত দরিদ্র, দিনমজুরি করিয়া খায়, দেহ তার দুর্বল; রোগপ্রবণ বলিয়া মজুরিও বড় মেলে না। ছমিরের দুঃসহ দুরবস্থা আজন্মের,—ওটা তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, মধ্যে মধ্যে ভিক্ষাও সে করে। বন্যার পর সাহায্য-সমিতি হওয়াতে বেচারা ইরসাদের অত্যন্ত অনুগত হইয়া পড়িয়াছে। ইর-সাদের পিছনে খানিকটা আসিয়া সে ডাকিল—মিয়া-ভাই!—ইরসাদ ফিরিয়া দেখিল ছমির।

—কি ছমির-ভাই?

—দেবু পণ্ডিতের কাছে যাবা? আমার লাগি, আর কবিলাটার লাগি—দুখানা কাপড় যদি বলে দাও—পুরানো হলিও চলবে মিয়া-ভাই।

ইরসাদ বলিল—আচ্ছা।

ইরসাদ বিশুকে বহুবার দেখিয়াছে। কিন্তু তেমন আলাপ কখনও হয় নাই। কঙ্কনার ইস্কুলে বিশু যখন ফার্স্ট ক্লাসে পড়িত সেই সময় ইরসাদ তাহার মামার বাড়ীর মাইনর ইস্কুলের পড়া শেষ করিয়া আসিয়া ভর্তি হইয়াছিল। বয়সে তফাত ছিল না, ইরসাদই বয়সে বৎসর খানেকের বড়, কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস ও ফোর্থ ক্লাসের পার্থক্যটা ইস্কুল-জীবনে এত বেশী যে কোনদিন ভাল করিয়া আলাপ জমিবার সুযোগ হয় নাই। তারপর মক্তবের মৌলবীত্ব গ্রহণ করিয়া, নিজের ধর্ম লইয়া সে বেশ একটু মাতিয়া উঠিয়াছিল; ফলে—ইরসাদ ইদানীং বিশুর উপর বিরূপ হইয়া উঠে। কারণ বিশু হিন্দুদের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ঘরের সন্তান। কিন্তু সম্প্রতি দেবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পরে সে বিরূপতা তাহার মুছিয়া যাইতেছে। দেবুর কাছে বিশ্বনাথের গল্প শুনিয়া সে আশ্চর্য হইয়া গিয়াছে। বিশুবাবুর এতটুকু

গোঁড়ামি নাই। মুসলমান, খৃষ্টান, এমন কি হিন্দুদের অস্পৃশ্যজাতির কাহাকেও ছুঁইয়া সে স্নান করে না।

দেবু বলিয়াছিল—তোমাকে দেখবামাত্র দুহাতে জড়িয়ে ধরবে, তুমি দেখো ইরসাদ-ভাই।

বিশুর চিঠিগুলি পড়িয়া তাহার খুব ভাল লাগিয়াছে। বন্যার পরে অকস্মাৎ সাহায্য-সমিতির খবর দিয়া যেদিন সে টাকা পাঠাইল, সেদিন সে বিস্মিত হইয়া গেল। বিশ্বনাথের সঙ্গে তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকিলেও মনে হইল—এ এক নূতন ধরনের মানুষ। এমন ধরনের মানুষ কঙ্কণার বাবুদের ছেলেদের মধ্যে নাই, তাহার পরিচিত মিয়া-মোক্তারদের ঘরেও সে দেখে নাই, তাহাদের নিজেদের মধ্যে তো থাকিবার কথাই নয়। মনে হইল বিশ্বনাথের সঙ্গে তাহাদের অমিল হইবার কিছু নাই। দেবুকে লেখা চিঠির মধ্যে—বিশ্বনাথের কথাবার্তার মধ্যেও চমৎকার দোস্তির সুর আছে—যাহা মুহূর্তে অন্তর স্পর্শ করে। লোকটিকে দেখিবার জন্য সে আগ্রহভরেই চলিয়াছিল। ভাবিতেছিল—বিশ্বনাথ তাহাকে জড়াইয়া ধরিলে, সে তখন কি বলিবে?—বিশুবাবু? না—ভাই-সাহেব? না—বিশু-ভাই? দেবু বলে বিশু-ভাই। কিন্তু প্রথমেই কি তাহার বিশু-ভাই বলা ঠিক হইবে?

দেবুর বাড়ীর খানিকটা আগেই জগন ডাক্তারের ডাক্তারখানা। ডাক্তার একখানা চেয়ারে বসিয়া গম্ভীরভাবে বিড়ি টানিতেছিল। ইরসাদ একটু বিস্মিত হইল। ডাক্তারও সাহায্য-সমিতির একজন পাণ্ডা। বিশেষ করিয়া এই সর্বনাশা ম্যালেরিয়ার সময়ে—সাহায্য-সমিতির নামে যে ভাবে চিকিৎসা করিতেছে—তাহাতে তাহার সাহায্য একটা মোটা অঙ্কের টাকার চেয়ে কম নয়। আজ বিশু আসিয়াছে, অথচ সে এখানে বসিয়া রহিয়াছে। ইরসাদ বলিল—সেলাম গো ডাক্তার!

ডাক্তার বলিল—সেলাম।

হাসিয়া ইরসাদ বলিল—কি রকম, বসে রয়েছেন যে?

—কি করব। নাচ্‌ব?

ইরসাদ একটু আহত হইল। ব্যথিত বিস্ময়ে সে জগনের মুখের দিকে চাহিল। জগন বলিল—কোথায় যাবে? দেবুর ওখানে বুঝি?

ইরসাদ নীরসকণ্ঠে বলিল—হাঁ। বিশ্বনাথ এসেছে শুনলাম। তাই যাব একবার মহাগেরামে।

—মহাগেরামে সে আসে নাই। জংশনের ডাক-বাংলোয় আছে। দেবুও সেইখানে।

—জংশনে?

—হাঁ।—বলিয়া ডাক্তার আপন মনে বিড়ি টানিতে আরম্ভ করিল। আর কথা বলিল না।

আরও খানিকটা আগে—হরেন ঘোষালের বাড়ী। ঘোষাল উত্তেজিত ভাবে বাড়ীর সামনে ঘুরিতেছিল, আপন মনেই সংস্কৃত আওড়াইতেছিল—স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।

ইরসাদ আরও খানিকটা আশ্চর্য হইয়া গেল। ঘোষালও যায় নাই। সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—ঘোষাল, কাণ্ডটা কি?

ঘোষাল লাফ দিয়া নিজের দাওয়ায় উঠিয়া বলিল—যাও, যাও, বিশুবাবু খানা সাজিয়ে রেখেছে—খেয়ে এস গিয়ে—যাও!—বলিয়াই সে ঘরে ঢুকিয়া দরজাটা দড়াম করিয়া বন্ধ করিয়া দিল।

আরও খানিকটা আগে—গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ, শ্রীহরি ঘোষের ঠাকুরবাড়ী। সেই ঠাকুরবাড়ীর নাটমন্দিরে বেশ একটি জনতা জমিয়া গিয়াছে। শ্রীহরি গম্ভীরভাবে পদচারণা করিতেছে। প্রাচীন বয়সীরা উদাসভাবে বসিয়া আছে। কথা বলিতেছে শুধু ঘোষের কর্মচারী দাসজী—কঙ্কণার বড়বাবু তো অজগরের মত ফুঁসছে—বুঝলেন কিনা? বলছে—আমি ছাড়ব না। মহামহোপাধ্যায়ই হোক—আর পীরই হোক, এর বিহিত আমি করবই।

ইরসাদের আর সন্দেহ রহিল না। কোন একটা গোলমাল হইয়াছে নিশ্চয়ই। সে ভাবিতেছিল—কোথায় যাইবে? ডাক্তার বলিল—বিশ্বনাথ জংশনের ডাক-

বাংলোয় আছে। দেবু সেখানে আছে। জংশনে যাওয়াই বোধ হয় ভাল, কিন্তু তাহার আগে সঠিক সংবাদ কাহার কাছে পাওয়া যায়?

হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল—দেবুর দাওয়ায় দাঁড়াইয়া আছে দুর্গা। ইরসাদ দ্রুতপদে আসিয়া দুর্গাকে জিজ্ঞাসা করিল—দুগ্‌গা, দেবু-ভাই কোথায় বল দেখি?

দুর্গা ম্লানমুখে বলিল—মহাগেরাম—ঠাকুর মশায়ের বাড়ী গিয়েছে।

—মহাগেরাম? তবে যে ডাক্তার বললে—জংশনে!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দুর্গা বলিল—সেখান থেকে মহাগেরামে গিয়েছে—ঠাকুর মশায়ের সঙ্গে।

—কি ব্যাপার বল দেখি? সবাই দেখি হৈচৈ করছে!

দুর্গার চোখে জল আসিয়া গেল। কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া দুর্গা বলিল—সে এক সর্বনেশে কাণ্ড শেখ মশায়। ঠাকুর মশায়ের নাতিকে নাকি পুলিশে জেলে দিয়েছে। ক'জনের সঙ্গে একসঙ্গে ধরেছে। ঠাকুর মশায় নাকি নিজের চোখে সব দেখেছেন। ঠাকুর মশায় নাকি থরথর করে কেঁপে ময়ূরাক্ষীর বালির ওপর পড়ে গিয়েছিলেন। এ চাকলায় সবাই এই নিয়ে বল্‌বল্‌ করছে। জামাই-পণ্ডিত ঠাকুর মশায়কে ধরে তুলে তাঁর বাড়ী নিয়ে গিয়েছে।

একুশ

জীবনে এইটাই বোধ হয় ন্যায়রত্নের পক্ষে প্রচণ্ডতম আঘাত।

প্রৌঢ়ত্বের প্রথম অধ্যায়ে—পুত্রের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ার ফলে তিনি এক প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াছিলেন। পুত্র শশিশেখর আত্মহত্যা করিয়াছিল। চলন্ত ট্রেনের সামনে সে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে মিলিয়াছিল শুধু একতাল মাংসপিণ্ড! ন্যায়রত্ন স্থির অকম্পিত ভাবে দাঁড়াইয়া সেই বৃদ্ধ—পুত্রের সেই দেহাবশেষ মাংসপিণ্ড দেখিয়াছিলেন; সযত্নে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত অস্থি-মাংস-মেদ-মজ্জা একত্রিত করিয়া, তাহার সৎকার করিয়াছিলেন। পৌত্র বিশ্বনাথ তখন শিশু। পুত্রবধূকে দিয়া তিনি শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন

করাইয়াছিলেন। বাহিরে তাঁহার একবিন্দু চাঞ্চল্য কেহ দেখে নাই। আজ কিন্তু ন্যায়রত্ন থরথর করিয়া কাঁপিয়া ময়ূরাক্ষীগর্ভের উত্তপ্ত বালির উপর বসিয়া পড়িলেন! বিশ্বনাথের অনেক বিদ্রোহ সহ্য করিয়াছেন। সে যে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার জীবনাদর্শের এবং পুণ্যময় কুলধর্মের বিপরীত-মত পোষণ করে এবং সে-সবকে সে অস্বীকার করে—তাহা তিনি পূর্ব হইতেই জানেন। বহুবার পৌত্রের সঙ্গে তাঁহার তর্ক হইয়াছে। তর্কের মধ্যে পৌত্রের মৌখিক বিদ্রোহকে তিনি সহ্য করিয়াছিলেন। মনে মনে নিজেকে নির্লিপ্ত দ্রষ্টার আসনে বসাইয়া, বিশ্বসংসারের সমস্ত কিছুকে মহাকালের দুর্জ্ঞেয় লীলা ভাবিয়া সমস্ত কিছু হইতে লীলা-দর্শনের আনন্দ-আস্বাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আজ পৌত্রের মৌখিক মতবাদকে বাস্তবে প্রত্যক্ষ করিয়া তর্কের বিদ্রোহকে কর্মে পরিণত হইতে দেখিয়া, মুহূর্তে তাঁহার মনোজগতে একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। আজ ধর্মদ্রোহী, আচারভ্রষ্ট পৌত্রকে দেখিয়া, তীব্রতম করুণ ও রৌদ্র রসে বিচলিত অভিভূত হইয়া, আপনার অজ্ঞাতসারে কখন দর্শকের নির্লিপ্ততার আসনচ্যুত হইয়া ন্যায়রত্ন অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চে নামিয়া পড়িয়া নিজেই সেই মহাকালের লীলায় ক্রীড়নক হইয়া পড়িলেন।

কয়েক দিন তিনি বিশ্বনাথকে প্রত্যাশা করিতেছিলেন। জয়াকে সে একটা পোস্টকার্ডে চিঠিতে লিখিয়াছিল—সে এবং আরও কয়েকজন ও-দিকে যাইবে। ন্যায়রত্ন লিখিয়াছিলেন—তোমরা কজন আসিবে লিখিবে। কাহারও কোন বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে কিনা তাহাও জানাইবে।...সে পত্রের উত্তর বিশ্বনাথ তাঁহাকে দেয় নাই। গতকাল সন্ধ্যার সময় দেবু তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইয়াছিল যে রাত্রি দেড়টার গাড়ীতে বিশু-ভাই কলিকাতার কয়েকজন কর্মী বন্ধুকে লইয়া জংশনে নামিবে। কিন্তু সে লিখিয়াছে, তাহারা 'জংশনের ডাক-বাংলোতেই থাকিবার ব্যবস্থা করিবে'।

ন্যায়রত্ন মনে-মনে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। রাত্রিতে বাড়ীতে আসিলে কি অসুবিধা হইত? বাড়ীতে আজিও রাত্রে দুইজন অতিথির মত খাদ্য রাখিবার নিয়ম আছে। অতিথি না আসিলে, সকালে সে খাদ্য দরিদ্রকে ডাকিয়া দেওয়া হয়। প্রতিদিন সকালে দরিদ্ররা আসিয়া এ-বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া থাকে।

বাসি হইলেও উপাদেয় উপকরণময় খাদ্য উচ্ছিষ্ট নয়; এই খাদ্যটির জন্য এ গ্রামের দরিদ্ররা সকলেই লোলুপ হইয়া থাকে। জয়া এখন পালা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। সেই গৃহে বিশ্বনাথ রাত্রিতে অতিথি লইয়া আসিতে দ্বিধা করিল! বন্ধুরা হয়তো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বিশ্বনাথ হয়তো ভাবিয়াছে তাহাদের যথোপযুক্ত মর্যাদা এ গৃহের প্রাচীনধর্মী গৃহস্বামী দিতে পারিবেন না।

জয়া কিন্তু ব্যাপারটাকে অত্যন্ত সহজ সরল করিয়া লইয়াছিল। বিশ্বনাথের প্রতি তাহার কোন সন্দেহ জন্মিবার কারণ আজও ঘটে নাই। পিতামহের সঙ্গে বিশ্বনাথ তর্ক করে, সে তর্কের বিশেষ কিছু সে বুঝিত না, তর্কের সময় সে শঙ্কিত হইত, আবার তর্কের অবসানে পিতামহ এবং পৌত্রের স্বাভাবিক ব্যবহার দেখিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিত। কখনও স্বামীকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে বিশ্বনাথ হাসিয়া কথাটাকে উড়াইয়া দিত; বলিত—ওসব হলো পণ্ডিতি কচ্‌কচি আমাদের! শাস্ত্রে বলেছে—অজা-যুদ্ধ আর ঋষি-শ্রাদ্ধ আড়ম্বরে ও গুরুত্বে এক রকমের ব্যাপার। প্রথমটা খুব হৈ-হৈ তর্কাতর্কি—দেখেছ তো বিচার-সভা—এই মারে তো এই মারে কাণ্ড! তারপর সভা শেষ হল—বিদেয় নিয়ে সব হাসতে হাসতে যে যার বাড়ী চলে গেল! আমাদেরও তাই আর কি। সভা শেষ হল এইবার বিদেয় কর দিকি! তুমিই তো গৃহস্বামিনী! বলিয়া সে সাদরে স্ত্রীকে কাছে টানিয়া লইত। জয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-ঘরের মেয়ে, আক্ষরিক লেখাপড়া তেমন না করিলেও অজা-যুদ্ধ, ঋষি-শ্রাদ্ধ উপমা সমন্বিত বিশ্বনাথের যুক্তি রস-সমেত উপভোগ করিত, এবং তর্কের মূল তত্ত্বের কিছু গন্ধও যেন পাইত।

জয়া কতবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে—তুমি কি করতে চাও বল দেখি?

—মানে?

—মানে দাদুর সঙ্গে তর্ক করছ, বলছ—ঈশ্বর নাই—জাত মানি না। ছি, ওই আবার বলে না কি—এত বড় লোকের নাতি হয়ে?

—বলে না বুঝি?

—না। বলতে নাই।

—স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বিশ্বনাথ হাসিত। অল্প বয়সে তাহার বিবাহ

দিয়াছিলেন ন্যায়রত্ন। বিশ্বনাথের মা—ন্যায়রত্নের পুত্রবধূ—বহুদিন পূর্বেই মারা গিয়াছেন। ন্যায়রত্নের স্ত্রী—বিশ্বনাথের পিতামহী মারা যাইতেই জয়া ঘরের গৃহিণী-পদ গ্রহণ করিয়াছে। তখন তাহার বয়স ছিল সবে ষোলো। বিশ্বনাথ সেবারেই ম্যাট্রিক পাস করিয়া কলেজে ভর্তি হইয়াছিল। তখন সে-ও ছিল পিতামহের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। হোস্টেলে থাকিত; সন্ধ্যাআহ্নিক করিত নিয়মিত। তখন তাহার নিকট কেহ নাস্তিকতার কথা বলিলে—সে শিশু-কেউটের মত ফণা তুলিয়া তাহাকে আক্রমণ করিত। এমনও হইয়াছে যে, তর্কে হারিয়া সে সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়াছে। তাহার পর কিন্তু ধীরে ধীরে বিরাট মহানগরীর রূপ-রসের মধ্যে এবং দেশদেশান্তরে রাজনৈতিক ইতিহাসের মধ্যে সে এক অভিনব উপলব্ধি লাভ করিতে আরম্ভ করিল। যখন তাহার এ পরিবর্তন সম্পূর্ণ হইল, তখন জয়ার দিকে চাহিয়া দেখিল—সে-ও জীবনে একটা পরিণতি লাভ করিয়াছে। তাহার কিশোর মন উত্তপ্ত তরল ধাতুর মত ন্যায়রত্নের ঘরের গৃহিণীর ছাঁচে পড়িয়া, সেইরূপেই গড়িয়া উঠিয়াছে, শুধু তাই নয়—তাহার কৈশোরের উত্তাপও শীতল হইয়া আসিয়াছে। ছাঁচের মূর্তির উপাদান কঠিন হইয়া গিয়াছে, আর সে ছাঁচ হইতে গলাইয়া অন্য ছাঁচে ঢালিবার উপায় নাই। ভাঙিয়া গড়িতে গেলে—এখন ছাঁচটা ভাঙিতে হইবে। ন্যায়রত্নের সঙ্গে জয়া জড়াইয়া গিয়াছে অবিচ্ছেদ্যভাবে। জয়াকে ভাঙিয়া গড়িতে গেলে, তাহার দাদুকে আগে ভাঙিতে হইবে। তাই বিশ্বনাথ—স্ত্রীর সঙ্গে ছলনা করিয়া দিনগুলি কাটাইয়া আসিয়াছে।

স্বামীর হাসি দেখিয়া জয়া তাহাকে তিরস্কার করিত। তাহাতেও বিশ্বনাথ হাসিত। এ হাসিতে জয়া পাইত আশ্বাস। এ হাসিকে স্বামীর আনুগত্য ভাবিয়া, সে পাকা গৃহিণীর মত আপন মনেই বকিয়া যাইত।—

আজ জয়া দাদুকে বলিল—আপনি বড় উতলা মানুষ দাদু! রাত্রে নেমে ইস্টিশনে ডাক-বাংলোয় থাকবে শুনে অবধি আপনি পায়চারি করছেন। থাকবে তো হয়েছে কি?

ন্যায়রত্ন ম্লান-হাসি হাসিয়া নীরবে জয়ার দিকে চাহিলেন। সে হাসির অর্থ

পরিষ্কারভাবে না বুঝিলেও আঁচটা জয়া বুঝিল। সে-ও হাসিয়া বলিল—আপনি আমাকে যত বোকা ভাবেন দাদু, তত বোকা আমি নই। তারা সব জংশনে নামবে রাত্রে দেড়টা-দুটোয়। তারপর জংশন থেকে—রেলের পুল দিয়ে নদী পার হয়ে—বকনা, কুসুমপুর, শিবকালীপুর—তিনখানা গ্রাম পেরিয়ে আসতে হবে। তার চেয়ে রাতটা ডাক-বাংলোয় থাকবে, ঘুমিয়ে-টুমিয়ে সকালবেলা দিব্যি খেয়া-ঘাটে নদী পার হয়ে—সোজা চলে আসবে বাড়ী।

ন্যায়রত্নকেও কথার যুক্তিটা মানিতে হইল। জয়া অযৌক্তিক কিছু বলে নাই। তা ছাড়া ন্যায়রত্নের আজ জয়ার বলটাই সকলের চেয়ে বড় বল। তাঁহার সঙ্গে প্রচণ্ড তর্ক করিয়া বিশ্বনাথ যখন ন্যায়রত্ন-বংশের কুলধর্মপরায়ণা জয়ার আঁচল ধরিয়া হাসিমুখে বেড়াইত—তখন তিনি মনে মনে হাসিতেন। মহাযোগী মহেশ্বর উন্মত্তের মত ছুটিয়াছিলেন—মোহিনীর পশ্চাতে। বৈরাগী-শ্রেষ্ঠ তপস্বী শিব উমার তপস্যায় ফিরিয়াছিলেন কৈলাস-ভবনে। তাঁহার জয়া যে একাধারে দুই, —রূপে সে মোহিনী, বিশ্বনাথের সেবায় তপস্যায় সে উমা। জয়াই তাঁহার ভরসা। জয়ার কথায় আবার তিনি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—সেখানে একবিন্দু উদ্বেগের চিহ্ন নাই। ন্যায়রত্ন এবার আশ্বাস পাইলেন। জয়ার যুক্তিটাকে বিচার করিয়া মানিয়া লইলেন—জয়া ঠিকই বলিয়াছে।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া আবার তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। জয়ার যুক্তি সহজ সরল—কোথাও এতটুকু অবিশ্বাসের অবকাশ নাই, কিন্তু বিশ্বনাথ সংবাদটা তাঁহাকে না দিয়া জয়াকে দিল কেন? বিশ্বনাথ আজকাল জয়াকে পোস্টকার্ডে চিঠি লেখে কেন? তাহাদের দুইজনের সম্বন্ধের রং কি তাহার ওই চিঠির ভাষার মত ফিকে হইয়া আসিয়াছে? লৌকিক মূল্য ছাড়া অন্য মূল্যের দাবি হারাইয়াছে?—মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বাহিরে আসিলেন।

—কে? দাদু?—জয়ার কণ্ঠস্বর শুনিয়া ন্যায়রত্ন চমকিয়া উঠিলেন। লক্ষ্য করিলেন—জয়ার ঘরের জানালার কপাটের ফাঁকে প্রদীপের আলোর ছটা জাগিয়া রহিয়াছে। ন্যায়রত্ন বলিলেন—হাঁ, আমি! কিন্তু তুমি এখনও জেগে?

জয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। হাসিয়া বলিল—আপনার বুঝি ঘুম

আসছে না? এখনও সেই সব উদ্ভট ভাবনা ভাবছেন?

ন্যায়রত্ন আপনাকে সংযত করিয়া হাসিয়া বলিলেন—আসন্ন মিলনের পূর্বক্ষণে সকলেই অনিদ্রা-রোগে ভোগে, দাদা! শকুন্তলা যেদিন স্বামিগৃহে যাত্রা করেছিলেন, তার পূর্বরাত্রে তিনিও ঘুমোন নি।

জয়া হাসিয়া বলিল—আমি গোবিন্দজীর জন্যে চাদর তৈরি করছিলাম।

—গোবিন্দজীর জন্যে চাদর তৈরি করছিলে? আমার গোবিন্দজীকেও তুমি এবার কেড়ে নেবে দেখছি। তোমার চারু মুখ আর সুচারু-সেবায়—তোমার প্রেমে না পড়ে যান আমার গোবিন্দজী!

জয়া নীরবে শুধু হাসিল।

—চল, দেখি—কি চাদর তৈরি করছ।

চমৎকার একফালি গরদ! গরদের ফালিটির চারি পাশে সোনালী পাড় বসাইয়া চাদর তৈয়ারি হইতেছে। ন্যায়রত্ন বলিলেন—বাঃ, চমৎকার সুন্দর হয়েছে ভাই।

হাসিয়া জয়া বলিল—আপনার নাতি এনেছিল রুমাল তৈরি করবার জন্যে। আমি বললাম, রুমাল নয়—এতে গোবিন্দজীর চাদর হবে। জরি এনে দিয়ো। আর খানকটা নীলরঙের খুব পাতলা ফিনফিনে বেনারসী সিল্কের টুকরো। রাধা-রাণীর ওড়না করে দেব। গোবিন্দজীর চাদর হল—এইবার রাধারাণীর ওড়না করব।

ন্যায়রত্নের সমস্ত অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার ভাগ্যে যাই থাক—জয়ার কখনও অকল্যাণ হইতে পারে না। না, কখনও না।

ভোরবেলায় উঠিয়াই কিন্তু ন্যায়রত্ন আবার চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। প্রত্যাশা করিয়াছিলেন—বিশ্বনাথের ডাকেই তাঁহার ঘুম ভাঙিবে। সে আসিয়া এখান হইতে তাহার বন্ধুদের জন্যে গাড়ী পাঠাইবে। প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া তিনি আসিয়া দাঁড়াইলেন—টোল-বাড়ীর সীমানার শেষপ্রান্তে। ওখান হইতে গ্রাম্য পথটা অনেকখানি দূর অবধি দেখা যায়।

কাহার বাড়ীতে কান্নার রোল উঠিয়াছে। ন্যায়রত্ন একটা দীর্ঘনিশ্বাস

ফেলিলেন। অকাল-মৃত্যুতে দেশ ছাইয়া গেল। আহা, আবার কে সন্তানহারা হইল বোধ হয়!

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ন্যায়রত্ন ফিরিয়া চাদরখানি টানিয়া লইয়া পথে নামিলেন। আসিয়া দাঁড়াইলেন গ্রামের প্রান্তে। পূর্বদিগন্তে জবাকুসুম-সঙ্কাশ সবিতার উদয় হইয়াছে। চারদিক সোনার বর্ণ আলোয় ভরিয়া উঠিয়াছে। দিগ্‌-দিগন্ত স্পষ্ট পরিষ্কার। পঞ্চগ্রামের বিস্তীর্ণ শস্যহীন মাঠখানার এখানে-ওখানে জমিয়া-থাকা-জলের বুকে আলোকচ্ছটার প্রতিবিম্ব ফুটিয়াছে। ময়ূরাক্ষীর বাঁধের উপরে শরবন বাতাসে কাঁপিতেছে। ওই শিবকালীপুর। এদিকে দক্ষিণে বাঁধের প্রান্ত হইতে আল-পথ। কেহ কোথাও নাই। বহুদূরে—সম্ভবত শিবকালীপুরের পশ্চিম প্রান্তে সবুজ খানিকটা মাঠের মধ্যে কালো কালো কয়েকটা কাঠির মত কি নড়িতেছে। চাষের ক্ষেতে চাষীরা বোধ হয় কাজ করিতেছে!...ন্যায়রত্ন ধীরে ধীরে আল-পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। উদ্বেগের মধ্যে তিনি মনে মনে বার বার পৌত্রকে আশীর্বাদ করিলেন। মানুষের এই দারুণ দুঃসময়—মুখের অন্ন বন্যায় ভাসিয়া গেল, মানুষ আজ গৃহহীন, ঘরে ঘরে ব্যাধি, আকাশে বাতাসে শোকের রোল,—এই দারুণ দুঃসময়ে বিশ্বনাথ যাহা করিয়াছে—করিতেছে, সে বোধ করি মহাযজ্ঞের সমান পুণ্যকর্ম। পূর্বকালে ঋষিরা এমন বিপদে যজ্ঞ করিয়া দেবতার আশীর্বাদ আনিতেন মানুষের কল্যাণের জন্য। বিশ্বনাথও সেই কল্যাণ আনিবার সাধনা করিতেছে। মনে মনে তিনি বার বার পৌত্রকে আশীর্বাদ করিলেন—ধর্মে তোমার মতি হোক—ধর্মকে তুমি জান, তুমি দীর্ঘায়ু হও—বংশ আমাদের উজ্জ্বল হোক!

মাথার উপর শন্ শন্ শব্দ শুনিয়া ন্যায়রত্ন ঈষৎ চকিত হইয়া আকাশের দিকে চাহিলেন। তাঁহার মন শিহরিয়া উঠিল। গোবিন্দ! গোবিন্দ! মাথার উপর পাক দিয়া উড়িতেছে একঝাঁক শকুন। আকাশ হইতে নামিতেছে। ময়ূরাক্ষীর বাঁধের ওপাশে বালুচরের উপর শ্মশান, সেইখানে। ন্যায়রত্ন আবার শিহরিয়া উঠিলেন—মানুষ আর শব সৎকার করিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছে না! শ্মশানে গোটা দেহটা ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে!

বাঁধের ওপারে বালুচরের উপর নামিয়া দেখিলেন—শ্মশান নয়—ভাগাড়ে নামিতেছে শকুনের দল। তিনটা গরুর মৃতদেহ পড়িয়া আছে। একটি তরুণ-বয়সী দুগ্ধবতী গাভী। পঞ্চগ্রামের গরীব গৃহস্থেরা সর্বস্বান্ত হইয়া গেল! সবাই হয়তো ধ্বংস হইয়া যাইবে। থাকিবে শুধু দালান-কোঠার অধিবাসীরা।...

—ঠাকুর মশায়! এত বিয়ান বেলায় কুথা যাবেন?

অন্যমনস্ক ন্যায়রত্ন মুখ তুলিয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখেন—খেয়া নৌকার পাটনী শশী ভাঙা হাসির উপর মাথা ঠেকাইয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিতেছে।

—কল্যাণ হোক। একবার ওপারে যাব।

শশী নৌকাখানাকে টানিয়া একেবারে কিনারায় ভিড়াইল।

ময়ূরাক্ষীর নিকটেই ডাক-বাংলো।

ন্যায়রত্ন তীরে উঠিয়া মনে মনে বিশ্বনাথকে আশীর্বাদ করিলেন।

তাহার বন্ধুদের কল্পনা করিলেন। মনে তাঁহার জাগিয়া উঠিল শিবকালীপুরের তরুণ নজরবন্দীটির ছবি। প্রত্যাশা করিলেন—হয়তো সেই যতীনবাবুটিকেও দেখিতে পাইবেন।

ডাক-বাংলোর ফটকে ঢুকিয়া তিনি শুনিলেন—উচ্ছ্বসিত হাসির কলরোল। হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত হাসি। এ হাসি যাহারা হাসিতে না পারে—তাহারা কি এই দেশ-ব্যাপী শোকার্ত ধ্বনি মুছিতে পারে? হ্যাঁ—উপযুক্ত শক্তিশালী প্রাণের হাসি বটে!

ন্যায়রত্ন ডাক-বাংলোর বারান্দায় উঠিলেন। সম্মুখের দরজা বন্ধ, কিন্তু জানালা দিয়া সব দেখা যাইতেছে। একখানা টেবিলের চারিধারে পাঁচ-ছয়জন তরুণ বসিয়া আছে, মাঝখানে একখানা চীনামাটির রেকাবির উপর বিস্কুট-জাতীয় খাবার। একটি তরুণী চায়ের পাত্র হাতে দাঁড়াইয়া আছে; ভঙ্গি দেখিয়া বুঝা যায়—সে চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু কেহ একজন তাহার হাত ধরিয়া আটকাইয়া রাখিয়াছে। যে ধরিয়াছিল—সে পিছন ফিরিয়া বসিয়া থাকিলেও—ন্যায়রত্ন চমকিয়া উঠিলেন। ও কে? বিশ্বনাথ?—হ্যাঁ বিশ্বনাথই তো!!

মেয়েটি বলিল—ছাড়ুন। দেখুন, বাইরে কে একজন বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন।

তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া মুখ ফিরাইল বিশ্বনাথ।

—দাদু, এখানে আপনি!—বিশ্বনাথ উঠিয়া পড়িল—তাহার এক হাতে আধখাওয়া ন্যায়রত্নের অপরিচিত খাদ্যখণ্ড। পরমুহূর্তেই সে বন্ধুদের দিকে ফিরিয়া বলিল—আমার দাদু! ··মেয়েটি পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

তাহারা সকলেই সসম্ভ্রমে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরের মধ্যে বেনুও কোন্‌খানে ছিল। সে দরজা খুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—ঠাকুর মশায়, বিশু-ভাই চা খেয়েই আসছে। চলুন, আমরা ততক্ষণ রওনা হই।

ন্যায়রত্ন বেনুর মুখের দিকে একবার চাহিয়া, তাহাকে অতিক্রম করিয়া ঘরে ঢুকিলেন; সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন বিশ্বনাথের বন্ধুদের দিকে। পাঁচজনের মধ্যে দুইজনের অঙ্গে বিলাতী পোশাক। বিশ্বনাথের বন্ধুরা সকলেই উঁহাকে নমস্কার করিল।

বিশ্বনাথ বলিল—আমার বন্ধু এঁরা। আমরা সব একসঙ্গে কাজ করে থাকি, দাদু!

ন্যায়রত্ন বলিলেন—তোমার বন্ধু ছাড়া ওঁদের একটা করে বিশেষ পরিচয় আছে আসল, ভাই! সেই পরিচয়টা দাও। কাকে কি বলে ডাকব?

বিশ্বনাথ পরিচয় দিল—ইনি শ্রীধর সেন, ইনি অমর বসু, ইনি পিটার পরিমল রায়—

—পিটার পরিমল!

—হ্যাঁ, উনি ক্রিশ্চান।

ন্যায়রত্ন স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। শুধু একবার চকিতের দৃষ্টি তুলিয়া চাহিলেন পৌত্রের দিকে।

—আর ইনি—আবদুল হামিদ।

ন্যায়রত্নের দৃষ্টি ঈষৎ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

—আর ইনি জীবন বীরবংশী।

বীরবংশী অর্থাৎ ডোম। ন্যায়রত্ন এবার চাহিলেন টেবিলের দিকে, একখানি মাত্র চীনামাটির প্লেটে খাবার সাজানো রহিয়াছে—এবং সে খাবার খণ্ডিত

হইয়াছে। চায়ের কাপগুলি সবই টেবিলের উপর নামানো। সেই মুহূর্তেই সেই মেয়েটি ও-ঘর হইতে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতে ধোয়া জামা ও গেঞ্জি।

—আর ইনিও আমাদের সহকর্মী দাদু—অরুণা সেন, প্রিয়ব্রতের বোন!

মেয়েটি হাসিয়া ন্যায়রত্নকে প্রণাম করিল, বলিল—আপনি বিশ্বনাথ-বাবুর দাদু!

ন্যায়রত্ন শুধু বলিলেন—থাক্, হয়েছে।...অস্ফুট মৃদু কণ্ঠস্বর যেন জড়াইয়া যাইতেছিল।

মেয়েটি জামা ও গেঞ্জি বিশ্বনাথকে দিয়া বলিল—নিন, জামা-গেঞ্জি পাল্টে ফেলুন দিকি! সকলের হয়ে গেছে। চলুন, বেরুতে হবে।

হাসিম একখানা চেয়ার আগাইয়া দিল, বলিল—আপনি বসুন।

ন্যায়রত্নের সংযম যেন ফুরাইয়া যাইতেছে। সুখ, দুঃখ, এমন কি দৈহিক কষ্ট সহ্য করিয়া, তাহার মধ্য হইতে যেন রসোপলব্ধির শক্তি তাঁহার বোধ হয় নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে। স্নায়ুশিরার মধ্য দিয়া একটা কম্পনের আবেগ বহিতে সুরু করিয়াছে, মস্তিষ্ক মন আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে সে আবেগে। তবু হাসিমের মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষীণ হাসি হাসিয়া তিনি বসিলেন।

বিশ্বনাথ জামা ও গেঞ্জি খুলিয়া ফেলিয়া, পরিষ্কার জামা-গেঞ্জি পরিতে লাগিল। ন্যায়রত্ন বিশ্বনাথের অনাবৃত দেহের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বিশ্বনাথের দেহ যেন বানবিধ্বস্ত নিরাভরণ হাত ভূমির মত দীপ্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার গৌর দেহ-বর্ণ পর্যন্ত অনুজ্জ্বল, শুধু অনুজ্জ্বল নয়, একটা দৃষ্টিকটু রুক্ষতায় লাবণ্যহীন। ওঃ তাই তো! উপবীত! বিশ্বনাথের গৌরবর্ণ দেহখানিকে ত্রিবক্র বেষ্টনে বেড়িয়া শুচি-শুভ্র উপবীতের যে মহিমা—যে শোভা ঝলমল করিত, সেই শোভার অভাবে এমন মনে হইতেছে। ন্যায়রত্নের দেহের কম্পন এবার স্পষ্ট পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তিনি আপনার হাতখানা বাড়াইয়া দিয়া ডাকিলেন—পণ্ডিত! দেবু পণ্ডিত রয়েছ?

দেবু আশঙ্কায় স্তব্ধ হইয়া দূরে দাঁড়াইয়া ছিল! সে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল—আজ্ঞে?

—আমার শরীরটা যেন অসুস্থ হয়েছে মনে হচ্ছে। আমায় তুমি বাড়ী পৌঁছে দিতে পার ?

সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিল। অরুণা মেয়েটি কাছে আসিয়া বলিল—বিছানা করে দেব, শোবেন একটু ?

—না।

বিশ্বনাথ অগ্রসর হইয়া আসিল, ডাকিল—দাদু !

নিষ্ঠুর যন্ত্রণা-কাতর স্থানে স্পর্শোদ্যত মানুষকে যে চকিত ভঙ্গিতে—যন্ত্রণায় রুদ্ধবাক্ রোগী হাত তুলিয়া ইঙ্গিতে নিষেধ করে, তেমনি চকিতভাবে ন্যায়রত্ন বিশ্বনাথের দিকে হাত তুলিলেন।

অরুণা ব্যস্ত উদ্বিগ্ন হইয়া প্রশ্ন করিল—কি হল ?

অন্য সকলেও গভীর উদ্বেগের সহিত তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

ন্যায়রত্ন চোখ বুজিয়া বসিয়া ছিলেন। তাঁহার কপালে ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে কয়েকটি গভীর কুঞ্চন-রেখা জাগিয়া উঠিয়াছে। বিশ্বনাথ তাঁহার বেদনাতুর পাণ্ডুর মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল ন্যায়রত্নের অবস্থাটা সে উপলব্ধি করিয়াছে।

কয়েক মিনিটের পর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ন্যায়রত্ন চোখ খুলিলেন, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—তোমাদের কল্যাণ হোক ভাই ? আমি তা হলে উঠলাম।

—সে কি ! এই অসুস্থ শরীরে এখন কোথায় যাবেন ;—বিশ্বনাথের বন্ধু পিতার পরিমল ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

—না, আমি এইবার সুস্থ হয়েছি !

বিশ্বনাথ বলিল—আমি আপনার সঙ্গে যাই ?

—না।—বলিয়াই ন্যায়রত্ন দেবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—তুমি আমায় একটু সাহায্য কর পণ্ডিত ! আমায় একটু এগিয়ে দাও।

দেবু সসম্ভ্রমে ব্যস্ত হইয়া কাছে আসিয়া বলিল—হাত ধরব ?

—না, না।—ন্যায়রত্ন জোর করিয়া একটু হাসিলেন—শুধু একটু সঙ্গে চল

ন্যায়রত্ন বাহির হইয়া গেলেন ; ঘরখানা অস্বাভাবিকরূপে স্তব্ধ, স্তম্ভিত হইয়া গেল। কেহই কোন কথা বলিতে পারিল না। ন্যায়রত্ন প্রাণপণ চেষ্টায় যে কথা গোপন রাখিয়া গেলেন—মনে করিলেন, সে কথা তাঁহার শেষের কয়েকটি কথায়, হাসিতে, পদক্ষেপের ভঙ্গিতে বলা হইয়া গিয়াছে।

বিশ্বনাথ নীরবে বাহির হইয়া আসিল। ডাক-বাংলোর সামনের বাগানের শেষপ্রান্তে ন্যায়রত্ন দাঁড়াইয়া ছিলেন। বিশ্বনাথ কাছে আসিবামাত্র বলিলেন—হ্যাঁ, জয়াকে—? জয়াকে কি পাঠিয়ে দেব তোমার কাছে?

বিশ্বনাথ হাসিল, বলিল—সে আসবে না।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—না, না। তাকে আসতে আমি বাধ্য করব।

—বাধ্য করলে অবশ্য সে আসবে। কিন্তু তাকে শুধু দুঃখ পেতেই পাঠাবেন।

—জয়াকেও তুমি দুঃখ দেবে?

—আমি দেব না, সে নিজেই পাবে, সাধ করে টেনে বুকে আঘাত নেবে; যেমন আপনি নিলেন। কষ্টের কারণ আপনার আছে আমি স্বীকার করি। কিন্তু সেই কষ্ট স্বাভাবিকভাবে আপনাকে এতখানি কাতর করে নি। কষ্টটাকে নিয়ে আপনি আবার বুকের ওপর পাথরের আঘাতের মতন—আঘাত করেছেন। জয়াও ঠিক এমনি আঘাত পাবে। কারণ, সে এতকাল আপনার পৌত্রবধূ হবারই চেষ্টা করেছে—জেনে রেখেছে, সেইটাই তার একমাত্র পরিচয়। আজকে সত্যকার আমার সঙ্গে নূতন করে পরিচয় করা তার পক্ষে অসম্ভব। আপনিও হয়তো চেষ্টা করলে পারেন, সে পারবে না।—

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—কুলধর্ম বংশপরিচয় পর্যন্ত তুমি পরিত্যাগ করেছ—উপবীত ত্যাগ করেছ তুমি। তোমার মুখে এ কথা অপ্রত্যাশিত নয়। অপরাধ আমারই। তুমি আমার কাছে আত্মগোপন কর নি, তোমার স্বরূপের আভাস তুমি আমাকে আগেই দিয়েছিলে। তবু আমি জয়াকে—আমার পৌত্রবধূর কর্তব্যের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছিলাম, তোমার আধ্যাত্মিক বিপ্লব লক্ষ্য করতে তাকে অবসর পর্যন্ত দিই নি। কিন্তু—

—বলুন।

—না। আর কিছু নাই আমার, আজ থেকে তুমি আমার কেউ নও। অপরাধ—এমন কি পাপও যদি হয় আমার হোক। জয়া আমার পৌত্রবধূই থাক্। তোমাকে অনুরোধ—আমার মৃত্যুর পর যেন আমার মুখাগ্নি করো না। সে অধিকার রইল জয়ার।

বিশ্বনাথ হাসিল। বলিল—বঞ্চনাকেও হাসিমুখে সইতে পারলে, সে বঞ্চনা তখন হয় মুক্তি। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন—আমি যেন এ হাসিমুখে সইতে পারি।...সে প্রণাম করিবার জন্য মাথা নত করিল।

ন্যায়রত্ন পিছাইয়া গেলেন, বলিলেন—থাক্, আশীর্বাদ করি, এ বঞ্চনাও তুমি হাসিমুখে সহ্য কর। বলিয়াই তিনি পিছন ফিরিয়া পথে অগ্রসর হইলেন। দেবু নতমস্তকে নীরবে তাঁহার অনুগমন করিল।

বিশ্বনাথ তাহার দিকে চাহিয়া হাসিবার চেষ্টা করিল।...

ন্যায়রত্ন খেয়া-ঘাটের কাছে আসিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। পিছন ফিরিয়া হাতখানি প্রসারিত করিয়া দিয়া আর্ত কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—পণ্ডিত! পণ্ডিত!

আজ্ঞে!—বলিয়া দেবু ছুটিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ন্যায়রত্ন আজীবনের পৌত্রশূন্য নদীর বালির উপর বসিয়া পড়িলেন।...

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাঁচখানা গ্রামে কথাটা ছড়াইয়া পড়িল। অভাবে রোগে শোকে জর্জরিত মানুষেরাও সভয়ে শিহরিয়া উঠিল। সচ্ছল অবস্থার প্রতিষ্ঠাপন্ন কয়েকজন—এ অনাচারের প্রতিকারে হইয়া উঠিল বদ্ধপরিকর।

ইরশাদের সঙ্গে দেবুর পথেই দেখা হইয়া গেল।

দেবু গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় মাথা হেঁট করিয়া পথ চলিতেছে। ইরশাদের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হইল; দেবু মুখ তুলিয়া ইরশাদের দিকে চাহিয়া ভাল করিয়া একবার চোখের পলক ফেলিয়া যেন নিজেকে সচেতন করিয়া লইল। তারপর মৃদুস্বরে বলিল—ইরশাদ-ভাই!

—হ্যাঁ। শুনলাম, তুমি মহাগ্রামে গিয়েছ। দুর্গা বললে।

গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দেবু বলিল—হ্যাঁ। এই ফিরছি সেখান থেকে।

—তোমাদের ঠাকুর মশায় শুনলাম নাকি মাথা ঘুরে পড়ে গিয়াছিলেন, নদীর ঘাটে। কেমন রইছেন তিনি?

একটু হাসিয়া দেবু বলিল—কেমন আছেন, তিনিই জানেন। বাইরে থেকে ভাল বুঝতে পারলাম না। নদীর ঘাটে কেঁপে বসে পড়লেন। আমি হাত ধরে তুলতে গেলাম। একটুখানি বসে থেকে নিজেই উঠলেন। ময়ূরাক্ষীর জলে মুখ-হাত ধুয়ে, হেসে বললেন— মাথাটা ঘুরে উঠেছিল, এইবার সামলে নিয়েছি পণ্ডিত! বাড়ী এসে—আমাকে জল খাওয়ালেন, স্নান করলেন, পূজা করলেন। আমি বসেই ছিলাম, দেখে বললেন—এইখানেই খেয়ে যাবে পণ্ডিত। আমি জোড়হাত করে বললাম— না, না বাড়ী যাই। কিন্তু কিছুতেই ছাড়লেন না। খেয়ে উঠলাম। আমাকে বললেন—আমার একটি কাজ করে দিতে হবে। বললেন—আমার জমি-জেরাত বিষয়-আশয় যা কিছু আছে—সে সবের ভার নিতে হবে। ভাগে—ঠিকে, যা বন্দোবস্ত করতে হয়, তুমি করবে। ফসল উঠলে আমাকে খাবার মত চাল পাঠিয়ে দেবে কাশীতে, আর উদ্বৃত্ত ধান বিক্রি করে টাকা।

ইরসাদ বলিল—ন্যায়রত্ন মশায় তবে কাশী যাবেন ঠিক করলেন?

—হ্যাঁ, ঠাকুর নিয়ে, বিশু ভাইয়ের স্ত্রীকে ছেলেকে নিয়ে কাশী যাবেন। হয় কাল—নয় পরশু।

—বিশুবাবু আসে নাই? একবার এসে বললে না কিছু?

—না।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া দেবু আবার বলিল— সেই কথাই ভাবছিলাম, ইরসাদ-ভাই!

—কি কথা বল দেখি?

—বিশু-ভাইয়ের সঙ্গে আর সম্বন্ধ রাখব না! টাকাকড়ির হিসেব-পত্র আজই আমি তাকে বুঝিয়ে দোব। ইরসাদ চুপ করিয়া রহিল।

দেবু বলিল—তোমাদের জাত ভাই একজন এসেছেন—আবদুল হামিদ।

তিনিও দেখলাম—ওই বিশু-ভাইয়ের মতন। নামেই মুসলমান, জাত-ধর্ম কিছু মানেন না।

বাইশ

কয়েক দিন পর।

মানুষ বন্যায় বিপর্যস্ত, রোগে জীর্ণ ও শোকে কাতর, অনাহার এবং অচিকিৎসার মধ্যে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। গো-মড়কে তাহাদের সম্পদের একটা বিশিষ্ট অংশ শেষ হইয়া যাইতেছে। তাহাদের জীবনের সম্মুখে মৃত্যু আসিয়া দাঁড়াইয়াছে করাল মূর্তিতে। তবু সে কথা ভুলিয়া তাহারা এ সংবাদে চঞ্চল হইয়া উঠিল।...ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পৌত্র ধর্ম মানে না, জাতি মানে না, ঈশ্বর মানে না—সে উপবীত ত্যাগ করিয়াছে! ন্যায়রত্ন পৌত্রবধূ এবং প্রপৌত্রকে লইয়া দুঃখে লজ্জায় দেশত্যাগ করিয়াছেন।...সে দুঃখ—সে লজ্জার অংশ যেন তাহাদের। শুধু তাই নয়, ইহাকে তাহারা মনে করিল—পঞ্চগ্রামের পক্ষে মহা অমঙ্গলের সূচনা। তাহারা ঘরে ঘরে হায়-হায় করিয়া সারা হইল, আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল। অনেকে চোখের জলও ফেলিল। বলিল—একপো ধর্ম হয়তো এইবার শেষ, চারপো কলি পরিপূর্ণ। সমস্ত কিছু সর্বনাশের কারণ যেন এই অনাচারের মধ্যে নিহিত আছে।

এই আক্ষেপ—এই আশঙ্কায় তাহারা মৃত্যুকামনা করিল কি না, তাহারাও জানে না, তবু তাহার কিছু একটার প্রেরণায় সাহায্য-সমিতির প্রতি বিমুখ হইল—যাহার ফলে মৃত্যু হয়তো অনিবার্য। এই নিদারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে অভাবে এবং রোগের নির্যাতনের মধ্যে প্রত্যক্ষ মৃত্যু-বিভীষিকা সম্মুখে দেখিয়াও আহার এবং ঔষধ প্রত্যাখ্যান অনিবার্য মৃত্যু নয় তো কি?

ন্যায়রত্ন চলিয়া যাওয়ার পরদিন সকালবেলায় বিশ্বনাথ আসিয়াছিল। সেদিন দেবু তাহাকে হিসাব-পত্র বুঝিয়া লইতে অনুরোধ করিয়াছিল। বিশ্বনাথ বলিয়াছিল—তুমি একটু বাড়াবাড়ি করছ, দেবু-ভাই! আমাদের সঙ্গে সংস্রব রাখতে না চাও, রেখো না। কিন্তু এখানকার সাহায্যের নাম করে দশজনের কাছে টাকা

তুলে যে সাহায্য-সমিতি হয়েছে, তার অপরাধটা কি হল?

দেবু হাত-জোড় করিয়া বলিয়াছিল—আমাকে মাফ্ কর, বিশু-ভাই!

আজ আবার বিশ্বনাথ আসিয়াছে। কয় দিন ধরিয়া সে নিজেই সাহায্য-সমিতি চালাইবার চেষ্টা করিতেছিল।

আজও দেবু তাহাকে বলিল—আমাকে মাফ্ কর বিশু-ভাই! তারপর হাসিয়া বলিল—দেখলে তো নিজেই এ-ক'দিন চেষ্টা করে, একজনও কেউ চাল নিতে এল না।

সত্যই কেহ আসে নাই। গ্রামে-গ্রামে জানানো হইয়াছে—সাহায্য-সমিতিতে শুধু চাল নয়, ওষুধও পাওয়া যাইবে। কলিকাতা হইতে একজন ডাক্তারও আসিয়াছে। কিন্তু তবুও কেহ ওষুধ লইতে আসে নাই।

বিশ্বনাথ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।...

এ কয় দিন ধরিয়া বিশ্বনাথ অনেক চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু মানুষগুলি অদ্ভুত। কাছিম যেমনভাবে খোলার মধ্যে তাহার মুখ-সমেত গ্রীবাখানি গুটাইয়া বসিলে তাহাকে আর কোনমতেই টানিয়া বাহির করা যায় না, তেমনি ভাবেই ইহারা আপনাদিগকে গুটাইয়া লইয়াছে। ইহাকে জড়ত্ব বলিয়া বিশ্বনাথ উপহাস করিতে পারে নাই—ইহার মধ্যে সহনশক্তির যে এক অদ্ভুত পরিচয় রহিয়াছে—তাহাকে সে সসম্মানে শ্রদ্ধা করিয়াছে। এই সহনশক্তি যাহারা আয়ত্ত করিয়াছে—রক্তের ধারায় বংশানুক্রমে যাহাদের মধ্যে এই শক্তি প্রবহমাণ—তাহারা যদি জাগে, তবে সে এক বিরাট শক্তির দুর্জয় জাগরণ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যে ডাকে—যাহার ডাকে সে জাগিবে, কূর্মাবতারের মত সমস্ত ধরিত্রীর ভারবহনের জন্য সে জাগিয়া উঠিবে, তেমন ডাক—সে দিতে পারিল না। তাই বোধ হয়, তাহার ডাকে তাহারা সাড়া দিল না!

সে ওই বীরবংশী—অর্থাৎ শিক্ষিত জোয়ান বন্ধুটিকে লইয়া গ্রামে গ্রামে হরিজন-পল্লীতে মিটিং করিবার বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিল। মিটিং করিতে পারিলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু মিটিং হয় নাই। মিটিং করিতে দেয় নাই ভূমির স্বামী—ভূস্বামী-বর্গ, যাহারা বিশ্বনাথের অনাচারের জন্য ন্যায়রত্নকে সামাজিক শাস্তি

দিবার সংকল্প করিয়াছিল—তাহারাই ; কঙ্কণার বাবুরা, শ্রীহরি ঘোষ। হাটতলা জমিদারের, গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ জমিদারের, ধর্মরাজতলার বকুল গাছের তলদেশের মাটিও জমিদারের ; সেখানে যত পতিত ভূমি, এমন কি ময়ূরাক্ষীর বালুময়-গর্ভও তাহাদের। বিশ্বনাথ এই দেশেরই মানুষ—বাল্যকাল হইতে এই দেশের ধুলা-কাদা মাখিয়া মানুষ হইয়াছে ; সে-ও ভাবিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল—এত পরের ধুলা সে মাখিয়াছে, পঞ্চগ্রামের মানুষ বাঁচিয়া আছে—পথ চলিতেছে—পরের মাটিতে। নিজেদের বলিতে তাহাদের ঘরের অঙ্গনটুকু ছাড়া আর কিছুই নাই। ব্যবহারের অধিকার বলিয়া একটা অধিকারের কথা বরাবর শুনিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সে অধিকারও জমিদার নাকচ করিয়া দিল আদালতের শীলমোহর-যুক্ত পরোয়ানার সাহায্যে। আদালতে দরখাস্ত করিয়া জমিদারেরা পরোয়ানা বাহির করিয়া আনিল—এই এই স্থানে মিটিংয়ের উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রবেশ করিতে নিষেধ করা যাইতেছে। অন্যথা করিলে অনধিকার-প্রবেশের দায়ে অভিযুক্ত হইবে।

এ আদেশ অমান্য করিবার কল্পনাও বিশ্বনাথের দল করিয়াছিল। কিন্তু কি ভাবিয়া সে কল্পনা ত্যাগ করিয়াছে। দলের অন্য সকলে কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছে। বিশ্বনাথ দেবুর কাছে আসিয়াছে—সাহায্য-সমিতির ভার দিতে।...

দেবু বলিল—বিশু-ভাই, তুমি আমাকে রেহাই দাও। তুমি ঠাকুর মশায়ের পৌত্র—তুমি যা-ই কর, তোমার বংশের পুণ্যফল তোমাকে রক্ষা করবে। কিন্তু আমি কেটে মরে যাব।

বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল—ওটা তোমার ভুল বিশ্বাস, দেবু-ভাই! কিন্তু সে যাক্ গে। এখন আমিই সাহায্য-সমিতির সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ছেড়ে দিচ্ছি। অন্য সকলে তো চলেই গেছেন, আমিও আজই চলে যাব! আমার সঙ্গে সংস্রব না থাকলে তো কারও আপত্তি হবে না।

দেবু কোন উত্তর দিল না। মাথা নিচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

—দেবু!

ম্লান-হাসি হাসিয়া দেবু বলিল—বিশু-ভাই!

বিশ্বনাথ বলিল—এতে আর তুমি অমত করো না।

—লোকে হয়তো হবু আর সাহায্য-সমিতিতে আসবে না, বিশু-ভাই!

—আসবে।...বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল—না আসে—তোমাকে বুঝিয়ে আনতে হবে। তুমি পারবে। টাকা পয়সা তো জাত মেনে হাত ঘোরে না, ভাই! চণ্ডালের ঘরের টাকা—বামুনের হাতে এলেই শুদ্ধ হয়ে যায়।

কাঁটার খোঁচার মত একটু তীক্ষ্ণ আঘাত দেবু অনুভব করিল; সে বিশ্বনাথের মুখের দিকে চাহিল। অদ্ভুত বিশু-ভাইয়ের মুখখানি! কোনখানে এক বিন্দু এমন কিছু নাই—যাহা দেখিয়া অপ্রীতি জন্মে, রাগ করা যায়। বিশ্বনাথের হাত ধরিয়া সে বলিল—কেন তুমি এমন কাজ করলে, বিশু-ভাই?

বিশ্বনাথ কথার উত্তর দিল না, অভ্যাস-মত নীরবে হাসিল।

দেবু বলিল—কঙ্কণার বাবুরা ব্রাহ্মণ হলেও সায়েবদের সঙ্গে এক-টেবিলে বসে খানা খায়—অখাদ্য খায়, মদ খায়, অজাত-কুজাতের মেয়েদের দিয়ে ব্যভিচার করে—তাদের আমরা ঘেন্না করি। হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল, পথের ভিখিরীরা পর্যন্ত ঘেন্না করে। ভয়ে মুখে কিছু না বললেও মনে মনে ঘেন্না করে। ওরা বামুনও নয়, ধর্মও ওদের নাই। কিন্তু রোগে, শোকে, দুঃখে বিশু-ভাই, মরণে পর্যন্ত আমাদের ভরসা ছিলে—তোমরা। ঠাকুর মশায়ের পায়ের ধুলো নিলে মনে হত সব পাপ আমাদের ধুয়ে গেল, সব দুঃখু আমাদের মুছে গেল। মনে মনে যখন ভাবতাম, একদিন ভগবান আসবেন, পৃথিবীর পাপীকে বিনাশ করে আবার সত্যযুগ প্রতিষ্ঠা করবেন—তখন মনে পড়ত ঠাকুর মশায়ের মুখ। আজ আমরা কি করে বাঁচব বলতে পার? কার ভরসায় আমরা বুক বাঁধব?

বিশ্বনাথ বলিল—নিজের ভরসায় বুক বাঁধ, দেবু-ভাই! যেসব কথা তুমি বললে, সেসব নিয়ে অনেক কথা বলা যায়। সে তোমার ভাল লাগবে না। শুধু একটা কথা বলে যাই। যে-কালে দাদুর মত ব্রাহ্মণেরা রাজার অন্যায়ের বিচার করতে পারত, চোখ রাঙালে বড়লোকে ভয়ে মাটিতে বসে যেত—সে কাল চলে গেছে। এ-কালে অভাব হলে—হয় নিজেরাই দল বেঁধে অভাব ঘুচোবার চেষ্টা কর, নয় যারা আজ দেশরক্ষার ভার নিয়ে বসে আছে—তাদের কাছে দাবি জানাও। রোগ হলে, ওষুধের জন্যে—চিকিৎসার জন্যে তাদেরই চেপে ধর।

অকালমৃত্যুতে তাদেরই চোখ রাঙিয়ে গিয়ে বল—কেন তোমাদের বন্দোবস্তের মধ্যে এমন অকাল-মৃত্যু? গভীর দুঃখে শোকে অভিভূত যখন হবে—তখন ভগবানকে যদি ডাকতে ইচ্ছে হয়—নিজেরা ডেকো। ঠাকুর মশায়দের কাল আজ ফুরিয়ে গিয়েছে; তাই সেই বংশের ছেলে হয়েও আমি অন্য রকম হয়ে গিয়েছি। দাদু, আমার—মন্ত্র-বিসর্জনের পর মাটির প্রতিমার মত বসে ছিলেন, তাই তিনি চলে গেলেন।

দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—বিশু-ভাই, তুমি অনেক লেখাপড়া করেছ, তুমি আমাদের ঠাকুর মশায়ের বংশধর—তুমি আমাদের বাঁচাবে—এইটাই আমাদের সব চেয়ে বড় ভরসা ছিল। কিন্তু—

হাসিয়া বিশ্বনাথ বলিল—বলেছি তো, অন্যে তোমাদের আশীর্বাদের জোরে বাঁচাবে, এ ভরসা ভুল ভরসা, দেবু-ভাই! সে ভুল যদি মাথা থেকে তোমাদের ভেঙে গিয়েই থাকে, তবে সে ভালই হয়েছে। আমি ভালই করেছি। আচ্ছা, আমি এখন চলি দেবু!

—কিন্তু বিশু-ভাই—।

—যেদিন সত্যি ডাকবে, সেইদিন আবার আসব, দেবু ভাই! হয়তো বা নিজেই আসব।

বিশ্বনাথ দ্রুতপদে পথ অতিক্রম করিয়া, খানিকটা আগে পথের বাঁকে মোড় ফিরিয়া মিলাইয়া গেল।

পথে যাইতে যাইতে হঠাৎ বিশ্বনাথ দাঁড়াইয়া গেল। কেহ কেহ তাহার পথরোধ করিল। তাহার চোখে পড়িল—অদূরবর্তী মহাগ্রাম। ওই যে তাহাদের বাড়ীর কোঠাঘরের মাথা দেখা যাইতেছে! ওই যে বনতায় কৃষ্ণচূড়া ফুলের গাছটি। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে দেখিয়া সে আবার মাথা নিচু করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। কোন্ আকর্ষণে সে যে দাদু-মা-অজয়কে ছাড়িয়া, ঘর-দুয়ার ফেলিয়া, এমনভাবে জীবনের পথে চলিয়াছে—সে কথা ভাবিয়া মধ্যে মধ্যে সে নিজেই বিস্মিত হইয়া যায়। অদ্ভুত অপরিমেয় উত্তেজনা এই পথ চলায়।

—ছোট-ঠাকুর মশায়!

—কে ?···চকিত হইয়া বিশ্বনাথ চারি পাশে চাহিয়া দেখিল।

পথের বাঁ দিকে মাঠের মধ্যে একটা পুকুরের পাড়ের আমবাগানের মধ্যে দাঁড়াইয়া একটি মেয়ে।

বিশ্বনাথ আবার প্রশ্ন করিল—কে ? বহুকালের প্রাচীন গাছগুলি বাগানটার নিচের দিকটা ঘন ছায়ায় প্রায় অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। তাহার উপর একটা নিচু গাছের ডালের আড়ালে মেয়েটির মুখের আধখানা আড়াল পড়িয়া গিয়াছে, চেনা যাইতেছে না।

বাগানের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল দুর্গা।

বিশ্বনাথ বলিল—দুর্গা ?

—আজ্ঞে হাঁ।

—এখানে ?

—এসেছিলাম মাঠের পানে। দেখলাম—আপনি যাচ্ছেন।

—হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি।

—একবারে দেশ-ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন আপুনি ?

বিশ্বনাথ দুর্গার মুখের দিকে চাহিল। দুর্গার মুখে বিষণ্ণতার ছায়া পড়িয়াছে। বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল—দরকার হলেই আসব আবার।

দুর্গা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া হাসিল। বলিল—একটা পেনাম করে নিই আপনাকে। আপনি তো এখানকার বিপদ-আপদ ছাড়া আসবেন না, তার আগে যদি মরেই যাই আমি!···সে আজ অনেকদিন পর খিল-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সে প্রণাম করিল খানিকটা সম্ভ্রমপূর্ণ দূরত্ব রাখিয়া। বিশ্বনাথ হাসিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ জানাইয়া বলিল—আমি জাত-টাত মানি না রে! আমার পায়ে হাত দিতে তোর এত ভয় কেন ?

দুর্গা এবার বিশ্বনাথের পায়ে হাত দিল। প্রণাম সারিয়া উঠিয়া হাসিয়া বলিল—জাত ক্যানে মানেন না ঠাকুর মশায় ? ওখানে এক নজরবন্দী বাবু ছিলেন—তিনিও মানতেন না! বলতেন—আমার খাবার জলটা না-হয় তুমিই

এনে দিয়ো দুগ্‌গা।

বিশ্বনাথও হাসিল, বলিল—আমার তেষ্টা এখন পায় নি দুর্গা। না-হলে তোকেই বলতাম—আমি এইখানে দাঁড়াই—তুই এক গেলাস জল এনে দে আমায়।

দুর্গা আবার খিল্‌-খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—তবে না-হয় আমাকে নিয়ে চলেন আপনার সঙ্গে। আপনার ঝিয়ের কাজ করব। ঘর-দোর পরিষ্কার করব, আপনার সেবা করব।

বিশ্বনাথ বলিল—আমার যে ঘরদোর নেই। এখানকার ঘরই পড়ে থাকল। তার চেয়ে এখানেই থাক্‌ তুই। আবার যখন আসব—তোর কাছে জল চেয়ে খেয়ে যাব।

বিশ্বনাথ চলিয়া গেল, দুর্গা একটু বিষণ্ণ হাসি মুখে মাখিয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

দেবু চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

বিশ্বনাথ চলিয়া যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ সে পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেই যে বসিয়াছিল—এখনও সেই চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

ঠাকুর মহাশয় চলিয়া গিয়াছেন। বিশ্বনাথ চলিয়া গেল। তাহার মনে হইতেছে—সে একা। এ বিশ্বসংসারে সে একা! তাহার বিলু, তাহার খোকা যেদিন গিয়াছিল—সেদিন যখন তাহার বিশ্বসংসার শূন্য মনে হইয়াছিল, সেদিন গভীর রাত্রে আসিয়াছিলেন ঠাকুর মহাশয়। যতীনবাবু রাজবন্দী ছিল, অনেক দিন আগেই চলিয়া গিয়াছে। তাহার অভাবেও সে বেদনা অনুভব করিয়াছিল; কিন্তু তখন নিজেকে অসহায় বলিয়া মনে হয় নাই। বিশ্বনাথ কয়েক দিন পরই আসিয়াছিল। কিন্তু আজ সে সত্যই একা। আজ সে একান্তভাবে সহায়হীন—আপনার জন কেহ পাশে দাঁড়াইতে নাই, বিপদে ভরসা দিতে কেহ নাই, সান্ত্বনার কথা বলে, এমন কেহ নাই। অথচ এ কি বোঝা তাহার ঘাড়ে আজ

চাপিয়াছে? এ বোঝা যে নামিতে চায় না। চোখে তাহার জল আসিল। চারিদিক নির্জন,—দেবু চোখের জল সংবরণ করিবার কোন প্রয়োজন বোধ করিল না। তাহার গাল বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

এ-বোঝা যেন নামিবার নয়। শুধু তাই নয়—বোঝা যেন দিন দিন বাড়িতেছে; বোঝা আজ পাহাড়ের মত ভারী হইয়া উঠিয়াছে। একখানা গ্রাম হইতে পাঁচখানা গ্রামের দুঃখের বোঝা তাহার ঘাড়ে চাপিয়াছে। খাজনা-বৃদ্ধির ধর্মঘট হইতে—শেখপাড়া কুসুমপুরের সঙ্গে বিরোধ, তারপর এই সর্বনাশা বন্যা, বন্যার পর কাল ম্যালেরিয়া—গো-মড়ক। পঞ্চগ্রামের অভাব-অনটন-রোগ-শোক আজ পাহাড়ের সমান হইয়া উঠিয়াছে। সে একা কি করিবে? কি করিতে পারে?

—জামাই-পণ্ডিত! তুমি কাঁদছ?

দেবু মুখ ফিরাইয়া দেখিল—দুর্গা কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

—ছোট-ঠাকুর মশায় চলে গেলেন—তাতেই কাঁদছ?...দুর্গা আঁচলের খুঁটে আপনার চোখ মুছিল। তারপর আবার বলিল—তা তুমি যদি যেতে না বলতে—তবে তো তিনি যেতেন না।

চাদরের খুঁটে চোখ-মুখ মুছিয়া দেবু বলিল—আমি তাকে যেতে বলেছি?

দুর্গা বলিল—আমি ঘরের ভেতরে ছিলাম—তোমরা যখন কথা বলছিলে, সব শুনেছি আমি। লোকে আজ চাল নিতে আসে নাই। কাল আসত। কাল না আসত, পরশু আসত। জামাই, পেটের লেগে মানুষ কি না করে বল? ...ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—জান তো, আমার দাদা ঘোষালের টাকা দিবি৷ হাত পেতে নেয়।

দেবু নীরবে দুর্গার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দুর্গা আবার বলিল—ছোট-ঠাকুর মশায় পৈতা ফেলে দিয়েছে, জাত মানে না, ধর্ম মানে না—বলছ, কিন্তু দ্বারিক চৌধুরী মাশায়ের খবর শুনেছ?

—কি? চৌধুরী মশায়ের কি হল?...দেবু চ মকিয়া উঠিল। দ্বারিক চৌধুরী কিছুদিন হইতে অসুখে পড়িয়া আছে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিদায়ের দিন পর্যন্ত

সে আসিতে পারে নাই। বৃদ্ধের অবশ্য বয়স হইয়াছে। তবুও তাহার মৃত্যু-সংবাদ দেবুর পক্ষে একটা বড় আঘাত হইবে। বৃদ্ধ মানুষ বড় ভাল। দেবুকে অত্যন্ত স্নেহ করে।

দুর্গা বলিল—চৌধুরী মশায় ঠাকুর বিক্রি করছে।

—ঠাকুর বিক্রি করছে!

—হ্যাঁ। ঠাকুরের সেবা আর চালাতে পারছে না। তার ওপরে বাসে আর কিছু রাখে নাই। চৌধুরী মশায়কে পাল বলেছে—ঠাকুর আমাকে দাও, আমি তোমাকে পাঁচশো টাকা দোব। পাল নিজের বাড়ীতে সেই ঠাকুর পিতিষ্ঠে করবে।

—শ্রীহরি?

দুর্গা ঘাড় নাড়িয়া একটু হাসিল।

দেবু আবার বলিল—চৌধুরী ঠাকুর বিক্রি করছেন?

—হ্যাঁ, বিক্রি করছেন। কথাটা এখন চাপা আছে। এখন হাজার হোক মানী লোক বটে তো চৌধুরী মশায়। পালের হাতে ধরে বলেছে—এ কথা যেন কেউ না জানে পাল—অন্তত আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন বলো, অন্ত কোন ঠাঁই থেকে এনেছ।...পাল কাউকে বলে নাই।

—বলতে যদি বারণই করেছে—শ্রীহরিও যদি বলে নাই কাউকে, তবে তুই জানলি কি করে? দেবু কথাটা কোনমতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। তর্কের কূটবুদ্ধিতে সে দুর্গার কথাটা উড়াইয়া দিতে চাহিল। কথার শেষে সেই কথাই সে বলিল—ও তুই কার কাছে বাজে কথা শুনেছিস।

হাসিয়া দুর্গা বলিল—কি আর তোমাকে বলব জামাই-পণ্ডিত, বল?

—কেন?

—আমি বাজে কথা শুনি না।...দুর্গা হাসিল :—আমার খবর পাকা খবর। মনে নাই?

—কি?

—নজরবন্দীর বাড়ীতে যেতে জমাদার এসেছিল—তোমাদের মিটিংয়ের খবর

পেয়ে, সে খবর আমি আগে পেয়েছিলাম।

দেবুর মনে পড়িল। সে দিন দুর্গা খবরটা সময়মত না দিলে সত্যই অনিষ্ট হইত। অন্ততঃ ডেটিনু যতীনবাবুর জেল হইয়া যাইত।

দুর্গা হাসিয়া বলিল—বিলু-দিদির বুন হয়েও আমি তোমার মন পেলাম না, আর লোকে সাধ্যি-সাধনা করে আমার মন পেল না।

দেবুর মুখে-চোখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল; দুর্গার রসিকতা—বিশেষ করিয়া আজ মনের এই অবস্থায়—তাহার একেবারেই ভাল লাগিল না; সে বলিল—থাম্ দুর্গা। ঠাট্টা-তামাশার কথাও নয় এটা, সময়ও নয়। বল্ তুই কার কাছে শুনলি?

কয়েক মুহূর্তের জন্য দুর্গা মুখ ফিরাইয়া লইল। তার পরই সে আবার তাহার স্বাভাবিক হাসিমুখে বলিল—নিজের লজ্জার কথা আর কি করে বলি বল? চৌধুরী মশায়ের বড় বেটা আমাকে বলেছে। সে কিছুদিন থেকে আমার বাড়ীর আনাচে-কানাচে ঘুরছে। আমি পরশু ঠাট্টা করেই বলেছিলাম—চৌধুরী মশায়, মামলা-খরচ করতে আমি সোনার হার লোব। বললে—তাই দোব আমি। বাবা ছিরু পালকে ঠাকুর বেচেছে—পাঁচশো টাকা দেবে। তোকে আমি হারই গড়িয়ে দোব।

দেবু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া সহসা উঠিয়া পড়িল। বলিল—আমি এসে রান্না করব দুর্গা!

—কোথায়—? প্রশ্নটা করিতে গিয়া দুর্গা চুপ করিয়া গেল। কোথায় যাইতেছে জামাই-পণ্ডিত—সে বিষয়ে অস্পষ্টতার তো অবকাশ নাই। বারণ করিলেও সে শুনিবে না।

—আসছি! বেশী দেরি করব না।

দেবু হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

শিবপুর ও কালীপুরের মধ্যে ব্যবধান একটি দীঘি।

প্রকাণ্ড বড় দীঘি। এক সময়ে ওই চৌধুরীরাই কাটাইয়াছিল। দীঘিটা

মজিয়া গিয়াছে। দীঘিটার পাড়েই চৌধুরীদের বাড়ী। এক সময়ে চৌধুরীদের বাঁধানো ঘাট ছিল, ঐ ঘাটে চৌধুরীদের গৃহ দেবতা লক্ষ্মী-জনার্দন শিলার স্নান যাত্রা পর্ব অনুষ্ঠিত হইত। ঘাটটির নামই 'জনার্দনের ঘাট'। ঘাটটি এখন ভাঙিয়া গিয়াছে, দীঘিটা মজিয়া আসিয়াছে, পানায় সারা বৎসর ভরিয়া থাকে, তবুও ওইখানেই স্নান-যাত্রা পর্বের অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠান ঠিক বলা চলে কি না, দেবু জানে না। দেবুর বাল্যকালে চৌধুরীদের ভাঙা ঘাটে ফাটল ধরা বাঁধা-ঘাটে স্নান-যাত্রার যে অনুষ্ঠান সে দেখিয়াছে, তাহার তুলনায় এখন যাহা হয়—তাহাকে বলিতে হয়—অনুষ্ঠানের অভিনয়, কোনমতে নিয়মরক্ষা।

মজা দীঘিটাতে যে জল থাকিত, তাহাতেও কার্তিক মাসের অনাবৃষ্টিতে অনেক উপকার করিত। অনেকটা জমিতে সেচ পাইত। এবার আবার ময়ূরাক্ষীর বন্যায় দীঘিটার একটা মোহনা ছাড়িয়া গিয়াছে, তাই এই আশ্বিন মাসেই দীঘিটা নিঃশেষে জলহীন হইয়া পড়িয়া আছে। দীঘির ভাঙা ঘাটে দাঁড়াইয়া দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

দীঘিটার পরই চৌধুরীদের আম-কাঁঠালের বাগান-ঘেরা খিড়কি। খিড়কির ছোট পুকুরটার ওপরেই ছিল চৌধুরীদের সেকালের পাকাবাড়ী। এখনও ছোট পাতলা ইটের স্তূপ পড়িয়া আছে। পাকা বাড়ী-ঘরের আর এখন কিছুই অবশিষ্ট নাই, বহু কষ্টে কেবল চৌধুরী রথের ঘরের ফাট-ধরা পাকা দেওয়াল কয়খানি খাড়া রাখিয়াছিল; ছাদ গেলে খড়ের চাল করিয়াছিল, এবার বন্যায় সেখানাও পড়িয়া গিয়াছে। কাঠের রথখানাও ভাঙিয়াছে। সর্বাঙ্গে কাদামাখা রথখানা কাত হইয়া পড়িয়া আছে একটা গাছের গুঁড়ির উপর।

ভগ্নস্তূপ পার হইয়া দেবু চৌধুরীর বর্তমান মাটির বাড়ীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। বাহিরের ঘরখানার সামনের বারান্দাটার চাল পড়িয়া খসিয়া গিয়াছে। বারান্দার উপরে পাতা তক্তপোশটা জলে ভিজিয়া—রৌদ্রে শুকাইয়া, ফুলিয়া-ফাঁপিয়া-ফাটিয়া পড়িয়া আছে—জরা-জীর্ণ রোগভোগগ্রস্ত বৃদ্ধের মত।

বাড়ীর ভিতর-মহলে বাহিরের পাঁচিল ভাঙিয়া গিয়াছে—সেখানে তালপাতার বেড়া দেওয়া হইয়াছে। বেড়ার ফাঁক দিয়াই দেখা যাইতেছে, একদিকে একখানা

ঘর ভাঙিয়া একটা মাটির স্তূপ হইয়া রহিয়াছে ; চালের কাঠগুলা এখনও ভাঙিয়া পড়িয়া আছে অতিকায় জানোয়ারের কঙ্কালের মত।

অবস্থা দেখিয়া কিছুক্ষণ দেবুর কণ্ঠনালী দিয়া আওয়াজ বাহির হইল না, তাহার পা উঠিল না, নির্বাক হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। চৌধুরীর বাড়ীর এ দুরবস্থা সে কল্পনা করিতে পারে না। চৌধুরীর বাড়ী অনেক দিন ভাঙিয়াছে ; পাকা ইমারত ইটের পাঁজায় পরিণত হইয়াছে, জমিদারী গিয়াছে, পুকুর গিয়াছে, যে পুকুর আছে, তাও মজিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তবুও চৌধুরীর মাটির কোঠা—মাটির বাড়ীখানার শ্রী ও পারিপাট্য ছিল। চৌধুরীর জমিও কিছু আছে ; বন্যার পরে যখন সাহায্য সমিতির পত্তন হয়, তখনও চৌধুরী নগদ একটি টাকা দিয়াছে। দেবু অনেকদিনই এদিকে আসে নাই, সুতরাং অবস্থার এমন বিপর্যয় দেখিয়া সে প্রায় স্তম্ভিত হইয়া গেল। ইহার উপর চৌধুরীর অসুখ। সে ক্ষুব্ধচিত্তে কঠোর কথা বলিতে আসিয়াছিল, কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া সব গোলমাল হইয়া গেল। দেবু একবার ভাবিল—ফিরিয়া যাই। চৌধুরী লজ্জা পাইবে, মর্মান্তিক বেদনা পাইবে। কিন্তু পরক্ষণেই সে ডাকিল—চৌধুরী মশায়! হরেকেষ্ট!

কেহ উত্তর দিল না, কিন্তু বাড়ীর ভিতর সাড়া জাগিয়াছে বুঝা গেল। মেয়েরা ফিস্ ফিস্ করিয়া কাহাকেও কিছু বলিতেছে। চৌধুরী-বাড়ী আজ সাধারণ চাষী গৃহস্থের বাড়ী ছাড়া কিছু নয়—তবুও পর্দার আভিজাত্য এখনও পুরা বজায় আছে।

দেবু আবার ডাকিল—হরেকেষ্ট বাড়ী আছ?

হরেকেষ্ট চৌধুরীর বড় ছেলে। সে এবার বাহির হইয়া আসিল ; সেই মুহূর্তেই চৌধুরীর ক্ষীণ কণ্ঠস্বরের রেশ ভাসিয়া আসিল—আঃ! কে ডাকছেন দেখ না রে!

দেবু বলিল—চৌধুরী মশায়কে দেখতে এসেছি।

হরেকেষ্ট নির্বোধ, গাঁজাখোর ; সে তাহার বড় বড় দাঁতগুলি বাহির করিয়া আপ্যায়িতের হাসি হাসিয়া বলিল—দেখবেন আর কি? বাবার আমার শেষ অবস্থা, কবরেজ বলেছে—বড় জোর পাঁচ-সাত দিন।

দেবু বলিল—চল, একবার দেখব।

হরেকেষ্ট ব্যস্ত হইয়া উঠিল—এস! এস!—সঙ্গে সঙ্গেই ভিড়ের দিকে উদ্দেশ করিয়া হাঁকিল—সরে যাও সব একবার। পণ্ডিত যাচ্ছে। দেবু পণ্ডিত।

কুড়ি-পঁচিশ দিন পূর্বে চৌধুরী অসুস্থ অবস্থাতেও গাড়ী করিয়া সাহায্য-সমিতির আসরে গিয়াছিল; এই কুড়ি-পঁচিশ দিনের মধ্যেই চৌধুরী যেন আর এক মানুষে পরিণত হইয়াছে—মানুষ বলিয়া আর চেনাই যায় না। চামড়ায় ঢাকা হাড়ের মালা একখানা পড়িয়া আছে যেন বিছানার উপর। চোখ কোটরগত, নাকটা খাঁড়ার মত প্রকট, হনু দুইটা উঁচু হইয়া উঠিয়া চৌধুরীর মূর্তিকে ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে।

চৌধুরী এই অবস্থাতেও হাসিয়া বলিল—এস, বস।...শীর্ণ হাতখানি দিয়া চৌধুরী অনতিদূরে পাতা একখানি মাদুর দেখাইয়া দিল। ইহারই মধ্যে চৌধুরী এই ব্যবস্থাটুকু করাইয়া রাখিয়াছে।

দেবু বসিল তাহার বিছানায়। বলিল—এমন কঠিন অসুখ করেছে আপনার? কই, কিছুই তো শুনি নি চৌধুরী মশায়?

চৌধুরী ম্লান হাসি হাসিল। বলিল—ফকিরে যায়-আসে, লোকের নজরে পড়বার কথা নয় পণ্ডিত। রাজা-উজীর যায়—লোক-লস্কর হাঁক-ডাক, লোকে পথে দাঁড়িয়ে দেখে। বুড়োর যাওয়াও ফকিরের যাওয়া!

দেবু চুপ করিয়া রহিল; তাহার অনুশোচনা হইল—লজ্জা হইল যে, সে এত-দিনের মধ্যে কোন খোঁজ-খবর করে নাই।

চৌধুরী বলিল—বাবা, তুমি ওই মাদুরটায় বস। আমার গায়ে বিছানায় বড় গন্ধ হয়েছে।

চৌধুরীর শীর্ণ হাতখানি আপনার কোলের উপর তুলিয়া দেবু বলিল—না, বেশ আছি।

চৌধুরী বলিল—তোমাকে আশীর্বাদ করি—তোমার মঙ্গল হোক; তোমার থেকে দেশের উপকার হোক—মঙ্গল হোক।

দেবু প্রশ্ন করিল—কে চিকিৎসা করছে?

—চিকিৎসা?...চৌধুরী হাসিল।—চিকিৎসা করাই নি। নিজেই বুঝতে

পারছি—নাড়ী তো একটু-আধটু দেখতে জানি, আর খুব বেশী দিন নয়। একদিন মেয়েরা জিদ্ করে কবরেজ ডেকেছিল। ওষুধও দিয়ে গিয়েছে, তবে ওষুধ আমি খাই না। আর দিন নাই। কি হবে মিছামিছি পয়সা খরচ করে? একটু জল দাও তো বাবা। ওই যে। হাঁ।

সযত্নে জল খাওয়াইয়া মুখ মুছাইয়া দেবু বলিল—না, না। ওষুধ না-খাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না।

—পয়সা নাই পণ্ডিত।

দেবু স্তম্ভিত হইয়া গেল।

চৌধুরী বলিল—অনেক দিন থেকেই ভেতর শূন্য হয়েছিল। এবার বন্যাতে সব শেষ করে দিলে। ধান যে কটা ছিল ভেসে গিয়েছে, কদিন আগে দুটো বলদের একটা মরেছে, একটা বেঁচেছে; কিন্তু সেও মরারই সামিল। বড় ছেলেটাকে তো জান—গাঁজাখোর—নষ্টচরিত্র। ছোটগুলো খেতে পায় না। কি করব?

দেবু বলিল—কাল ডাক্তার নিয়ে আসব।

—না।

—না নয়। ডাক্তারকে না চান, কবরেজ নিয়ে আসব আমি।

—না। চৌধুরী এবার বার বার ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না, পণ্ডিত না। বাঁচতে আমি আর চাই না। একটুখানি স্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিল—ঠাকুর মশায় কাশী গেলেন—বিছানায় শুয়েই খবরটা শুনলাম। ডুলি করে একবার শেষ দর্শন করতে ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু লজ্জাতে তাও পারলাম না। পণ্ডিত, আমি কি করেছি জান?

দেবু চৌধুরীর মুখের দিকে চাহিল।

চৌধুরীর মুখে তিক্ত হাসি ফুটিয়া উঠিল; বলিল—আমি বাপদাদার লক্ষ্মী-জনার্দন ঠাকুরকে বিক্রি করেছি! শ্রীহরি ঘোষ কিনলেন।

ঘরখানা অস্বাভাবিকরূপে স্তব্ধ হইয়া গেল। কথাটি বলিয়া চৌধুরী বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। দেবুও কোন কথা বলিতে পারিল না।

বহুক্ষণ পরে চৌধুরী বলিল—লক্ষ্মী না থাকলে নারায়ণও থাকেন না, পণ্ডিত! ঠাকুরও দেখলাম—সম্পদের ঠাকুর! গরীবের ঘরে উনি থাকেন না। আমি স্বপ্ন দেখলাম পণ্ডিত! ঠাকুর আমাকে স্বপ্নে তাই বললেন!

সবিস্ময়ে দেবু প্রশ্নের আকারে কথাটার শুধু পুনরুক্তি করিল—স্বপ্নে বললেন?

—হ্যাঁ…বহুক্ষণ ধরিয়া বার বার থামিয়া—মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চৌধুরী বলিয়া গেল—একদিন ঘরে কিছুই ছিল না। আতপ চালও একমুঠো ছিল না যে নৈবেদ্য হয়। ভোগ তো দূরের কথা। নিরুপায় হয়ে বড় ছেলেটাকে পাঠালাম—মহাগ্রামে ঠাকুর মশায়ের কাছে। ওটা গাঁজা খায়—মধ্যে মধ্যে ঘোষের দরবারে আজকাল যায় তামাক খেতে, হয়তো ঘোষের ওখানে নেশাও পায়। ও ঠাকুর মশায়ের বাড়ী না গিয়ে, ঘোষের বাড়ী গিয়েছিল। ঘোষ আতপ চাল দিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল—তোমার বাবাকে বলো—ঠাকুরটি আমাকে দেন। আমার ইচ্ছে, ঠাকুর প্রতিষ্ঠে করি। নাহয় পাঁচশো টাকা দক্ষিণে আমি দোব।…হতভাগা আমাকে এসে সেই কথা বললে। বলব কি দেবু, মনে মনে বার বার ঠাকুরকে অন্তর কাঁদিয়ে বললাম,—ঠাকুর তুমি আমাকে সম্পদ দাও, তোমার সেবা করি সাধ মিটিয়ে; এ অপমান থেকে আমাকে বাঁচাও। নইলে বল আমি কি করব?…রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম—শ্রীহরির ঘরে ঠাকুর প্রতিষ্ঠে হচ্ছে। আমি টাকা নিচ্ছি শ্রীহরির কাছে। প্রথম দিন মনে হল—চিন্তার জন্যে এমন স্বপ্ন দেখেছি, বলব কি পণ্ডিত, দ্বিতীয় দিন দেখলাম—আমাদের পুরুত মশায় বলছেন—আপনি শ্রীহরির ঘরেই ঠাকুরকে দিয়ে আসুন। ঠাকুর রেখে আপনি কি করবেন?…পরের দিন আবার দেখলাম—আমি নিজে শ্রীহরির হাতে ঠাকুরকে তুলে দিচ্ছি। বুঝলাম, তবেও দেখলাম—আমার মৃত্যুর পর ছেলেরা হয়তো নিত্যপূজাই তুলে দেবে।…চৌধুরী হাসিয়া বলিল, আর রাখবেই বা কি করে? নিজেদেরই যে অন্ন জুটবে না! যে জমিটুকু আছে, তাও বন্ধক ছিল কেনারাম চৌধুরীর কাছে। একশো টাকা—সুদে আসলে আড়াইশো হয়েছে। শ্রীহরিকে ডেকে পাঁচশো টাকা নিলাম পণ্ডিত। জমিটা ছাড়িয়ে নিলাম। কি করব, বল?

দেবু স্তম্ভিত, নির্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—আচ্ছা, আজ আমি উঠি।

—উঠবে?

—হ্যাঁ। আজ যাই, আবার আসব।

—এস।

দীর্ঘক্ষণ কথা বলিয়া চৌধুরী শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া নিথর হইয়া সে-ও চোখ বুজিল।

দেবু আসিয়াছিল চৌধুরীর উপর ক্ষোভ লইয়া। অর্থের জন্য দেবতা—বংশের ঠাকুরকে বিক্রয় করিয়াছে শুনিয়া তাহার যে ক্ষোভ হইয়াছিল, সে ক্ষোভ—সে দুঃখ ন্যায়রত্নের দেশত্যাগের জন্য ক্ষোভ-দুঃখের চেয়ে বড় কম নয়। তাহার প্রিয়তম বন্ধু, জীবনের একমাত্র ভরসার স্থল বিশু-ভাইকে সে যেমন ত্যাগ করিয়াছে, তেমনি ভাবে চৌধুরীকে পরিত্যাগের বার্তাই সে শুনাইতে আসিয়াছিল। দূর হইতে মনে মনে সংকল্প করিয়া তাহার ক্ষোভ মেটে নাই, তাই সে আসিয়াছিল—চৌধুরীকে সে কথা রূঢ়ভাবে শুনাইয়া দিবার জন্য। কিন্তু সে ফিরিল নির্বাক বেদনার ভার লইয়া। চৌধুরীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ তাহার আর নাই। মনে মনে বার বার সে দোষ দিল—অভিযুক্ত করিল দেবতাকে। ক্ষেত্রে চৌধুরী আর কি করিতে পারিত? স্বপ্নগুলি যদি তাহার মনের ভ্রমও হয়—তবুও সব দিক বিচার করিয়া দেখিয়া মনে হইল, চৌধুরী ঠিকই করিয়াছে। তাহার কর্তব্য সে করিয়াছে। চিরদিন সংসারের শ্রেষ্ঠ বস্তু দিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিয়াছে—ভোগ দিয়াছে; আজ নিঃস্ব অবস্থায় সেই দেবতার সেবাভোগ দিতে পারিবে না বলিয়া সে যদি সম্পদশালীর হাতেই দেবতাকে দিয়া থাকে—তবে সে অন্যায় করে নাই, তাহার কর্তব্যই করিয়াছে; কিন্তু দেবতা তাহার কি করিল? হঠাৎ তাহার মনে পড়িল—ঠাকুর মহাশয়ের গল্প। দুঃখ তাঁহার পরীক্ষা!

না—না! সে আপন মনেই বলিল—না। এই বিশ্ব-জোড়া দুঃখ তাঁহার

পরীক্ষা বলিয়া আজ আর কিছুতেই সে মানিয়া লইতে পারিতেছে না। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মড়ক দিয়া গোটা দেশটাকে ছন্নছাড়া করিয়া পরীক্ষা?

পথ দিয়া আসিতে আসিতে শুনিল—পাশেই শিবপুরের বাউড়ীপাড়ায় কয়েকটি নারী-কণ্ঠের বিনাইয়া বিনাইয়া কান্নার সুর উঠিতেছে!

বাঁ দিকে আউশের মাঠ খাঁ-খাঁ করিতেছে। ধান নাই। সামনে আসিতেছে কার্তিক মাস, রবিফসল চাষের সময়, লোকের শক্তি-সামর্থ্য নাই, গরু নাই, সে চাষও হয়তো অসম্ভব হইয়া উঠিবে। তাহারও আগে পূজা—দুর্গাপূজা। পূজাও বোধ হয় এবার হইবে না। ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীর পূজা করিবে—তাঁহারই টোলের এক ছাত্র। তিনি তাহাকেই ভার দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঠাকুর মশায় না থাকিলে—সে কি পূজা হইবে? মহাগ্রামের দত্তদের পূজা গতবারেও তাহারা ভিক্ষা করিয়া করিয়াছিল। এবার আর হইবেই না। লোকের ঘরে নূতন কাপড়-চোপড়, ছেলেদের জামা-পোশাক—হইবে না।

সব শেষ হইয়া গেল! সব শেষ!

ঠাকুর মহাশয় চলিয়া গিয়াছেন, চৌধুরী মৃত্যু-শয্যায়; মাতব্বর বলিতে পঞ্চগ্রামে আর কেহ রহিল না। ছেলেবেলায় প্রাচীন কালের লোকদের কাছে শুনিয়াছিল—'তে মুণ্ডে'র পরামর্শ লইতে হয়; 'তেমুণ্ড' অর্থাৎ তিনটা মুণ্ড যাহার, তাহার কাছে। প্রথমে তাহার বিস্ময়ের আর সীমা ছিল না। তার পরই শুনিয়াছিল—'তেমুণ্ড' হইল অতি প্রাচীন বৃদ্ধ। উবু হইয়া বসিয়া থাকে, দুই পাশে থাকে হাঁটু দুইটা; মাঝখানে টাক-পড়া চকচকে মাথাটি—দূর হইতে দেখিয়া মনে হয় তিনমুণ্ডবিশিষ্ট মানুষ। তে-মুণ্ড দূরে থাক্‌, আজ পরামর্শ দিবার কোন প্রবীণ লোকই রহিল না।

অন্নহীন দেশ, শক্তিহীন রোগজর্জর মানুষ, উপদেষ্টা-অভিভাবকহীন সমাজ! দেবতারা পর্যন্ত নির্দয় হইয়া সেবা-ভোগের জন্য ধনীদের ঘরে চলিয়াছেন। এদেশের আর কি রক্ষা আছে?

কোন আশা নাই, সব শেষ।

গভীর হতাশায় দুঃখে দেবু একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। ভিক্ষা করিলেও এই

বিস্তীর্ণ অঞ্চলের লোককে বাঁচানো কি তাহার সাধ্য! পরক্ষণেই মনে হইল—একজন পারিত; বিশু-ভাই হয়তো পারিত! সে-ই তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে।...

তাহার চিন্তা-সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল।

কিসের ঢোল পড়িতেছে! ও কিসের ঢোল? ঢোল পড়ে সাধারণত জমিদারের ঘোষণায়—আজকাল অবশ্য ইউনিয়ন-বোর্ডের হাকিমদের হুকুমজারি ঢোল সহযোগে হইয়া থাকে। ট্যাক্সের জন্য অস্থাবর ক্রোক, ট্যাক্স আদায়ের শেষ তারিখ, ট্যাক্স বৃদ্ধি প্রভৃতির ঘোষণা—হরেক রকমের হুকুম। এ ঢোল কিসের?... দেবু দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

চিরপরিচিত ভূপাল একজন মুচীকে লইয়া ঢোল সহরত করিয়া চলিয়াছে!

—কিসের ঢোল, ভূপাল?

—আজ্ঞে, ট্যাক্স।

—ট্যাক্স? এই সময় ট্যাক্স?

—আজ্ঞে হাঁ। আর খাজনাও বটে।

দেবুর সমস্ত শরীর যেন কেমন করিয়া উঠিল। এই দুঃসময়—তবু ট্যাক্স চাই, খাজনা চাই!...কিন্তু সে কথা ভূপালকে বলিয়া লাভ নাই। সে দীর্ঘ দ্রুত পদক্ষেপে ভূপালদের পিছনে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া গেল।

দুঃখে নয়—এবার ক্ষোভে ক্রোধে তাহার বুকের ভিতরটা তোলপাড় করিয়া উঠিল।

কোন উপায়ই কি নাই? বাঁচিবার কি কোন উপায়ই নাই?

চণ্ডীমণ্ডপে শ্রীহরির সেরেস্তা পড়িয়াছে। গোমস্তা দাসজী বসিয়া আছে। কালু শেখ কাঠের ধুনি হইতে একটা বিড়ি ধরাইতেছে। ভবেশ ও হরিশ বসিয়া আছে, তাহাদের হাতে হুঁকা। মহাজন ফেলারাম ও শ্রীহরি বকুলগাছের তলায় দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে—কোন গোপন কথা। কাহারও সর্বনাশের পরামর্শ চলিতেছে বোধ হয়।

গতিবেগ আরও দ্রুততর করিল দেবু।

বাড়ীর দাওয়ার উপর গৌর চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ওই একটি ছেলে! বড় ভাল ছেলে! একেবার বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া সে বিস্মিত হইয়া গেল! একটা লোক—তাহার তক্তাপোশের উপর শুইয়া ঘুমাইতেছে। লোকটার পরনে হাফ-প্যাণ্ট, গায়ে সস্তাদরের কামিজ ও কোট; পায়ে ছেঁড়া মোজা, জুতাজোড়াটা নূতন হইলেও দেখিলে বুঝা যায় কমদামী। হ্যাটও আছে, হ্যাটটা মুখের উপর চাপা দিয়া দিব্য আরামে ঘুমাইতেছে, মুখ দেখা যায় না। পাশে টিনের একটা স্যুট্‌কেস।

দেবু গৌরকে প্রশ্ন করিল—কে গৌর?

গৌর বলিল—তা তো জানি না। আমি এখুনি এলাম দেখলাম, এমনি ভাবেই শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

দেবু সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে আবার লোকটার দিকে চাহিল।

গৌর ডাকিল—দেবু দা!

—কি?

—ভিক্ষের বাক্সগুলো নিয়ে এসেছি। চাবি খুলে পয়সাগুলো নেন্। আরও পাঁচ-ছটা বাক্স দিতে হবে। আমাদের আরও পাঁচ ছজন ছেলে কাজ করবে।

দেবু মনে অদ্ভুত একটা সান্ত্বনা অনুভব করিল। তালাবন্ধ ছোট ছোট টিনের বাক্স লইয়া গৌরের দল জংশন-স্টেশনে যাত্রীদের কাছে ভিক্ষা করে। সেই বাক্সগুলি পূর্ণ করিয়া সে পয়সা লইয়া আসিয়াছে। সংবাদ আনিয়াছে—তাহার দলে আরও ছেলে বাড়িয়াছে, আরও ভিক্ষার বাক্স চাই; পাত্রে ভিক্ষা ধরিতেছে না। আরও পাত্র চাই।

সে সস্নেহে গৌরের মাথায় হাত বুলাইয়া দিল।

গৌর বলিল—আজ একবার আমাদের বাড়ী যাবেন? সন্ধ্যের সময়?

—কেন? দরকার আছে কিছু? কাকা ডেকেছেন নাকি?

—না, স্বর্ণ এবার পরীক্ষা দেবে কিনা। তাই দরখাস্ত লিখে দেবেন। আর স্বর্ণ তার পড়ার কতকগুলো জায়গা জেনে নেবে।

—আচ্ছা, যাব।···গভীর স্নেহের সঙ্গে দেবু সম্মতি জানাইল। গৌর আর স্বর্ণ—ছেলেটি আর মেয়েটির কথা ভাবিয়া পরম সান্ত্বনা অনুভব করিল দেবু। আর ইহারা বড় হইলে এ অঞ্চলের অবস্থা আর এক রকম হইয়া যাইবে।

বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল দুর্গা, সে ঝঙ্কার দিয়া বলিল—যাক্, ফিরতে পারলে! খাবে দাবে কখন্?

তাহার শাসনে দেবু না হাসিয়া পারিল না, বলিল—এই যে! চল।

দুর্গা একটু হাসিয়া বলিল—নাও, আবার কুটুম এসেছে।

—কুটুম?

—ওই যে! দুর্গা ঘুমন্ত লোকটিকে দেখাইয়া দিল

দেবুর কথাটা নূতন করিয়া মনে হইল। সবিস্ময়ে সে বলিল—তাই বটে! ও কে রে?

—কর্মকার!

—কর্মকার?

—অনিরুদ্ধ গো! চাকরি করে মাথের মোক্ষ ফিরে এসেছে। মরণ আর কি!

—অনিরুদ্ধ গো? অনি ভাই?

—হাঁ।

কথাবার্তার সাড়াতেই, বিশেষ করিয়া বার বার অনিরুদ্ধ শব্দটি উচ্চারণে অনিরুদ্ধ জাগিয়া উঠিল। প্রথমে মুখের টুপিটা সরাইয়া দেবুর দিকে চাহিল, তার পর উঠিয়া বসিয়া বলিল—দেবু-ভাই! রাম-রাম!

তেইশ

দেবু অনিরুদ্ধকে বলিল—এতদিন কোথায় ছিলে অনি-ভাই?

উত্তরে অনিরুদ্ধ দেবুকে বলিল—কেয়া, পলা ঘর ছোড়কে চলা গেয়া দেবু-ভাই?

দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাথা হেঁট করিল। কোন কথা সে বলিতে

পারিল না, পদ্মকে সে রক্ষা করিতে পারে নাই! গৃহত্যাগিনী কন্যার পিতা, পত্নীর স্বামী, ভগ্নীর ভাই সেই গৃহত্যাগের প্রসঙ্গ উঠিলে যে ভাবে মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া থাকে, তেমনি ভাবেই সে চুপ করিয়া রহিল।

অনিরুদ্ধ হাসিল; বলিল—শরম কাহে? তুমারা কেয়া কসুর ভাই?

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, ঘাড় নাড়িয়া—যেন মনে মনে অনেক বিবেচনা করিয়া বলিল—উস্‌কা ভি কুছ কসুর নেহি! কুছ্‌ না। যানে দেও।

শেষে আপনার বুকে হাত দিয়া নিজেকে দেখাইয়া বলিল—কসুর হামারা হ্যায়; হামারা কসুর।

দেবু এতক্ষণে বলিল—একখানা চিঠিও যদি দিতে অনি ভাই!

অনিরুদ্ধ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—আর কোন কথা বলিল না।

দুর্গা দেবুকে তাগিদ দিল—জামাই, বেলা দুপুর যে গড়িয়ে গেল! রান্না কর।...তারপর অনিরুদ্ধের দিকে চাহিয়া বলিল—মিতেও তো এইখানে খাবে? না কি হে?

দেবু ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ, এইখানে খাবে বৈ কি। তুই কথাবার্তা বলতে শিখলি না দুগ্‌গা।

দুর্গা খিল্‌-খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল—ও যে আমার মিতে! ওকে আবার কুটুম্বিতে কিসের? কি হে মিতে, বল না?

অনিরুদ্ধ অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল—সচ্‌ বোলা তুম্ মিতেনী!

তাহার এই হাসিতে দেবু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিল। বলিল—তুমি মুখহাত ধোও অনি-ভাই। তেল-গামছা নাও, চান কর। আমি রান্না করে ফেলি।

বাড়ীর ভিতর আসিয়া সে রান্নার উদ্যোগ আরম্ভ করিল।...অনিরুদ্ধ! হতভাগ্য অনিরুদ্ধ। দীর্ঘকাল পরে ফিরিল—কিন্তু পদ্ম আজ নাই। থাকিলে কি সুখের কথাই না হইত! আজ অনিরুদ্ধের হাতে তাহাকে সে সমর্পণ করিত মেয়ের বাপের মত—বোনের বড় ভাইয়ের মত। হতভাগিনী পদ্ম! সংসারের চোরাবালিতে কোথায় সে তলাইয়া গেল, কে জানে! তাহার কঙ্কালের একখানা টুকরাও আর মিলিবে না—তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য!

অনিরুদ্ধ বাহিরে বক্ বক্ করিতেছে। অনর্গল অশুদ্ধ হিন্দিতে কথা বলিয়া চলিয়াছে। বাংলা যেন জানেই না। যেন আর-এক দেশের মানুষ হইয়া গিয়াছে সে।

খাইতে বসিয়া অনিরুদ্ধ তাহার নিজের কথা বলিল—এতক্ষণে সে বাংলায় কথা বলিল।...জেলখানাতেই মনে মনে বড় আক্ষেপ হয়েছিল দেবু-ভাই! নিজের ওপর ঘেন্না হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে ভাবতাম, গাঁয়ে মুখ দেখাব কি করে? আর গাঁয়ে গিয়ে খাবই বা কি? কিছুদিন থাকতে থাকতে আলাপ হল একজন হিন্দুস্থানী মিস্ত্রীর সঙ্গে। লোকটার জেল হয়েছিল মারামারি করে। কারখানার আর একজন মিস্ত্রীর সঙ্গে মারামারি করেছিল—একজন মেয়েলোকের জন্যে। সেই আমাকে বললে। আমার খালাসের একদিন আগে তার খালাসের দিন। কলকাতায় তার জেল হয়েছিল—খালাস হবে সে সেইখানে। ক'দিন আগেই এ জেল থেকে চলে গেল। আমাকে ঠিকানা দিয়ে বলে গেল—তুমি চলে এসো আমার কাছে। আমি তোমার কাজ ঠিক করে দোব।... জেল থেকে খালাস পেয়ে বের হলাম। ভাবলাম বাড়ী যাব না, জংশন থেকে খবর দিয়ে পদ্মকে আনিয়ে সঙ্গে নিয়ে চলে যাব।...তা—! অনিরুদ্ধ হাসিল; কপালে হাত দিয়া বলিল—হামারা নসীব দেবু-ভাই! আমাদের সেই বলে না—"গোপাল যাচ্ছ কোথা?...ভূপাল! কপাল? কপাল সঙ্গে!" আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল জংশনের কলের একটা মেয়ের সঙ্গে। দুগ্‌গা জানে, সাবি—সাবিত্রী মেয়েটার নাম। মেয়েটা দেখতে-শুনতে খাসা; আমার সঙ্গে—। অনিরুদ্ধ আবার হাসিল। অনিরুদ্ধের সঙ্গে মেয়েটির আগে হতেই জানাশুনা; জানাশুনার চেয়েও গাঢ়তর পরিচয় ছিল। মেয়েটি ছিল কলের বৃদ্ধ খাজাঞ্চীর অনুগৃহীতা। বৃদ্ধের কাছে টাকা-পয়সা সে যথেষ্ট আদায় করিত, কিন্তু তাহার প্রতি অনুরক্তি বা প্রীতি একটুক ছিল না। সে সময়টায় বুড়ার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া মেয়েটি সদর শহরে আসিয়া দেহ-ব্যবসায়ের আসরে নামিয়াছিল।

অনিরুদ্ধ বলিল—মেয়েটা কিছুতেই ছাড়লে না আমাকে। নিয়ে গেল তার বাসায়। মাটির খাওয়ালে। আর সেই দিনই এলো সেই বুড়ো খাজাঞ্চী তাকে

ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। মেয়েটা জলে গেল। রাত্রেই আমাকে বললে—চল, আমরা পালাই।···দেবু-ভাই, মাতন কাকে বলে, তুমি জান না। মাতনে মেতে তাই চলে গেলাম। গিয়ে উঠলাম কলকাতায় মিস্ত্রীর ঠিকানায়। তারপর—।

তারপর অনিরুদ্ধ বলিয়া গেল এতদিনের দীর্ঘ কাহিনী··· কলে কাজ ঠিক করিয়া দিল মিস্ত্রী। কামারশালায় মজুরের কাজ। কামারের ছেলে—তাহার উপর বুকে দারিদ্র্যের জ্বালা, কাজ শিখিতে তাহার বিলম্ব হইল না। মজুর হইতে কামারের কাজ, কামারের কাজ হইতে ফিটার-মিস্ত্রীর কাজ শিখিয়া সে আজ পুরাদস্তুর একজন ফিটার। বারো আনা হইতে দেড় টাকা—দেড় টাকা হইতে দুই টাকা—দুই হইতে আড়াই—আজ তাহার দৈনিক মজুরি তিন টাকা। তাহার উপর ওভারটাইম। ওভারটাইম ছাড়াও মধ্যে তাহার বাহিরে দুই-চারিটা ঠিকার কাজ থাকে।

অনিরুদ্ধ বলিল—দেবু-ভাই, পেট ভরে খেয়েছি—পরেছি—আবার মদ খেয়েছি, ফুর্তি করেছি—করেও আমি ছ'শো পঁচাত্তর টাকা সঙ্গে এনেছি। ভেবে-ছিলাম—ঘর দোর মেরামত করব—জমি কিনব। পদ্মকে সঙ্গে নিয়ে যাব।—তা···অনিরুদ্ধ দুটি হাত-ই উল্টাইয়া দিয়া বলিল—ফুড়ুৎ সব উড়ে গেল। অনিরুদ্ধ চুপ করিল। দেবুও কোন উত্তর দিল না। এ সবের কি উত্তর সে দিবে? দুর্গা অদূরে বসিয়া সব শুনিতেছিল। সেও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—তার-পর, সাধি কেমন আছে?

—ছিল ভালই। তবে—···হাসিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—কদিন হল সাধি কোথা পালিয়েছে!

—পালিয়েছে?

—হ্যাঁ।

—তাতেই বুঝি পরিবারকে মনে পড়ল?

অনিরুদ্ধ দুর্গার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কাজে-কাজেই, তাই হল বৈ কি। দোষ আমার, সে তো আমি স্বীকার করছি। তবে—

দুর্গা বলিল—তবে কি?

—তবে যদি ছিরের ঘরে না যেত, তবে আমার কোন দুঃখই হত না।···
কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—তাও যে সে ছিরের ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে
—এতেও আমি সুখী।

দেবু বলিল—তাহার একমাত্র অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করিল—তুমি যদি এক-খানা চিঠিও দিতে, অনি-ভাই।

অনিরুদ্ধ বলিল—বলেছি তো মাতন কাকে বলে, তুমি জান না দেবু-ভাই! আমি মেতে গিয়েছিলাম। তা ছাড়া—মনে মনে কি ছিল জান? মনে মনে ছিল যে, রোজগার করে হাজার টাকা না নিয়ে আমি ফিরব না। ফিরে তোমাদিগকে সব তাক লাগিয়ে দেব!

দুর্গা হাসিয়া বলিল—তা এখন এসে তোমারই তাক লেগে গেল!

—না। অনিরুদ্ধ অস্বীকার করিয়া বলিল—না। এ রকম একটা মনে মনে ভেবেই এসেছিলাম। বাবার নাই, পরবার নাই—স্বামী দেশ-ছাড়া, ছেলেপুলে নাই, জোয়ান বয়েস পদ্মর; এ আমি হাজারবার ভেবেছি দুর্গা। তবে সবচেয়ে বেশী দুঃখ—।

—কি?

—না। সে আর বলব না।

—ক্যানে? তোমার আবার লজ্জা হচ্ছে নাকি?

—লজ্জা?···দেবুর মুখের দিকে চাহিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—দেবু-ভাইয়ের ছেলে-পরিবার ছিল না, ওই তাকে খেতে-পরতে দিলে। হারামজাদী এসে ওর পায়ে গড়িয়ে পড়ল না কেন? আজ আমি দেবু-ভাইয়ের কাছে চেয়ে নিয়ে যেতাম। সে যদি না যেতে চাইত, কি দেবু-ভাই যদি দুঃখু পেতো, আমি হাসি-মুখে চলে যেতাম।

দেবু বলিয়া উঠিল—আঃ—আঃ, অনি-ভাই!

সে খাবার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।···

সমস্ত বাকী দ্বিপ্রহরটাই দেবুর মনে পড়িল—সেদিনকার রাতের কথা। বাহিরের তক্তাপোশের উপর বসিয়া সে স্থিরদৃষ্টিতে সেই শিউলি গাছটার দিকে

চাহিয়া রহিল।

তাহার একাগ্র চিন্তায় বাধা দিয়া দুর্গা তাহাকে ডাকিল—জামাই!

—এ্যাঁ! আমাকে বল্‌ছিস?

দুর্গা হাসিল; বলিল—বেশ যা হোক্‌। জামাই আর কাকে বলব?

—কি বল্‌ছিস?

—উ বেলায় গৌর এসেছিল। আমাকে বলে গিয়েছে, দেবু-দাদাকে একবার মনে করে যেতে বলো আমাদের বাড়ী। কি দরখাস্ত না কি লিখতে হবে। বার বার করে বলে গিয়েছে। তোমাকে বলে নাই?

দেবুর মনে পড়িয়া গেল। স্বর্ণ মাইনর পরীক্ষা দিবে, তাহার দরখাস্ত লিখিয়া দিতে হইবে। স্বর্ণকে একটু পড়াশুনা দেখাইয়া দিতে হইবে। স্বর্ণকেও যদি জীবনের পথ ধরাইয়া দিতে পারে, তবে সে-ও আমার পক্ষে একটা মহাধর্ম হইবে। বড় চমৎকার মেয়ে। গৌরেরই বোন তো! দেবু আশ্চর্য হইয়া যায়—কোথা হইতে কেমন করিয়া তাহারা এমনটি হইল?

তিনকড়ির বাড়ীতে বেশ একটা জটলা বসিয়া গিয়াছে। তিনকড়ি উপুড় হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে। ভল্লাবাগদীদের রামচরণ, তারিণী, বৃন্দাবন, গোবিন্দ প্রভৃতি কয়েকজন বসিয়া তামাক খাইতেছে। সকলেই চুপ করিয়া আছে। ইহাদের নিস্তব্ধতার একটা বিশেষ অর্থ আছে। আস্ফালন, উচ্চহাসি—ইহাদের স্বাভাবিক প্রকাশ। তিনকড়ির চারিত্রিক গঠনও অনেকটা ইহাদেরই মত। তিনকড়িকে কেন্দ্র করিয়া ইহাদের মজলিশ বসিলে, অন্ততঃ সিকি মাইল দূর হইতে সমবেত অট্টহাসির শব্দ শোনা যায়। অথবা শোনা যায় বচসার উচ্চকণ্ঠের আস্ফালন। অথবা শোনা যায় ঈষৎ জড়িত কণ্ঠের সমবেত গান।

নিস্তব্ধ আসর দেখিয়া দেবু শঙ্কিত হইল। কি ব্যাপার মিতে-কাকা?

তিনকড়ি এতক্ষণে মুখ তুলিয়া দেবুকে লক্ষ্য করিল, বলিল—এস বাবা!

দেবু বলিল—এমন করে চুপ্‌চাপ্‌ কেন আজ?

রামভল্লা বলিল—মোড়ল-দাদার ভাল গাইটি আজ মরে গেল পণ্ডিত মাশায়।

তিনকড়ি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—শুধু তাই নয় বাবা! হারামজাদা ছিদমে ঘোষপাড়াতে কাল রেতে ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। পঞ্চাশবার আমি বলেছিলাম—ওরে হারামজাদা ছিদমে, তোর বয়েস এখন কাঁচা, হাজার হলেও ছেলেমানুষ, যাস নি। তা শুনলে না!

—ঘোষপাড়ায় ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে? কই, ঘোষপাড়ায় ডাকাতি হয়েছে বলে কিছু শুনি নাই তো?

—এ ঘোষপাড়া নয়। মৌলিক-ঘোষপাড়া—মুরশিদাবাদের পাঁচহাটির ধারে। কেউ কেউ পাঁচহাটি-ঘোষপাড়াও বলে।

দেবুর বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না! পাঁচহাটি সে নিজেই গিয়াছে। সপ্তাহে পাঁচ দিন হাট বসে। এ অঞ্চলের বিখ্যাত হাট। তরিতরকারি হইতে আরম্ভ করিয়া চাল-দাল, মসলা পত্র, এমন কি গরু-মহিষ পর্যন্ত কেনা-বেচা হয়। মৌলিক-ঘোষপাড়াও সে একবার দেখিয়াছে, বনিয়াদী মৌলিক উপাধিধারী কায়স্থ জমিদারের বাস। প্রকাণ্ড বাড়ি! কায়দা-করণ কত! কিন্তু পাঁচহাটি যে এখান হইতে অন্তত বারো ক্রোশ পথ—চব্বিশ মাইল। এখান হইতে সেখানে ডাকাতি করিতে গিয়াছে? ছিদাম ডোম? উনিশ-কুড়ি বছরের লিকলিকে সেই লম্বা ছোঁড়াটা?

সবিস্ময়ে দেবু বলিল—সে যে এখান থেকে বারো চৌদ্দ ক্রোশ পথ!

অত্যন্ত সহজভাবে রাম বলিল—হ্যাঁ, তা হবে বৈ কি!

—এত দূর ডাকাতি করতে গিয়েছে? ছিদমে? সেই ছোঁড়াটা? কাল বিকেলবেলাতেও যে আমি তাকে দেখেছি। আমার সঙ্গে পথে দেখা হল!

—হ্যাঁ। সন্ধ্যের সময় বেরিয়েছে।

তিনকড়ি বলিল—হারামজাদা ধরা পড়ল,—এরপর গোটা গাঁ নিয়ে টানাটানি করবে। আমাকেও বাদ দেবে না, বাবা-দেবু!... সে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

দেবু চমকাইয়া উঠিল। তিনকড়ির মত লোকের মাথায় হাত দিয়া বসিয়া থাকার অর্থ এতক্ষণে তাহার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই সে

সংযত হইয়া বলিল—কি তার উপায় নাই! সে অবশ্যই সহ্য করতে হবে। কিন্তু তাতেই বা ভয় কি? আদালত তো আছে। মিথ্যাকে সত্যি বলে চালাতে গেলে সে চলে না।

তিনকড়ি একটু হাসিল।

রাম হাসিয়া বলিল—পণ্ডিত লোকে কথা বলে নাই তিনু দাদা। তুমি ভেবো না কিছু। পুলিশ হজ্জোৎ করবে—মেজেস্টারও হয়তো দায়রায় ঠেলবে। কিন্তু দায়রাতে তোমার সব ঠিক হয়ে যাবে তুমি দেখো।

হঠাৎ রাত্রির অন্ধকার যেন শিহরিয়া উঠিল, নিকটেই কোথায় ধ্বনিত হইয়া উঠিল কাহার মর্মান্তিক দুঃখে বুকফাটা কান্না। সকলেই চমকিয়া উঠিল।

তিনকড়ি বলিল—কে রে রাম! কে কাঁদছে?

রামের চাঞ্চল্য ইহারই মধ্যে প্রশমিত হইয়া গিয়াছে, সে বলিল—রংলের বেটাটা গেল বোধ হয়।

তারিণী বলিল—হ্যাঁ। তাই লাগছে!

হঠাৎ তিনকড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, ক্ষুব্ধ আক্রোশে বলিয়া উঠিল—মানুষে মানুষ খুন করলে ফাঁসি হয়, কিন্তু রোগকে ধরে ফাঁসি দিক—দেখি! আয় রাম, দেখি। যা হবার, সে তো হবেই—তার লেগে ভেবে কি করব?

সে হন্‌-হন্‌ করিয়া সকলের আগেই চলিয়া গেল। দেবু একটু বিস্মিত হইল। তিনু-কাকার এমন বিচলিত অবস্থা সে কখনো দেখে নাই! সকলে চলিয়া গেল—সে দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিতেছিল, রংলের বাড়ী যাইবে কি না? গেলে, যে কাজের জন্য সে আসিয়াছে—সে কাজ আজ আর হইবে না। এদিকে স্বর্ণের পরীক্ষার জন্য অনুমতির আবেদন পাঠাইবার দিনও আর বেশী নাই। রংলের বাড়ী গিয়াই বা কি হইবে? কি করিবে সে? শুধু পুত্রশোকাতুর মা-বাপের বুকফাটা আর্তনাদ শোনা, তাহাদের মর্মান্তিক আক্ষেপ চোখে দেখা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারে? না:, আর সে দুঃখ দেখিতে পারিবে না। দুঃখ দেখিয়া দেখিয়া তাহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। সে এখানে আসিবার পথে আনন্দ-আস্বাদনের প্রত্যাশা লইয়াই আসিয়াছিল। পথে সে অনেক কল্পনা করিয়াছে।

বুদ্ধি-দীপ্তিমতী স্বর্ণকে সে কঠিন প্রশ্ন করিবে, স্বর্ণ প্রথম শূন্যদৃষ্টিতে ভাবিতে থাকিবে। হঠাৎ তাহার চোখ দুটি চেতনার চাঞ্চল্যে দীপশিখার মত জ্বলিয়া উঠিবে, মুখে স্মিত হাসি ফুটিবে, ব্যগ্র হইয়া বলিয়া দিবে সে প্রশ্নের উত্তর। আরও কঠিনতর প্রশ্ন করিবে সে—স্বর্ণ সে প্রশ্নের উত্তর ভাবিয়া পাইবে না। তখন তাহার বিস্মিত চোখের প্রদীপে জানার আলোক-শিখা সে জ্বালাইয়া দিবে। বলিবে—শোন, উত্তর শোন। সে উত্তর বলিয়া যাইবে, স্বর্ণের চোখে দীপ্তি ফুটিবে, আর বুদ্ধিমতী মেয়েটির মুখে ফুটিয়া উঠিবে পরিতৃপ্ত কৌতূহলের তৃপ্তি ও শ্রদ্ধান্বিত বিস্ময়। গৌরও হয়তো স্তব্ধ হইয়া বসিয়া শুনিবে। গৌরের বুদ্ধি ধারালো নয়, কিন্তু অফুরন্ত তাহার প্রাণশক্তি। মধ্যে মধ্যে তাহার প্রাণশক্তির স্ফুরণের স্পর্শ সে পাইবে। সাহায্য-সমিতির জন্য হয়তো ইহারই মধ্যে সে কোন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া বসিয়া আছে। পড়াশুনার অবসরের মধ্যে মৃদু কণ্ঠে বলিবে—দেবু-দা একটা কথা বলছিলাম কি—।

কল্পনার মধ্যে সে যেন মুক্তির আস্বাদ পাইয়াছিল। দুঃখ হইতে মুক্তি, হতাশা হইতে মুক্তি—দুর্যোগময়ী অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রির অবসানক্ষণে পূর্বাকাশের ললাট-রেখার প্রান্তে এ যেন শুকতারার উদয়-আশ্বাস! দুঃখ আর সে সহ্য করিতে পারিতেছে না। মধ্যে মধ্যে তাহার মনে হয়, সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যায়। তাহার ঘর! ঘরের কথা মনে করিলে তাহার হাসি পায়। বিলু-খোকনের সঙ্গেই তাহার ঘর পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। যেটা আছে, সেই ঘরেতে এবং গাছতলাতে কোন প্রভেদ নাই। পৃথিবীর পথের ধারে গাছতলার অভাব নাই, এটা ছাড়িয়া আর-একটার আশ্রয়ে যাইতেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু এই কাজগুলা যেন তাহাকে নেশার মত পাইয়া বসিয়াছে। নেশাখোর যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াও নেশা ছাড়িতে পারে না—নেশার সময় আসিলেই যেমন নেশা করিয়া বসে, সেও তেমনি মনে করে—এই কাজটা শেষ করিয়া আর সে এসবের মধ্যে থাকিবে না, এই শেষ। কিন্তু কাজটা শেষ হইতে না-হইতে আবার একটা নূতন কাজের মধ্যে আসিয়া মাথা গলাইয়া বসে।

দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে ভাগ্যবানের

চোখের সম্মুখে বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠে—বর্ষার দিগন্তের বিদ্যুৎ; আলোর আভাস আসে, গর্জনের শব্দ আসিয়া পৌঁছায় না—ভাগ্যবান্ অন্ধকারের মধ্যেও নিশ্চিন্ত পথ দেখিয়া চলে। কিন্তু ভাগ্যহীনের হাতের আলো নিভিয়া যায়; তাহার ভাগ্যফলের দিগন্তে বিদ্যুতাভার পরিবর্তে আসে ঝড়ো হাওয়া। দেবু যে আনন্দের প্রদীপখানি মনে মনে জ্বালিয়া ছিল—সে আলো তিনকড়িদের দুশ্চিন্তার দীর্ঘনিশ্বাসে এবং সন্তানবিয়োগে রতন বাগ্দীর বুকফাটা আর্তনাদের ঝড়ো হাওয়ায় নিমেষে নিভিয়া গেল।

দাওয়ায় উঠিয়া সে দেখিল—সামনের ঘরে যেখানে গৌর ও স্বর্ণ বসিয়া পড়ে, সেখানে কেহই নাই। শুধু একখানা মাদুর পাতা রহিয়াছে, পিলসুজে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে। সে ডাকিল—গৌর!

কেহ সাড়া দিল না।

আবার সে ডাকিল—গৌর রয়েছ? গৌর!

এবার ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল স্বর্ণ।

দেবু বলিল—স্বর্ণ!

স্বর্ণ কোন উত্তর দিল না।

দেবু বলিল—গৌর কই? তোমার পরীক্ষার দরখাস্ত লেখবার কথা বলে এসেছিল সে, তোমার কি কি পড়া দেখিয়ে নেবার আছে বলেছিল!

স্বর্ণ এবারও কোন কথা বলিল না। প্রদীপটা স্বর্ণের পিছনে জ্বলিতেছে, তাহার সম্মুখ অবয়বে ঘনায়িত ছায়া পড়িয়াছে; তবুও দেবুর মনে হইল—স্বর্ণের চোখ দিয়া জলের ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। সে সবিস্ময়ে একটু আগাইয়া গেল, বলিল—স্বর্ণ!

চাপা কান্নার মধ্যে মৃদুস্বরে স্বর্ণ এবার বলিল—কি হবে দেবু-দা?

—কিসের স্বর্ণ? কি হয়েছে?

—বাবা—

—কি স্বর্ণ? বাবার কি? বলিতেই তাহার মনে পড়িল তিনকড়ির কথা।

তিনকড়ি তাহাকে বলিতেছিল—"ঘোষগাঁয়ে ডাকাতি করতে গিয়ে ছিদাম ধরা পড়েছে। হারামজাদা ধরা পড়ল, এর পর গোটা গাঁ নিয়ে টানাটানি করবে। আমাকেও বাদ দেবে না বাবা।" দেবু বুঝিল, আলোচনাটা বাড়ীর ভিতর পর্যন্ত পৌঁছিয়া মেয়েদের মনেও একটা আতঙ্কের সঞ্চার করিয়াছে।

অভয়ের সহিত সান্ত্বনা দিয়া সে বলিল—ছিদামের কথা বলছ তো? তা—তার জন্যে ভয় কি? মিছিমিছি তিনু-কাকাকে জড়ালেই তো জড়ানো যাবে না। ভগবান আছেন। এখনও দিন রাত্রি হচ্ছে। সত্য মিথ্যা—কখনও চাপা থাকবে না। এ চাকলার লোক সাক্ষী দেবে—তিনু কাকা সে রকম লোক নয়! এর আগেও তো পুলিস—দু-দুবার বি-এল কেস করেছিল—কিন্তু কিছুই তো করতে পারে নি। চাকলার লোকের সাক্ষ্য জজ সাহেব কখনও অমান্য করতে পারেন না।

স্বর্ণের কান্না বাড়িয়া গেল, বলিল—কিন্তু এবার যে বাবা সত্যি সত্যি ওদের দলে মিশেছে।

—য়্যাঁ, বল কি!···দেবু বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

স্বর্ণ বলিল—তাউ আমরা জানতাম না, দেবু-দা। আজ সন্ধ্যের সময় রাম-কাকারা এসে চুপি চুপি বাবাকে বললে—সর্বনাশ হয়েছে মোড়ল-দাদা, ছিদেমে ধরা পড়েছে। আমরা মনে করলাম, তাড়া খেয়ে ছোঁড়া কোন দিকে ছটকে পড়েছে, কিন্তু না—হারামজাদা ধরাই পড়েছে।···বাবা মাথায় হাত দিয়ে বসে বললে—রামা, তোরাই আমাকে মজালি। তোরাই আমাকে এবার এ পাপ করালি।

দেবু যেন পাথর হইয়া গিয়াছে, সে নির্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

স্বর্ণ মৃদুস্বরে বলিল—কাল বিকেলবেলা বাবা বললে—আমি কাজে যাচ্ছি—ফিরব কাল সকালে; তার আগে যদি ফিরি তো অনেক শেষরাত্তির হবে। পুলিসে যদি ডাকে তো বলে দিস—অসুখ করেছে, ঘুমিয়ে আছে।···পুলিসে ডাকে নাই, কিন্তু বাবা ফিরল শেষরাত্রে। হাঁপাচ্ছিল। মদ খেয়েছিল। তা—বাবা তো মদ খায়। আমরা কিছু বুঝতে পারি নি। আজ সন্ধ্যেবেলায় রাম-কাকারা যখন এল—

স্বর্ণের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

দেবু একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। শেষ—সব শেষ! চৌধুরী ঠাকুর বিক্রয় করিয়াছে, তিনু-কাকা শেষে ডাকাতের দলে ভিড়িয়াছে!

কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছিয়া স্বর্ণ বলিল—এরা সব যখন ডাকাতির কথা বলছিল, দাদা তখন ঘরে বসেছিল—বাবা জানতো না। আমি ঘরে এলাম—দাদা ইশারা করে আমাকে চুপ করে থাকতে বললে। আমিও চুপ করে দাঁড়িয়ে সব শুনলাম।

আবার একটা আবেগের উচ্ছ্বাস স্বর্ণের কণ্ঠে প্রবল হইয়া উঠিল; বলিল—দাদা বাড়ী থেকে চলে গিয়েছে দেবু-দা!

দেবু চমকিয়া উঠিল। বলিল—চলে গিয়েছে! কেন?

—হ্যাঁ। রাগে, দুঃখে, অভিমানে। যাবার সময় বললে—স্বর্ণ, বাবা খোঁজ করে তো বলিস, আমি বাড়ী থেকে চলে যাচ্ছি। এ বাড়ীতে আমি আর থাকব না।

চব্বিশ

তিনকড়ি নিজেই একদিন অকপটে দেবুর কাছে সব খুলিয়া বলিল। ঘর খানাতল্লাশ করিয়া কিছু মিলিল না। কিন্তু ছিদাম জীবনে প্রথম ডাকাতি করিতে গিয়া, ধরা পড়িয়া পুলিসের কাছে আত্মসংবরণ করিতে পারে নাই, সে কবুল করিয়াছে। তাহার উপর মৌলিক-ঘোষপাড়ার যে গৃহস্থের বাড়ীতে ডাকাতি হইয়াছিল, তাহাদের বাড়ীর দুজনে তিনকড়ি, রাম এবং তারিণীকে দেখিবামাত্র চিনিয়া ফেলিল। পুলিসের প্রশ্নের সম্মুখে—স্বর্ণও, যাহা শুনিয়াছিল, বলিয়া ফেলিল। তিনকড়ি পাথরের মূর্তির মত নিষ্পলক দৃষ্টিতে মেঝের দিকে চাহিয়া রহিল।

তারপর বিচারকালে—তিনকড়ি তখন হাজতে—দেবু একজন উকীল লইয়া তিনকড়ির সঙ্গে যেদিন দেখা করিল, সেইদিন তিনকড়ি অকপটে দেবুর কাছে সব

খুলিয়া বলিল।

সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াও দেবুকে তিনকড়ির মামলার তদ্বির করিতে হইল। নিজের মনের সঙ্গে এই লইয়া যুদ্ধ করিয়া সে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। তিনু-কাকা ডাকাতের দলে মিশিয়া ডাকাতি করিয়াছে—পাপ সে করিয়াছে—তাহার পক্ষে থাকিয়া মকদ্দমার তদ্বির করা কোনমতেই উচিত নয়। কিন্তু অন্যদিকে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া সে কোনমতেই নিজেকে নিরপেক্ষ রাখিতে পারিতেছে না। শুধু মমতার কথাই নয়, আজ যদি তিনকড়ির মেয়াদ হইয়া যায় তবে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের মাকে লইয়া তাহাকে আবার বিপদে পড়িতে হইবে। ত্রিসংসারের মধ্যে তাহাদের অভিভাবক কেহ নাই। গৌর সেইদিন সন্ধ্যায় যে কোথায় পালাইয়াছে—তাহার আর কোন উদ্দেশ নাই! জীবনে এমন জটিল অবস্থার মধ্যে সে কখনও পড়ে নাই।

প্রতিদিন রাত্রে একাকী বসিয়া শত চিন্তার মধ্যে তাহার মনে হয়—ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়াই শ্রেয়। এখান হইতে চলিয়া গেলেই তাহার মুক্তি—সে জানে; কিন্তু তাহাও সে পারিতেছে না। সে ইতিমধ্যে স্বর্ণদের সংস্রব এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিল, তিনদিন সে স্বর্ণদের বাড়ী গেল না। চতুর্থ দিনে মা এবং একজন ভল্লার ছেলেকে সঙ্গে লইয়া স্বর্ণ ম্লানমুখে তাহার বাড়ীর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল; কম্পিত-কণ্ঠে ডাকিল—দেবু দা!

দেবু ব্যস্ত হইয়া উঠিল, মনে মনে অপরাধের গ্লানি তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল; সে বাহিরে আসিয়া বলিল—স্বর্ণ! খুড়ীমা! আসুন—আসুন! ওরে দুর্গা, ওরে কোথা গেলি সব! এই যে এই মাদুরখানায় বসুন।...বাহিরের তক্তাপোশের মাদুরখানা তাড়াতাড়ি টানিয়া আনিয়াই সে মেঝেতে পাতিয়া দিল।

স্বর্ণের মা পূর্বে দেবুর সঙ্গে কথা বলিত না। এখন কথা বলে ঘোমটার ভিতর হইতে। সে বলিল—থাক্ বাবা, থাক্।

স্বর্ণ দেবুর পাতা মাদুরখানা তুলিয়া ফেলিল।

দেবু বলিল—ও কি, তুলে ফেলছ কেন?

স্বর্ণ একটু হাসিয়া বলিল—উল্টো করে পেতেছেন। উল্টো মাদুরে বসতে নেই।...বলিয়া সে মাদুরখানা সোজা করিয়া পাতিতে লাগিল।

—ও। অপ্রতিভ হইয়া দেবু বলিল—আপনারা কষ্ট করে এলেন কেন বলুন তো? আমি তিন দিন যেতে পারি নি বটে। শরীরটা তেমন ভাল ছিল না। আজই যেতাম।

স্বর্ণ বলিল—একটা কথা, দেবু-দা।

—কি, বল।

—দাদার জন্যে খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলে হয় না? কাল একটা পুরনো কাগজে দেখছিলাম একজনরা বিজ্ঞাপন দিয়েছে—'ফিরে এসো' বলে।

—হ্যাঁ, হাঁ। কথাটা দেবুর মনেই হয় নাই। সে বলিল—হ্যাঁ, তা ঠিক বলেছ। তাই দিয়ে দেখি। আজই লিখে বরং ওকে পাঠিয়ে দেব।

স্বর্ণ আপনার আঁচলের খুঁট খুলিয়া দুইটি টাকা দাওয়ার উপর রাখিয়া দিয়া বলিল—কত লাগবে, তা তো জানি না। দু'টাকায় হবে কি?

—টাকা তোমার কাছে রাখ। আমি সে ব্যবস্থা করব'খন।

ঘোমটার ভিতর হইতে স্বর্ণের মা বলিল—টাকা দুটি তুমি রাখ বাবা। তুমি আমাদের জন্যে অনেক করেছ। মাঝে মাঝে টাকাও খরচ করছ জানি। এ দুটি আমি গৌরের নাম করে নিয়ে এসেছি।

দেবু টাকা দুটি তুলিয়া লইল। স্বর্ণের মায়ের কথা মিথ্যা নয়। তবে সে কথা দেবু নিজে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করে নাই। কেবল স্বর্ণের পরীক্ষার ফিয়ের কথাটাই তাহারা জানে। পরীক্ষা দেওয়ার সংকল্প আজও স্বর্ণ অটুট রাখিয়াছে, মেয়েটির অদ্ভুত জেদ। সে তাহাকে বলিয়াছিল—দেবু দা, বাবার তো এই অবস্থা! দাদা চলে গিয়েছে। যেটুকু জমি আছে, তাও থাকবে না। এর পর আমাদের কি অবস্থা হবে? শেষে লোকের বাড়ী ঝি-গিরি করে খেতে হবে?

দেবু চুপ করিয়াই ছিল। এ কথার উত্তরই বা কি দিবে সে?

স্বর্ণ আবার বলিয়াছিল—সেদিন জংশনে গিয়েছিলাম, বালিকা-বিদ্যালয়ের দিদিমণির সঙ্গে দেখা হল। তিনি আমাকে বললেন—মাইনার পাস কর তুমি,

তোমাকে আমাদের ইস্কুলে নেব। ছোট মেয়েদের পড়াবে তুমি। দশ টাকায় ভর্তি হতে হবে। তারপর বাড়িয়ে দেবেন।

দেবু নিজেও অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছে। এ ছাড়া স্বর্ণের জন্য কোন পথ সে দেখিতে পায় নাই। আগেকার কালে অবশ্য এ পথের কথা কেহ ভাবিতেও পারিত না। বিধবার চিরাচরিত পথ—বাপ-মা অথবা ভাইয়ের সংসারে থাকা। কেহ না থাকিলে, অন্যের বাড়ীতে চাকরি করা। যাহারা শূদ্র, বামুন-বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ অথবা অবস্থাপন্ন স্বজাতিদের বাড়ীতে পাচিকার কাজই ছিল দ্বিতীয় উপায়। আর এক উপায়—শেষ উপায়—সে উপায়ের কথা ভাবিতেও দেবু শিহরিয়া উঠে। মনে পড়ে শ্রীহরিকে, মনে পড়ে পদ্মকে। সে মনে মনে বার বার স্বর্ণকে ধন্যবাদ দিয়াছে, সে যে এরূপ সাধু সংকল্প করিতে পারিয়াছে, এজন্যও তাহাকে অন্তরে প্রশংসা করিয়াছে। ভাবিয়া আশ্চর্যও হইয়াছে,—মেয়েটি আবেষ্টনীর প্রভাব কাটাইয়া এমন সংকল্পের প্রেরণা কেমন করিয়া পাইল?

প্রাচীন লোকে বলে—কাল-মাহাত্ম্য! কলিকাল।

চণ্ডীমণ্ডপে, লোকের বাড়ীতে, স্নানের ঘাটে এই কথা লইয়া ইহারই মধ্যে অনেক সবিদ্রূপ আলোচনা চলিতেছে।

দেবুকেও অনেকে বলিয়াছে—পণ্ডিত, এ কাজ ভাল হচ্ছে না। এর ফল পরে বুঝবে।...অনেক কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়াছে ইহার ভবিষ্যৎ লইয়া আলোচনা প্রসঙ্গে।

—মেয়েতে বিবি সেজে জংশনে চাকরি করতে যাবে কি হে? তখন তো সে যা মন চাইবে—তাই করবে।

দেবু যে এ কথা মানে না, এমন নয়। জংশনের বালিকা-বিদ্যালয়েরই একজন শিক্ষয়িত্রী এখান হইতে ভীষণ দুর্নাম লইয়া চলিয়া গিয়াছে। সদরের হাসপাতালের একজন লেডি ডাক্তারকে লইয়া একজন হোমরা-চোমরা মোক্তার বাবুর কলঙ্কের কথা জেলায় জানিতে কাহারও বাকি নাই। কিন্তু পরের ঘরে ঝিয়ের কাজ করিলেও তো সে অপযশ, সে পাপের সম্ভাবনা হইতে পরিত্রাণ নাই! জংশনের কলেও তো কত মেয়েছেলে কাজ করিতে যায়। সেখানেও কি তাহারা

নিষ্কলঙ্ক থাকিতে পারে? কিন্তু এসব যেন লোকের সহিয়া গিয়াছে। দেবুর মুখে তিক্ত হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এ ছাড়াও স্বর্ণের উপর তাহার বিশ্বাস আছে, শিক্ষার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা আছে। স্বর্ণ লেখাপড়া শিখিলে, তাহার জীবন উজ্জ্বলতর হইবে বলিয়া তাহার দৃঢ় ধারণা।

তিনকড়িকেও সে স্বর্ণের সংকল্পের কথা বলিল—তিনকড়িও বলিল—ওর আর কথা নাই বাবা। তুমি তাই করে দাও। স্বর্ণের জন্যে নিশ্চিন্ত হলে আর আমার কোন ভাবনাই রইল না। কালাপানি কি ফাঁসি হলেও আমি হাসতে হাসতে যেতে পারব।

দেবু চুপ করিয়া রহিল। স্বর্ণের কথা প্রসঙ্গে তিনকড়ি নিজের অপরাধের কথাটা তুলিতেই সে মনে অশান্তি অনুভব করিল।

তিনকড়ি মনের আবেগে অকপটে সব খুলিয়া বলিল।

বলিল—দেবু, এ আমার কপালের ফের বই কি! চিরকালটা আমাদের এই পাপের জন্যে গাল দিয়েছি, মেরেছি, দু মাস তিন মাস ওদের মুখ পর্যন্ত দেখি নি। বাবা, জীবনের মধ্যে পরের পুকুরের ছুটো একটা মাছ ছাড়া—পরের একটা কুটোগাছটা কখনও নিই নি। সেই আমার কপালের দুর্মতি দেখ! আমার অদেষ্ট আমাকে যেন ঘাড়ে ধরে এ পথে নিয়ে এলো। বানে সর্বস্ব করে নিয়ে গেল। দেবু, তোমাদিকে লুকিয়ে প্রথম প্রথম থালা-কাঁসা বেচলাম, তারপর—অন্ধকার হল চারিদিক। ভাবলাম, তোমাদের সাহায্য সমিতিতে যাই। কিন্তু লজ্জা হল। বীজ-ধান নিয়ে এলাম প্রথম, তাও অর্ধেকের উপর খেয়েই ফেললাম। তখন রামা একদিন এল। বললে—মোড়ল-দাদা, আমাদিগকে তুমি কিছু বলতে পারে না। আমরা তোমার ওই সমিতির ভিক্ষে নিয়ে বেঁচে থাকতে লারব। বাগ্দী—লাঠিয়াল, আমরা ডাকাত, চিরকাল জোর করে খেয়েছি—মাজ ভিক্ষে নিতে পারব না। ও মাগা চালের ভাত গলা দিয়ে নামছে না। আমাদের যা হয় হবে। তুমি আমাদের পানে চোখ বুজে থেকো। আমরা আমাদের উপায় করে লোব।...আমি বলেছিলাম—আমি ভিক্ষা নিতে পারলে তোরা পারবি না কেন? রামা বলেছিল—তোমাকেও ও ভাত খেতে দোব না। ভিখ্ মাঙ্তে

দোব না তোমায়। তুমি মোড়ল—তুমি তোমার বাপ-পিতেমো চিরকাল মাথা উঁচু করে রয়েছ—পাঁচজনাকে খাইয়েছ, ভিক্ষে দিতে শরম লাগে না তোমার? বরং যার বেশি আছে, তার কেড়ে নিই—এম…তবু আমি বলেছিলাম পাপ! এ পাপ করতে নাই!…রাম বললে—আমরা কালীমায়ের আজ্ঞা নিয়ে যাই মোড়ল, পাপ হলে, মা আজ্ঞা দিবে কেন? বেশ, তুমি মায়ের মাথায় ফুল চড়াও, ফুল যদি পড়ে—তবে বুঝবে মায়ের আজ্ঞে তাই। আর না পড়ে—তুমি যাবে না।… তা শ্মশানে কালীপুজো হল সেদিন রাত্রে। ফুল চড়ালাম মাথায়, ফুল পড়ল।…

তিনকড়ি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল। তারপর হাসিয়া বলিল—আমার কপালে এই ছিল বাবা। আমিই বা কি করব? তুমি উকিল দিলে—বেশ করলে। আর এসব নিয়ে নিজেকে জড়িও না। এরপর পুলিশ তোমাকে নিয়ে হাঙ্গামা করবে। তুমি বরং স্বর্ণমায়ের একটা ভালো ব্যবস্থা করে দিয়ো। তা হলেই আমি নিশ্চিন্ত। বল, আমাকে কথা দাও, স্বর্ণের ব্যবস্থা করবে তুমি?

দেবুকে সমর্থন করিয়াছে—কেবল জগন ডাক্তার। ডাক্তার দোষেগুণে সত্যই বেশ লোক। যেটা তাহার ভাল লাগে, সেটা সে অকপটে সমর্থন করে। যেটা মন্দ মনে হয়—সেটার প্রতিরোধ করিতে পারুক আর নাই পারুক—আকাশ ফাটাইয়া চিৎকার করিয়া বলে—না। না। এ অন্যায়—এ হতে পারে না।

আর সমর্থন করিয়াছে অনিরুদ্ধ।

মাস দেড়েক হইয়া গেল—অনিরুদ্ধ এখনও রহিয়াছে। চাকরির কথা বলিলে সে বলে—আমার চাকরির ভাবনা! হাতুড়ি পিটব আর পয়সা কামাব। পয়সা সব ফুরিয়ে যাক—আবার চলে যাব। কোন্ পরোয়া? মাগ-না-ছেলে, ঢেঁকি-না-কুলো—শালা বোঝার মধ্যে শুধু একটা সুটকেস। হাতে ঝুলিয়ে নোব আর চলব মজেসে!

সে এখন আড্ডা গাড়িয়াছে দুর্গার ঘরে। দুর্গার ঘরে ঠিক নয়—থাকে সে পাতুর ঘরে। ওইখানেই তার আড্ডা। দেবু বুঝিতে পারে—অনিরুদ্ধ দুর্গাকে চায়। কিন্তু দুর্গা অদ্ভুত রকমে পাল্টাইয়া গিয়াছে; ও-ধার দিয়াও ঘেঁষে না; দেবুর ঘরে কাজ-কর্ম করে, দুইটা খায়, রাত্রে গিয়া ঘরে খিল আঁটিয়া শোয়।

প্রথম প্রথম শ্রীহরির ঘটনায় দেবুকে জড়াইয়া যে অপবাদটা উঠিয়াছিল—সেটা ওই দুর্গার আচরণের জন্যই আপনি মরিয়া গিয়াছে সকালের আকাশে অকালের মেঘের মত। তাহার উপর বন্যায় পড়ে দেবু যখন সাহায্য-সমিতি গঠন করিয়া বসিল, দেশ-বিদেশ হইতে দেবুর নামে টাকা আসিল, দেবুকে কেন্দ্র করিয়া পাঁচখানা গ্রামের বালক-সম্প্রদায় আসিয়া জুটিল—চাষীর ছেলে গৌর হইতে আরম্ভ করিয়া জংশনের স্কুলের ছেলেরা পর্যন্ত ভিক্ষা করিয়া দেবুর ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিল; এবং দেবুও যখন সকলকে সাহায্য দিল—ভিক্ষা দেওয়ার ভঙ্গিতে নয়—আত্মীয়-কুটুম্বের দুঃসময়ে তত্ত্বতল্লাসের মত করিয়া সাহায্য দিল, তখন লোকে তাহাকে পরম সমাদরের সঙ্গে মনে মনে গ্রহণ করিল, তাহার প্রতি অবিচারের ত্রুটিও স্বীকার করিল। সমাজের বিধানে দেবু পতিত হইয়াই আছে। পাঁচখানা গ্রামের মণ্ডলদের লইয়া শ্রীহরি যে ঘোষণা করিয়াছে—তাহার প্রকাশ্য প্রতিবাদও কেহ করে নাই। কিন্তু সাধারণ জীবনে চলাফেরায়—মেলামেশায় দেবুর সঙ্গে প্রায় সকলেরই ঘনিষ্ঠতা বজায় আছে এবং সে ঘনিষ্ঠতা দিন দিন গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে। শ্রীহরি চণ্ডীমণ্ডপে দাঁড়াইয়া সবই লক্ষ্য করে। দু চারজনকে সে প্রশ্ন করিয়াছিল—দেবুর ওখানে যে এত যাওয়া-আসা কর—জান দেবু পতিত হয়ে আছে?

শ্রীহরি একদিন প্রশ্ন করিয়াছিল রামনারায়ণকে। সে তাহার তাঁবের লোক। অন্তত শ্রীহরি তাই মনে করে। রামনারায়ণ ইউনিয়ন বোর্ড পরিচালিত প্রাইমারী স্কুলের পণ্ডিত। রামনারায়ণ শ্রীহরিকে খাতিরও করে; এক্ষেত্রে সে বেশ বিনয়ের সঙ্গেই উত্তর দিয়াছিল—তা যাই আসি—ভাই বন্ধুলোক, তার ওপর ধরুন সাহায্য-সমিতি থেকে এ দুদিনে সাহায্যও নিতে হয়েছে। দশখানা গাঁয়ের লোকজন আসে। যাই, বসি, কথাবার্তা শুনি। পণ্ডিত করেছেন পঞ্চায়েত—দশখানা গাঁয়ের লোক যদি সেটা না মানে, তবে একা আমাকে বলে লাভ কি বলুন!

শ্রীহরি রাগ করিয়াছিল। দশখানা গাঁয়ের লোকের উপরেই রাগ করিয়াছিল; কিন্তু সে রাগটা প্রথমেই পড়িয়াছিল—রামনারায়ণের উপর। ইউনিয়ন

বোর্ডের মেম্বর সে, কৌশল করিয়া অপর সভ্যদের প্রভাবান্বিত করিয়া রামনারায়ণের উপর এক নোটিশ দিয়াছিল। তোমার অনুপযুক্ততার জন্য তোমাকে এক মাসের নোটিশ দেওয়া যাইতেছে। কিন্তু দেবু সে নোটিশের উত্তরে—ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অব্ স্কুলস্-এর নিকট একখানা ও সার্কেল অফিসারের মারফৎ এস্-ডি-ওর কাছে বহু লোকের সইযুক্ত একখানা দরখাস্ত পাঠাইয়া রামনারায়ণের উপযুক্ততা প্রমাণ করিয়া সে নোটিশ নাকচ করিয়া দিয়াছে।

তারা নাপিতকেও শ্রীহরি শাসন করিয়াছিল—তুই দেবুকে ক্ষৌরি করিস কেন বল্ তো?

ধূর্ত তারার আইন-জ্ঞান টনটনে। সে বলিয়াছিল—আজ্ঞে, আগের মতন ধান নিয়ে কামানো আজকাল উঠে গিয়েছে। ধরুন—যারা পতিত নয়—তাদের অনেকে—নিজে ক্ষুর কিনে কামায়, রেল জংশনে গিয়ে হিন্দুস্থানী নাপিতের কাছে কামিয়ে আসে; আমি পয়সা নিয়ে কত বাইরের লোককেও কামাই। পতিত পয়সা দেন—আমি কামিয়ে দিই। আমার তো পেট চলা চাই। আপনি যত লোক—যারা ক্ষুর কিনেছে, কি যারা অন্য নাপিতের কাছে কামায়, তাদের বারণ করুন দেখি; তখন একশো বার—ঘাড় হেঁট করে আমি হুকুম মানব; পতিতকে কামাবো না আমি।

শ্রীহরি ব্যাপারটা লইয়া আর কোন উচ্চবাচ্য করে নাই; কিন্তু লক্ষ্যতে সে সমস্তই লক্ষ্য করিতেছে। তিনকড়ির মামলায় সে যথাসাধ্য পুলিস-কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করিতেছে। তিনকড়ি ডাকাতির মামলায় ধরা পড়ায় সে মহাখুশী হইয়াছে,—সে কথা সে গোপনও করে না।

ঘটনাটা যখন সত্য, তখন পুলিসকে সাহায্য করায় দেবু শ্রীহরিকে দোষ দেয় নাই। কিন্তু আক্রোশবশে—শ্রীহরি তাহার খুনা গোমস্তা দাসজীর সাহায্যে মিথ্যা সাক্ষী খাড়া করিবার চেষ্টা করিতেছে। দাসজী নিজে নাকি পুলিসকে বলিয়াছে যে, সে স্বচক্ষে তিনকড়ি ও রামভল্লাদের লাঠি হাতে ঘটনার রাত্রে—তিনটার সময় বাঁধের উপর দিয়া ফিরিয়া আসিতে দেখিয়াছে। সে নিজে সেদিন জংশনে রাত্রি দেড়টার ট্রেনে নামিয়া ফিরিবার পথে রাস্তা ভুল করিয়া দেখুড়িয়ার কাছে গিয়া

পড়িয়াছিল।

এই কথা মনে করিয়া দেবুর মন শ্রীহরির উপর বিষাইয়া উঠে। ঘৃণাও হয় যে—তিনকড়ির বিপদে শ্রীহরি হাসে, সে খুশী হইয়াছে। সে আরও জানে—অদূর ভবিষ্যতে তিনকড়ির জেল হইবার পর, শ্রীহরি আবার একবার পড়িবে স্বর্ণকে লইয়া। তাহার আভাসও সে পাইয়াছে। সে বলিয়াছে—জুতো পায়ে দিয়ে জংশনের ইস্কুলে মাস্টারি করবে বিধবা মেয়ে!...আচ্ছা, দেখি কেমন ক'রে করে। আমি-তো মরি নাই এখনো!...

সন্ধ্যাবেলায় আপনার দাওয়ায় বসিয়া দেবু এই সব কথাই ভাবিতেছিল। আজ তাহার মজলিশে কেহ আসে নাই। দূরে ঢাক বাজিতেছে। আজ রাত্রে জগদ্ধাত্রী-প্রতিমার বিসর্জন-উৎসব। কঙ্কণার বাবুদের বাড়ীতে তিনখানি জগদ্ধাত্রী পূজা হইয়া থাকে। সে এক পূজার প্রতিযোগিতা। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কে কত আগে খাওয়াইতে পারে এবং কাহার বাড়ীতে কতগুলি মাছ তরকারি, এই লইয়া প্রতিবারই পূজার পরও কয়েক দিন ধরিয়া আলোচনা চলে। বিসর্জন উপলক্ষে বাজী পোড়ানো লইয়া আর এক দফা প্রতিযোগিতা হয়।...সকলেই প্রায় বাজী পোড়ানো দেখিতে ছুটিয়াছে। জগন ডাক্তার, হরেন ঘোষাল পর্যন্ত গিয়াছে পাতুদের দলবলসহ। দুর্গাও গিয়াছে। শ্রীহরিও গিয়াছে সন্ধ্যার আগেই। শ্রীহরির বাহারের টাপর-চাপানো গাড়ীখানা দেবুর দাওয়ার সুমুখ দিয়াই গিয়াছে। গলায় ঘণ্টার মালা পরানো তেজী বলদ দুইটা হেলিয়া-দুলিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। গাড়ীর পাশে লালপাগড়ি বাঁধিয়া কালু শেখ এবং চৌকিদারী নীল উর্দি ও পাগড়ী আঁটিয়া ভূপাল বাগ্দীও গিয়াছে। সে জমিদার শ্রেণীর মানুষ এখন; তাহার বিশেষ নিমন্ত্রণ আছে।

গ্রামের মধ্যে আছে যাহারা, তাহারা বৃদ্ধ অক্ষম, অথবা রুগ্ন কিংবা সদ্যশোকাতুর। শোকাতুর এ অঞ্চলে প্রায় প্রতিটি মানুষ। বন্যার পর করাল ম্যালেরিয়া অঞ্চলটার প্রতিঘরেই একটা-না-একটা শেল হানিয়া গিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশ লোক—ওই সদ্য-শোকার্তরা ছাড়া—সকলেই গিয়াছে।

ভাসান দেখিতে আলো-বাজনা-বাজী পোড়ানোর আনন্দে মাতিতে এই পথে দেবুর চোখের উপর দিয়া সব গিয়াছে। তৃষ্ণার্ত মানুষ যেমন বুকে হাঁটিয়া মরীচিকার দিকে ছুটিয়া যায় জলের জন্য—তেমনি ভাবেই মানুষগুলি ছুটিয়া গেল—ক্ষণিকের মিথ্যা আনন্দের জন্য। কিছুক্ষণ আগে একা একটি লোক গেল—মাথায় কাপড় ঢাকিয়া, দেবু তাহাকেও চিনিয়াছে। সে ও-পাড়ার হরিহর—পরশু তাহার একটা ছেলে মারা গিয়াছে। দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। উহাদের কথায় মনে পড়িল নিজের কথা—বিলুকে, খোকাকে। সেই বা বিলুকে খোকাকে কতক্ষণ মনে করে? ...তাহার মুখে বাঁকা হাসি ফুটিয়া উঠিল।...কতক্ষণ? দিনান্তে একবার স্মরণও করে না। হিসাব করিয়া দেখিলে—মাসান্তে একদিন একবার হইবে কিনা সন্দেহ। কেবল কাজ-কাজ পরের কাজের বোঝা ঘাড়ে করিয়া ভূতের ব্যাগার খাটিয়া চলিয়াছে সে। এ বোঝা কবে নামিবে কে জানে?

তবে এইবার হয়তো নামিবে বলিয়া মনে হইতেছে।

সাহায্য-সমিতির টাকা ও চাউল ফুরাইয়া আসিয়াছে। অন্যদিকেও সাহায্য-সমিতির প্রয়োজনও কমিয়া আসিল। আশ্বিন চলিয়া গিয়াছে—কার্তিক শেষ হইয়া আসিল। এখানে-ওখানে দুই-চারিটা আউস—ইতিমধ্যেই চাষীর ঘরে আসিয়াছে। 'ভাদো' ধানও কাটিয়াছে। অগ্রহায়ণের প্রথমেই 'নবীনা' ধান উঠিবে, তাহার পর ধান কাটিবে 'আমন'। পঞ্চগ্রামের মাঠই এ অঞ্চলের মধ্যে প্রধান মাঠ—সেই মাঠে অবশ্য এবার কিছুই নাই। কিন্তু প্রতি গ্রামেরই অন্যদিকেও কিছু কিছু জমি আছে। সেই সব মাঠ হইতে ধান কিছু কিছু আসিবে। সম্ভ অভাবটা ঘুচিবে। দু-মাসের মধ্যে ম্যালেরিয়া অনেকখানি সহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এখন তাদের তেজ কমিয়াছে—আর সে মড়কের ভয়াবহতা নাই। ছেলে অনেক গিয়াছে; বয়স্ক মরিয়াছেও কম নয়। গরু মহিষ প্রায় অর্ধেক উজাড় হইয়াছে। সেই অর্ধেক গরু-মহিষ লইয়াই লোকে আবার চাষের কাজে নামিয়াছে। রামের একটা শ্যামের একটা লইয়া—রাম-শ্যাম দুজনে 'গাঁতো' করিয়া কিছু কিছু রবি ফসল চাষের উদ্যোগ করিতেছে।

দেবু দেখে আর ভাবে—আশ্চর্য মানুষ! আশ্চর্য সহিষ্ণুতা! আশ্চর্য তাহার বাঁচিবার—ঘরকন্না করিবার সাধ-আকাঙ্ক্ষা! এই মহাবিপর্যয়—বন্যারাক্ষসীর করকরে জিভের লেহন-চিহ্ন সর্বাঙ্গে অঙ্কিত; এই অভাব, এই রোগ, এই মড়কের মধ্যে ঘরের ভাঙন, জমির বালি, ক্ষেতের গর্ত—সমস্তই মানুষ এক লহমায় মুছিয়া ফেলিল! কালই সে পঞ্চগ্রামের মাঠ দেখিয়া আসিয়াছে। দেখুড়িয়ায় গিয়াছিল—স্বর্ণদের তল্লাস করিতে। পঞ্চগ্রামের মাঠের মধ্য দিয়া আলপথের দুই ধারের জমিগুলিতে কিছু কিছু চাষ হইয়াছে। এখন ছোলা, মসুর, গম, যব, সরিষার বীজ সংগ্রহ করার দায়টাই সাহায্য-সমিতির শেষ দায়। এই কাজটা করিয়া ফেলিতে পারিলেই—সাহায্য-সমিতি সে বন্ধ করিয়া দিবে।

সাহায্য-সমিতির দায়ের বোঝা এইবার ঘাড় হইতে নামিবে।

আর এক বোঝা—তিনকড়ির সংসারের বোঝা। এই নূতন দায়টি লইয়াই তাহার চিন্তার অন্ত নাই। তিনকড়ির মামলার শেষ হইতে আর দেরি নাই। শোনা যাইতেছে—শীঘ্রই—বোধ হয় এক মাসের মধ্যে দায়রায় উঠিবে। দায়রার বিচারে তিনকড়ির সাজা অনিবার্য। তারপর স্বর্ণ ও তিনকড়ির স্ত্রীকে লইয়া সমস্যা বাধিবে। এ দায়—সত্যকার দায়, মহাদায়। শ্রীহরির শাসনবাক্য সে শুনিয়াছে। কাহারও শাসনবাক্যকে সে আর ভয় করে না। শাসনবাক্য শুনিলেই তাহার মনের আগুনের শিখা জ্বলিয়া উঠে। তারা নাপিতের কাছে কথাটা শুনিয়া সেদিন তাহার মনে হইয়াছিল—তিনকড়ির জেল হইলে সে স্বর্ণ এবং তাহার মাকে নিজের বাড়িতে আনিয়া রাখিবে। স্বর্ণ যে রকম পরিশ্রম করিতেছে এবং যে রকম তাহার ধারালো বুদ্ধি, তাহাতে সে এম-ই পরীক্ষায় পাস করিবেই। জংশনের ইস্কুলে সে নিজে উদ্যোগী হইয়া তাহার চাকরি করিয়া দিবে, এবং স্বর্ণ যাহাতে ম্যাট্রিক পাস করিতে পারে, তাহাও সে করিবে। শ্রীহরি বলিয়াছে—জুতা পায়ে দিয়া বিধবা মেয়ে চাকরি করিলে, সে সহ্য করিবে না। তবুও স্বর্ণকে সে রীতিমত আজকালকার শিক্ষিত মেয়ের মত সাজপোশাক পরাইবে। সাদা থানকাপড়ের পরিবর্তে সে তাহাকে রঙিন শাড়ি কাপড় পরিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। বিধবা! কিসের বিধবা স্বর্ণ? পাঁচ বৎসর বয়সে বিবাহ

—সাত বৎসর বয়সে বিধবা! বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সব বিধবা বিবাহের জন্য প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। আইন পর্যন্ত পাস হইয়া রহিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা তাহার মনে পড়িল—

"হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কতকাল তোমরা মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমোদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে!...হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না!"...স্বর্ণের একটা ভালো বিবাহ দিয়া তাহাদের লইয়াই সে আবার নূতন করিয়া সংসার পাতিবে।

এ সব তাহার উত্তেজিত মনের কথা। স্বাভাবিক শান্ত অবস্থায় স্বর্ণদের চিন্তাই এখন তাহার বড় চিন্তা হইয়াছে। অভিভাবকহীন স্ত্রীলোক দুটিকে লইয়া কি ব্যবস্থা সে যে করিবে—স্থির করিতে পারিতেছে না। গৌর থাকিলে সে নিশ্চিন্ত হইত। লজ্জায়-দুঃখে সে কোথায় চলিয়া গেল—তাহার কোন সন্ধানই মিলিল না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতেও কোন ফল হয় নাই। হঠাৎ একটা কথা তাহার মনে হইয়া গেল। সে কয়েক মুহূর্ত স্থির হইয়া ভাবিয়া উঠিল। উপায় সে পাইয়াছে।

দূরে দুম-দাম ফট্-ফাট্ শব্দ উঠিতেছে। বোম-বাজি ফাটিতেছে। কদম গাছের ফুল ফাটিতেছে। ওই যে আকাশের বুকে লাল-নীল রঙের ফুলঝুরি ঝরিতেছে, হাউই বাজি পুড়িতেছে।...

উপায় সে পাইয়াছে। সংঘ-সমিতির দায় হইতে মুক্তি পাইলেই সে তাহার নিজের জমি-বাড়ী স্বর্ণ এবং স্বর্ণের মাকে ভোগ করিতে দিয়া একদিন রাত্রে উঠিয়া চলিয়া যাইবে। স্বর্ণ এবং তাহার মায়ের বরং জংশনে ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের কাছাকাছি কোথাও থাকিবার একটা ব্যবস্থা করিয়া দিবে। স্বর্ণ ইস্কুলে চাকরি করিবে, তাহার জমিগুলি সতীশ বাউড়ীর হাতে চাষের ভার দিবে, সে ধান তুলিয়া স্বর্ণদের দিয়া আসিবে। তারপর—গৌর কি কোন দিনই ফিরিবে না? ফিরিলে সেই এই সব ভার লইবে।

এই পথ ছাড়া মুক্তির উপায় নাই। হ্যাঁ, তাই সে করিবে। সংসার হইতে—বন্ধন হইতে মুক্তিই সে চায়! প্রাণ তাহার হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। আর সে

পারিবে না। আর সে পরের বোঝা বহিয়া ভূতের ব্যাগার খাটিতে পারিতেছে না। তাহার বিনু—তাহার খোকাকে মনে করিবার অবসর হয় না, রাজ্যের লোকের সঙ্গে বিরোধ মনান্তর করিয়া দিন কাটানো, কলঙ্ক-অপবাদ অঙ্গের ভূষণ করিয়া লওয়া—এ সব আর তাহার সহ্য হইতেছে না। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া অতল শান্তির মধ্যে—নিরুদ্বেগ আনন্দের মধ্যে দিন কাটাইতে চায় সে। সে তাহার বৈচিত্র্যময় বাধাতুর অতীতকে পিছনে ফেলিয়া সে গ্রাম হইতে বাহির হইয়া পড়িবে। প্রাণ ভরিয়া সে খোকনকে বিনুকে স্মরণ করিবে—ভগবানকে ডাকিবে—তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইবে। যাইবার আগে সে অমুক একটা কাজ করিবে—খোকন এবং বিনুর চিতাটি সে পাকা করিয়া বাঁধাইয়া দিবে। আর শ্মশানঘাটে একখানি ছোট টিনের চালাঘর করিয়া দিবে। জলে, ঝড়ে, শিলাবৃষ্টিতে, বৈশাখের রৌদ্রে শ্মশান-বন্ধুদের বড় কষ্ট হয়। একখানি মার্বেল ট্যাবলেটে লিখিয়া দিবে—"বিনু ও খোকনের স্মৃতি-চিহ্ন"।

খোকন ও বিনু! আজ এই নির্জন অবসরে তাহারা যেন প্রাণ পাইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে মনের মধ্যে। খোকন ও বিনু! সামনেই ওই শিউলি গাছটার ফাঁকে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে—মনে হইতেছে বিনুই যেন দাঁড়াইয়া আছে, পদ্মের মত আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। তাহার খোকন ও বিনু!

দেবু চমকিয়া উঠিল। মাত্র একটুখানি সে অন্যমনস্ক হইয়াছিল, হঠাৎ দেখিল শিউলিতলার পাশ হইতে কে বাহির হইয়া আসিতেছে। ধবধবে কাপড় পরা নারীমূর্তি। বিনু—বিনু! হাঁ...ওই যে তাহার কোলে খোকন! খোকনকে কোলে করিয়া সে দাওয়ায় আসিয়া উঠিল। দেবুর সর্বশরীরে একটা শিহরণ বহিয়া গেল। শিরায়-শিরায় যেন রক্তধারায় আগুন ছুটিতেছে। সে তক্তাপোশে বসিয়াছিল—লাফ দিয়া উঠিয়া গিয়া অন্ধ আবেগে দুই হাতে বিনুকে বুকে টানিয়া চাপিয়া ধরিল, মুখ-কপাল চুমায় চুমায় ভরিয়া দিল। বাঁচিয়া উঠিয়াছে—বিনু তাহার বাঁচিয়া উঠিয়াছে!

—এ কি জামাই, ছাড় ছাড়! ক্ষেপে গেলে নাকি?

দেবু চমকিয়া উঠিল। আর্তস্বরে প্রশ্ন করিল—কে! কে?

—আমি দুগ্‌গা। তুমি বুঝি—

—হ্যাঁ, দুর্গা?···দেবু তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া যেন পাথর হইয়া গেল।

দুর্গা বলিল—বোষেদের ছেলেটা ভিড়ের ভেতর সঙ্গ হারিয়ে কাঁদছিল, নিয়ে এলাম কোলে করে। মরণ আমার—দিয়ে আসি বাড়ীতে।

দেবু উত্তর দিল না। পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত সে অসাড়ভাবে দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িল। দুর্গা চলিয়া গেল।

দুর্গা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—দেবু তক্তাপোশের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া আছে।

সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—মুখে তাহার বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল; সে মৃদুস্বরে ডাকিল—জামাই-পণ্ডিত!

দেবু উঠিয়া বসিল—কে, দুর্গা?

—হ্যাঁ।

—আমাকে মাফ্ করিস্ দুর্গা, কিছু মনে করিস্ না।

—কেন গো, কিসের কি মনে করব আবার?···দুর্গা খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া সারা হইল।

—আমার মনে হল দুর্গা, শিউলিতলা থেকে বিলু যেন খোকনকে কোলে করে বেরিয়ে আসছে। আমি ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম, থাকতে পারলাম না।

দুর্গা একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল—কোন উত্তর দিল না। নীরবেই ঘরের শিকল খুলিয়া ঘরের ভিতর হইতে লণ্ঠনটা আনিয়া তক্তাপোশের উপর রাখিয়া বলিল···আঁধারে কত কি মনে হয়। আলোটা নিয়ে বসলেই—।···কথা বলিতে বলিতেই সে আলোর শিখাটা বাড়াইয়া দিতেছিল; উজ্জ্বলতর আলোর মধ্যে দেবুর মুখের দিকে চাহিয়া সে অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল। তারপর সবিস্ময়ে বলিল—এর জন্যে তুমি কাঁদছ জামাই-পণ্ডিত!

দেবুর দুই চোখের কোণ হইতে জলের রেখা আলোর ছটায় চক্-চক্ করিতেছে। দেবু ঈষৎ একটু ম্লান হাসিয়া হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিল।

দুর্গা বলিল—জামাই-পণ্ডিত! তুমি আমাকে ছুঁয়েছ বলে কাঁদছ?

দেবু বলিল—চোখ থেকে জল অনেকক্ষণ থেকেই পড়ছে দুর্গা; আজ মনে পড়ে গেল—খোকন আর বিলুকে। হঠাৎ তুই এলি ছেলে কোলে করে—আমার কেমন ভুল হয়ে গেল।…দেবুর চোখ দিয়া আবার জল গড়াইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দুর্গা বলিল—তোমার মত লোক জামাই-পণ্ডিত—তোমাকে কি কাঁদতে হয়?

হাসিয়া দেবু বলিল—কাঁদতেই তো হয় দুর্গা। তাদের কি ভুলে যেতে পারি?

দুর্গা বলিল তা বলছি না জামাই। বলছি—তোমার মত লোক যদি কাঁদবে, তবে গরীব-দুঃখীর চোখের জল মোছাবে কে বল?

দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।…

ওদিকে ময়ূরাক্ষীর তীরের বাজনা থামিয়া গিয়াছে। দূরে লোকজনের সাড়া পাওয়া যাইতেছে, সাড়া আগাইয়া আসিতেছে।

দুর্গা বলিল—উনানে আগুন দিই, জামাই! অনেক রাত হল, ওঠ!

—নাঃ, আজ আর কিছু খাব না।

—ছিঃ! তোমার মুখে ও কথা সাজে না। ওঠ, ওঠ। না উঠলে তোমার পায়ে মাথা ঠুকব আমি।

দেবু হাসিয়া বলিল—বেশ। চল্‌

হঠাৎ নিকটেই কোথাও ঢোল বাজিয়া উঠিল। বিস্মিত হইয়া দেবু বলিল—ও আবার কি?

দুর্গা হাসিয়া বলিল—কর্মকার, আবার কে?

—অনিরুদ্ধ?

—হ্যাঁ। ভাসান দেখতে গিয়ে যা হুল্লোড় করলে! আজ আবার পাকী মদ এনেছিল। পাড়ার লোককে খাইয়েছে। এই রেতে আবার মঙ্গলচণ্ডীর গান হবে। তাই আরম্ভ হল বোধ হয়।

দেবু হাসিল। অনিরুদ্ধ ফিরিয়া আসিয়া এই পাড়াটাকে বেশ জমাইয়া রাখিয়াছে। জমাইয়া রাখিয়াছেই নয়—অনেককে অনেক রকম সাহায্যও করিয়াছে।

দুর্গা বলিল—দাদা যে কর্মকারের সঙ্গে কাজ করতে কলকাতা চলল, শুনেছ?

—এমনি শুনেছি। অনিই একদিন বলছিল।

—আরও সব ক'জনা কর্মকারকে ধরেছে। তা কর্মকার বলেছে—সবাইকে নিয়ে কোথা যাব আমি? পাতু আমার পুরনো জানের লোক, ওকে নিয়ে যাব। তোরা সব জংশনের কলে গিয়ে কাজ কর।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। আজই সব সন্ধ্যেবেলায়—ভাসান দেখতে যাবার আগে, খুব কলকল্ করছিল সব। সতীশ দাদা বলছিল—কলে খাটতে যাবি কি! আর আর সবাই বলছিল—আলবৎ যাব, খুব যাব। কর্মকার ঠিক বলেছে।...সে সব নাকানি কি! মাচের খুব তো।

দেবু চুপ করিয়া রহিল। দুর্গার কথাটার মধ্যে দেবুর মন চিন্তার বিষয় খুঁজিয়া পাইয়াছে। কলে খাটিতে যাইবে! ওপারে জংশনে কল অনেক দিন হইয়াছে। কিন্তু আজও পর্যন্ত এ গ্রামের দীনদরিদ্র ও অবনত জাতির কেহই খাটিতে যায় নাই। সাঁওতাল এবং হিন্দুস্থানী মুচীরাই কলে মজুর খাটিয়া থাকে। কলের মজুরদের অবস্থাও সে জানে। পয়সা পায় বটে, মজুরিও বাঁধা বটে, কিন্তু কলে যে সব কাণ্ড ঘটিয়া থাকে, তাহাতে গৃহস্থের গৃহধর্ম থাকে না। গৃহও না—ধর্মও না। এতদিন ধরিয়া কলের লোকেরা অনেক চেষ্টা করিয়াছে, অনেক লোভ দেখাইয়াছে, কিন্তু তবুও গৃহস্থের একজনও ও পথে হাঁটে নাই। কালবন্যায় গৃহস্থের ঘর ভাঙিয়াছে। অনিরুদ্ধ আসিয়া ধর্মভয়ও ফুৎকারে উড়াইয়া দিল নাকি?...

দুর্গা বলিল—নাও, আবার কি ভাবতে বসলে? রান্না চাপাও!

দেবু রান্নার হাঁড়িটা আনিবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিল। দুর্গা বলিল—দাঁড়াও দাঁড়াও।

—কি?

—কাপড় ছাড়।

—কেন?

সলজ্জ ভাবেই দুর্গা হাসিয়া বলিল—আমাকে ছুঁলে যে!

—তা হোক!

উনানের উপর দেবু হাঁড়ি চড়াইয়া দিল।

বাউড়ীপাড়ায় কলরব উঠিতেছে। উৎসবের মতই বোধ হয় সবাই মাতিয়া উঠিয়াছে। অনিরুদ্ধ একটা ঝড় তুলিয়াছে যেন। ঢোল বাজিতেছে, গান হইতেছে। নিস্তব্ধ রাত্রে গান স্পষ্ট শোনা যাইতেছে।

মঙ্গল-চণ্ডীর পালা-গানই বটে। বায়েনেরা গাহিতেছে।—

"আষাঢ়ে পূরয়ে মহী নব মেঘ জল। বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল॥

সাহসে পসরা লয়ে ভ্রমি ঘরে ঘরে। কিছু খুদকুঁড়ো মিলে উদর না পূরে॥

বড় অভাগ্য মনে গণি, বড় অভাগ্য মনে গণি।

কত শত খায় জোঁক নাহি খায় ফণী॥"

দেবু আপন-মনেই হাসিল। সাপে খাইলে মরিয়া গরীবের হাড় জুড়ায়।... ভারি চমৎকার বর্ণনা কিন্তু!

তাহার আগাগোড়া—ফুল্লরার বারোমাস্যার বর্ণনা মনে পড়িয়া গেল।

"বসিয়া চণ্ডীর পাশে কহে দুঃখ বাণী।

ভাঙা কুঁড়ে ঘর তালপাতের ছাউনি॥

ভেরেণ্ডার খুঁটি তার আছে মধ্য ঘরে।

প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে॥

পদ পোড়ে খরতর রবির কিরণ!

শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঁটের বসন॥"

দুর্গা বলিয়া উঠিল—উনানের আগুন যে নিভে গেল গো! কাঠ দাও!

দেবু উনানের দিকে চাহিয়া বলিল—দে বাপু, তুই একখানা কাঠ দে।

দুর্গা একখানা কাঠ ফেলিয়া দিয়া বলিল—না, তুমি দাও।

ওদিকে গান হইতেছে—

"দুঃখ কর অবধান, দুঃখ অবধান। লঘু বৃষ্টি হইলে কুঁড়ায় আসে বান॥
ভাদ্রমাসেতে বড় দুরন্ত বাদল। নদ-নদী একাকার আট দিকে জল॥"

দেবুর মন কবির প্রশংসায় যেন শতমুখ হইয়া উঠিল; 'আট দিকে জল'—কেবল ঊর্ধ্ব এবং অধঃ ছাড়া আর সব দিকে জল।

দুর্গা বলিল—আমাদের এবারকার মতন বান হলে মাগী আর বাঁচত না।

দেবুর মনে আবার একটা চকিত রেখার মত চিন্তার অনুভূতি খেলিয়া গেল; যে ছেলেটা ফুল্লরার গান গাহিতেছে, তাহার কণ্ঠস্বর ঠিক মেয়েদের মত, সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত জোরালো। মনে হইতেছে, ফুল্লরাই যেন এই পাড়ায় বসিয়া বারমেসে গান গাহিতেছে। ওপাড়ার যে-কোন ঘরই তো ফুল্লরার ঘর, কোন প্রভেদ নাই। তালপাতার ছাউনি, দেওয়ালও ভাঙা, খুঁটি শুধু ভেরেণ্ডার নয়—বাঁশের। দু-একজনের বটের ডালের খুঁটিও আছে।

গান চলিতেছে। ভাদ্রের পর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা। সকলের পরনে নূতন কাপড়। "অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা।" আশ্বিনের পর কার্তিক। হিম পড়িতেছে; ফুল্লরার গায়ে কাপড় নাই

দুর্গা হাসিয়া বলিল—তা আমাদের চেয়ে ভাল ছিল ফুল্লরা। মাসোয়ারাই ছিল না।

দেবু হাসিল।

মাসের পর মাস দুঃখ-ভোগের বর্ণনা চলিয়াছে। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন—।

"দুঃখ কর অবধান—দুঃখ কর অবধান।
আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান।
মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ-মন্দ।
মালতীর মধুকর পিয়ে মকরন্দ॥"

গান শেষ হইয়া আসিয়াছে। দেবু এই গানেই প্রায় তন্ময় হইয়া গিয়াছে।

"দারুণ দৈবদোষে, দারুণ দৈবদোষে।
একত্র শয়নে স্বামী যেন যোগ কোশে ॥"

গান শেষ হইল। দেবুর খেয়াল হইল—ভাত নামানো দরকার। সে বলিল—দুর্গা, ভাত হয়ে গিয়েছে বোধ হয়। নামিয়ে ফেলি, কি বল্?

কেহ উত্তর দিল না।

দেবু সবিস্ময়ে ডাকিল—দুর্গা!

কেহ উত্তর দিল না। দুর্গা চলিয়া গিয়াছে? কখন গেল? এই তো ছিল!
—দুর্গা!

দুর্গা সত্যই কখন চলিয়া গিয়াছে।

পঁচিশ

কার্তিকের শেষ। শীত পড়িবার সময় হইয়াছে। কিন্তু এবার শীত ইহারই মধ্যে বেশ কনকনে হইয়া উঠিয়াছে। সকালবেলায় কাঁপুনি ধরে। শেষরাত্রে সাধারণ কাপড়ে বা সুতী চাদরে শীত ভাঙে না। কার্তিক মাসে লোক লেপ গায়ে দেয় না। কারণ, কার্তিক মাসে লেপ গায়ে দিলে মরিয়া পরজন্মে নাকি কুকুর হইতে হয়। তবুও লোকে লেপ-কাঁথা পাড়িয়াছে। বন্যার প্লাবনে দেশের মাটি এমনভাবে ভিজিয়াছিল যে, সে জল এখনও শুকায় নাই। ছায়ানিবিড় আম-কাঁঠালের বাগানগুলির মাটি—জানালাহীন ঘরের মেঝে এখন স্যাঁৎসেঁৎ করিতেছে। বাউড়ীপাড়ার লোকে মেঝের উপর গাছের ডাল পুঁতিয়া বাখারি দিয়া মাচা বাঁধিয়াছে। সতীশ গায়ে দেয় একখানা পাতলা ও জরাজীর্ণ বিলাতী কম্বল, সে এখনও লেপ গায়ে দেয় নাই।

পাতু বলে—কুকুর হতে দুঃখু নাই সতীশ দাদা। তবে যেন বড় বড় লোমওয়ালা বিলিতি কুকুর হই। দিব্যি শেকলে বেঁধে বড়লোকে পুষবে। দুধ-ভাত-মাংস খেতে দেবে।

অনিরুদ্ধ বলিয়াছে—আরে শালা—রোঁয়াতে উকুন হবে, রোঁয়া উঠে গেলে মরবি। তাগিয়ে দেবে তখন।

—তখন ক্ষেপে গিয়ে যাকে পাব তাকে কামড়াব।

—ডাক্তার বাড়ি থাকতক দিয়ে না হয় গুলি করে মেরে ফেলবে।

—ব্যাস্, তখন তো কুকুর জন্ম থেকে খালাস পাব!...পাতু আবার হাসিয়া বলে—আর যদি দিশি কুকুর হই, তবে তুমি পুষো আমাকে সতীশ দাদা।

অনিরুদ্ধ আসিবার পর হইতে পাতুর কথাবার্তার ধারাটা এমনি হইয়াছে। খোঁচা দিয়া ছাড়া কথা বলিতে পারে না। পাতুর কথায় সতীশ একটু-আধটু আহত হয়।...

গতকাল রাত্রে ব্যাপারটা বেশ জট পাকাইয়া উঠিয়াছে। গোটা পাড়ার মেয়ে-পুরুষে মদ খাইয়াছে এবং হল্লা করিয়াছে। শেষে কলে খাটিবার মতলব প্রায় পাকা করিয়া ফেলিয়াছে। সতীশ ভোরবেলায় উঠিয়া বিলাতী কম্বল গায়ে দিয়া হাল জুড়িবার আয়োজন করিল। তাহাদের পাড়ায় সবসুদ্ধ পাঁচখানি হাল ছিল; পূর্বে অবশ্য আরও বেশি ছিল। এই পাতুরই ছিল একখানা। এখন এই গ্রাম-মণ্ডলের পর পাঁচখানা হালের দশটা বলদের মধ্যে অবশিষ্ট আছে চারিটা। তাহারই শুধু দুইটা আছে—বাকী দুইজনের একটা একটা। তাহারা দুইজনে মিলিয়া রবি-ফসলের চাষ করিবে ঠিক করিয়াছে। সতীশ তাহাদের ওই জনের বাড়ীতে গিয়া তাগিদ দিল—আয়, সূয্যি উঠে গেল।

অটল বলিল—এই হয়েছে। লাও, তামাক একটুকুন্ ভালো করে খেয়ে লাও। আমি কালাচাঁদকে ডাকি, গরুটা লিয়ে আসি।

সতীশ তামাক খাইতে বসিল।

অটল ফিরিয়া আসিল একা। বলিল—সতীশ-দাদা, তুমি যাও, আমার আজ হল না।

—হল না?

অটল বলিল—যাবে না শালা কালাচাঁদে।

—যাবে না?

—যাবেও না, গরুও দেবে না। বলে—চাষবাস আমি করব না। আমার গরু আমি বেচে দোব। পার তো কিনে নাও।...শালার আবার রস কত! বলে—পয়সা ফেল মোয়া খাও আমি কি তোমার পর?

—হ্যাঁ। ভূতে পেয়েছে শালাকে।

ভূতই বটে! নহিলে পিতৃপুরুষের কাজকর্ম, কুলধর্ম মানুষ ছাড়িবে কেন? আঃ, এমন সুখের এমন পবিত্র কাজ কি আর আছে? জমি-চাষ, গো-সেবা—পবিত্র কাজ; কাজগুলি করিয়া যাও—মুনিবেরও ঘরের ধান, মাইনে, কাপড়, এই হইতেই তোমার চলিয়া যাইবে! বর্ষা-বাদলে কোথাও মজুরি করিয়া মরিতে হইবে না, অবশ্য আগের মত সুখ আর নাই। আগে অসুখ হইলে মুনিবেরা বৈদ্য সুদ্ধ দেখাইত। তা ছাড়া মুনিবের ঘর হইতে কাঠ-কুটা-খড় এগুলা তো মেলেই। পালে-পার্বণে, মুনিব-বাড়ীর কাজ কর্মে উপরি বকশিশ আছে। সে সুখ ছাড়িয়া কলে খাটিবার জন্য সব নাচিয়া উঠিয়াছে। কর্মকার কতকগুলা টাকা আনিয়া মদ খাওয়াইয়া লোকের মাথা খারাপ করিয়া দিল। কর্মকারের দোষ কি? সে কোন দিন বলে নাই। ধুয়াটা তুলিয়াছে পাতু। পাতুই অনিরুদ্ধকে বলিয়াছে—আমাকে তুমি নিয়ে চল কম্মকার-ভাই। তোমার সঙ্গে আমি যাব।

অনিরুদ্ধ পাতুকে লইয়া যাইতে রাজী হইয়াছিল। সে তাহার অনেক দিনের ভাবের লোক। এককালে পাতুর যখন হাল ছিল—তখন পাতুই তাহার জমি চাষ করিত। তা ছাড়া সে দুর্গার ভাই।

অনিরুদ্ধ পাতুকে লইয়া যাইতে রাজী হইয়াছে শুনিয়া সবাই আসিয়া নাচিতে লাগিল—আমাকে নিয়ে চলেন কম্মকার মশায়। আমিও যাব। আমিও, আমিও, আমিও!

কর্মকারের আমোদ লাগিয়াছে। সে বলিয়াছে—সবাইকে নিয়ে কোথা যাব বল্? তোরা এখানকার কলে গিয়ে খাট্।...কর্মকারের কি? না ঘর, না পরিবার, না জমি, না কিছু; গাঁয়ে-মায়ে সমান কথা—সেই গ্রামকেই সে ত্যাগ করিয়াছে! কলে খাটিবার পরামর্শ সে দিয়া বসিল।

কলে খাটা! ভাবিতেও সতীশের সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে! হউক তারা

গরীব, ছোট লোক, তবু তো তাহারা গৃহস্থ লোক। গৃহস্থ লোকে কি কলে খাটে!

সতীশ অটলকে বলিল—না দিক্। আয়, তু আমার সঙ্গে আয়। তিনটে গরু নিয়ে আমরা দু-জনাতেই যতটা পারি করব—চল্।

অটল চুপ করিয়া বসিয়াছিল; সেও পাতুর মত কিছু ভাবিতেছিল। সে উত্তর দিল না, নড়িলও না।

সতীশ ডাকিল—কি বলছিস, যাবি?

অটল মাথা চুলকাইয়া এবার বলিল—তা পরে ভাগাটো কি রকম করবে বল?

—ভাগ?

—হ্যাঁ।

—যা পাঁচ জনায় বলবে, তাই হবে।

—না ভাই। সে তুমি আগাম ঠিক কর নাও।

—বেশ! চল্ -যাবার পথে পণ্ডিত মাশায়ের কাছ হয়ে যাব। পণ্ডিত মাশায় যা বলবেন তাই হবে। পণ্ডিতের কথা মানবি তো?

পণ্ডিতের বাড়ীর সম্মুখ বেশ একটি জনতা জমিয়া গিয়াছে। স্বয়ং শ্রীহরি ঘোষ মহাশয় দাঁড়াইয়া আছে। সে-ই কথা বলিতেছে, খুব ভারী গলায় বেশ দাপের সঙ্গেই বলিতেছে—কাজটা তুমি ভাল করছ না দেবু!

আগে ঘোষ পণ্ডিতকে বলিত—দেবু-খুড়ো। আজ শুধু দেবু বলিতেছে। ঘোষ যে ভয়ানক চটিয়াছে—ইহাতে সতীশ এবং অটলের সন্দেহ রহিল না।

পণ্ডিত হাসিয়াই বলিল—সকালবেলায় উঠেই তুমি কি আমাকে শাসাতে এসেছ শ্রীহরি?

শ্রীহরি এমন উত্তরের জন্য ঠিক প্রস্তুত ছিল না। সে কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া রহিল; তারপর বলিল—তুমি গ্রামের কত বড় অনিষ্ট করছ—তুমি বুঝতে পারছ না।

পণ্ডিত বলিল—আমি গ্রামের অনিষ্ট করছি?

—করছ না? গ্রামের ছোটলোকগুলো সব চললো কলে খাটতে! তুমি

তাদের উস্কে দিচ্ছ !

পণ্ডিত বলিল—না। আমি দিই নি।

—তুমি না দিয়েছ, তুমি অনিরুদ্ধকে ঘরে ঠাঁই দিয়েছ। সে-ই এ সব করেছে।

—সে গ্রামের লোক, আমার ছেলেবেলার বন্ধু। সে দুদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে, আমার ঘরে আছে। যতদিন ইচ্ছে সে থাকবে। সে কি করছে না-করছে—তার জন্যে আমি দায়ী নই।

শ্রীহরি বলিল—জান, সে ছোটলোকের সঙ্গে মদ খায়, ভাত খায় ! সেই লোককে তুমি ঘরে ঠাঁই দিয়েছ ?

দেবু বলিল—অতিথের জাত-বিচার করি না আমি। তার এঁটোও আমি খাই না। আর তা ছাড়া—।…দেবু এবার হাসিয়া বলিল—আমিও তো পতিত, শ্রীহরি !

শ্রীহরি আর কথা বলিতে পারিল না। সে আর দাঁড়াইলও না, নিজের বাড়ীর দিকে ফিরিল !

শ্রীহরির পশ্চাদ্‌বর্তিগণের মধ্য হইতে হরিশ আগাইয়া আসিয়া বলিল—শোন বাবা দেবু, শোন।

দেবু বলিল—বলুন।

—চল, তোমার দাওয়াতেই বসি। না, চল বাড়ীর ভেতর চল।

দেবু সমাদর করিয়াই বলিল—আসুন। সে তো আমার ভাগ্য।

বাড়ীর ভিতরে আসিয়া হরিশ বলিল—ও পতিত-এতিতের কথা ছাড়ান্ দাও। ও সব কথার কথা। কই, কেউ কোনদিন বলেছে যে দেবু পণ্ডিতের বাড়ী যাব না, সে পতিত ? না—তোমার বাড়ী আসে নি ? ওসব আমরা ঠিক করে দোব !

দেবু চুপ করিয়া রহিল।

হরিশ বলিল—শ্রীহরি বলছিল, দেবুকে বলো হরিশ ঠাকুর-দাদা, ও রাজী হয় তো আমার শালার একটি কন্যে আছে, ভাগর মেয়ে—তার সঙ্গে সম্বন্ধ করি।

পণ্ডিত! বাজে, বাজে ও সব।

দেবু বলিল—থাক্, হরিশ খুড়ো—বিয়ের কথা থাক্। এখন আর কি বলছেন বলুন।

হরিশ বলিল—এ কাজ থেকে তুমি 'নিবিত্ত' হও বাবা। এ কাজ করো না! গাঁয়ে মুনিষ মিলবে না, মান্দের মিলবে না, মহা কষ্ট হবে লোকের। নিজেদের গোবরের ঝুড়ি মাথায় করে ক্ষেতে নিয়ে যেতে হবে। ওদের তুমি বারণ কর।

—বেশ তো, আপনারাই ডেকে বলুন।

—না রে বাবা। তোমাকে ওরা দেবতার মত মান্যি করে।

দেবু বলিল—শুনুন হরিশ-খুড়ো, আমি ওদের কিছু বলি নাই। বলছে অনিরুদ্ধ। আগে-আগে উড়ো-ভাসা শুনেছিলাম, ঠিক-ঠাক শুনেছি কাল রাত্রে। আমি সমস্ত রাত্রি ভেবে দেখেছি। কাগজ-কলম নিয়ে হিসেব করে দেখলাম—গাঁয়ের যত গেরস্ত বাড়ী, তার পাঁচগুণ লোক ওদের পাড়ায়। ইদানীং গাঁয়ের গেরস্তদের অবস্থা এত খারাপ হয়েছে যে, লোক রাখবার মত গেরস্ত হাতের আঙুলে গুনতে পারা যায়। অন্য গাঁয়ের গেরস্ত বাড়ীতে কাজ করে এখন বেশির ভাগ লোক। বানের পর তাদের অনেকেও মুনিষ-মান্দের ছাড়িয়ে দিয়েছে। এখন এ সব লোকে খাবে কি? খেতে দেবে কে বলুন দেখি?

হরিশ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দেবু চুপ করিয়া রহিল তাহার উত্তরের প্রতীক্ষায়। উত্তর না পাইয়া সে বলিল—তামাক খাবেন? আনব সেজে?

হরিশ ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল—না। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আচ্ছা, তা হলে আমি উঠলাম।

বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া বলিল—গাঁয়ের যে অনিষ্ট তুমি করলে দেবু, সে অনিষ্ট কেউ কখনও করে নি। সর্বনাশ করে দিলে তুমি।

দেবু বলিল—আমি ওদের একবারের জন্যেও কলে খাটবার কথা বলি নি, হরিশ-খুড়ো। অবিশ্যি আপনি বিশ্বাস না করেন, সে আলাদা কথা।

—কিন্তু বারণও তো করলে না!

কথা বলিতে বলিতে তাহারা রাস্তার উপর দাঁড়াইল; ঠিক সেই মুহূর্তেই চণ্ডীমণ্ডপ হইতে শ্রীহরির উচ্চ গম্ভীর কণ্ঠের কথা শোনা গেল—বলে দেবে, যারা কলে খাটতে যাবে—তারা আমার চাকরান্ জমিতে বাস করতে পাবে না। কলে খাটতে হ'লে গাঁ ছেড়ে উঠে যেতে হবে।

তর্তর্ করিয়া চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নামিয়া আসিল কালু শেখ। লাঠি হাতে পাগড়ী মাথায় কালু শেখ তাহাদের সম্মুখ দিয়াই চলিয়া গেল।

শ্রীহরির হুকুমজারি শুনিয়া দেবুর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, ওটা নিতান্ত বাজে হুকুম। সে জানে, লোকে ও-কথা শুনিবে না। সেট্‌লমেণ্ট কিন্তু একটা কাজ করিয়া গিয়াছে। পরচার ওই কাগজখানা দিয়া নিতান্ত দুর্বল ভীরু লোককেও জানাইয়া দিয়া গিয়াছে যে, এই জমিটুকুর উপর তোমার এই স্বত্ব আছে, অধিকার আছে। আগে গৃহস্থ লোকেরা—আপন আপন জমির উপর বাউড়ী, ডোম, মুচিদের ডাকিয়া বসবাস করিবার জায়গা দিত। তাহারা গৃহস্থের এ অনুগ্রহকে অসীম অপার করুণা বলিয়া মনে করিত। সেই গৃহস্থটির সুখ-দুঃখে তাহারা একটা করিয়া অংশ গ্রহণ করিত—পবিত্র অবশ্য-কর্তব্যের মত। পৃথিবীতে তাহাদের জমি থাকিতে পারে বলিয়া ধারণাই পুরুষানুক্রমে এই সব মানুষের ছিল না। তাই যে বাস করিতে একটুকরা জমি দিত—সে-ই ছিল তাহাদের সত্যকার রাজা। পারিবারিক পারস্পরিক কলহ বিবাদে এই রাজার কাছেই তাহারা আসিত। তাহার বিচার মানিয়া লইত, দণ্ড লইত মাথা পাতিয়া। বেগার খাটিত- উপঢৌকন দিত। আবার যেদিন রাজা বলিত—আমার জমি হইতে চলিয়া যাও, সেদিন আসিয়া তাহারা পায়ে ধরিয়া কাঁদিত, করুণা-ভিক্ষা করিত; ভিক্ষা না পাইলে—তল্পি-তল্পা বাঁধিয়া স্ত্রী-পুত্র সঙ্গে লইয়া আবার কোন রাজার আশ্রয় খুঁজিত। শিবকালীপুরে ইহাদের বাস—জমিদারের খাস-পতিত ভূমির উপর। শ্রীহরি জমিদারের স্বত্বে স্বত্ববান্ হইয়া—আজ সেই পুরাতন কালের হুকুমজারি করিতেছে। কিন্তু ইহার মধ্যে কালের যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে! তাহারা পূর্বকালের মত নিরীহ ভীরু নাই, আর সঙ্গে সঙ্গে সেটলমেণ্ট আসিয়া সকলের হাতে পরচা দিয়া জানাইয়া গিয়াছে যে, এ জমিতে তোমাদের একটা

লিখিত অধিকার আছে, যেটা মুখের হুকুমে যাইবে না। কথায় কথায় তাহারা এখন পয়সা বাহির করে। শ্রীহরির এ হুকুমে কেহ ভয় পাইবে না—এ কথা যবু জানে।...

গতরাত্রে সমস্ত রাত্রিটাই দেবুর ঘুম হয় নাই। তাহার শরীর অবসন্ন, চোখ জ্বালা করিতেছে। দুর্গাকে ছেলে কোলে করিয়া অকস্মাৎ শিউলিতলা হইতে বাহির হইতে দেখিয়া যে মারাত্মক ভ্রম করিয়া বসিয়াছিল, তাহার অনুশোচনায় এবং ইহাদের এই কলে খাটিতে যাওয়ার কথা শুনিয়া কি যে তাহার হইয়া গেল, সারারাত্রি আর কিছুতেই ঘুম আসিল না।

দুইটা চিন্তা একসঙ্গে তাহার মাথায় আসিয়া এমন ভাবে জট পাকাইয়া গেল, যে শেষটা দুইটাকে পৃথক বলিয়া চিনিবার উপায় পর্যন্ত ছিল না। সে মাথায় হাত দিয়া স্থিরভাবে ধ্যানমগ্নের মত বসিয়া সমস্ত রাত্রি ধরিয়া চিন্তা করিয়াছে। বিলু-খোকা! উঃ, সে আজ কি ভুলই না করিয়াছে! ছেলেটাকে কোলে করিয়া দুর্গা শিউলিতলার পাশ দিয়া আসিতেই তাহার মনে হইল—বিলু খোকাকে কোলে লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। এখনও পর্যন্ত সে সেই ছবিকে কিছুতেই ভ্রম বলিয়া মনে করিতে পারিতেছে না। উঃ বিলু-খোকাহীন এই ঘর—এই ঘরে সে কি করিয়া আছে? কোন্ প্রাণে আছে! বুক তাহার হু-হু করিয়া উঠিয়াছিল। পরের কাজ, দশের কাজ ভূতের ব্যাগার! স্বর্ণ, স্বর্ণের মায়ের ভাবনা, তাহাদের সংসারের কাজ-কর্মের বন্দোবস্ত, স্বর্ণের পরীক্ষার পড়ার সাহায্য, তিনকড়ির অপ্রশংসনীয় ফৌজদারী মামলার তদ্বির, সাহায্য-সমিতি—এই সব লইয়াই তাহার আজ দিন কাটিতেছে। সে এসব হইতে মুক্তি চায়! এ ভার সে বহিতে পারিতেছে না।

তিনকড়িদের বোঝা নামিতে আর বিলম্ব নাই। এই সময়ে অনি-ভাই আসিয়া বাউড়ী-পাড়া, মুচী-পাড়া, ডোম-পাড়ার লোকগুলিকে কলের কাজে ঢুকাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া ভালই [illegible]—উহারা খাটুক. যাক। তাহার সাহায্য-সমিতির কাজের তিন সুন্দর হইয়াছে! কত সাহস তাহার! উহারা এমনই সে উহাদের লইয়া ভুগিতেছে না। ঘাড়ের বোঝা নামিতে চাহিতেছে—সে বাধা

তালগাছের পাতা কাটার জন্ম শ্রীহরির সঙ্গে বিরোধ বাধিয়াছিল। শ্রীহরি উহাদের গরুগুলি খোঁয়াড়ে দিলে, সে উহাদের উপকার করিবার জন্যই তাহার খোকার হাতের বালা বন্ধক দিয়াছিল—ষষ্ঠীর দিন! মনে পড়িল—রাত্রে ন্যায়-রত্ন মহাশয় নিজে বালা দুইগাছি ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। সেই দিন তিনি তাহাকে—ধার্মিক ব্রাহ্মণের গল্পের প্রথম অংশ বলিয়াছিলেন। তারপর উহাদের পাড়াতেই আরম্ভ হইল কলেরা। সে উহাদের সেবা করিতে গিয়াই ঘরে বহন করিয়া আনিল মহামারী রাক্ষসীর বিষদন্তের টুকরা; যে টুকরা বিদ্ধ হইল খোকনের বুকে—খোকন হইতে গিয়া বিঁধিল তাহার বুকে। উঃ, সেই সমস্ত সহ্য করিয়াও সে আজও এই উহাদের বোঝা বহন করিয়া চলিয়াছে।

ন্যায়রত্নের গল্প মনে পড়িল—মেছুনীর ডালার শালগ্রামশিলার গল্প। সে উহাদের গলায় বাঁধিয়া আজও ফিরিতেছে। কিন্তু হইল কি? তাহারই বা কি হইল? এই হতভাগ্যদেরই বা কি করিতে পারিয়াছে সে? বন্যার পরে অবশ্য সাহায্য-সমিতি হইতে উহাদের অনেক উপকার হইয়াছে। কিন্তু উপকার লইয়া কতকাল উহারা বাঁচিয়া থাকিবে। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, সংসারে কোন সংস্থান নাই, অন্য কেহ উপকার করিতেছে—সেই উপকারে বাঁচিয়া থাকা কি সত্যকারের বাঁচা? আর পরের উপকারে বা কতদিন চলে? নাঃ, তার চেয়ে কলে-খাটা অনেক ভাল। অনি-ভাই তাহাদের বাঁচার উপায় বাহির করিয়াছে। চৌধুরীর লক্ষ্মী-জনার্দনশিলা বিক্রয় করিবার পর হইতে আর তাহার মেছুনীর ডালার শালগ্রামকে গলায় বাঁধিয়া ফেরার আদর্শে বিশ্বাস নাই! ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কথায় তাহার অবিশ্বাস নাই। কিন্তু মেছুনীর ডালার শালগ্রাম হইতে এইবার ঠাকুর হাত-পা লইয়া মূর্তি ধরিয়া বাহির হইয়া আসুন—এই সে চায়। তাহাতে তাহার হয়তো মুক্তি হইবে! কিন্তু তাহার মুক্তির পর শালগ্রামশিলার সেবা করিবে কে? তার্কিক হয়তো বলিবে—দেবু, তুমি ছাড়া সংসারে কোটি কোটি সেবক আছে। সত্য কথা। কিন্তু এ পরীক্ষা পুরানো হইয়া গিয়াছে। আর এই তাহারা পূর্বকালের মত নিরীহ ভীরু নাই, আর ন
সকলের হাতে পরচা দিয়া জানাইয়া গিয়াছে যে,

বাউড়ী-ডোমেরাই যদি মেছুনীর ডালার শালগ্রাম হয়—তবে সেবকের চেয়ে দেবতার সংখ্যাই বাড়িয়া গিয়াছে। নাঃ, উহারা যদি নিজে হইতে বাঁচিবার পথ না পায়, তবে কাহারও সাধ্য নাই উহাদের বাঁচাইয়া রাখে। তাহার চেয়ে অনিরুদ্ধের পথই শ্রেয়। এ পথে অন্তত তাহারা পেটে খাইয়া, গায়ে পরিয়া—এখনকার চেয়ে ভালভাবে থাকিবে। একটা বিষয়ে পূর্বে তাহার ঘোর আপত্তি ছিল। কলে খাটিতে গেলে—মেয়েদের ধর্ম থাকিবে না; পুরুষেরাও মাতাল উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিবে। কিন্তু কাল সে ভাবিয়া দেখিয়াছে—ও আশঙ্কাটা অমূলক না হইলেও, যতখানি গুরুত্ব সে তাহার উপর আরোপ করিয়াছে ততখানি নয়। গাঁয়ে থাকিয়াও তো উহাদের ধর্ম খুব বজায় আছে! মনে পড়িয়াছে—শ্রীহরির কথা, কঙ্কণার বাবুদের কথা, হরেন ঘোষালের কথা; ভবেশ-দাদা; হরিশ-খুড়ার যৌবনকালের গল্পও সে শুনিয়াছে। এই সেদিন শোনা দ্বারকা চৌধুরীর ছেলে হরেকৃষ্ণের কথা মনে পড়িল। অনি-ভাই আগে যখন মাতামাতি করিয়াছিল—তখন সে গ্রামেরই মানুষ ছিল। ইহাদের মেয়েগুলি কঙ্কণার বাবুদের ইমারতে রেজা খাটিতে যায়, সেখানেও নানা কথা শোনা যায়। কালই চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ তাহার মনে হইয়াছে যে, মানুষের এ পাপ যায় যে পুণ্যে সেই পুণ্যে যতদিন সব মানুষ পুণ্যবান্ না হইবে ততদিন সর্ব অবস্থায় এ পাপ থাকিবে। এ পাপ প্রবৃত্তি গ্রামে থাকিলেও থাকিবে, গ্রামের বাহিরে গেলেও থাকিবে। চেহারার একটু বদল হইবে মাত্র।

যাক্, অনি-ভাইয়ের কথায় যদি উহারা কলে খাটিতে যায় তো যাক। সে বারণ করিবে না। উহাদের দুঃখ দুর্দশার প্রতিকারে ইহার অপেক্ষা বর্তমানে ভাল পথ আর নাই।

কলের মজুরও সে দেখিয়াছে। অনেকের সঙ্গে আলাপও আছে। তাহারা বেশ মানুষ। তবে একটু উচ্ছৃঙ্খল। ওই অনিরুদ্ধ সব চেয়ে ভাল নমুনা। তা হোক। উহারা যদি উপায় বেশী করে—কিছু বেশী পয়সার মদ গিলুক। কিন্তু অনিরুদ্ধের শরীরখানি কি সুন্দর হইয়াছে! কত সাহস তাহার! উহারা এমনই হোক। সে বারণ করিবে না। ঘাড়ের বোঝা নামিতে চাহিতেছে—সে বাধা

দিবে না। সে মুক্তি চায়, তাহার মুক্তি আসুক।

সে আজ বাধা দিলেও তাহারা শুনিবে না। এ কথা কাল রাত্রেই তাহারা তাহাকে বলিয়া দিয়াছে। গানের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল—হঠাৎ গান থামিয়া গিয়া একটা প্রচণ্ড কলরব উঠিল। আপন দাওয়ায় বসিয়া চিন্তা করিতেছিল দেবু—কলরবের প্রচণ্ডতায় সে চমকিয়া উঠিয়া ছুটিয়া গিয়াছিল। মদ বেশী খাইলে—হতভাগারা মারামারি করিবেই। সকলেই বীর হইয়া উঠে। রক্তারক্তি হইয়া যায়। মনের যত চাপা আক্রোশ অন্ধকার রাত্রে সাপের মত গর্ত হইতে বাহির হইয়া ফুঁসিয়া উঠে। অনেকে আবার মারামারি করিবার জন্যই মদ খায়।

দেবু গিয়া দেখিল—সে প্রায় এক কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। মদের নেশায় কাহারও স্থির হইয়া দাঁড়াইবার শক্তি নাই, লোকগুলা টলিতেছে; সেই অবস্থাতেও পরস্পরের প্রতি কিল-ঘুঁষি হানাহানি করিতেছে। শত্রু-মিত্র বুঝিবার উপায় নাই। একটা জায়গায় ব্যাপারটা সঙ্গীন মনে হইল। দেবু ছুটিয়া গিয়া দেখিল—সত্যই ব্যাপারটা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। পাতু নির্মম আক্রোশে একটা লোকের—ভদ্রলোকের গলা টিপিয়া ধরিয়াছে; পাতু বেশ শক্তিশালী জোয়ান—তাহার হাতের পেষণে লোকটার জিভ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। দেবু চিৎকার করিয়া বলিল—পাতু, ছাড়! ছাড়!

পাতু গর্জন করিয়া উঠিল—এ্যাও। না—ছাড়ব না।

দেবু আর দ্বিধা করিল না, প্রচণ্ড একটা ঘুঁষি বসাইয়া দিল—পাতুর কাঁধের উপর; পাতুর হাত খুলিয়া গেল। ছাড়া পাইয়া লোকটা বন্ বন্ করিয়া ছুটিয়া পলাইল, কিন্তু পাতু আবার ছুটিয়া আসিয়াই দেবুকেই আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। দেবু ধাক্কা দিয়া কঠিন স্বরে বলিল—পাতু!

এবার পাতু থমকিয়া গেল; মত্ত-চোখের দৃষ্টি স্তিমিত করিয়া দেবুকে চিনিতে চেষ্টা করিয়া বলিল—কে?

—আমি পণ্ডিত।

—কে, পণ্ডিত মশায়?…পাতু সঙ্গে সঙ্গে বসিয়া তাহার পায়ে হাত দিয়া বলিল—পেন্নাম। আচ্ছা, তুমি বিচার কর পণ্ডিত! বামুনের ছেলে হয়ে ও-

বেটা মুচী-পাড়ায় যখন তখন ক্যানে আসে ?…

ও-দিকে গোলমালটা তখন থামিয়া আসিয়াছে। সকলে চাপা গলায় বলিতেছে—এ্যাই চুপ। পণ্ডিত!…কেবল একটা নিতান্ত দুর্বল লোক তখন আপন মনেই দুই হাতে শূন্যে ঘুঁষি খেলিয়া চলিয়াছে। পাতু বলিতেছে—নেহি মাংতা হ্যায়। তুমি শালার বাত নেহি শুনে গা! যাও!

দেবু বলিল—কি হল কি ? তোরা এ সব আরম্ভ করেছিস কি ?

পাতু বলিল—আমাদের দোষ নাই। ওই সতীশ—সতীশ বাউড়ী। শালা আমার দাদা না কচু।

—কি হল ? সতীশ কি করলে ?

—বলছে—যাস্ না তোরা, যাস্ না।

—কি বিপদ ? যাস্ না কি ?

পাতু হাত দুটি জোড় করিয়া বলিল—তুমি যেন বারণ ক'র না পণ্ডিত। তোমাকে জোড়হাত করছি।

—কি ? কি বারণ করব ?

—আমরা সব ঠিক করেছি কলে খাটব। দখকার সব ঠিক করে দেবে; আমি অবিশ্যি দখকারের সঙ্গে কলকাতা যাব। এরা সব এখানকার কলে খাটবে। তুমি যেন বারণ ক'র না।

দেবু হাসিল।

পাতু বলিল—আমরা কিছুক তা শুনতে পারব।

দেবু বলিল—সতীশ তার কি করলে ?

—শালা বলছে—যাস্ না—যেতে পাবি না, গেরস্ত-ধম্ম থাকবে না। গেরস্ত-ধম্ম না কচু! পেটে ভাত নাই—বসে ধম্মের উপোস করেছি। শালা, ভিখ মেগে খেতে হচ্ছে—গেরস্ত-ধম্ম।

একজন বলিল—উ শালার জমি আছে—হাল আছে, আমাদিগে দিক হাল-গরু-জমি, তবে বুঝি। তা না—শালা নিজে পেট ভরে খাবে, আর আমরা ভিখ মাগব আর ঘরে বসে গেরস্ত ধম্ম করব।

পাতু বলিল—আর এই শালা ঘোষাল।…হঠাৎ জিভ্ কাটিয়া কপালে হাত ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—না-না। বেরাহ্মন। ঘোষাল মাশায়! বল তো পণ্ডিত—আমার ঘরে আসে ঘোষাল—সবাই জানে। বেশ—আসিস, পয়সা দিস্, ধান দিস, বেশ কথা। তা বলে তো, আমার একটা ইজ্জৎ আছে। গোপনে আয়, গোপনে যা। তা না, আমাদের মারামারি লেগেছে—আর ঘোষাল আমার ঘর থেকে বেরিয়ে এল—তামাম লোকের ছামুতে। এসে মাতব্বরি করতে লেগে গেল! তাতেই ধরেছিলাম টুঁটি টিপে।…তারপর আপন মনেই বলিল—দাঁড়া দাঁড়া, যাব চলে কম্মকারের সঙ্গে—তোর পিরীতের মুখে ছাই দোব আমি। দাঁড়া।

দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কম্মকার কোথায়?

—ওই, ওই শুয়ে রয়েছে।

অনিরুদ্ধ মদের নেশায় বকুলগাছ-তলাটাতেই পড়িয়া ছিল। ঘুমে ও নেশায় সে প্রায় চেতনাহীন। এত গোলমালেও ঘুম ভাঙে নাই।

দেবু সকলকে বাড়ী যাইতে বলিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল।

তাহারা উহাকে বলিয়াও দিয়াছে—পণ্ডিত, তুমি বারণ করিও না। অনিরুদ্ধের সমৃদ্ধি দেখিয়া তাহারা এই পথ বাছিয়া লইতে চাহিতেছে। আর তাহারা ভিক্ষা মাগিয়া গৃহস্থ-ধর্ম পালনের অভিনয় করিতে চায় না। উপার্জনের পথ থাকিতে—পেট ভরিয়া খাইবার উপায় থাকিতে তাহারা ক্রীতদাসত্ব অথবা ভিক্ষা করিয়া আধপেটা খাইয়া থাকিতে চায় না। সে বারণ করিবে কেন? কোন্ মুখেই বা বারণ করিবে? তা ছাড়া তাহাদের বোঝা তাহার ঘাড় হইতে নামিতে চাহিতেছে, সে ধরিয়া রাখিবে কেন? মুক্তির আগমন-পথে সে বাধা দিবে না। মুক্তি আসুক। খোকন-বিলু-শূন্য জীবন—বাড়ী-ঘর তাহার কাছে মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করিতেছে। সে তাহাদেরই সন্ধানে বাহির হইবে। পরলোকের আত্মাও তো ইহলোকের রূপ ধরিয়া আসিয়া প্রিয়জনকে দেখা দেয়! এমন গল্প তো কত শোনা যায়!

সকালে উঠিয়াই শ্রীহরি তাহাকে দেখিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া শাসন করিতে আসিয়াছিল। বেচারা জমিদারত্ব জাহির করিবার লোভ কিছুতেই সংবরণ

করিতে পারে নাই।

দেবু স্থির করিল—সে নিজে কলে গিয়া মালিকদের সঙ্গে কথা বলিয়া আসিবে—ইহাদের কাজের ব্যবস্থা করিয়া আসিবে—শর্ত ঠিক করিয়া দিবে। শ্রীহরি যদি উহাদের বসত বাড়ী হইতে জোর করিয়া উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করে, তবে এই বাউড়ী-ডোমদের লইয়া সে খোদ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাইবে।

পাতু আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। গতরাত্রের সে পাতু আর নাই। সেই শান্ত মানুষটি।

দেবু হাসিয়া বলিল—এস পাতু।

মাথা চুলকাইয়া পাতু বলিল—এলাম।

—কি সংবাদ বল?

—কাল রেতে—

হাসিয়া দেবু বলিল—মনে আছে?

—সব নাই। আপুনি যেয়েছিলেন—লয়?

—তোমার কি মনে হচ্ছে?

—যেয়েছিলেন বলেই লাগছে।

—হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।

মাথা চুলকাইয়া পাতু বলিল—কি সব বলেছিলাম?

—অন্যায় কিছু বল নাই। তবে ঘোষালকে হয়তো মেরে ফেলতে আমি না গেলে।

পাতু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—অন্যায় হয়ে গিয়েছে বটে। তা ঘোষালেরও অন্যায় হয়েছে; মজলিসের ছামুতে আমার ঘর থেকে বেরুনো ঠিক হয় নাই মাশায়।

দেবু চুপ করিয়া রহিল। এ কথার উত্তর সে কি দিবে?

পাতু বলিল—পণ্ডিত মাশায়!

—বল!

—কি বলছেন, বলেন ?

—ও-কথার আমি কি উত্তর দেব পাতু ?

পাতু জিভ কাটিয়া বলিল—রাম-রাম-রাম ! উ কথা লয় ।

—তবে ?

পাতু আশ্চর্য হইয়া গেল ; বলিল—আপুনি শোনেন নাই ? কলে খাটতে যাওয়ার কথা ?

—শুনেছি !···দেবু উঠিয়া বসিল, বলিল—শুনেছি । যাও—তাই যাও । তা নইলে আর উপায়ও নাই ভেবে দেখেছি । আমি বারণ করব না ।

পাতু খুশি হইয়া দেবুর পায়ের ধুলা লইল । বলিল—পণ্ডিত মাশায়, কল তো উ-পারে অনেক কালই হয়েছে—এতদিন যাই নাই । দুঃখ-কষ্টে পড়েও যাই নাই । কিন্তু এ দুঃখ-কষ্ট আর সইতে নারছি !

দেবু জিজ্ঞাসা করিল—অনি-ভাই কোথা ?

—সে জংশনে গিয়েছে । কলের বাবুদের সঙ্গে পাকা কথাবার্তা বলতে ।

—বেশ । তাই যাও তোমরা । তাই যাও ।

পাতু চলিয়া গেল । কিছুক্ষণ পর দেবুও উঠিল । জগন ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়া ডাকিল—ডাক্তার !

ডাক্তারের দাওয়ায় এখনও অনেক রোগীর ভিড় । ম্যালেরিয়ার নূতন আক্রমণ অবশ্য কমিয়াছে ; মৃত্যু-সংখ্যাও হ্রাস পাইয়াছে । কিন্তু পুরানো রোগীও যে অনেক । জনকয়েক দাওয়ায় বসিয়াই কাঁপিতেছে । একজন গান ধরিয়া দিয়াছে ; আপন মনেই গাহিয়া চলিয়াছে—"আমার কি হল বকুল ফুল ?"

ডাক্তার ঘরের মধ্যে ওষুধ তৈয়ারি করিতে ব্যস্ত ছিল । দেবুর গলার স্বর শুনিয়া সাড়া দিল—কে ? দেবু ভাই ? এস, এই ঘরের মধ্যে ।

প্রকাণ্ড একটা কলাই-করা গামলায় ডাক্তার ওষুধ তৈয়ারি করিতেছিল ; হাসিয়া বলিল—পাইকারী ওষুধ তৈরি করছি । কুইনিন, ফেরিপারক্লোর, ম্যাগসালফ্, আর সিন্‌কোনা । একটু লাইকার আর্সেনিক দিলে ভাল হত, তা পাচ্ছি কোথায় বল ? এই অমৃত—এক এক শিশি গামলায় ডোবাব আর দেব ।

তারপর, কি খবর বল ?

দেবু বলিল—সাহায্য সমিতির ভার তোমাকেই নিতে হবে। একবার সময় করে হিসেব-টিসেবগুলো বুঝে নাও। তাই বলতে এলাম তোমায়।

—সে কি!

—হ্যাঁ ডাক্তার। টাকা-কড়িও বিশেষ নাই, কাজও কমে এসেছে। তার ওপর বাউড়ী-মুচীরা কলে খাটতে চললো। আমি এইবার রেহাই চাই ভাই। একবার তীর্থে বেরুব আমি।

—তীর্থে যাবে ?···ডাক্তারের হাতের কাজ বন্ধ হইয়া গেল। দেবুর মুখের দিকে সে চাহিয়া রহিল এক অদ্ভুত বিচিত্র দৃষ্টিতে! সে দৃষ্টির সম্মুখে দেবু একটু অস্বস্তি বোধ করিল। ডাক্তারের চিবুক অকস্মাৎ থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল —রূঢ় অপ্রিয়ভাষী জগন ডাক্তার সে কম্পন সংযত করিয়া কিছু বলিতে পারিল না।

দেবু হাসিল,—গভীর প্রীতির সঙ্গে সে যেন আপনার অপরাধ স্বীকার করিয়া হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ ভাই ডাক্তার। আমার ঘাড়ের বোঝা তোমরা নামিয়ে দাও।

ডাক্তার এবার আত্মসংবরণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

দেবু বলিল—তিনকড়ি-খুড়োর হাঙ্গামাটা মিটলেই আমি খালাস।

ছাব্বিশ

শীঘ্রই দেবুর ঘাড়ের বোঝা নামিল।

ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি তিনকড়িদের দায়রায় বিচার শেষ হইয়া গেল। নিষ্কৃতির কোন পথই ছিল না তিনকড়ির। এক ছিদামের স্বীকৃতি—তাহার উপর স্বর্ণের সাক্ষ্য আরম্ভ হইতেই তিনকড়ি নিজেই অপরাধ স্বীকার করিয়া বসিল। স্বর্ণকে অনেক করিয়া উকিল শিখাইয়াছিলেন—একটি কথা—'না'। 'জানি না' 'মনে নাই' এবং 'না'—এই তিনটি তার উত্তর। প্রথম এজাহারের কথা—জিজ্ঞাসা

করিলে বলিবে—কি বলিয়াছে তার মনে নাই। রাম এবং তিনকড়ির মধ্যে কোন কথাবার্তা হইয়াছিল কিনা জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে—না। এমন কথা শোনে নাই।...কিন্তু আদালতে দাঁড়াইয়া হলপ গ্রহণ করিয়া স্বর্ণ যেন কেমন হইয়া গেল। সরকারী উকিলটি প্রবীণ, মামলা পরিচালনা করিয়া তাঁহার মাথায় টাকও পড়িয়াছে, এবং অবশিষ্ট চুলে পাকও ধরিয়াছে; লোকচরিত্রে তাঁহার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। কখন ধমক দিয়া কাজ উদ্ধার করিতে হয়, কখন মিষ্ট কথায় কাজ হাসিল করিতে হয়—এসব তিনি ভাল রকমই জানেন। হলপ গ্রহণ করিবার পরই স্বর্ণের বিবর্ণ মুখ দেখিয়া তিনি প্রথমেই গম্ভীরভাবে বলিলেন—ভগবানের নামে ধর্মের নামে তুমি হলপ করেছ, বাছা। সত্য গোপন করে যদি মিথ্যা কথা বল তবে ভগবান তোমার উপর বিরূপ হবেন; ধর্মে তুমি পতিত হবে। তোমার বাপেরও তাতে অমঙ্গল হবে। তারপর তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিলেন—এই কথা তুমি বলেছ এস্-ডি-ওর আদালতে?

স্বর্ণ বিহ্বল দৃষ্টিতে উকিলের দিকে চাহিয়া রহিল।

উকিল একটা ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বল? উত্তর দাও!

স্বর্ণের মুখের দিকে চাহিয়া মুহূর্তে তিনকড়ি কাঠগড়া হইতে বলিয়া উঠিল—আমি কবুল খাচ্ছি হুজুর। আমার কন্যাকে রেহাই দিন। আমি কবুল খাচ্ছি।

সে আপনার অপরাধ স্বীকারকরিল। হ্যাঁ, আমি ডাকাতি করেছি। মৌলিক-ঘোষপাড়ায় দোকানীর বাড়ীতে যে ডাকাত পড়েছিল—তাতে আমি ছিলাম। বাড়ীতে আমি ঢুকি নাই, ঘাঁটি আগলেছি।

আপনার দোষই স্বীকার করিল—কিন্তু অন্য কাহারও নাম সে করিল না। বলিল—চিনি কেবল ছিদেমকে। ছিদেমই আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল—তারই চেনা দল। আমার বাড়ীতে সে অনেককাল কাজ করেছে। বন্যের পর ভিক্ষে করেই একরকম খাচ্ছিলাম। সাহায্য-সমিতি থেকে চাল-ধান ভিক্ষে নিচ্ছি দেখে সে আমাকে বলেছিল—গেলে মোটা টাকা পাব। আমি লোভ সামলাতে পারি নি, গিয়েছিলাম। আর যারা দলে ছিল—তারা কোথাকার লোক, কি নাম—আমি কিছুই জানি না। রামভল্লার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল—রাম

আমাকে বলেছিল—তুমি ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে এই করলে? এই পর্যন্ত!

সকলের নাম করিয়া রাজসাক্ষী হইলে তিনকড়ি হয়তো খালাস পাইত। কিন্তু তাহা সে করিল না। তবু বিচারক তাহার নিজের দোষ স্বীকার করার জন্য অন্য আসামীদের তুলনায় তাহাকে কম সাজা দিলেন। চারি বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হইয়া গেল তিনকড়ির। রাম, তারিণী প্রভৃতির হইল কঠোরতর সাজা; পূর্বের অপরাধ, দণ্ড প্রভৃতির নজির দেখিয়া বিচারক তাহাদের উপর ছয় হইতে সাত বৎসর কারাবাসের আদেশ দিলেন।...

দেবু আদালত হইতে বাহির হইয়া আসিল। যাক, সে একটা অপ্রীতিকর অস্বস্তিকর দায় হইতে অব্যাহতি পাইল। দুঃখের মধ্যেও তাহার সান্ত্বনা যে, তিনকড়ি-খুড়া যেমন পাপ করিয়াছিল, তেমনি সে নিজেই যাচিয়া দণ্ড গ্রহণ করিয়াছে।

রায়ের দিন সে একাই আসিয়াছিল। স্বর্ণ বা তিনকড়ির স্ত্রী আসে নাই। দণ্ড নিশ্চিত এ কথা সকলেই জানে, কেবল দণ্ডের পরিমাণটা জানার প্রয়োজন ছিল—সেইটাই তাহাদিগকে গিয়া জানাইতে হইবে।

ফিরিবার পথে একবার সে ডিস্ট্রিক্ট ইন্‌স্‌পেক্টার অব স্কুলসের আপিসে গেল—স্বর্ণের পরীক্ষার খবরটা জানিবার জন্য। খবর বাহির হইবার সময় এখনও হয় নাই; তবু যদি কোন সংবাদ কাহারও কাছে পাওয়া যায় সেইজন্যই গেল।

স্বর্ণ এম-ই পরীক্ষা দিয়াছে; এবং ভালই দিয়াছে। প্রশ্নপত্রের উত্তরগুলি সে যাহা লিখিয়াছে, সে তাহাতে পাস হইবেই। অঙ্কের পরীক্ষায় সমস্ত অঙ্কগুলি স্বর্ণের নির্ভুল হইয়াছে!

দেবুর প্রত্যাশা স্বর্ণ বৃত্তি পাইবে। এম-ই পরীক্ষায় বৃত্তি মাসিক চারি টাকা এবং পাইবে পূর্ণ চারি বৎসর। বৃত্তি পাইলে স্বর্ণ জংশনের বালিকা বিদ্যালয়ে একটি কাজ পাইবে। শিক্ষয়িত্রীরা আশ্বাস দিয়াছেন, স্কুলের সেক্রেটারীও কথা দিয়াছেন। তাঁহাদের গরজও আছে। স্কুলটাকে তাঁহারা ম্যাট্রিক স্কুল করিতে চান। চাকরি দিয়াও স্বর্ণকে তাঁহারা ক্লাস সেভেনে ভর্তি করিয়া লইবেন। এ হইলে স্বর্ণের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে নিশ্চিত হইতে পারিবে। যে যত্ন সে দিতে পারে

নাই, স্বর্ণ সেই মন্ত্র খুঁজিয়া পাইবে জ্ঞানের মধ্যে—বিদ্যার মধ্যে। শুধু মন্ত্রই নয়—সসম্মানে জীবিকা-উপার্জনের অধিকার পাইয়া স্বর্ণ তাহার জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারিবে। কল্পনায় সে স্বর্ণের শুভ্র শুচি-স্মিত রূপও যেন দেখিতে পায়। বড় ভাল লাগে দেবুর। পরিচ্ছন্ন বেশ-ভূষা পরিয়া, মুখে শিক্ষা এবং সপ্রতিভতার দীপ্তি মাখিয়া, স্বর্ণ যেন তাহার চোখের সম্মুখে দাঁড়ায় স্মিত হাসিমুখে।

স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টারের অফিসে আসিয়া সে অপ্রত্যাশিতরূপে সংবাদটা পাইয়া গেল। জেলা শহরের বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী এবং সেক্রেটারী বারান্দায় দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিলেন। সে অদূরে দাঁড়াইয়া খুঁজিতেছিল কোন পরিচিত কেরানীকে। যখন সে গ্রামের পাঠশালায় পণ্ডিতি করিত, তখন কয়েক-জনের সঙ্গে তাহার আলাপ ছিল। হঠাৎ তাহার কানে আসিল শিক্ষয়িত্রী বলিতেছেন—আপনিই চিঠি লিখুন। আপনার চিঠির অনেক বেশী দাম হবে; স্কুলের সেক্রেটারী, নাম করা-উকিল আপনি, আপনার কথায় ভরসা হবে তাদের। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে তো বৃত্তি পেলেও সহজে ঘর ছেড়ে শহরে পড়তে আসবে না। আপনি যদি লেখেন, কোন ভাবনা নেই, হোস্টেলে ফ্রি, স্কুল ফ্রি, এ ছাড়া আমরা হাত-খরচাও কিছু দেব—আপনি নিজে অভিভাবকের মত দেখবেন, তবেই হয়তো আসতে পারে।

—বেশ, তাই লিখে দেব আমি।

—হ্যাঁ। মেয়েটি অদ্ভুত নম্বর পেয়েছে। খুব ইন্টেলিজেন্ট মেয়ে।

—স্বর্ণময়ী দাসী। দেখুন্তিয়া, পোস্ট কঙ্কনা।—এই ঠিকানা তো?

—হ্যাঁ, মেয়েটির বাপের নাম বুঝি তিনকড়ি মণ্ডল। শুনলাম লোকটা একটা ডাকাতি-কেসে ধরা পড়েছে। কি অদ্ভুত ব্যাপার দেখুন তো! বাপ ডাকাত, আর মেয়ে বৃত্তি পাচ্ছে।

দেবু আনন্দে প্রায় অধীর হইয়া উঠিল। সে অগ্রসর হইয়া পরিচয় দিয়া জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল—তাঁহারা কি চান? কিন্তু সেই মুহূর্তেই সেক্রেটারী বাবু বলিল—আচ্ছা, আমি শিবকালীপুরের জমিদারকে চিঠি লিখছি—শ্রীহরি ঘোষকে। তাকে আমি চিনি।

দেবু থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। তাহারা চলিয়া গেলে—তাহার দেখা হইল এক পরিচিত কেরানীর সঙ্গে। তাহাকে নমস্কার করিয়া সে বলিল—ওই মহিলাটি আর ওই ভদ্রলোকটি কে বলুন তো?

—কে?—ও, মহিলাটি এখানকার গার্লস স্কুলের হেড মিস্ট্রেস্ আর উনি সেক্রেটারী রায়সাহেব সুরেন্দ্র বোস, উকিল। কেন বলুন তো?

—না। এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম। বৃত্তির কথা বলছিলেন ওঁরা।

—হ্যাঁ। আজ বৃত্তির খবর জেনে গেলেন। ওঁরা বৃত্তি পাওয়া মেয়ে যাতে ওঁদের ইস্কুলে আসে সেই চেষ্টা করবেন। তাই আগে এসে প্রাইভেট সব জেনে গেলেন। আমরা পাব সব দু-চার দিনের মধ্যেই। আপনি তো পণ্ডিতি ছেড়ে খুব মাতব্বরি করছেন। একটা ডাকাতি মামলার তদ্বির করলেন শুনলাম। কি রকম পেলেন?

দেবুর মনে হইল—কে যেন তাহার পিঠে অতর্কিতে চাবুক দিয়া আঘাত করিল। পা হইতে মাথা পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া হাসিয়া সে বলিল—তা বেশ, পাচ্ছিলুম বেশ, এখন হজম করতে কষ্ট হচ্ছে।

—আমাদের কিছু খাওয়ান-টাওয়ান্? লোকটি দাঁত মেলিয়া হাসিতে লাগিল।

দেবু বলিল—আপনিও হজম করতে পারবেন না।—বলিয়াই সে আর দাঁড়াইল না। স্টেশনের পথ ধরিল। শহর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া খানিকটা মুক্ত প্রান্তর। প্রান্তরটা পার হইয়া রেলওয়ে স্টেশন। জনবিরল মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া সে যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। আঃ! এইবার তাহার ছুটি। এদিকে সাহায্য-সমিতির কাজ ফুরাইয়াছে; সমিতির হিসাব-নিকাশ ডাক্তারকে বুঝাইয়া দিয়াছে; সামান্য কিছু টাকা আছে, সে টাকা এখন মজুদ থাকিবে স্থির হইয়াছে। ডাক্তারকেই সে-টাকা সে দিয়া দিয়াছে। এদিকে তিনকড়ির মামলা চুকিয়া গেল; স্বর্ণ বৃত্তি পাইয়াছে। সে জংশনের ইস্কুলে চাকরিও করিবে—পড়াশুনাও চলিবে। শহরের স্কুলের চেয়ে সে অনেক ভাল। বিশেষ করিয়া সে ইস্কুলের সেক্রেটারী শ্রীহরির জানাশুনা লোক, সে মনে করে জমিদারই দেশের প্রভু, পালনকর্তা,

আশ্রয়দাতা, তাহার ইস্কুলে সে কখনই স্বর্ণকে পড়িতে দিবে না। কখনই না। জংশনের ইস্কুল অন্য দিক দিয়াও ভাল, ঘরের কাছে; জংশনে থাকিলে—জগন ডাক্তার খোঁজখবর করিতে পারিবে। যাক্, স্বর্ণদের সম্বন্ধেও সে একরূপ নিশ্চিন্ত। এইবার তাহার সত্য সত্যই ছুটি। আঃ, সে বাঁচিল।

জংশনে সে যখন নামিল, তখন বেলা আর নাই। সূর্য অস্ত গিয়াছে, দিনের আলো ঝিকিমিকি করিতেছে ময়ূরাক্ষীর বালুময় গর্ভের পশ্চিম প্রান্তে, যেখানে মনে হয় ময়ূরাক্ষীর দুটি তটভূমি একটি বিন্দুতে মিলিয়া দিগন্তের বনরেখার মধ্যে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। ময়ূরাক্ষীর গর্ভ প্রায় জলহীন। শীতের দিন, নদীর গর্ভে বালিতে ঠাণ্ডার আমেজ লাগিয়াছে ইহারই মধ্যে। নদীর বিশীর্ণ ধারায় কচিৎ কোথাও জল একহাঁটু। ঘাটে আসিয়া দেবু মুখ-হাত ধুইয়া একটু বসিল। তাহার জীবনে কিছুদিন হইতেই অবসাদ আসিয়াছে—আজ সে অবসাদ যেন শেষরাত্রির ঘুমের মত তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। খোকন আগের দিন মারা গিয়াছিল—পরের দিন রাত্রি দুইটার সময় মারা গিয়াছিল বিলু। সেদিন শেষ রাত্রে যেমন ভাবে ঘুম তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছিল—আজ অবসাদও তেমনিভাবে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। যাক্, কাজ তাহার শেষ হইয়াছে। পরের বোঝা ঘাড় হইতে নামিয়াছে—ভূতের ব্যাগার খাটার আজ হইতে পরিসমাপ্তি। আর কোন কাজ নাই—কোন দায়িত্ব নাই।

দেবুর মনে পড়িয়া গেল—ন্যায়রত্ন সেদিন ঠিক এইখানেই বসিয়া পড়িয়াছিলেন। সে উদাস দৃষ্টিতে ওপারের দিকে চাহিল। ময়ূরাক্ষীর জলপ্রবাহের পর বালির রাশি; তারপর চর, এ-দেশে বলে—'ওলা'; ময়ূরাক্ষীর চর-ভূমিতে এবার চাষ বিশেষ হয় নাই; উর্বর পলিমাটি ফাটিয়া উষর হইয়া পড়িয়া আছে। চর-ভূমির পর বাঁধ। বাঁধের ওপাশে পঞ্চগ্রামের মাঠ। বন্যার পর আবার তাহাতে ফসলের অঙ্কুর দেখা দিয়াছে। সে অবশ্য নামে মাত্র! পঞ্চগ্রামের মাঠকে অর্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করিয়া পঞ্চগ্রাম। সাড়া নাই, শব্দ নাই, জরাজীর্ণ পাঁচখানা গ্রাম যেন চর্ম-কঙ্কালের বোঝা লইয়া নিঝুম হইয়া পড়িয়া আছে।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। শীত-সন্ধ্যার সূর্যালোকের শেষ আভার মধ্য হইতে উত্তাপ ইহারই মধ্যে উবিয়া গিয়াছে। দেবু উঠিল। জল পার হইয়া বালি ভাঙিয়া সে আসিয়া উঠিল বাঁধের উপর। স্বর্ণদের বাড়ীতে খবর দিয়া বাড়ী ফেরাই ভাল মনে হইল। তিনকড়ির সাজা অনিবার্য—এ তাহারাও জানে, তবুও তাহারা উদ্বেগ লইয়া বসিয়া আছে। মানুষের মন ক্ষীণতম আশাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিতে চায়। বন্যার স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া মানুষ কুটা ধরিয়া বাঁচিতে চায়—কথাটা অতিরঞ্জিত; কিন্তু সামান্য একটা গাছের ডাল দেখিলে সেটাকে সে ছাড়ে না—এটা সত্য কথা। স্বর্ণ এখনও আশা করিয়া আছে যে, তাহার বাবা যখন দোষ স্বীকার করিয়াছে, তখন জজসাহেব মৌখিক শাসন করিয়াই ছাড়িয়া দিবেন। সাজা দিলেও অতি অল্প কয়েক মাসের সাজা হইবে। এ সংবাদে স্বর্ণ আঘাত পাইবে—কিন্তু উপায় কি? স্বর্ণের বৃত্তি পাওয়ার সংবাদটাও দেওয়া হইবে। সঙ্গে সঙ্গে দেবু স্বর্ণের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা পাকা করিয়া ফেলিবে। সব কাজ সারিয়া শেষ করিতে হইবে। আর নয়! সে একবার বাহির হইতে পারিলে বাঁচে!

হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে হইল—বাঁধের পাশে ময়ূরাক্ষীর চরের উপর জঙ্গলের ভিতরে যেন নিঃশব্দ ভাষায় কাহারা কানাকানি হাসাহাসিতে মাতিয়া উঠিয়াছে। পাশেই শ্মশান। দেবুর সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাহার বিলু এবং খোকন এইখানেই আছে। তবে কি তাহারাই? হ্যাঁ, তাহাদের দেহ নাই, কণ্ঠযন্ত্রের অভাবে বুকের কথা শব্দহীন বায়ুপ্রবাহের মত শুনাইতেছে। তাহারা মায়ে-ছেলেতে বোধ করি খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছে। হাসাহাসি কানা-কানির ঢেউ শূন্যলোক ভরিয়া গিয়া—লাগিয়াছে গাছের মাথায় মাথায়। শ্মশানের ভিতর জঙ্গলের মধ্যে—অশরীরী আত্মা দুটি—ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতেছে। খেলায় মাতিয়া তাহারা যেন নাচিয়া-নাচিয়া চলিয়াছে; তাহাদের চলার বেগের আলোড়নে—শীতের ঝরা পাতার মধ্যে—ঘূর্ণি জাগিয়াছে; বোধ হয়—খোকন ছুটিয়াছে—তাহাকে ধরিবার জন্য পিছনে পিছনে ছুটিয়াছে বিলু। ঠিক তাই। তাহাদের উল্লসিত চলার চিহ্ন—পাতার ঘূর্ণি—এ গাছের আড়াল হইতে ও গাছের

আড়ালে চলিয়াছে—নাচিয়া নাচিয়া! দেবু আর এক পা নাড়িতে পারিল না। সে যেন কেমন অভিভূত হইয়া পড়িল! ভয়-বিস্ময়-আনন্দ সব মিশাইয়া সে এক অদ্ভুত অনুভূতি। তাহার ইচ্ছা হইল—সে একবার চিৎকার করিয়া ডাকে—বিলু—বিলু—খোকন! কিন্তু তাহার গলা দিয়া স্বর বাহির হইল না। কিন্তু তাহারাও কি তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না? তাহার উপস্থিতি সম্বন্ধে তাহাদের এত অবহেলা কেন? পরের বোঝা দশের কাজ লইয়া ভুলিয়া আছে—এইজন্য? কয়েক মুহূর্ত পরেই জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য অশরীরীদের পদক্ষেপ স্তব্ধ হইয়া গেল। তবে তাহারা কি তাহাকে দেখিয়াছে? হ্যাঁ! ঐ যে আবার নিঃশব্দ ভাষায় আর হাসাহাসি কানাকানি নাই—এবার নিঃশব্দ অভিমান-ভরা একটানা সুর উঠিয়াছে। এবার যেন তাহারা ডাকিতেছে—আয়—আয়—আয়—আয়! আকাশে বাতাসে—গাছের মাথায় মাথায়—পঞ্চগ্রামের মাঠ ভরিয়া উঠিয়াছে—সেই নিঃশব্দ ভাষার উতরোল আহ্বান। হ্যাঁ, তাহারাই তাহাকে ডাকিতেছে। তাহার সর্বশরীর ঝিম্-ঝিম্ করিয়া উঠিল—সমস্ত স্নায়ু-তন্ত্রী যেন অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। হাতের পায়ের আঙুলের ডগায় যেন আর স্পর্শবোধ নাই। কতক্ষণ যে এইভাবে অসাড় অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল কে জানে, হঠাৎ একটা দূরাগত ক্ষীণ সুর-ধ্বনি তাহার কানে আসিয়া ক্রমশ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। শব্দের স্পর্শের মধ্য দিয়া জীবিত মানুষের সঙ্গে অস্তিত্ববোধ তাহার অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলিকে সচেতন করিয়া তুলিল; সকালের রৌদ্রের আলোক এবং উত্তাপের স্পর্শে—রাত্রের মুদিতদল পদ্মের মত আবার দল মেলিয়া জাগিয়া উঠিল। এতক্ষণে তাহার ভুল ভাঙিল; বুঝিল—বিলু-খোকনের হাসাহাসি কানাকানি নয়, বাতাস ও গাছের খেলা; শীতের বাতাসে—তালগাছের মাথায় পাতায় পাতায় শব্দ উঠিতেছে। জঙ্গলের ঝরা পাতায় ঘূর্ণি জাগিয়াছে। ওদিকে পিছনে—ময়ূরাক্ষী-গর্তে মানুষের গান ক্রমশঃ নিকটে আগাইয়া আসিতেছে।

কাহারা গান গাহিতে গাহিতে ময়ূরাক্ষী পার হইয়া এইদিকেই আসিতেছে। শুক্লপক্ষের চতুর্থী কি পঞ্চমীর একফালি চাঁদ রূপার কাস্তের মত পশ্চিম আকাশে মৃদু দীপ্তিতে জল্-জল্ করিতেছে; প্রকাণ্ড বড় ঘরে প্রদীপের আলোর মত অনুজ্জ্বল

জ্যোৎস্না। লোকগুলি আসিতেছে—অস্পষ্ট ছায়ার মত। অনেকগুলি লোক, স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে দল বাঁধিয়া আসিতেছে। হঠাৎ মনে পড়িল—ও! বাউড়ী, মুচি, তোমেরা সব কলে খাটিয়া ফিরিতেছে। এতক্ষণে দেবু চলিতে আরম্ভ করিল। চলিতে চলিতে সে ভাবিতেছিল—বিলুর কথা নয়, খোকনের কথা নয়, ঐ লোক-গুলির কথা। উহাদের সাড়ায় সে যে আশ্বাস আজ পাইয়াছে, তাহা সে কখনও ভুলিতে পারিবে না। উহাদের মঙ্গল হউক। তাহাদের বর্তমান অবস্থার কথা ভাবিয়া দেবুর আনন্দ হইল। তবু ইহারা অনেকটা রক্ষা পাইয়াছে। দেড় মাস এখনও হয় নাই, ইহাদের মধ্যে অনেকে তিষ্ঠিয়াছে। অভাব অভিযোগ অনেক আছে, তবুও দু-বেলা দু মুঠা জুটিতেছে। বাড়ী ফিরিয়া গিয়াই সকলে ঢোল পাড়িয়া বসিবে। ইহাদের সম্বন্ধে দেবু নিশ্চিন্ত হইয়াছে। একটা বোঝা ঘাড় হইতে নামিয়াছে। এইবার আজই স্বর্ণদের বোঝা নামাইবার ব্যবস্থা সে করিয়া আসিবে। অনেক বোঝা সে বহিল—আর নয়! ইহার মধ্যে কতদিন কতবার সে ভগবানের কাছে বলিয়াছে—হে ভগবান, মুক্তি দাও, আমাকে মুক্তি দাও।... কিন্তু মুক্তি পায় নাই। কতদিন বিলু ও খোকার চিতার পাশে কাঁদিবে বলিয়া বাহির হইয়াও কাঁদিতে পায় নাই। মানুষ পিছনে পিছনে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। মুহূর্তে তাহার মন অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিল। দীর্ঘকাল বিলু-খোকাকে ভুলিয়া থাকিয়া তাহার মনের অবস্থা এমন হইয়াছে যে, আজ নির্জন ঐ শ্মশানের ধারে দাঁড়াইয়া বিলু-খোকার অশরীরী অস্তিত্বের আভাস অনুভব মাত্রেই তাহার মন, চেতনা ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া অন্তরে অন্তরে পরিত্রাণ চাহিয়া সারা হইয়া গেল। ঐ মানুষ কয়টির সাড়া পাইয়া তাহার মনে হইল সে যেন বাঁচিল। নিজেকে নিজেই ছি-ছি করিয়া উঠিল। সংকল্প করিল—না, আর নয়, আর নয়।

দেখুড়িয়ার ঢুকিবার মুখেই কে অন্ধকারের মধ্যে ডাকিল—কে? পণ্ডিত মাশায় নাকি?

চিন্তামগ্ন দেবু চমকিয়া উঠিল—কে?

—আমি তারাচরণ।

—তারাচরণ ?

—আজ্ঞে হাঁ। সদর থেকে ফিরলেন বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—তিনকড়ির মেয়াদ হয়ে গেল ? কতদিন ?

—চার বছর।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তারাচরণ বলিল—অন্যায় হয়ে গেল পণ্ডিত মাশায় ! ঘরটা নষ্ট হয়ে গেল।...তারপর হাসিয়া বলিল—কোন্ ঘরটাই বা থাকল ? রহম-চাচারও আজ সব গেল !

—সব গেল ? মানে ?

—দৌলতের কাছে হ্যাণ্ডনোট ছিল, তার নালিশ হয়েছিল ; সুদে আসলে সমান সমান, তার ওপর আদালত-খরচা চেপেছে। প্রথম আজ অস্থাবর হল। কি আর অস্থাবর ? মেরেকেটে পঞ্চাশটা টাকা হবে। বাকীর জন্য জমি ক্রোক হবে। জমিতেও খাজনা বাকী পড়ে এসেছে।

দেবু চুপ করিয়া রহিল। সে যেন পথ চলিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিল।

পরামাণিক বলিল—এ আর রহম-চাচা সামলাতে পারবে না।—কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তারাচরণ বলিল—একটা কথা শুধোব পণ্ডিত মাশাই ?

—বল।

—আপনি নাকি তিনকড়ির কন্যের বিয়ে দেবেন ? বিধবা-বিয়ে ?

দেবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—কে বললে তোমায় ?

তারাচরণ চুপ করিয়া রহিল।

দেবু উষ্ণ হইয়াই বলিল—তারাচরণ ?

—আজ্ঞে ?

—কে রটাচ্ছে এসব কথা বল তো ? শ্রীহরি বুঝি ?

—আজ্ঞে না।

—তবে ?

তারাচরণ বলিল—ঘোষাল বলছিল।

—হরেন ঘোষাল ?

—হ্যাঁ।

দপ্ করিয়া মাথায় যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল—কিন্তু কি বলিবে দেবু খুঁজিয়া পাইল না। কিছুক্ষণ পর বলিল—মিছে কথা তারাচরণ। তবে হাঁ, স্বর্ণ রাজী হলে ওর বিয়ে আমি দিতাম।

স্বর্ণদের বাড়ীতে যখন দেবু আসিয়া উঠিল—তখন মা ও মেয়ে একটি আলো সামনে রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

সমস্ত শুনিয়া তাহারা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ ধরিয়া কেহ একটা কথা বলিতে পারিল না।

তারপর দেবু স্বর্ণের বৃত্তি পাওয়ার সংবাদ দিল। তাহা শুনিয়াও স্বর্ণ মুখ তুলিল না।

স্বর্ণের মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দেবু বলিল—আমি আপনাদের ভবিষ্যতের কথা ভাবছিলাম।

স্বর্ণের মা বলিল—তুমি যা বলবে তাই করব। তুমি ছাড়া আর তো কেউ নাই আমাদের।

এমন সকরুণ স্বরে সে কথা কয়টি বলিল যে, দেবু কিছুতেই বলিতে পারিল না যে, আমি আর কাহারও বোঝা বহিতে পারিব না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে বলিল—আমি তো এখানে থাকব না খুড়ী-মা!

—থাকবে না ?

স্বর্ণ চমকিয়া উঠিল, এতক্ষণে সে বলিল—কোথায় যাবেন দেবু দা ?

—তীর্থে যাব ভাই।

—তীর্থে ?

—হ্যাঁ ভাই, তীর্থে। শূন্য ঘর আর আমার ভাল লাগছে না।

স্বর্ণ আর কোন কথা বলিতে পারিল না। স্তব্ধ নীরব হইয়া গেল মাটির

পুতুলের মত। কিছুক্ষণ পর আলোর ছটায় দেবুর নজরে পড়িল—স্বর্ণের চোখ হইতে নামিয়া আসিতেছে জলের দুটি ধারা। সে মুখ ঘুরাইয়া লইল। মমতায় তাহার অবিশ্বাস নাই, তাহার প্রাণে অফুরন্ত মমতা। এখানকার মানুষকে সে ভালবাসে নিতান্ত আপনজনেরই মত। এক শ্রীহরি ছাড়া কাহারও সঙ্গে তাহার মনোমালিন্য নাই। এখানকার মানুষ তো দূরের কথা—এখানকার পথের কুকুরগুলিও তাহার বাধ্য ও প্রিয়। গ্রামের কয়েকটা কুকুর ইদানীং উচ্ছিষ্ট-লোভে জংশনে গিয়া পড়িয়াছে। তাহারা জংশনে তাহাকে দেখিয়া আজও যে আনন্দ প্রকাশ করে—সে তাহার মনে আছে। আজই দুইটা কুকুর তাহার সঙ্গে সঙ্গে ময়ূরাক্ষীর ঘাট পর্যন্ত আসিয়াছিল। এখানকার গাছপালা, ধূলা-মাটির উপরে তাহার এক গভীর মমতা। এই গ্রাম লইয়া কতবার কত কল্পনাই সে করিয়াছে! কত অবসর সময়ে কাগজের উপর গ্রামের নকশা আঁকিয়া পথ-ঘাটের নূতন পরিকল্পনা করিয়াছে! কোথায় সাঁকো হইলে উপকার হয়, কোথায় অসমান পথ সমান হইলে সুবিধা হয়, বাঁকা পথ সোজা হইলে ভাল লাগে, বন্ধ পথকে বাড়াইয়া গ্রামান্তরের সঙ্গে যুক্ত করিলে ভাল হয়—কত চিন্তা করিয়া ছবি আঁকিয়াছে। গ্রামের লোক, এ অঞ্চলের লোকও তাহাকে ভালবাসে এ কথা সে জানে। তাহারাই আবার তাহাকে পতিত করে, তাহার গায়ে কলঙ্কের কালি লেপিয়া দেয়, তাহাকে আড়ালে ব্যঙ্গ করে—তবুও তাহারা তাহাকে ভালবাসে। সে ভালবাসা দেবুও অন্তরে অন্তরে অনুভব করে। কিন্তু সে মমতার প্রতি ফিরিয়া চাহিলে আর তাহার যাওয়া হইবে না। সে আপনাকে সংযত করিয়া মুখ ফিরিয়াই বলিল—তোমার ব্যবস্থা—যা বলেছিলাম আমি, তাতে তোমার অমত নাই তো?

স্বর্ণ মাটির দিকে চাহিয়া বোধ করি বারকয়েক ঠোঁট নাড়িল, কোন কথা বাহির হইল না।

দেবু বলিয়া গেল—আমার ইচ্ছা তাই। ভেবে দেখ—এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা কিছু হতে পারে না তোমাদের। জংশনের স্কুলে চাকরি করবে, পড়বে। তোমার মাইনে—বৃত্তি প্রভৃতিতে নগদ পনের-ষোল টাকা হবে। ওদের চেপে ধরলে কিছু বেশীও হতে পারে। এর ওপর সতীশকে আমার জমি ভাগে দিলাম—সে

তোমাদের মাসে এক মন হিসেবে চাল দিয়ে আসবে। স্বাধীনভাবে থাকবে। ভবিষ্যতে ম্যাট্রিক পাস করলে চাকরিতে আরও উন্নতি হবে। লেখাপড়া শিখলে মনেও বল বাড়বে। কতজনকে তখন তুমিই আশ্রয় দেবে—প্রতিপালন করবে। আর—গৌরও নিশ্চয় ফিরবে এর মধ্যে।

দেবু চুপ করিল। স্বর্ণের উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। কিন্তু স্বর্ণ কোন উত্তর দিল না। দেবু আবার প্রশ্ন করিল—খুড়ী-মা?

একান্ত অনুগৃহীতজনের মানিয়া লওয়ার মতই স্বর্ণের মা দেবুর কথা মানিয়া লইল—তুমি যা বলছ তাই করব বাবা।

দেবু বলিল—স্বর্ণ?

—বেশ। একটি কথায় স্বর্ণ উত্তর দিল।

দেবু এবার মুখ ফিরাইয়া স্বর্ণের দিকে চাহিল। স্বর্ণ এখনও আত্মসংবরণ করিতে পারে নাই, তাহার চোখের কোণের জলের ধারাটি এখনও শুকাইয়া যায় নাই।

দেবু উঠিয়া পড়িল; এ সবই তাহার না-জানার অভিনয়ের পিছনে ঢাকা পড়িয়া থাকা ভাল। নইলে কাঁদিবে অনেকেই।

তিন দিন পর যখন দেবু বিদায় লইল তখন সত্যসত্যই অনেকে কাঁদিল।

বাউড়ীরা কাঁদিল। সতীশের ঠোঁট দুইটা কাঁপিতেছিল—চোখে জল টল্-মল্ করিতেছিল। সে বলিল, আমাদের দিকে চেয়ে কে দেখবে পণ্ডিত মাশায়!

পাতু নাই, সে অনিরুদ্ধের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে—নহিলে সেও কাঁদিত। পাতুর মা হাউ-মাউ করিয়া কাঁদিল—আঃ, বিলু মা রে! তোর লেগে জামাই আমার সন্নেসী হয়ে গেল।

আশ্চর্যের কথা, ইহাদের মধ্যে দুর্গা কাঁদিল না। সে বিরক্ত হইয়া মাকে ধমক দিল—মরণ! থাম বাপু তুই!—

দেবুর জ্ঞাতিরা কাঁদিল। রামনারায়ণ কাঁদিল, হরিশ কাঁদিল। শ্রীহরিও বলিল—আহা, বড় ভাল লোক! তবে এইবার দেবু খুড়ো ভাল পথ বেছে নিয়েছে।

হরেন ঘোষালও কাঁদিল—ব্রাদার, আবার ফিরে এসো।

জগন ডাক্তারও দেবুর সঙ্গে নিরিবিলি দেখা করিয়া কাঁদিল; বলিল—আমিও জংশনে জায়গা কিনছি, এখানকার সব বেচে দিয়ে ওখানেই গিয়ে বাস করব। এ গাঁয়ে আর থাকব না।

ইরসাদ আসিয়াছিল। সেও চোখের জল ফেলিয়া বলিয়া গেল—দেবু-ভাই, এবাদতের কাজে বাধা দিতে নাই। বারণ করব না—খোদাতালা তোমার ভালই করবেন। কিন্তু আমার দোস্ত কেউ রইল না।

রহম আসে নাই। কিন্তু সে-ও নাকি কাঁদিয়াছে। ইরসাদই বলিয়াছে—রহম-চাচার চোখ দিয়ে পানি পড়ল ঝর্-ঝর্ করে। বললে—ইরসাদ বাপ, তুমি বারণ করিয়ো। সব্বস্বান্ত হয়েছি—এ মুখ দেখাতে বড় সরম হয়। নইলে আমি যাতাম—বুলতাম যেয়ে দেবুকে।

ময়ূরাক্ষী পার হইয়া সে একবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। পঞ্চগ্রামের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইল। ওপারের ঘাটে একটি জনতা দাঁড়াইয়া আছে। সে চলিয়া যাইতেছে—দেখিতেছে। তাহাদের পিছনে বাঁধের উপরে কয়েকজন, দূরে শিবকালীপুরের মুখে দাঁড়াইয়া আছে মেয়েরা।

দেবুর মনে পড়িল—এককালে এ রেওয়াজ ছিল, তখন কেহ কোথাও গেলে গ্রাম ভাঙিয়া লোক বিদায় দিতে আসিত। পঞ্চগ্রামে যখন ছিল ঘরে ঘরে ধান, জোয়ান পুরুষ, আনন্দ-হাসি-কলরব। যখন বৃদ্ধেরা তীর্থে যাইত, গ্রামের লোকেরা তখন এমনই ভাবে বিদায় দিতে আসিত। ক্রমে ক্রমে সে রেওয়াজ উঠিয়া গিয়াছে। আপনিই উঠিয়া গিয়াছে। আজ উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়াও মানুষের অন্ন জোটে না; শক্তি নাই—কঙ্কালসার মানুষ শোকে ম্রিয়মাণ, রোগে শীর্ণ; তবু তাহারা আসিয়াছে, এতটা পথ আসিয়া অনেকে হাঁপাইতেছে, তবু আসিয়াছে—ঘোলাটে চোখ হতাশা-ভরা দৃষ্টি মেলিয়া এই বিদায়ী বন্ধুটির দিকে চাহিয়া আছে।

দেবু তাহাদের দিকে পিছন ফিরিল। নাঃ, আর নয়। সকলকে হাত তুলিয়া দূর হইতে নমস্কার জানাইয়া শেষ বিদায় লইল। সে আর ফিরিবে না।

সে জানে ফিরিলেও আর সে পঞ্চগ্রাম দেখিতে পাইবে না। এখানকার মানুষের পরিত্রাণ নাই। জীবনের গাছের শিকড়ে পোকা ধরিয়াছে। পঞ্চগ্রামের মাটি থাকিবে—মানুষগুলি থাকিবে না! পাতা-ঝরা শুকনা গাছের মত রসহীন পঞ্চগ্রামের রূপ তাহার চোখের সামনে যেন ভাসিয়া উঠিল।

না—সে আর ফিরিবে না।

আসে নাই কেবল স্বর্ণ ও স্বর্ণের মা। স্বর্ণের জন্য স্বর্ণের মা আসিতে পারে নাই। দুর্গা বলিল, স্বর্ণ কাঁদিতেছে; সেদিন সে-রাত্রে বাপের উপর জেলের হুকুমের কথা শুনিয়া সে যে বিছানায় পড়িয়া মুখ গুঁজিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে শুরু করিয়াছে, তাহার আর বিরাম নাই।

দেবু কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। যাইবার সময় স্বর্ণ ও স্বর্ণের মাকে না দেখিয়া সে একটু দুঃখিত হইল। দেবুর মনে হইল—সে ভালই করিয়াছে। আর সে ফিরিবে না ...

মাস ছয়েক পর।

দেশে—সমগ্র ভারতবর্ষে আবার একটা দেশপ্রেমের জোয়ার আসিয়া পড়িয়াছে। যাদুমন্ত্রে যেন প্রতিটি প্রাণের প্রদীপে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। অদ্ভুত একটা উত্তেজনা। সে উত্তেজনায় শহর-গ্রাম চঞ্চল—পল্লীর প্রতিটি পর্ণ-কুটীরেও সে উচ্ছ্বাসের স্পর্শ লাগিয়াছে। উনিশ-শো ত্রিশ সালের আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পঞ্চগ্রামেও উত্তেজনা জাগিয়াছে।

জগন ডাক্তার আসিয়াছিল জংশন স্টেশনে। তাহার পরনে খদ্দরের জামা-কাপড়, মাথায় টুপি। ডাক্তারও এই উত্তেজনায় মাতিয়া উঠিয়াছে। জেলা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী আসিয়াছিলেন—তাঁহাকে সে বিদায় দিতে আসিয়াছে। গাড়ীতে তাঁহাকে তুলিয়া দিল, ট্রেনখানা চলিয়া গেল। জগন ফিরিল। হঠাৎ তাহার পিঠে হাত দিয়া কে ডাকিল—ডাক্তার!

জগন পিছন ফিরিয়া দেখিয়া আনন্দে উৎসাহে যেন জ্বলিয়া উঠিল; দুই হাত প্রসারিত করিয়া দেবুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—দেবু-ভাই, তুমি!

—হ্যাঁ ডাক্তার, আমি ফিরে এলাম।

—আঃ। আসবে আমি জানতাম দেবু-ভাই। আমি জানতাম।

হাসিয়া দেবু বলিল—তুমি জানতে?

—রোজই তোমায় মনে করি, হাজার বার তোমার নাম করি। সে কি মিথ্যে হয় দেবু-ভাই! অন্তর দিয়ে ডাকলে পরলোক থেকে মানুষের আত্মা এসে দেখা দেয়, কথা কয়; তুমি তো পৃথিবীতে, এই দেশেই ছিলে!...ডাক্তার হাসিল।

দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—না ডাক্তার, মানুষের আত্মা আর আসে না। আর তিন মাস অহরহ ডেকেও তো কিছু দেখতে পেলাম না!

কথাটায় ডাক্তার খানিকটা স্তিমিত হইয়া গেল। নীরবে পথ চলিয়া তাহারা নদীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবু বলিল—বস ভাই ডাক্তার। খানিকটা বস।

—বসবার সময় নাই ভাই। চলি, আজ আবার মিটিং আছে।

—মিটিং?

—কংগ্রেসের মিটিং। আমাদের এখানে মুভমেণ্ট আমরা আরম্ভ করে দিয়েছি কিনা। আজ মাদক বর্জনের মিটিং।

দেবু উজ্জল দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে চাহিয়া রহিল।

ডাক্তার বলিল—তুমি চলে গেলে। হঠাৎ একদিন তিনকড়ির ছেলে গৌর এসে হাজির হল একটা মস্ত বড় পতাকা নিয়ে—কংগ্রেস ফ্ল্যাগ! বললে—২৬শে জানুয়ারী এটা তুলতে হবে।

—গৌর ফিরে এসেছে?

—হ্যাঁ। সেই তো এখন আমাদের কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী। সে এখান থেকে চলে গিয়ে কংগ্রেস-ভলেণ্টিয়ার হয়েছিল। ফিরে এসেছে গাঁয়ের কাজ করবে বলে। তুমি নাই দেখে বেচারা বড় দমে গেল। বললে—দেবু-দা নাই! কে করবে এ-সব? আমি আর থাকতে পারলাম না দেবু-ভাই,—নেমে পড়লাম। উচ্ছ্বসিত উৎসাহে ডাক্তার অনর্গল বলিয়া গেল সে কাহিনী। বলিল—ঘরে ঘরে চরকা চলছে, প্রায় সমস্ত বাউড়ী-মুচীই মদ ছেড়েছে, গাঁয়ে পঞ্চায়েত করেছি,

চারিদিকে মিটিং হচ্ছে। চল নিজের চোখেই দেখবে সব। এইবার তুমি এসেছ, এইবার বান ডাকিয়ে দোব : তোমাকে কিন্তু ছাড়ব না। তুমি যে মনে করছ দুদিন পরেই চলে যাব, তা হবে না।

দেবু বলিল—আমি যাব না ডাক্তার। সেই জন্যই আমি ফিরে এলাম। তোমাকে তো বললাম অনেক ঘুরলাম ক-মাস। ছাব্বিশে জানুয়ারী আমি এলাহাবাদে ছিলাম। সেখানে সেদিন জহরলালজী পতাকা তুললেন, দেখলাম। সেদিন একবার গাঁয়ের জন্য মনটা টন্-টন্ করে উঠেছিল ডাক্তার, সেদিন আমি কেঁদেছিলাম। মনে হয়েছিল—সব জায়গায় পতাকা উঠল—বুঝি আমাদের পঞ্চগ্রামেই উঠল না। সেখানে মানুষ শুধু দুঃখ বুকে নিয়ে—ঘরের ভেতর মাথা হেঁট করেই বসে রইল এমন দিনে। ফিরে আসতেও ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু জোর করে মনকে বললাম—না, যে পথে বেরিয়েছিস্ সেই পথে চল্।...তারপর কিছুদিন ওখানে ত্রিবেণী-সঙ্গমে কুঁড়ে বেঁধে ছিলাম। দিনরাত ডাকতাম বিলুকে খোকনকে। সেখানে ভাল লাগল না। এলাম কাশী। হরিশ্চন্দ্রের ঘাটে গিয়ে বসে থাকতাম। এই শ্মশানেই হরিশ্চন্দ্রের রোহিতাশ্ব বেঁচেছিল। কিন্তু—

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দেবু বলিল—তোমার কথা হয়তো মিথ্যে নয়। প্রাণ দিয়ে ডাকলে পরলোকের মানুষ আসে, দেখা দেয়। আমি হয়তো প্রাণ দিয়ে ডাকতে পারি নি। ন্যায়রত্ন মশাই কাশীতে ছিলেন তো, তিনি আমাকে বলেছিলেন—পণ্ডিত, তুমি ফিরে যাও। এ পথ তোমার নয়। এতে তুমি শান্তি পাবে না। তা ছাড়া পণ্ডিত, ধ্যান করে ভগবানকে মেলে। কিন্তু মানুষ মরে গেলে সে আর ফেরে না, তাকে আর পাওয়া যায় না। বাইরে দেখতে পাওয়ার কথা পাগলের কথা, মনের মধ্যেও তাকে পাওয়া যায় না। যত দিন যায়, তত সে হারিয়ে যায়। নইলে আর মরণের ভয়ে অমৃত খোঁজে কেন মানুষ! আমার শশীকে আমি ভুলে গিয়েছি পণ্ডিত। তোমাকে সত্য বলছি আমি, তার মুখ আমার কাছে ঝাপসা হয়ে এসেছে। তা নইলে বিশ্বনাথের ছেলে অজয়কে নিয়ে আমি আবার সংসার বাঁধি?...

তা ছাড়া—।...দেবু বলিল—ঠাকুর মশায় একটা কথা বললেন, পণ্ডিত, যে

মরে, তাকে আর পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যায় না, মানুষের মনেও সে থাকে না; থাকে—সে যা দিয়ে যায়—তারই মধ্যে। শশী আমাকে দিয়ে গিয়েছে সহগুণ। আমার মধ্যে সে তাতেই বেঁচে আছে। তোমার স্ত্রীকে একদিন দেখেছিলাম—শান্ত-হাস্যময়ী মেয়ে। তোমাকেও আমি ছোটবেলা থেকে দেখছি। তুমি ছিলে অত্যন্ত উগ্র, অসহিষ্ণু। আজ তুমি এমন সহিষ্ণু হয়েছ—তার কারণ তোমার স্ত্রী। সে তো হারায় নি। সে তো তোমার মধ্যেই মিশে রয়েছে! বাইরে যা খুঁজছ পণ্ডিত, সে তাদের নয়, সেটা তোমার ঘর-সংসারের আকাঙ্ক্ষা!...দেবু চুপ করিল। জগনও কোন উত্তর দিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল—আজও ঠিক বুঝতে পারলাম না ডাক্তার, আমার মন ঠিক কি চায়। বিলু-খোকনকে ভাবতে বসতাম, তারই মধ্যে মনে হত গাঁয়ের কথা, তোমাদের কথা। তোমার কথা, দুর্গার কথা, চৌধুরীর কথা। গৌরের কথা, যাক্ সে দুষ্টু তা হলে ফিরেছে!

ডাক্তার বলিল—অদ্ভুত উৎসাহ গৌরের। আশ্চর্য ছেলে! ওর বোন স্বর্ণও খুব কাজ করছে। চরকার ইস্কুল করছে। চমৎকার সুতা কাটে স্বর্ণ!

—স্বর্ণ! স্বর্ণ পড়ছে তো? চাকরি করছে তো?

—হাঁ। তবে চাকরি আর থাকবে কিনা সন্দেহ বটে।

দেবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—যায় যাবে। তাই তো ভাবতাম ডাক্তার। যখন দেখতাম চারিদিকে মিটিং, শোভাযাত্রা, দেখতাম—মাতাল মদ ছাড়লে, নেশাখোর নেশা ছাড়লে, ব্যবসাদার লোভ ছাড়লে, রাজা, ধনী, জমিদার, প্রজা, চাষী, মজুর—একসঙ্গে গলাগলি করে পথ চলছে—তখন আমার চোখে জল আসত। সত্যি বলছি ডাক্তার, জল আসত। মনে হত—আমাদের পঞ্চগ্রামে হয়তো কোন পরিবর্তনই হল না—কিছু হয় নাই। শেষটা আর থাকতে পারলাম না, ছুটে এলাম।

ডাক্তার বলিল—চল, দেখবে অনেক কাজ হয়েছে।...হাসিয়া পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—যা গৌর-চেলা ছেড়ে গিয়েছ তুমি!

গৌর জ্বলিয়া উঠিল প্রদীপের শিখার মত।—দেবু-দা!

স্বর্ণ প্রণাম করিয়া অতি নিকটে দাঁড়াইয়া বলিল—ফিরে এলেন!

দুর্গা বলিল—তাহারও লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই,—গাঢ়স্বরে সর্বসমক্ষে বলিল, পরাণটা জুড়ালো জামাই-পণ্ডিত।

গৌর বলিল—এইখানেই মিটিং হবে আজ। এইখানেই ডাক, সবাইকে খবর দাও। বল—দেবু-দা এসেছে। সে বাহির হইয়া পড়িল।

দেবুর বাড়ীতেই কংগ্রেস কমিটির অফিস। আপন দাওয়ায় বসিয়া দেবু দেখিল—গৌর আয়োজনের কিছু বাকী রাখে নাই। স্বর্ণ তাহাকে ডাকিল—আসুন দেবু-দা, হাত-মুখ ধুয়ে ফেলুন!

বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া দেবু বিস্মিত হইল। ঘরখানার শ্রী যেন ফিরিয়া গিয়াছে, চারিদিকে নিপুণ যত্নে মার্জনায় ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। দেবু বলিল—বাঃ! এখন এ বাড়ীর যত্ন কে করে?

স্বর্ণ বলিল—আমি। আমরা তো এখানে থাকি!

দেবু বলিল—খুড়ী-মা কই?

স্বর্ণ বলিল—মা নেই দেবু-দা!

দেবু চমকিয়া উঠিল—খুড়ী-মা নেই!

—না। মাস দুয়েক আগে মারা গিয়েছেন।

দেবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। বড় দুঃখিনী ছিলেন খুড়ী-মা। হাত-মুখ ধুইয়া সে নিজের সুটকেসটি খুলিয়া, একখানা খদ্দরের শাড়ী বাহির করিয়া স্বর্ণকে দিয়া বলিল—তোমার জন্য এনেছি।

স্বর্ণের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে ম্লান হইয়া গেল, ম্লান মুখে বলিল—এ যে লাল চওড়াপেড়ে শাড়ী দেবু-দা?

দেবু চমকিয়া উঠিল, স্বর্ণ বিধবা—একথা তাহার মনেই হয় নাই। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল—তা হোক। তবু তুমি পরবে। হ্যাঁ, আমি বলছি।

গৌর আসিয়া ডাকিল—আসুন দেবু-দা! সব এসে গিয়েছে।

দেবু বাহিরে আসিল। সমস্ত গ্রামের লোক আসিয়াছে। দেবুকে দেখিয়া তাহাদের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শীর্ণ, অনাহার-ক্লিষ্ট মুখের মধ্যে চোখগুলি জল-জল্ করিতেছে। সে যেদিন যায়—সেদিন এই চোখগুলি ছিল যেন নির্বাণমুখী প্রদীপের স্তিমিত শিখার মত। আজ আবার সেগুলি প্রাণের হবি সংযোগে জল্-জল্ করিয়া জ্বলিতেছে—দীপ্ত শিখায়। উচ্ছ্বাসে, উত্তেজনায়, জাগরণের চাঞ্চল্যে, শীর্ণদেহ মানুষগুলি দৃঢ়তার কাঠিন্যে মেরুদণ্ড সোজা করিয়া বসিয়া আছে! সে অবাক হইয়া গেল। সে পঞ্চগ্রামের মানুষের ধ্বংস নিশ্চিত ভাবিয়া চলিয়া গিয়াছিল—তাহারা আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়া বসিয়াছে, কণ্ঠে স্বর জাগিয়াছে, চোখে দীপ্তি ফুটিয়াছে, বুকে একটা নূতন আশা জাগিয়াছে।

দাওয়া হইতে দেবু জনতার মধ্যে নামিয়া আসিল।

সাতাশ

তিন বৎসর পর। উনিশ-শো তেত্রিশ সাল।

জেলার সদর শহরের জেল-ফটক খুলিয়া গেল। ভোরবেলা, সূর্যোদয় তখনও হয় নাই, শুধু চারিদিকের অন্ধকার কাটিয়া সবে প্রত্যুষালোকে জাগিতেছে। পূর্বদিগন্তে জ্যোতির্লেখার চকিত ক্রমবিকাশের লেখাও শুরু হয় নাই। পাখীরা শুধু ঘন ঘন ডাকিতেছে।

জেল-ফটক খুলিয়া গেল। দেবু বাহিরে আসিল। উনিশ-শো ত্রিশ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে সে দণ্ডিত হইয়াছিল। দণ্ডিত হইয়াছিল দেড় বৎসরের জন্য। ত্রিশ সালের জুন মাসে—বাংলা মাসের আষাঢ় মাসে জেলাময় সভা, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ জারী হইয়াছিল। সেই আদেশ অমান্য করিয়া সে শোভাযাত্রা পরিচালনা করিয়াছিল—সভা করিয়াছিল। শুধু দণ্ডিতই হয় নাই, মাথায় আঘাত পাইয়া সে আহতও হইয়াছিল, দেড় বৎসর অতীত হইবার পূর্বেই—গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে—তাহার মুক্তি পাওয়ারই কথা ছিল। অধিকাংশ দণ্ডিত কর্মীই মুক্তি পাইল; কিন্তু মুক্তির প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে আটক আইনে বন্দী

হইয়া সঙ্গে সঙ্গেই আবার জেলে ঢুকিয়াছিল। মুক্তির আদেশ আসিয়াছে। আজ সে মুক্তি পাইল। ট্রেন খুব সকালে, পূর্ব সন্ধ্যায় মুক্তির আদেশ আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই দেবুর মনটা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল; কর্তৃপক্ষকে সে বলিয়াছিল— ভোরের ট্রেন যাতে ধরতে পারি—তার ব্যবস্থা যদি করে দেন, তবে বড় ভাল হয়।

কর্তৃপক্ষ সে ব্যবস্থা করিতে অবহেলা করেন নাই। ভোরবেলায় স্টেশনে যাওয়ার জন্য মোটর বাসও বলিয়া দিয়াছেন। দেবু বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দূরে মোটর বাসের হর্ন শুনা যাইতেছে। জেলখানার পাঁচিলের চারিপাশেও প্রকাণ্ড খোলা ক্ষেত, সমস্তটাকে ঘিরিয়া বেশ উঁচু এবং মোটা মাটির পগারের উপর বড় বড় ঘনসন্নিবদ্ধ গাছের সারি, সেই সারির মধ্যে কতকগুলি সুদীর্ঘ-শীর্ষ ঝাউ গাছ ভোরের বাতাসে শন্-শন্ শব্দে ডাক তুলিতেছে, সদ্য-মুক্ত দেবুর মনে সে ডাক বড় রহস্যময় মনে হইল। মনে হইল দূরান্তে ধ্বনিত আকুল আহ্বানের কম্পন এই গাছের মাথায় মাথায় স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে। পরক্ষণেই সে হাসিল। কে তাকে ডাকিবে?

আবার মনে হইল—আছে বই কি! সে তো দেখিয়া আসিয়াছে—পঞ্চগ্রামের মানুষের বুকে সে কী উচ্ছ্বাস—সমুদ্রের জোয়ারের মত জোয়ার—তাহাদের উচ্ছ্বসিত প্রাণের কত মমতা তাহার প্রতি, তাহারাই ডাকিতেছে! গৌর, জগন, হরেন, সতীশ, তারাচরণ, ভবেশ, হরিশ, ইরসাদ, রামনারায়ণ, যতীন, দুর্গা, দুর্গার মা—সকলেই তাহার পথ চাহিয়া আছে, সকলেই তাহাকে ডাকিতেছে! স্বর্ণ— স্বর্ণ তাহার পথ চাহিয়া আছে। স্বর্ণ এতদিনে বোধ হয় ম্যাট্রিক দিবার চেষ্টা করিতেছে। জেলে থাকিতে সে সংবাদও পাইয়াছে—সে পড়িতেছে! স্বর্ণ নিজেও তাহাকে পত্র লিখিয়াছে, তাহার হাতের লেখা, তাহার পত্রের ভাষা দেখিয়া দেবু খুশি হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে চমক লাগিয়াছে।

এই দীর্ঘ-দিনের বন্দিত্বের মধ্যে তাহারও অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। বন্দিত্বের বেদনা-দুঃখ সত্ত্বেও এই সময়ের মধ্যে নানা আটক-বন্দীদের সঙ্গে থাকাটাকে সে জীবনের একটা আশীর্বাদ বলিয়া মনে করিয়াছে। পড়াশুনাও সে করিয়াছে অনেক। দীর্ঘকাল পর মুক্ত পৃথিবীর বুকে দাঁড়াইয়া সে অনুভব করিল—পৃথিবীর রঙ যেন

বদলাইয়া গিয়াছে, সুরের যেন বদল হইয়াছে। আগের কালে, এই জেলে যাওয়ার পূর্বে ওই ঝাউগাছের শব্দ কানে আসিলেও হয়তো মনে এমন করিয়া ধরা পড়িত না; পড়িলেও ওটাকে মনে হইত ওপারের সাড়া—বিলু-খোকনের ডাক ময়ূরাক্ষীর বাঁধের ধারে, সন্ধ্যার পর, নির্জন তালগাছের পাতায় একটা বাতাসের সাড়া যে ডাকের ইঙ্গিত দিয়া তাহাকে এতটা দেশ-দেশান্তরে ঘুরাইয়া লইয়া ফিরিয়াছিল—বুঝি সেই ডাক।

বাস্‌টা আসিয়া দাঁড়াইল। দেবু বাসে চড়িয়া বসিল।

পূর্বমুখে বাস্‌টা চলিয়াছে। শহরের প্রান্তদেশ দিয়া প্রান্তরের বুকের লাল ধূলায় আচ্ছন্ন রাজপথ। সম্মুখে পূর্বদিগন্ত অবারিত। আকাশে জ্যোতির্লেখার খেলা চলিয়াছে, মুহুর্মুহু বর্ণচ্ছটার রূপান্তর ঘটিয়া চলিয়াছে। রক্তরাগ ক্রমশ ঘন হইয়া উঠিতেছে। সূর্য উঠিতে আর দেরি নাই। গ্রাম সম্বন্ধেই সে ভাবিতেছিল। জেলে বসিয়া সে চিন্তা করিয়াছে, অনেক বই পড়িয়াছে, যাহার ফলে একটি সুন্দর পরিকল্পনা লইয়া সে ফিরিতেছে। এবার সুন্দর করিয়া সে গ্রামখানিকে গড়িবে। যে উৎসাহ, যে জাগরণ, বন্দীদের মধ্যে যে মহাসঞ্জীবনীর সঞ্চার সে দেখিয়া আসিয়াছে, তাহাতে সে কল্পনা করিতেছিল, পঞ্চগ্রামের লোকেরা শোভাযাত্রা করিয়া চলিয়াছে। ভাঙা পথ সংস্কার করিয়া, নদী-নালায় সেতু বাঁধিয়া, কাঁটার জঙ্গল সাফ করিয়া, শ্মশানের ভাগাড়ে হাড়ের টুকরা সরাইয়া পথ করিয়া তাহারা মুক্তির পথে চলিয়াছে।

বাস্‌খানা স্টেশনে থামিল।

দেবু নামিয়া পড়িল। একটা স্যুটকেস এবং একপ্রস্থ বিছানা ছাড়া অন্য জিনিস তাহার ছিল না—সে দুইটা নিজেই হাতে করিয়া নামিয়া পড়িল।

স্টেশন প্ল্যাটফর্মটা উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। সামনেই পূর্বদিক। সূর্য উঠিতেছে। স্টেশনের সামনের প্রান্তরটার ও-মাথায় কয়েকখানা পাশাপাশি গ্রাম, সেখানে সকালেই ঢাক বাজিতেছে। আশ্বিন মাস। পূজার ঢাক বাজিতেছে। দেবু প্ল্যাটফর্মটায় ঘুরিতে ঘুরিতে একটা মিষ্ট গন্ধ পাইল। এ যে অতি পরিচিত তাহার চিরদিনের প্রিয় শিউলি ফুলের গন্ধ। চারিদিকে চাহিতেই তাহার নজরে

পড়িল প্ল্যাটফর্মের রেলিংয়ের ওপাশে স্টেশনের কর্মচারীদের কোয়ার্টার্স শ্রেণীর পাশে একটি বড় শিউলি গাছ। তলায় অজস্র ফুল পড়িয়া আছে, সকালের বাতাসে এখনও টুপটাপ করিয়া ফুল খসিয়া পড়িতেছে; তাহার মনে পড়িল—নিজের বাড়ীর সামনের শিউলি-ফুলের গাছটি। সকালের বাতাসের মধ্যেও তাহার সমস্ত শরীর যেন কেমন করিয়া উঠিল—চোখের দৃষ্টি হইয়া উঠিল স্বপ্ন তুর!

টিকিটের ঘণ্টায় তাহার চমক ভাঙিল।

টিকিট করিয়া সে আবার প্ল্যাটফর্মে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্ল্যাটফর্মে ক্রমশ ভিড় বাড়িতেছে। যাত্রীর দল এখানে ওখানে জিনিসপত্র মোট-পোঁটলা লইয়া বসিয়া আছে—দাঁড়াইয়া পাঁচজনে জটলা করিতেছে। দুই-চারিজনের চেনা মুখও দেবু দেখিতে পাইল। তাহারা সকলেই সহরের লোক; কেহ উকিল, কেহ মোক্তার, কেহ ব্যবসায়ী। দেবু তাহাদের চেনে। সে আমলে দেবুরও মনে হইত, ইহারা সব মাননীয় ব্যক্তি, তাই তাহার মনে পরিচয়ের একটা ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। দেবুকে তাহারা চেনে না। হঠাৎ নজরে পড়িল, কঙ্কণার একজন জমিদারবাবুও রহিয়াছেন। দিব্য শতরঞ্জি পাতিয়া প্ল্যাটফর্মের উপরেই আসর জমাইয়া ফেলিয়াছেন—গড়গড়ায় নল দিয়া তামাক টানিতেছেন। ভদ্রলোকের সে আমলের চালটি এখনও ঠিক আছে। যেখানেই যান, গড়গড়া তাকিয়া সঙ্গে যায়—আর গঙ্গাজলের কুঁজা। গঙ্গাজল ছাড়া উনি অন্য কোন জল খান না। নিয়মিত কাটোয়া হইতে একদিন অন্তর গঙ্গাজল আসে। সেকালে দেবু এই গঙ্গাজল-প্রীতির জন্য ভদ্রলোককে খাতির করিত। যাই হোক, তাঁহার ওই নিষ্ঠাটুকু তিনি বজায় রাখিয়াছেন। সে তখন ভাবিত, গঙ্গাজলের ফল কোন কালেও ফলিবে না। সে আজ হাসিল।

—আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

দেবু মুখ ফিরাইয়া দেখিল—তাহার পাশেই দাঁড়াইয়া আছে সস্তা সাহেবী পোশাক-পরা একজন ভদ্রলোক। সাহেবী পোশাক হইলেও ভদ্রলোকটিকে আধ-ময়লা ধুতি-জামা-পরা বাঙালী ভদ্রলোকের মতই মনে হইল, নিতান্ত মধ্যবিত্ত

মানুষ।

দেবু বলিল—আমাকে বলছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার বাড়ী কি শিবকালীপুর?

—হ্যাঁ। কেন বলুন তো? দেবু আন্দাজ করিল, লোকটি গোয়েন্দা বিভাগের লোক।

—আপনার নাম বোধ হয় দেবনাথ ঘোষ?

—হ্যাঁ। দেবুর স্বর রূঢ় হইয়া উঠিল।

—একবার এদিকে একটু আসবেন?

—কেন?

—একটু দরকার আছে।

—আপনার পরিচয় জানতে পারি?

—নিশ্চয়। আমার নাম জোসেফ নগেন্দ্র রায়। আমি ক্রিশ্চান। এখানেই এককালে বাড়ী ছিল—কিন্তু পাঁচ-ছ বছর হল—আসানসোলে বাস করছি। কাজও করি সেইখানে। এখানে এসেছিলাম আত্মীয়দের বাড়ী, আজ ফিরে যাচ্ছি আসানসোলে। আমার স্ত্রী বললেন—উনি আমাদের পণ্ডিত দেবনাথ ঘোষ। আপনার কথা তাঁর কাছে অনেক শুনেছি। আপনার জেল এবং ডিটেনশনের সময়ও খবর নিয়েছি এখানে। আজ বুঝি রিলিজড হলেন?

দেবু অবাক হইয়া গেল, কিছুই সে বুঝিতে পারিল না, শুধু বলিল—হ্যাঁ।

—আমার স্ত্রী একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

—আপনার স্ত্রী?

—হ্যাঁ। দয়া করে একবার আসতেই হবে। ওই তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।

দেবু দেখিল—একটি দীর্ঘাঙ্গী শ্যামবর্ণ মেয়ে জুতা পায়ে আধুনিক রুচিসম্মত ভাবে ধবধবে পরিষ্কার একখানি মিলের শাড়ী পরিয়া তাহাদের দিকেই চাহিয়া আছে। পাশেই তাহার আঙুল ধরিয়া আড়াই-তিন বছরের ছোট একটি ছেলে। তাহার খোকনের মত।

মেয়েটিকে দেখিয়াই দেবুর মনে বিস্ময়ের চমক লাগিল। কে এ? এ তো

চেনা মুখ! বড় বড় চোখে উজ্জ্বল নির্নিমেষ দৃষ্টি, এই টিকলো নাক —ও যে তাহার অত্যন্ত চেনা! কিন্তু কে? অত্যন্ত চেনা মানুষ অপরিচিত আবেষ্টনীর মধ্যে নূতন ভঙ্গিতে অভিনব সজ্জায় সাজিয়া দাঁড়াইয়া আছে, যাহার মধ্যে চাপা পড়িয়া গিয়াছে তাহার নাম ও পরিচয়। বিস্মিত স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া দেবু অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল, মেয়েটিও কয়েক পা আগাইয়া আসিল—বোধ হয় ঘনিষ্ঠ মুখোমুখি দাঁড়াইতে বিলম্ব তাহার সহ্য হইতেছিল না। হাসিয়া মেয়েটি বলিল—মিতে!

পদ্ম! কামার-বউ! দেবুর বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। অপরিসীম বিস্ময়ে সে পদ্মের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সেই পদ্ম? চোখে জল-জলে অসুস্থ দৃষ্টি, শঙ্কিত সন্তর্পিত অপরাধীর মত পদক্ষেপ, জীর্ণ কাপড়, শীর্ণ দেহ, কণ্ঠস্বরে উগ্র তিক্ততা, কথায় উগ্রতা—সেই কামার-বউ?

পদ্ম আবার বলিল—মিতে! ভালো তো?

দেবু আত্মস্থ হইয়া বলিল—মিতেনী? তুমি!

—হাঁ! চিনতে পার নি—না?

দেবু স্বীকার করিল—না চিনতে পারি নি। চিনেছি, মন বলছে চিনি, হাসি চেনা, টানা চোখ চেনা, লম্বা গড়ন চেনা—তবু ঠাহর করতে পারছিলাম না—কে!

পদ্মের মুখ অপূর্ব আনন্দের হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—সে শিশুটিকে বুকে তুলিয়া লইয়া বলিল—আমার ছেলে!

এক মুহূর্তে দেবুর চোখে জল ভরিয়া উঠিল। কারণ সে জানে না। চোখ দুইটা যেন স্পর্শকাতর, রস-পরিপূর্ণ ফলের মত পদ্মের ওই দুইটি শব্দের ছোঁয়ায় ফাটিয়া গেল।

পদ্মই আবার বলিল—ওর নাম কি রেখেছি জান?

দেবু বলিল—কি?

—ডেভিড দেবনাথ রায়।

পাশ হইতে নগেন রায় বলিল—আপনার নামে নাম রাখা হয়েছে। উনি

বলেন—ছেলে আমাদের পণ্ডিতের মত মানুষ হবে।

দেবু নীরবে হাসিল।

পদ্ম দেশের লোকের খবর লইতে আরম্ভ করিল; প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল দুর্গার কথা।

দেবু বলিল—ভালই থাকবে! আমি তো আজ তিন বছর পর ফিরছি মিতেনী!

পদ্ম বলিল—লক্ষ্মী পুজোর দিন দুর্গার কথা মনে হয়। লক্ষ্মী তো আমাদের নাই; কিন্তু আমাদের জমি আছে, ধান উঠলে নতুন চাল ঘরে এলে পিঠে করি, সে দিনে মনে হয়। ষষ্ঠীর দিনে মনে হয়। ষষ্ঠীর কথা মনে পড়ে।

দেবু হাসিল। আনন্দে তাহার বুক যেন ভরিয়া গিয়াছে। পদ্মের এই রূপ দেখিয়া তাহার তৃপ্তির আর সীমা নাই!...

—এই এই ঘণ্টি মারো, ট্রেন আতা হ্যায়।...

দেবু ফিরিয়া দেখিল—নীল প্যাণ্টালুন ও জামা গায়ে একজন লোক লাইন ক্লিয়ারের লোহার গোল ফ্রেমটা হাতে করিয়া চলিয়াছে, মুহূর্তে তাহার মনে পড়িয়া গেল অনি-ভাইকে। সে কিছুতেই নিজেকে সংবরণ করিতে পারিল না, বলিল—অনি-ভাই মধ্যে ফিরে এসেছিল মিতেনী।

পদ্ম স্থিরদৃষ্টিতে দেবুর দিকে চাহিয়া রহিল।

দেবু বলিল—সে কলকাতায় মিস্ত্রীর কাজ করে অনেক টাকা নিয়ে এসেছিল।...

বাধা দিয়া পদ্ম বলিল—তার কথা থাক্ মিতে। তোমাদের সে কামার বউ তো এখন আমি নই।

তাহার কথা শুনিয়া দেবু আশ্চর্য হইয়া গেল। পদ্মের কথাবার্তার ধারা সুদ্ধ পাল্টাইয়া গিয়াছে।

পদ্ম বলিল—সে দুঃখু-কষ্ট অভাবের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে—সুখের মুখ দেখেছে শুনে আমার আনন্দ হল। কিন্তু আমি এই সবচেয়ে সুখে আছি পণ্ডিত। আমার খোকন—আমার ঘর—পণ্ডিত, অনেক দুঃখে আমি গড়ে

ভুলেছি। পরকাল—?—বলিয়াই সে হাসিয়া বলিল—পরকাল আমার মাথায় থাক! এ-কালেই আমি স্বর্গ পেয়েছি। আমার খোকন!—বলিয়া সে ছেলেটিকে বুকে চাপিয়া ধরিল।

ঠং ঠং ঠং ঠন্‌ন্‌-ন্‌-ন্‌—করিয়া ট্রেনের ঘণ্টা পড়িল।

দেবু বলিল—তাহলে যাই মিতেনী!

নগেন রায় তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—আপনার সঙ্গে আমি কিন্তু আজ কথা বলতে পেলাম না!

দেবু বলিল—আপনার ছেলের বিয়েতে আমাকে নেমন্তন্ন করবেন, যাব আমি।

পদ্ম বলিল—তুমি আসবে পণ্ডিত? আমাদের বাড়ী?

—আসব বই কি মিতেনী।

ট্রেনে চাপিয়া চোখ বন্ধ করিয়া সে পদ্মের এই অপরূপ ছবিখানি মনে মনে যেন ধ্যান করিতে বসিল পদ্মের ছবি মিলাইয়া গিয়া অকস্মাৎ মনে পড়িল স্বর্ণকে। লেখাপড়া শিখিয়া স্বর্ণ এমনই সার্থক হইয়া উঠে নাই! নিশ্চয় উঠিয়াছে।

জংশনে সে যখন নামিল, তখন বেলা দশটা

শরতের শুভ্র দীপ্ত রৌদ্রে চারিদিক ঝলমল করিতেছে। আকাশ গাঢ় নীল---মধ্যে মধ্যে সাদা হালকা খানা-খানা মেঘের টুকরা ভাসিয়া চলিয়াছে—দ্রুততম গতিতে। ময়ূরাক্ষীর কিনারা ধরিয়া বকের সারি দেবলোকের শুভ্র পুষ্প-মাল্যের মত ভাসিয়া চলিয়াছে। প্ল্যাটফর্ম হইতেই ময়ূরাক্ষীর ভরা বুক দেখা যাইতেছে—জল আর এখন তেমন ঘোলা নয়, ভরা নদীতে ওপার হইতে এপারের দিকে খেয়ার নৌকা আসিতেছে। জংশনের কতকগুলা চিমনিতে ধোঁয়া উঠিতেছে।

সে প্ল্যাটফর্ম হইতে বাহির হইয়া আত্মগোপন করিয়াই একটা জনবিরল পায়ে-চলা পথ ধরিল। এখানে প্রায় সকলেই তাহার চেনা মানুষ। তাহাকে দেখিলে সহজে ছাড়িবে না। তাহারা তাহাকে ভালবাসে।

ময়ূরাক্ষীর ঘাটে গিয়া সে নামিল। খেয়া-নৌকাটা ওপার হইতে এপারে

আসিয়াছে।

এপারের ঘাটে অনেকের সঙ্গে দেখা হইল। ওপারের ঘাটেও অনেকে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারাও দেবুকে দেখিল। কয়েকটি ছেলে দাঁড়াইয়া ছিল—তাহারাও ওপার হইতে চিৎকার করিয়া উঠিল—দেবু-দা'! জনদুয়েক ছুটিয়া চলিয়া গেল গ্রামের দিকে। দেবু হাসিমুখে হাত তুলিয়া তাহাদের সম্ভাষণ করিল।

খেয়া-মাঝি শশী ভল্লা স্মিতমুখে বলিল—পণ্ডিত মাশায়! ফিরে এলেন আপুনি?

—হ্যাঁ। ভাল আছ তুমি?

শশী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমাদের আবার ভাল থাকা পণ্ডিত মাশায়! কোনরকমে বেঁচে আছি, নেলেনের (অদৃষ্ট লিখনের) দুঃখু ভোগ করছি আর কি!

দেবুর অন্তরের আনন্দ-দীপ্তি লোকটির কথার সুরের ভঙ্গিমায় ম্লান হইয়া গেল। পাশে যাহারা দাঁড়াইয়াছিল, তাহারাও সকলেই কেমন স্তিমিত শুষ্ক; সামান্য দুই একটা প্রশ্ন করিয়া সকলেই চুপ করিয়া রহিল। শশীর সঙ্গে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিল কিন্তু সকলেই।

দেবু মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—ছেলেপিলে সব ভাল আছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওই বেঁচে আছে কোন রকমে। জ্বর-জ্বালা, ঘরে খেতে নাই, পরনে কাপড় নাই, এই ভাদ্দ মাস—বুঝলেন, দুঃখু-কষ্টের আর অবধি নাই।

সেই পুরানো কথা।—অন্ন নাই, বস্ত্র নাই! অনাহারে রোগে আবার—আবার পঞ্চগ্রাম মরিতে বসিয়াছে।

দেবু আশ্বাস দিয়া বলিল—এবার বর্ষা ভাল, ধানও ভাল—আর ক'দিন গেলেই ধান উঠবে। অভাব ঘুচবে। ভয় কি!

শশী অদ্ভুত হাসিয়া বলিল—আর ভয় কি! ভরসা আর নাই পণ্ডিত মাশায়। সব গেল।

—দেবু ভাই! দেবু!...চিৎকার করিয়া বাঁধের উপর হইতে কে যেন

ডাকিতেছে। দেবু ফিরিয়া দেখিল। জগন-ভাই ডাক্তার—ডাক্তার তাহাকে ডাকিতেছে। খবর পাইয়া সে ছুটিয়া আসিতেছে। দেবু নৌকার উপরে দাঁড়াইয়া হাত তুলিয়া বলিল—জগন-ভাই!

তাক্তার চিৎকার করিয়া উঠিল—বন্দে মাতরম্! সঙ্গে সঙ্গে ছেলেগুলিও চিৎকার করিয়া উঠিল—বন্দে মাতরম্।

দেবুও হাসিয়া বলিল—বন্দে মাতরম্।

ডাক্তার হাঁপাইতেছে, সে ছুটিয়া আসিয়াছে বোধ হয়। সে বেশ অনুমান করিল, সমস্ত গ্রামের লোক বোধ হয় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গ্রাম হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে।

শিবকালীপুরের ঘাটে নামিতেই ডাক্তার তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। ছেলেগুলির মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। আগে প্রণাম করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। হাসিমুখে দেবু তাহাদের মাথায় হাত দিয়া বলিল—হই হয়েছে! হই হয়েছে!

তবু তাহারা মানে না, কিশোর প্রাণের আবেগে চাঞ্চল্যে তাহারা অধীর হইয়া উঠিয়াছে। দেবুর হাতের স্যুটকেস এবং বিছানার মোটটা কাড়িয়া লইয়া নিজেরাই মাথায় করিয়া লইল। সারিবন্দী হইয়া পায়ে-চলার পথে কিশোরবাহিনী আগাইয়া চলিল—দৃপ্ত উল্লসিত পদক্ষেপে। কিন্তু তবু যেন দেবুর মনে হইল, এ বাহিনী সম্পূর্ণ নয়। কই? গৌর কই? সর্বাগ্রে যাহার চলিবার কথা, সে কই? দেবু বলিল—ডাক্তার, গৌর কোথায় বল তো?

—গৌর? ডাক্তার বলিল—জেল থেকে এসে সে তো এখান থেকে একরকম চলেই গিয়েছে।

—চলে গিয়েছে?

—হাঁ। সে কলকাতায় কোথায় থাকে। মধ্যে মধ্যে আসে, দু-চার দিন থাকে, আবার চলে যায়। এই ক'দিন আগে এসেছিল।

—চাকরি করছে?

—চাকরি না; ভলেন্টিয়ারী করে। কি করে ভাই, সেই জানে।—তাহারা

বাঁধের উপর উঠিল।

দেবু বলিল—স্বর্ণ? স্বর্ণ কেমন আছে ডাক্তার? সে কি—সে বোধ হয় জংশনেই আছে, না?

—হ্যাঁ। জংশনে সেই থেকে মাস্টারি করে। ওখানেই থাকে। ভারি চমৎকার মেয়ে হে। এবার ম্যাট্রিক দেবে।

দেবু একবার পিছন ফিরিয়া জংশনের দিকে চাহিল। কিন্তু দাঁড়াইবার অবকাশ ছিল না। কিশোরবাহিনী আগাইয়া চলিয়াছে। তাহারা থামিতে চায় না।

সম্মুখেই পঞ্চগ্রামের মাঠ। আশ্বিনের প্রথম। বর্ষাও এবার ভাল গিয়াছে। ধান এবার ভাল। ইহারই মধ্যে ঝাড়েগোড়ে খুব জোয়ানো হইয়া উঠিয়াছে। নয়া ধান গাছের ঝাড় যেন কালো মেঘের মত ঘোরালো। মধ্যে মধ্যে কোন নালার ধারে—জমির আলের উপর কাশের ঝাড়ের মাথায় সাদা ফুল ফুটিয়াছে, আউশ ধানের শীষ উঠিয়াছে; ওই কঙ্কণা, ওই কুসুমপুর, ওই তাহার শিবকালীপুর! ওই মহাগ্রাম! মহাগ্রাম নজরে পড়িতেই সে যেন একটা প্রচণ্ড ঘা খাইয়া দাঁড়াইয়া গেল। মুহূর্তের জন্য সে চোখ বুজিল। দেহের সকল স্নায়ু ব্যাপ্ত করিয়া বহিয়া গেল একটা দুঃসহ অন্তর-বেদনার মর্মান্তিক স্পর্শ। জগন পিছন হইতে বলিল—দেবু!

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া দেবু আবার অগ্রসর হইল, বলিল—ডাক্তার!

ডাক্তার বলিল—কি হল ভাই? দাঁড়ালে?

দেবু সে কথার উত্তর দিল না, প্রশ্ন করিল—ঠাকুর মশায়? ঠাকুর মশায় আর এসেছিলেন?

ডাক্তার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—না।...কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ডাক্তার বলিল—বিশ্বনাথের খবর জান তুমি?

—জানি।—জেলেই খবর পেয়েছিলাম।

বিশ্বনাথ নাই। বিশ্বনাথ জেলের মধ্যেই মারা গিয়াছে।

কিছুক্ষণ পর আত্মসংবরণ করিয়া দেবু মুখ তুলিল। বিশ্বনাথের জন্য অন্ধকার রাত্রে জেলখানার গরাদ-দেওয়া জানালায় মুখ রাখিয়া সে রাত্রির পর রাত্রি কাঁদিয়াছে। আর তাহার কান্না আসে না।

ওই দেখুড়িয়া। বিস্তীর্ণ মাঠখানায় বুকভরা নমনীয় চাপ-বাঁধা ধান কমনীয়-সবুজ; বাতাসের দোলায় মুহূর্তে মুহূর্তে দুলিয়া ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলিতেছে। কিন্তু কোথাও কোন লোকের সাড়া আসিতেছে না। পাশাপাশি আধখানা চাঁদের বেড়ের মত পাঁচখানা গ্রাম—স্তিমিত—স্তব্ধ।

অনেকক্ষণ নীরবে চলিয়া দেবু বলিল—তারপর জগন-ভাই, কি খবর বল দেশের!

—দেশের?

—হ্যাঁ! আমাদের এখানকার?

—সব মরেছে, সব গিয়েছে, সব শেষ হয়ে গেল। খায় দায় আধপেটা, ঘুমোয়, ব্যাস। সে সব আর কিছু নাই।

—বল কি?

—দেখবে চল।

আবার নীরবে তাহারা চলিল। ছেলেগুলি নিজেদের মধ্যে মৃদুস্বরে গোলমাল করিতেছে। দেবুর মুখের দিকে কয়েকবার ফিরিয়া দেখিয়া তাহাদের কলরবের উৎসাহ নিভিয়া গিয়াছে। ধান-ভরা মাঠে কানায় কানায় ভরিয়া জল বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। আশ্বিন মাস—কন্যারাশি। "কন্যা কানে কান—বিনা বায়ে তুলায় বসে কোথা রাখিবি ধান!" আশ্বিনে মাঠ ভরিয়া জল দিতে হয়।

মধ্যে নিড়ানের কাজ চলিতেছে। দেবু বিস্মিত হইল, কৃষকেরা অপরিচিত। সাঁওতাল সব।

সে বলিল—এরা কোত্থেকে এল ডাক্তার?

জগন বলিল—শ্রীহরি ঘোষ আর ফেলু চৌধুরী আনিয়াছে—দুমকা থেকে ওদের।

দেবু আর একটু বিস্মিত হইয়া ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিল।

ডাক্তার বলিল—এসব জমি প্রায় সব শ্রীহরি আর চৌধুরীর ঘরে ঢুকেছে।

দেবু স্তম্ভিত হইয়া গেল; পঞ্চগ্রামের মানুষ সর্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছে!

শিবপুরের পাশ দিয়া মজা চৌধুরী দীঘিটা ডাইনে রাখিয়া দুধারে বাঁশ-বাগানের মধ্য দিয়া কালীপুরের প্রবেশের পথ।

ডাক্তার বলিল— চৌধুরী খালাস পেয়েছেন।

দেবু একটা ম্লান হাসি হাসিল। হ্যাঁ— খালাস পাইয়াছেন বটে!

ছেলের দল গ্রামে প্রবেশের মুখে আর মানিল না; তাহারা হাঁকিয়া উঠিল— জয়, দেবু ঘোষ কি জয়!

গ্রামের ভিতর হইতে কে ছুটিয়া আসিতেছে।

দেবু নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। ও কি দুর্গা? হ্যাঁ, দুর্গাই তো! ক্ষারে ধোওয়া একখানি সাদা থান-কাপড় পরিয়া, নিরাভরণা, শীর্ণ দেহ, মুখের সে কোমল লাবণ্য নাই, চুলের সে পারিপাট্য নাই—সেই দুর্গা এ কি হইয়া গিয়াছে!

দেবু বলিল—দুর্গা! এ কি তোর শরীরের অবস্থা, দুর্গা? তুই এমন হয়ে গিয়েছিস কেন?

দুর্গার সব গিয়াছে—কিন্তু ডাগর চোখ দুইটি আছে, মুহূর্তে দুর্গার বড় বড় চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল।

ডাক্তার বলিল—দুর্গা আর সে দুর্গা নাই। দান ধ্যান—পাড়ায় অসুখ-বিসুখে সেবা—

দুর্গা লজ্জিত হইয়া বলিল—থামুন ডাক্তার-দাদা! তারপরেই বলিল— উঃ, কতদিন পর এলে জামাই!

পথ হইতে চণ্ডীমণ্ডপের উপর শ্রীহরিকে দেখা গেল। শ্রীহরির কপালে তিলক-ফোঁটা। জগন বলিল—শ্রীহরি এখন খুব ধর্ম-কর্ম করছে।

দুর্গা ঘর খুলিয়া দিল। ঘর-দুয়ার সে পরিষ্কার রাখিত, আবারও সে একবার ঝাঁটা বুলাইয়া জল ছিটাইয়া দিল।

দেবু দাওয়ার উপর দাঁড়াইয়া চারিদিকে দেখিতেছিল। চাষী-সদ্গোপ-পল্লীর অবস্থা দেখিলে চোখে জল আসে। প্রতি বাড়ীতে ভাঙন ধরিয়াছে। জীর্ণ চালের ছিদ্র দিয়া বর্ষার জলের ধারা দেওয়ালের গায়ে হিংস্র জানোয়ারের নখের আঁচড়ের মত দাগ কাটিয়া দিয়াছে, জায়গায় জায়গায় মাটি খসিয়া ভাঙন ধরিয়াছে।

জগন অতিরঞ্জন করে নাই, পঞ্চগ্রামের সব শেষ হইয়াছে।

কত লোক যে এই কয় বৎসরে মরিয়াছে— তাহার হিসাব একজনে দিতে পারিল না। একজনের বিস্মৃতি অন্যজন স্মরণ করাইয়া দিল! এমন মরণ তাহারা মরিয়াছে যে, মরিয়া তাহারা হারাইয়া গিয়াছে। যাহারা আছে, তাহাদের দেহ জীর্ণ, শীর্ণতার মধ্যে অভাব এবং রোগের পীড়নের চিহ্ন সব অবয়বে পরিস্ফুট, কণ্ঠস্বর স্তিমিত, চোখের শ্বেতচ্ছদ পীত পাণ্ডুর, দৃষ্টি বেদনাতুর, কালো মানুষগুলির দেহ-বর্ণের উপরে একটা গাঢ় কালিমার ছাপ, জোয়ান মানুষের দেহ-চর্মে পর্যন্ত কুঞ্চনের জীর্ণতা দেখা দিয়াছে। শুধু তাই নয়—মানুষগুলি যেন সব বোবা হইয়া গিয়াছে।

দেবু এমন অনুমান করিতে পারে নাই!

তাহার মনে পড়িল সেদিনের কথা। সে যেদিন জেলে যায়—সেই দিনের মানুষের মুখগুলি।

সে কি উৎসাহ! প্রাণশক্তির সে কি প্রেরণাময় উচ্ছ্বাস! সে কথা মনে হইলে—আজ সব শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

একে একে অনেকেই আসিল। মৃদুস্বরে কুশল-প্রশ্ন করিল—দেবু কুশল-প্রশ্ন

জিজ্ঞাসা করিলে উদাসভাবে দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিল—আর আমাদের ভাল-মন্দ!

এই কথায় একটা কথা দেবুর মনে পড়িয়া গেল।

তিরিশ সালে আন্দোলনের সময় একদিন তাহাকে তাহারা প্রশ্ন করিয়াছিল—আচ্ছা, এতে কি হবে বল দিকিনি?

দেবুও তখন জানিত না এসব কথা। অস্পষ্ট ধারণা ছিল মাত্র। নিজেরই একটি অদ্ভুত কল্পনা ছিল; তাই সেদিন আবেগময়ী ভাষায় তাহাদের কাছে বলিয়াছিল। সে অদ্ভুত কল্পনা তাহার একার নয়, পঞ্চগ্রামের মানুষ সকলেই মনে মনে এমনই একটি অদ্ভুত কাল্পনিক অবস্থা কামনা করে।

সে সেদিন বলিয়াছিল—উহারই মধ্যেই মিলিবে সর্ববিধ কাম্য। সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ-পথ্য, আরোগ্য, স্বাস্থ্য, শক্তি, অভয়। প্রত্যাশা করিয়াছিল—আর কেহ কাহারও উপর অত্যাচার করিবে না, উৎপীড়ন থাকিবে না, মানুষে কেহই আর অন্যায় করিবে না, মানুষের অন্তর হইতে অসাধুতা মুছিয়া যাইবে, অভাব ঘুচিয়া যাইবে, মানুষ শান্তি পাইবে, অবসর পাইবে, সেই অবসরে আনন্দ করিবে, তাহারা হাসিবে, নাচিবে, গান করিবে, নিয়মিত দুটি বেলা ইষ্টকে স্মরণ করিবে।...

লোকে মুগ্ধ হইয়া তাই শুনিয়াছিল।

একজন বলিয়াছিল—শুনে তো আসছি চিরকাল—এমনি একদিন হবে! সে তো সত্যকালে যেমনটি ছিলো গো! বাপ-ঠাকুরদাদা সবাই বলে আসছে তা।

দেবু সেদিন আবেগবশে বলিয়াছিল—এবার তাই হবে!

তাহারা সে কথা বিশ্বাস করিয়াছিল—সত্যযুগের কথা। শুধু কি ওইটুকুই সত্যযুগ! গরুর রঙ হইবে ফিট সাদা, মানুষের চেয়েও উঁচু হইবে। গাইগরুগুলি দুধ দিবে অফুরন্ত, পাত্র হইতে উথলিয়া পড়িয়া মাটি ভিজিয়া যাইবে। সাদা পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড আকারের বলদের একবারের কর্ষণেই চাষ হইবে। মাটিতে আসিবে অপরিমেয় উর্বরতা, ফসলের প্রতিটি বীজ হইতে

গাছ হইবে, শস্যের মধ্যে কোনটি অপুষ্ট থাকিবে না। মেঘে নিয়মিত বর্ষণ দিবে; পুকুরে পুকুরে জল কানায় কানায় টলমল করিবে। মানুষ এখন আকারে ছোট, দেহে শক্তি থাকিবে না, বলশালী দীর্ঘ দেহ হইয়া তাহারা পৃথিবীর বুকে নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইবে।...

এবার এই দীর্ঘকাল জেলের মধ্যে থাকিয়া দেবু অন্য মানুষ হইয়াছে। তাহার কাছে আজ পৃথিবীর রূপ পাল্টাইয়া গিয়াছে। সে জানিয়াছে, এদেশের মানুষ মরিবে না। মহামঙ্গলময় মূর্তিতে নবজীবন লাভ করিবে। চার হাজার বৎসর ধরিয়া বার বার সংকট আসিয়াছে—ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছে—সে সংকট—সে ধ্বংস সম্ভাবনা সে উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। নবজীবনে জাগ্রত হইয়াছে। সে সমস্ত কথাগুলি স্মরণ করিয়া কথাগুলির মধ্যে শুধু পিতৃ-পিতামহের নয়—যুগ-যুগান্তরের শত শত মানুষের এই ইতিহাসের সঙ্গে তাহার নূতন মনের কল্প-কামনার অদ্ভুত মিল প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিল। শুধু তাই নয়, মানুষের জীবনী-শক্তির মধ্যে অমরত্বের সন্ধান পাইয়াছে সে। অমর বইকি! দিন দিন মানুষের বুকের উপর মানুষের অন্যায়ের বোঝা চাপিতেছে। অন্যায়ের বোঝা বাড়িয়া চলিয়াছে বিন্ধ্যগিরির মত—মানুষের প্রায় নাভিশ্বাস উঠিতেছে। কিন্তু কি অদ্ভুত মানুষ, অদ্ভুত তাহার সহনশক্তি, নাভিশ্বাস ফেলিয়াও সেই বোঝা নীরবে বহিয়া চলিয়াছে; অদ্ভুত তাহার আশা—অদ্ভুত তাহার বিশ্বাস! সে আজও সেই কথা বলিতেছে, সে দিন-গণনা করিতেছে—কবে সে দিন আসিবে! মানুষ—এই দেশের মানুষ মরিবে না। সে থাকিবে। থাকিবে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।

রামনারায়ণ এখন ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রাইমারী স্কুলের পণ্ডিত। দেবুর পাঠশালা উঠিয়া যাইবার পর সে-ই এখানকার নূতন পণ্ডিত হইয়াছে। দেবুর জ্ঞাতি। সে হাসিমুখে আসিয়া হাজির হইল।—ভাল আছ দেবু-ভাই?

তাহাকে দেখিয়া দেবুর ইরসাদকে মনে পড়িল। কেমন আছে সে!

—ইরসাদ-ভাই! সে কেমন আছে? এখানেই আছে তো?

—হ্যাঁ। পাঠশালা ছেড়ে সে মোক্তারি পড়ছে আর কৃষক-সমিতি করছে।

—ইরসাদ-ভাই কৃষক-সমিতি করছে? ইরসাদের মাথাতেও পোকা ঢুকিয়াছে!

—হ্যাঁ। দৌলত শেখেরা লীগ করেছে! ইরসাদ কৃষক-সমিতি করেছে।

—ইরসাদের শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে ঝগড়া মেটেনি বোধ হয়?—দেবু হাসিল।

—না। তবে সে আবার বিয়ে করেছে।

—বিয়ে করেও ইরসাদ কৃষক-সমিতি করছে?—বলিয়া দেবু আবার হাসিল।

রামনারায়ণ কিন্তু রসিকতাটুকু বুঝিল না—সে বলিল, তা কে জানি না ভাই! বলিয়াই অন্য প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িল—বলিল—রহম-চাচা কিন্তু গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে দেবু-ভাই!

দেবু চমকিয়া উঠিল!—গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে?

রামনারায়ণ বলিল—মনের ক্ষোভে গলায় দড়ি দিলে রহম-চাচা। বাবুরা সেই জমিটা নিলেম করে নিলে। সেই ক্ষোভেই—।···রামনারায়ণ তাহার ঘাড়টা উল্টাইয়া দিল।

দেবু এক মুহূর্ত স্তব্ধ স্তম্ভিত হইয়া গেল। রহম-চাচা গলায় দড়ি দিয়াছে!

জগন আসিয়া বলিল—খাবার রেডি দেবু-ভাই, স্নান কর। যাও যাও সব, এখন যাও। ও বেলায় হবে সব।

দুপুরের সময় দেবু একা বসিয়া ভাবিতেছিল।

সামনে শিউলি গাছটার দিকে চাহিয়া সে ভাবিতেছিল—এলোমেলো ভাবনা। শিউলিতলায় রৌদ্র-ম্লান করা শিউলিগুলি হইতে একটি মৃত্তি সকরুণ মৃদু গন্ধ আসিতেছে। শরতের দ্বিপ্রহরে রৌদ্র ঝল-মল করিতেছে। সামনে পূজা। দুর্বল দেহেও মানুষ পূজা উপলক্ষে ঘর-দুয়ার মেরামতের কাজে লাগিয়াছে। বর্ষার জলের দাগের উপর গোবরমাটির ঘন প্রলেপ বুলাইতেছে। জগন তাহাকে বলিয়াছিল—সব শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু না। তাহার কথাই সত্য। তাহারা বাঁচিয়া আছে। বাঁচিতে চায়। তাহারা মরিবে না। তাহারা সুখ চায়, স্বাচ্ছন্দ্য চায়, ঘর চায়, দুয়ার চায়, আরও অনেক চায়—নূতন জীবনে সেই সত্যযুগের

সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে শান্তিতে পুনরুজ্জীবন পরিপূর্ণ চায়। তাহারা নিজেদের জীবনে যদি না পায়, তবে পুত্র-পৌত্রাদি রাখিয়া যাইতে চায়—তাহারা সে সব পাইবে।

ওদিকে একটা দমকা হাওয়া শিউলি গাছটাকে আলোড়িত করিয়া দিয়া গেল। গাছের পাতায় যে ঝরা ফুলগুলি আটকাইয়া ছিল, ঝরিয়া মাটিতে পড়িল।

দেবু লক্ষ্য করিল না। সে ভাবিতেছিল, সবাই থাকিবে—মরিবে শুধু সেই নিজে। তাহার নিজের জীবনে তো এসব আসিবে না। তাহার পরে—সন্তান-সন্ততির মধ্যেও সে থাকিবে না। তাহার সঙ্গেই তো সব শেষ!

ঠিক এই সময় শিউলি ফুলের ম্লান গন্ধ তাহার নাকে আসিয়া ঢুকিল। চকিত হইয়া দেবু চারিদিকে চাহিল। মনে হইল, বিলুর গায়ের গন্ধ পাইল যেন, পরক্ষণেই বুঝিল, না—এ শিউলির গন্ধ!

অথচ আশ্চর্য, বিলুর মুখটা ঠিক মনে পড়িতেছে না। মনে করিতে গেলেই—। চাবুক-মারা ঘোড়ার মত তাহার সারাটা অন্তর যেন চমকিয়া উঠিল।

হায় রে, হায় রে মানুষ!

দাওয়া হইতে সে প্রায় লাফ দিয়া পড়িয়া দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিল।

হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। আবার ফিরিয়া আসিল শিউলি গাছের তলায়। কতকগুলা শিউলি ফুল কুড়াইয়া লইয়া চলিতে শুরু করিল।

আজ তিন বৎসর বিলু-খোকনের চিতার ধারে যাওয়া হয় নাই। সে ফুলগুলি হাতে করিয়া শ্মশানের দিকে চলিল।

সারাটা দুপুর সে সেই চিতার ধারে বসিয়া রহিল।

তীর্থে যাইবার পূর্বে সে বিলু-খোকনের চিতাটি বাঁধাইয়া দিয়াছিল। দেখিল, বৎসর বৎসর ময়ূরাক্ষীর পলি পড়িয়া সে মাটির নিচে কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পাঁচ-সাত জায়গা খুঁড়িয়া সে চিতাটি বাহির করিল। কোঁচার খুঁট ভিজাইয়া ময়ূরাক্ষী হইতে জল আনিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিল। বার বার ধুইয়াও কিন্তু মাটির রেশের অস্পষ্টতা মুছিয়া মনের মত উজ্জ্বল করিতে পারিল না। শেষে ক্লান্ত হইয়া তাহার উপর সাজাইয়া দিল ফুলগুলি।

অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সে হাসিল। ওই শিউলি ফুলগুলির সঙ্গেই তার

তুলনা চলে। এতক্ষণে বসিয়া একমনে চিন্তা করিয়াও সে বিলু-খোকনকে স্পষ্ট করিয়া মনে করিতে পারিল না। মনে পড়িল ন্যায়রত্নের কথা। তিনি স্পষ্ট করিয়া তাঁহার পুত্র শশীশেখরকে মনে করিতে পারেন না বলিয়াছিলেন বলিয়াছিলেন—শশীশেখর তাঁহার মধ্যে আছে, শুধু শশীশেখর যাহা তাহাকে দিয়া গিয়াছে তাহারই মধ্যে। বিলু-খোকনও ঠিক তেমনি ভাবেই তাহার মধ্যে আছে। রূপ তাহাদের হারাইয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে চকিতের মত মনে পড়িয়া আবার মিলাইয়া যায়। আবার অন্ধকার রাত্রে শ্মশানে [illegible] শব্দের মধ্যে তাহাদের অশরীরী অস্তিত্বের চাঞ্চল্য কল্পনা করিয়া দেহের [illegible] চেতনা শূন্য, অসাড় হইয়া যায়! দেবু হাসিল।

বেলা গড়াইয়া গেল, সে গ্রামে ফিরিল।

তাহার দাওয়ার সম্মুখে গ্রামের লোকজনেরা আসিয়া বসিয়াছে। কোন একটা উত্তেজিত আলোচনা চলিতেছে। ইরসাদ-ভাইও আসিয়াছে, জগন বসিয়া আছে। সে আসিয়া দাঁড়াইল।

ইরসাদ আসিয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল।—আঃ, দেবু ভাই, কতদিন পর! আঃ!

উত্তেজিত আলোচনা চলিতেছে—নবীন কুন্তের একটা জোতের নীলাম লইয়া। রামনারায়ণ বলিতেছে—নূতন আইনেও এ ডিক্রি রদ হইবে না।

নূতন প্রজাস্বত্ব আইন পাস হইয়াছে। সেই আইনের ধারা আলোচনা হইতেছে।

নবীন উত্তেজিত হইয়া বলিতেছে—আলবাৎ ফিরবে। কেন ফিরবে না?

জগন মন দিয়া ডিক্রিটা পড়িতেছে। দেবুকে দেখিয়া জগন ডিক্রির কাগজটা রাখিয়া বলিল—আমাদের এখানেও কৃষক-সমিতি করা যাক্, দেবু ভাই!

ইরসাদ উৎসাহিত হইয়া উঠিল। দেবু বলিল—বেশ তো। কালই কর। তাহার মন যেন এমনই কিছু চাহিতেছিল। জগন তখনই কাগজ কলম লইয়া বসিয়া গেল। ঠিক সেই সময়েই চিৎকার করিতে করিতে আসিয়া হাজির হইল হরেন ঘোষাল।—ব্রাদার, তোমার পথ চেয়েই বসে আছি। আমার কথা কেউ

শোনে না। এবার লাগবই।

জগন বলিল—থাম ঘোষাল!

দেবু হাসিয়া বলিল—কি?—ব্যাপারটা কি?

ঘোষাল বলিল—সার্বজনীন দুর্গাপুজো। এবার লাগবেই হবে, জগনদা হচ্ছে— আমি কতদিন থেকে বলছি।

দেবু বলিল—বেশ তো। হোক না সার্বজনীন পুজো।

ঘোষাল তৎক্ষণাৎ একটা কাগজ কলম লইয়া বসিয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্বেই আসিয়া উপস্থিত হইল বাউড়ি-মুচীর দল। কলে খাটিতে গিয়াছিল তাহারা। সবে ফিরিয়াছে। ফিরিয়াই দেবুর খবর পাইয়া তাহারা ছুটিয়া আসিয়াছে। দলের নেতা সেই পুরাতন সতীশ, সতীশও আজকাল কলে খাটে। কলে তাহার গরু-গাড়ী লইয়া কলের মাল বহিয়া থাকে। চাষও আছে। চাষের সময় চাষ করে, কলের মজুরি পাইয়া সকলেই মদ খাইয়াছে। সতীশ দেবুকে প্রণাম করিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল—আপনি ফিরে এলেন—পরাণটা আমার জুড়াল।

সতীশ বলিল—আমাদের পাড়ায় একবার পদার্পণ করতে হবে।

—কেন? কি ব্যাপার?

—গান। গান শুনতে হবে!

—কিসের গান?

—আমাদের গান।

সুতরাং পদার্পণ করিতেই হইবে।

দেবু হাসিয়া ইরসাদ এবং জগনকে বলিল—চল ভাই। গান শুনে আসি।

লোকগুলি মন্দ নাই, কলে খাটে—পেটে খাওয়ার কষ্ট বিশেষ নাই, পরনের বেশভূষাতে দৈন্য সত্ত্বেও শহরের কিছু ছাপ লাগিয়াছে, কিন্তু ঘর-দুয়ারগুলির অবস্থা ভাল নয়। কেমন যেন একটা পড়ো বাড়ীর ছাপ লাগিয়াছে। কয়েকখানা ঘর একেবারেই ভাঙিয়া গিয়াছে। যাইতে যাইতে দেবু প্রশ্ন করিল—এ ঘরগুলো খসে পড়ছে কেন সতীশ?

সতীশ বলিল—যোগী, কুঞ্জ, শম্ভু—ওরা সব চলে গিয়েছে সাহেবগঞ্জ। বলে গেল—যাক এখন ভেঙে, ফিরে এসে তখন ঘর আবার করে লোব।

ওদিকে ঢোল বাজিতে আরম্ভ হইল।

সতীশ গান ধরিল—

"ভাল দেখালে কারখানা—
দেবু পণ্ডিত অ্যানেক রকম দেখালে কারখানা,
হুকুম জারী করে দিলে মদ খেতে মানা।"

দেবু বলিল—না, ও গান শুনব না। অন্য গান কর সতীশ।

—ক্যানে, পণ্ডিত মাশায় ?

—না, অন্য গান কর। ফুল্লরার বারো-মেসে গান কর।···

গান যখন ভাঙিল, তখন রাত্রি অনেক।

ইরসাদকে ঐখান হইতে বিদায় দিয়াই সে ফিরিল। জগন মাঝখানেই একটা 'কল্' আসায় চলিয়া গিয়াছে। বাউড়ী-পাড়া পার হইয়া খানিকটা খোলা জায়গা। শরতের গাঢ় নীল আকাশে পূর্বদিক্ হইতে আলোর আভা পড়িয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর চাঁদ উঠিতেছে। সে দাঁড়াইল। বাড়ী ফিরিবার কোন তাগিদ তাহার নাই। আজ এবেলা খাবার ব্যবস্থা করিতেও সে ভুলিয়া গিয়াছে। দুর্গারও বোধ হয় মনে হয় নাই। হইলে সে নিশ্চয় এতক্ষণ তাগিদ দিত। দুর্গা এখন অন্যরকম হইয়া গিয়াছে। তাছাড়া তাহার শরীরও খুব দুর্বল। হয়তো জ্বর আসিয়াছে। উঠিতে পারে নাই।

দূরে তাম্রাভ জ্যোৎস্নার মধ্যে পঞ্চগ্রামের মাঠ নরম কালো কিছুর মত দেখাইতেছে। ময়ূরাক্ষীর বাঁধের গাছগুলিও কালো চেহারা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাঁধের গায়ের চাপ-বাঁধা শরবন কালো দেওয়ালের মত মনে হইতেছে। ওই অর্জুন গাছটার উঁচু মাথা! ওই গাছটার তলায় শ্মশান, বিলু-খোকনের চিতায় সে আজই ফুল দিয়া আসিয়াছে। আশ্চর্য, তাহাদের অভাবটা আছে! তাহারাই হারাইয়া গিয়াছে। এই মুহূর্তেই মনে পড়িতেছে—খাবারের কথা।

বাড়ী গিয়া কি খাইবে—তাহার ঠিক নাই। হাসি আসিল প্রথমটা। তারপর মনে হইল—বিলু থাকিলে খাবার তৈয়ারি করিয়া সে তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিত। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

সে আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

সে স্থির করিয়াছে—আবার সে পাঠশালা করিবে। পাঠশালার ছেলেদের সে লেখাপড়া শিখাইবে, তাহাদের কাছে বেতন লইবে! বিনিময়। সেবা নয়, দান নয়। দেনা-পাওনা। সে তাহাদের লেখাপড়ার মধ্যে তাহার জীবনের আশ্বাসের কথা জানাইয়া ও বুঝাইয়া দিয়া যাইবে। বুঝাইয়া দিয়া যাইবে—জানাইয়া দিয়া যাইবে—তোমরা মানুষ, তোমরা মরিবে না, মানুষ মরে না। সে বাঁচিয়া দুঃখ-কষ্টের বোঝা বহিয়া চলিয়াছে—পিঠ বাঁকিয়া গিয়াছে ধনুকের মত, বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া যাইতেছে মনে হইতেছে, চোখ ছটকাইয়া বাহিরে আসিতে চাহিতেছে—তবু সে চলিয়াছে সেই সুদিনের প্রত্যাশায়। সে দিন মানুষের যাহা ন্যায্য অধিকার পাওনা—তাহা তোমরা পাইবে। সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ, পথ্য, আরোগ্য, অভয়—এ তোমাদেরও পাওনা। আমি যাহা শিখিয়াছি—তাহা শোন—আমি কাহারও চেয়ে বড় নই, কাহারও চেয়ে ছোট নই। কাহাকেও বঞ্চনা করিবার আমার অধিকার নাই, আমাকেও বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহারও নাই!...মানুষের সেই পরম কামনার মুক্তি একদিন আসিবেই। সেই দিনের দিকে চাহিয়াই মানুষ দুঃসহ বোঝা বহিয়া চলিয়াছে! সযত্নে রাখিয়া চলিয়াছে, পালন করিয়া চলিয়াছে—আপন বংশপরম্পরাকে। যে মহা-আশ্বাস সে পাইয়াছে, তাহাতে তাহার স্থির বিশ্বাস—মুক্তি একদিন আসিবেই। যেদিন আসিবে, সেদিন পঞ্চগ্রামের জীবনে আবার জোয়ার আসিবে, সে আবার ফুলিয়া ফাঁপিয়া গর্জমান হইয়া উঠিবে। শুধু পঞ্চগ্রাম নয়, পঞ্চগ্রাম হইতে সপ্তগ্রাম, সপ্তগ্রাম হইতে নবগ্রাম, নবগ্রাম হইতে বিংশতি গ্রাম, পঞ্চবিংশতি গ্রাম, শত গ্রাম, সহস্র গ্রামে জীবনের কলরোল উঠিবে। সে হয়তো সেদিন থাকিবে না; তাহার বংশানুক্রমেও থাকিবে না।

চলিতে চলিতে সে হঠাৎ থমকিয়া আবার দাঁড়াইয়া গেল। তাহার মনের ওই অবসন্নতার যেন চকিতে একটা রূপান্তর ঘটিয়া গেল। সমস্ত দেহের স্নায়ু ও শিরায় একটা আবেগ সঞ্চারিত হইল। সে কি পাগল হইয়া গেল? জীবনের সকল অবসন্নতা কিসে কাটাইয়া দিল এক মুহূর্তে? এ কি মধুর সঞ্জীবনীময় গন্ধ? হাঁ। বাতাসে শিউলি-ফুলের গন্ধ আসিয়া তাহার বুক ভরিয়া দিয়াছে। সে বুঝিতে পারে নাই, আচমকা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ গন্ধটির মধ্যে যেন কি একটা আছে। অন্তত তাহার কাছে আছে। তাহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল, রোমাঞ্চ দেখা দিল শীতার্তের মত। স্বপ্নাবিষ্টের মত সে গন্ধ অনুসরণ করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল তাহার বাড়ীর সামনের সেই শিউলি গাছের তলায়। দেখিল বাতাসে টুপ্-টাপ্ করিয়া একটি দুটি ফুল গাছের ডাল হইতে খসিয়া মাটিতে পড়িতেছে। পাপড়িগুলোর এখনও বাঁকা ভাব রহিয়াছে, সবেমাত্র ফুটিতেছে। সদ্য-ফোটা শিউলির গন্ধের মধ্যে সে বিভোর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কত ছবি তাহার মনে পর পর জাগিয়া উঠিল। বুকের স্পন্দনটা চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে।

—কে? কে ওখানে? নারীকণ্ঠে কে প্রশ্ন করিল।

আবিষ্টতার মধ্যেই দেবু বলিল—আমি

দেবুর দাওয়া হইতে নামিয়া আসিল—একটি মেয়ে। জ্যোৎস্নার মধ্যে সাদা কাপড়ে তাহাকে অদ্ভুত মনে হইতেছিল, সে যেন অশরীরী কেহ। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল ও কে? বিলু? না। চাঞ্চল্য সত্ত্বেও আজ তাহার মনে পড়িল—একদিনের ভ্রমের কথা।

—বাপ্‌রে! সেই সন্ধ্যে-বেলা থেকে এসে বসে রয়েছি—বলিতে বলিতেই সে আসিয়া দাঁড়াইল একেবারে দেবুর কাছটিতে। আরও কিছু মেয়েটি বলিতে যাইতেছিল—কিন্তু বলিতে পারিল না। দেবু ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহাকে দেখিল, মেয়েটি বিস্মিত হইয়া গেল। সত্যই কি দেবু চিনিতে পারে নাই? অথবা চিনিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না? পরমুহূর্তেই দেবু তাহার চিবুকে হাত দিয়া তাহার মুখখানি আকাশের শুভ্র-জ্যোৎস্নার দিকে তুলিয়া ধরিল। এই তো,

এই সে—এই তো—নবজীবন—ইহাকেই যেন সে চাহিতেছিল। বুঝিতে পারিতেছিল না।

মেয়েটি বলিল—আমায় চিনতে পারছেন না? আমি স্বর্ণ।

—স্বর্ণ?

দেবু বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। বলিল—হ্যাঁ। বলিয়াই হেঁট হইয়া দেবুকে প্রণাম করিল। তারপর বলিল—বিকেলবেলা খবর পেলাম। সন্ধ্যের সময় এসেছি। জংশন দিয়েই তো এলেন। একটা খবর দিলেন না।

দেবু কোন উত্তর দিল না। বিচিত্র দৃষ্টিতে সে তাহাকে দেখিতেছিল। এই স্বর্ণ! তিন বৎসরে—এ কি পরিপূর্ণ রূপ লইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া আজ দাঁড়াইল! পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যে—শরতের কাশ-মঞ্জরীর মত স্বর্ণ। চোখে-মুখে জ্ঞানের দীপ্তি, সর্বদেহ ভরিয়া তরুণ স্বাস্থ্যের নিটোল পুষ্টি, গৌর-দেহবর্ণের উপর ফুটিয়া উঠিয়াছে রক্তোচ্ছ্বাসের আভা। মুহূর্তের জন্য তাহার মনে পড়িল পদ্মকে।

স্বর্ণ তাহাকে ডাকিল—দেবু-দা!

—কি স্বর্ণ!

আসুন, বাড়ীর ভিতরে আসুন। রান্না করে বসে আছি। কতবার দুর্গাকে বললাম ডাকতে। কিছুতেই গেল না।

—তুমি আমার জন্য রান্না করে বসে আছ? অবাক হইয়া গেল।

—হ্যাঁ। এখানে এসে দেখলাম, রান্নাবান্নার কোন ব্যবস্থা হয় নি, বেশ মানুষ আপনি! দেবু একদৃষ্টে তাহাকে দেখিতেছিল।

পদ্মের সঙ্গে স্বর্ণের পার্থক্য আছে। পদ্মের মধ্যে উল্লাসের উচ্ছ্বাস আছে—স্বর্ণ নিরুচ্ছ্বসিত। স্বর্ণকে দেখিয়া তাহার পলক পড়িতেছে না।

স্বর্ণ আবার ডাকিল—দেবু দা! এমন করে চেয়ে রয়েছেন কেন?

প্রগাঢ় স্নেহ এবং সম্ভ্রমের সঙ্গে দেবু হাত বাড়াইয়া স্বর্ণের হাতখানি ধরিয়া বলিল—তোমার সঙ্গে আমার অনেক কিছু বলবার কথা স্বর্ণ।

স্বর্ণ তাহার স্পর্শে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। জ্বর-জর্জর মানুষের মত দেবুর হাতখানি উত্তপ্ত। স্বর্ণ হাতখানা টানিয়া লইতে চেষ্টা করিল, দেবুর হাতের

মুঠা আরও শক্ত হইয়া উঠিল। মৃদু গাঢ়স্বরে সে বলিল—ভয় পাচ্ছ স্বর্ণ! ভয় করছে তোমার?

—দেবু-দা! একান্ত বিহ্বলের মত স্বর্ণ অর্থহীন উত্তর দিল।

—ভয় করো না। তুমি তো সেই চাষীর ঘরের অক্ষরপরিচয়হীনা হতভাগিনী মেয়েটি নও। ভয় করো না। হয়তো এই মুহূর্তটি চলে গেলে আর আমার কথা বলা হবে না। স্বর্ণ, আমি আজ বুঝতে পেরেছি। আমি তোমাকে—ভালবেসেছি।

স্বর্ণ কাঁপিতেছিল। দেবুকে ধরিয়াই কোন রূপে দাঁড়াইয়া রহিল।

রাত্রি চলিয়াছে ক্ষণ-মুহূর্তের পালকময় পক্ষ বিস্তার করিয়া। আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের স্থান পরিবর্তন ঘটিতেছে। কৃষ্ণপক্ষে সপ্তমীর চাঁদ আকাশে প্রথম-পাদ পার হইয়া দ্বিতীয়-পাদের খানিকটা অতিক্রম করিল। ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করিয়া সপ্তর্ষি-মণ্ডলের প্রদক্ষিণ সমাপ্ত হইতে চলিয়াছে। জ্যোৎস্নালোকিত শরতের আকাশে শুভ্র ছায়াপথ আকাশবাহিনী নদীর মত এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত, শুভ্র ফেনার রাশির মত ওগুলি নীহারিকাপুঞ্জ। ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের রূপান্তর ঘটিতেছে, চোখ দেখিয়া বুঝা যায় না!

দেবু স্বর্ণকে বলিয়া চলিয়াছে—তাহার যে কথা বলিবার ছিল। তাহার নিজের কথা, পঞ্চগ্রামের কথা, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। সেই পুরানো কথা। নূতন যুগের আমন্ত্রণ নূতন ভঙ্গিতে, নূতন ভাষায়, নূতন আশায়, নূতন পরিবেশে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যভরা ধর্মের সংসার—

দেবু বলিল—তোমার আমার সে সংসারে সমান অধিকার, স্বামী প্রভু নয়—স্ত্রী দাসী নয়—কর্মের পথে হাত ধরাধরি করে চলব আমরা। তুমি পড়াবে এখানকার মেয়েদের—শিশুদের, আমি পড়াব ছেলেদের—যুবকদের। তোমার আমার দুজনের উপার্জনে চলবে আমাদের ধর্মের সংসার।

দুর্গা তাহাদের কাছেই বসিয়া সব শুনিতেছিল। সে অবাক্ হইয়া গেল।

শুধু তাহাদের নয়—পঞ্চগ্রামের প্রতিটি সংসার ন্যায়ের সংসার; সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা অভাব নাই, অন্যায় নাই, অন্ন-বস্ত্র, ঔষধ-পথ্য, আরোগ্য, স্বাস্থ্য, শক্তি, সাহস, অভয় দিয়া পরিপূর্ণ উজ্জ্বল। আনন্দে মুখর, শান্তিতে স্নিগ্ধ। দেশে নিরন্ন কেহ থাকিবে না, আহার্যের শক্তিতে—ঔষধের আরোগ্যে নীরোগ হইবে পঞ্চগ্রাম; মানুষ হইবে বলশালী, পরিপুষ্ট, সবল-দেহ—আকারে তাহারা বৃদ্ধিলাভ করিবে,

বুকের পাটা হইবে এতখানি, অদম্য সাহসে নির্ভয়ে তাহারা চলা-ফেরা করিবে। নূতন করিয়া গড়িবে ঘর-দুয়ার, পথ-ঘাট। ঝকঝকে বাড়ীগুলি অবারিত আলোয় উজ্জ্বল—মুক্ত বাতাসের প্রবাহে নির্মল সুস্নিগ্ধ। সুন্দর সুগঠিত সুসমান পথগুলি ময়ূরাক্ষীর সম্মুখ দিয়া, পঞ্চগ্রামের মাঠের মধ্য দিয়া, সুদূরপ্রসারী হইয়া চলিয়া যাইবে—শিবকালীপুর হইতে দেখুড়িয়া—দেখুড়িয়া হইতে মহাগ্রাম, মহাগ্রাম হইতে কুসুমপুর, কুসুমপুর হইতে কঙ্কণা, কঙ্কণা হইতে ময়ূরাক্ষী পার হইয়া জংশনের দিকে। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে যাইবে সেই পথ। সেই পথ ধরিয়া যাইবে [illegible] মানুষ, পঞ্চগ্রামের শস্য-বোঝাই গাড়ী দেশ-দেশান্তরে। [illegible] শহরের গ্রামের মানুষ তাহাদের জিনিসপত্র লইয়া সেই পথ ধরিয়া আসিবে পঞ্চগ্রামে।

স্বর্ণ স্তব্ধ হইয়া অপলক চোখে দেবুর দিকে চাহিয়া কথা শুনিতেছে; লজ্জা সংকোচ কিছুই যেন নাই! শুধু তাহার মুখখানি অল্প অল্প রাঙা দেখাইতেছে। দুর্গা দেবুর সব কথা বুঝিতে পারিতেছে না—তবু একটা আবেগে তাহার বুক ভরিয়া উঠিতেছে; শুনিতে শুনিতে চোখ হইতে তাহার জল গড়াইয়া আসিল।

দেবু বলিল—সে দিনের প্রভাতে মানুষ ধন্য হবে। পিতৃপুরুষকে স্মরণ করবে ঊর্ধ্বমুখে—সজল চোখে। আমাদের সন্তানেরা আমাদের স্মরণ করবে, তাদের মধ্যেই আমরা পাব—তাদেরই চোখে আমরা দেখবো সেদিনের সূর্যোদয়।

হঠাৎ দুর্গা প্রশ্ন করিয়া বসিল—সে আর থাকিতে পারিল না—বলিল—জামাই!

দেবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বল্। একটু অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল—কিছু বলছিলি?

কথাটা, দুর্গার মত প্রগল্‌ভাও বলিতে গিয়া বলিতে পারিতেছিল না। জামাই পণ্ডিতের ভরসা পাইয়া সে বলিল—আমাদের মত পাপীর কি হবে জামাই? আমরা কি নরকে যাব?

হাসিয়া দেবু বলিল—না দুর্গা—নরক আর থাকবে না রে! সবই স্বর্গ হয়ে যাবে। ছোট-বড়র ছোট থাকবে না—অচ্ছুৎ-ছুতের অচ্ছুত থাকবে না—ভাল মন্দের মন্দ থাকবে না—

—তাই হয়? কি বলছ?

—ঠিক বলছি রে। ঠিক বলছি। মানুষ চার যুগ তপস্যা করছে—এই নতুন যুগের জন্যে। এই আশায় নিয়মেই রাত্রির পর দিন আসে দুর্গা। দিনের

পর মাস আসে, মাসে মাসে বছরের পর বছর আসে—পার হয়। মানুষের সেই আশা নিয়ে বসে আছে। সে দিনকে আসতেই হবে।

দুর্গা মনে মনে বলিল—সে দিন যেন জামাই তোমাকে আমি পাই। বিলু-দিদি মুক্তি পেয়েছে আমি জানি। স্বর্ণও যেন সেদিন মুক্তি পায়—নারায়ণের দাসী হয়! আমি আসব এই মর্তে—তোমার জন্যে আসব, তুমি যেন এস। আমার জন্যে একটি জন্মের জন্যে এস। তোমার কথা আমি বিশ্বাস করলাম' করছি এই জন্যে! তোমাকে পাবার জন্যে।

কৃষ্ণা-সপ্তমীর চাঁদ মধ্য আকাশে পৌছিতেছে, বর্ণ তাহার পাণ্ডুর স্তিমিত হইয়া আসিতেছে; রাত্রি অবসানের আর দেরি নাই।

আশ্বিনের প্রথমে মাঠে চাষীদের অনেক কাজ—নিড়ানের কাজ, অনেকের ক্ষেতে আউশ পাকিয়াছে—ধান কাটার কাজ রহিয়াছে—এই ভোরেই চাষীরা মাঠে যাইবে। মেয়েরা—ঘর-দুয়ারে মাড়ুলী দিতেছে। তাহাদেরও এখন সমস্ত ঘরগুলিকে ঝাড়িয়া কলি ফেরানোর মত নিকানোর কাজ—তাহার উপর আলপনা-আঁকার কাজ। পূজায় মুড়ি ভাজার কাজ, ছোলা পিষিয়া সিউই ভাজার কাজ, নাড়ু তৈয়ারীর কাজ—অনেক কাজ রহিয়াছে। এমনি করিয়া পালে-পার্বণে—ঘর নিকাইয়া আলপনা দিয়া ঘরগুলিকে শ্রীসম্পন্ন করিতে হয়। সম্মুখে মহাপূজা আসিতেছে। ময়ূরাক্ষীর ওপারে জংশনে শহরে কলের দশ বারোটা বাঁশী বাজিতেছে—একসঙ্গে। সতীশদের পাড়ায় সাড়া পড়িয়া গিয়াছে—কলের কাজে যাইতে হইবে। কত কাজ! কত কাজ!! কত কাজ!!! গাছে চারিদিকে পাখীরা কলরব করিয়া ডাকিয়া উঠিল। দুর্গা আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল—ভোর হয়ে গেল? যাই, ঘরে দোরে জল দিই! স্বর্ণও উঠিয়া গলায় আঁচল দিয়া দেবুকে প্রণাম করিল। বলিল—আমায় গিয়ে তুমি নিয়ে এস। যেদিন নিয়ে আসবে, আমি আসব। দুর্গার চোখ হইতে দুটি জলের ধারা নামিয়া আসিয়াছে। ঠোঁটের প্রান্তে প্রান্তে হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অন্ধকার কাটিয়া—সূর্য উঠিতেছে—প্রভাত চলিয়াছে দণ্ড-মুহূর্ত প্রহর দিন রাত্রির পথ বাহিয়া সেই প্রত্যাশিত প্রভাতের দিকে।

সমাপ্ত